স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা

সংকলক ও সম্পাদক

স্বামী চেতনানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী মুমুক্ষানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩

প্রথম প্রকাশ
২০ পৌষ ১৩৬৬

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা-৭০০০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ কর্তৃক সংকলিত 'স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা' বইখানি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর ১৪২ তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম পর্বের ত্রিশ বছরের ইতিহাসে এর প্রথম সম্পাদক হিসেবে স্বামী সারদানন্দের যে রচনাত্মক ভূমিকা, তার বিবরণ তদানীন্তন ও তার অব্যবহিত পরবর্তী কালে বিশিষ্ট সাধু মহারাজ ও গৃহী ভক্তমণ্ডলী যাঁরা এই দিব্যবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের শ্রীমুখ থেকে জানতে হলে এইটিকে একটি মহামূল্য আকর গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। মঠ ও মিশনের সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদটি অলঙ্কৃত করা ছাড়াও, স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীমা সারদামণির 'দ্বারী' হিসেবে তাঁর অসামান্য-সেবা ও পরিচর্যার যে অতুলনীয় নিদর্শন রেখে গেছেন, সে বিষয়েও এই গ্রন্থখানি অনেক অমূল্য তথ্যের সন্ধান দেবে। বাগবাজারে অবস্থিত এই যে 'মায়ের বাড়ি'—তার জমি কেনা থেকে শ্রীশ্রীমায়েব এই বাড়িতে পুণ্য পদার্পণ পর্যন্ত স্বামীজী নির্দেশিত আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে শরৎ মহারাজ অপূর্ব কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও স্থৈর্যের এক বিবল নজির স্থাপন করে পরবর্তী যুগের মঠ ও মিশনের সকল কর্মী ও সেবকদের নিকট এক আদর্শ হয়ে আছেন। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর 'শরৎ'কে আপন সন্তানের অধিক আপনার বলে জ্ঞান করতেন। তিনি বলতেন, 'শরৎ, আমার মাথার মণি'। রোগশয্যায় শ্রীমা তাঁব এই সন্তানের শ্রীহস্ত থেকে পথ্যাদি গ্রহণ করে যে তৃপ্তি ও আনন্দ পেতেন, তা আর অন্য কারও কাছ থেকে নয়। এছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দেব পাশ্চাত্য ভ্রমণের শেষ দিকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর এদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী সারদানন্দজী আমেরিকা ও ইংলন্ডে অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার-কার্যে সবিশেষ সাফল্য-অর্জন করে ঐ-সব দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর মনে আচার্য হিসেবে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তা-ও মঠ ও মিশনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ এই রকম একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনায় উদ্যোগী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারদা-স্বামীজীর ভক্তমণ্ডলীর বিরাট এক চাহিদা পূরণ করেছেন। এ জন্য আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিটি প্রসঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরবৃন্দ ও তাঁদের সংস্পর্শে আসা সকল সাধু মহাবাজও গৃহী ভক্তমণ্ডলীর কথা ও কাহিনী আমাদের মনে যে আনন্দ-সুধার সন্ধান দেয়, তা এক কথায় অনাস্বাদিত-পূর্ব আর যে আধ্যাত্মিক প্রেরণার সঞ্চার করে, তাও সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশনার খুঁটিনাটি কার্যে আমরা যেসব স্বেচ্ছাব্রতী কর্মীদেব স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা লাভ করেছি, তার জন্য আমরা তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

আশাকবি, এই গ্রন্থটি শ্রীবামকৃষ্ণ ভাবানুরাগী ও ভক্তমহলে যথাযোগ্য সমাদব লাভ করবে।

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সূচীপত্র

ভূমিকা

মানবজীবনে স্মৃতির মূল্য অপরিসীম। মানুষের হাত-পা ভাঙলে বা চোখ-কান নষ্ট হলে তার জীবনের বিরতি হয় না। কিন্তু স্মৃতিলোপ পেলে জীবন অচল। কালচক্র ক্রমাগত ঘুরছে। বর্তমানের বা ভবিষ্যতের স্মৃতি কোথায়? অতীতেরই স্মৃতি। মানুষ অতীতের সুখদুঃখের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে। স্মৃতি হাসায়, স্মৃতি কাঁদায়। আমরা যাদের পছন্দ করি না, তাদের স্মৃতি আমাদের মানসপটে ম্লান হয়ে যায়; আর যাদের ভালবাসি তারা স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠে।

"স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা" গ্রন্থে আমরা দেখব অনেক সন্ন্যাসী ও গৃহিভক্তের বহু মূল্যবান স্মৃতিকথা ও উপদেশ। এঁরা সত্যি ভাগ্যবান; কারণ এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহান শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে নিজেদের অধ্যাত্মসম্পদে পুষ্ট করেছেন এবং ঐ স্মৃতিগুলি ভাবী কালের অধ্যাত্মপিপাসুদের জন্য রেখে গেছেন। এই ৮০/৯০ বছরের পুরনো দিব্য স্মৃতিগুলি এখনও আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয় এবং প্রাণে জাগিয়ে দেয় ভগবানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

স্বামী সারদানন্দের জীবনী (১৮৬৫-১৯২৭) ঘটনাবহুল। ১৮৮৩ সালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন, গুরুরূপে বরণ করেন এবং ঠাকুরের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রাণঢেলে সেবা করেন। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শরতের (পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ) উপর উপবেশন করে বলেন, "দেখলাম ও কতটা ভার সইতে পারে।" আর একদিন বলেছিলেন, "শশী ও শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের (যিশুখ্রিস্ট) দলে।" ১৮৯৬ সালে পাশ্চাত্যে যাবার পথে তিনি রোমে সেন্ট পিটারের চার্চে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিস্থ হন। তাঁর এই অধ্যাত্মানুভূতি ঠাকুরের দিব্যদর্শনের সত্যতা প্রমাণ করে।

১৮৮৬ সালে ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে সারদানন্দ তপস্যা

ও তীর্থপর্যটন করেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে যান। দুই বৎসর পরে তিনি ভারতে ফিরে এসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক হন এবং আজীবন সেই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিরাট রামকৃষ্ণ সংঘের ভার বহন করা সোজা কথা নয়। তাঁর অপূর্ব চরিত্র, ধীর স্বভাব, কর্মকুশলতা, বিদ্যাবত্তা, মিষ্ট ব্যবহার জেনে স্বামীজী তাঁকে রামকৃষ্ণ সংঘের "ভারী' করেন। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, "শরতের গায়ে বেলে মাছের রক্ত, কিছুতেই তাতে না।"

স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভার সারদানন্দ গ্রহণ করেন। মা বলতেন, "শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।" "শরৎ আমার মাথার মণি।" "শরৎ আমার বাসুকি—সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করছে; যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।" "শরৎ সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ নয়। শরৎ সর্বভূতে শুধু ব্রহ্ম দেখে না, সে সব মেয়ের মধ্যে আমাকে দেখে, সব পুরুষের মধ্যে ঠাকুরকে দেখে। শরতের মতো হৃদয় দেখা যায় না।" শুধু শ্রীশ্রীমা নন, স্বামীজী, রাজা মহারাজ ও অন্যান্য গুরুভাইয়েরা এই ধীর, স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিটির উপর রামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালনার ব্যাপারে সর্বতোভাবে নির্ভর করতেন। এই নিরভিমান সাধুটি স্নেহ, ভালবাসা, ক্ষমা ও আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সাধু ও ভক্তদের ভগবানের পথে চালিত করতেন।

একবার এক নবাগত ভদ্রলোক উদ্বোধনে এসে শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এখানে কী করেন?" শরৎ মহারাজ বললেন, "কি আর করব—এই মায়ের বাড়ির দ্বারী হয়ে আছি।" পরে ভদ্রলোক অফিসে গিয়ে অন্য সাধুদের কাছে যখন শুনলেন যে ঐ ব্যক্তিটি রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের রচয়িতা, তখন তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। স্বামী সারদানন্দ তাঁর শেষ জন্মদিনে বেলুড় মঠে যান। সেখানে ভক্তেরা তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে সাজান। তিনি সব দেখে মন্তব্য করেন ঃ "দশচক্রে ভগবান ভূত। কোথায় মায়ের বাড়ির দারোয়ান—তাকে কিনা ফুল দিয়ে সাজিয়ে ভগবান করে তুলেছে।"

১৯৬৪ সালে বেলুড় মঠে একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বামী বোধাত্মানন্দ আমাকে শরৎ মহারাজের তাঁর এই স্মৃতিটুকু বলেন ঃ ''একবার একখানি জরুরি চিঠি নিয়ে আমি বেলুড় মঠ থেকে উদ্বোধনে গেলুম। শরৎ মহারাজ তখন তাঁর ছোট ঘরটিতে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'মহাবাজ, এই জরুরি চিঠিটা মঠ অফিস থেকে আপনার জন্য এনেছি।' তিনি তৎক্ষণাৎ গড়গড়ার নলটি পাশে রাখলেন। তারপর চশমা পরে কাঁচি দিয়ে খামটা কেটে চিঠিটা পড়লেন। আবার কাঁচিটি তার জায়গায় রেখে, চিঠিটি খামের ভিতর ঢুকিয়ে ডানদিকে ডেস্কের উপর রাখলেন; পরে নলটি ধরে তামাক খেতে শুরু করলেন। তাঁর এই আচরণ দেখে আমার মনে হলো, তাঁর মন সদা ভগবানে নিবিষ্ট। ঠাকুরের কাজ করবার জন্য নিচে নামিয়ে আনেন, আবার কাজ শেষ হলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মশগুল হয়ে থাকেন।''

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের জীবনকথা, সাধনকথা, ভ্রমণকথা, স্মৃতিকথা ও উপদেশ অধ্যাত্মজগতের পরম সম্পদ। এই গ্রন্থের মধ্যে ছড়ান আছে ঠাকুর মা ও তাঁদের শিষ্যশিষ্যাদের নানাবিধ ঘটনা, আধ্যাত্মিক জীবন গড়বার বহু সদুপদেশ, রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস। পুরনো 'উদ্বোধন' পত্রিকা ও নানা গ্রন্থে প্রকাশিত সব স্মৃতিকথা সংগ্রহ করে আমি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে সেগুলি উৎসর্গ করেছি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করলে যেমন পূজকের কোন বাহাদুরি থাকে না, আমারও তেমনি কোন কৃতিত্ব নেই। পাঠকের অবগতির জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে উৎস দেওয়া হলো। ভক্তজন এই গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা পেলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী সারদানন্দ (জীবন কথা)

স্বামী নিখিলানন্দ

(১)

পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে যখন মানবজাতির মধ্যে ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় ভগবান তখন স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হন। আবার অবতার পুরুষগণের লোকোত্তর জীবন পাঠে দেখা যায় যে তাঁহারা স্বীয় লীলাসহচর নিত্যপার্ষদগণ সমভিব্যাহারে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সত্ত্বঘনমূর্তি অবতারগণ সাধন সহায়ে লুপ্তধর্মের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং স্বীয় সাধনলব্ধ-শক্তি স্বল্প সংখ্যক শিষ্যগণের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। সর্বসাধারণ তাঁহাদের জীবন বা আদর্শ সহজে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারে না। মানব সাধারণের মধ্যে উক্তভাব প্রচারের উপযুক্ত রজোশক্তি অবতার সহচর নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারাই নানাভাবে ও নানা উপায়ে ভগবদ্বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে প্রচার করিয়া পৃথিবীতে ঈশ্বরের জন্মপরিগ্রহরূপ দৈব কার্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। আবার একমাত্র তাঁহারাই অবতারগণের অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসমূহ অজ্ঞ ও মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মধ্যে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন। এই সকল লীলাসহচরগণ আমাদের ন্যায় পূর্ব পূর্ব জন্মানুষ্ঠিত কর্মদ্বারা চালিত হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ ও ঈশ্বরকোটি শ্রেণির লোক। ইঁহারা অতীত কালে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া লোক-দুঃখ অপনোদনের নিমিত্ত বারংবার অবতারের সঙ্গে লোকসমাজে অবতীর্ণ হন। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, বুদ্ধ ও আনন্দ, শংকর ও পদ্মপাদ, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ, যিশু ও পিটার প্রভৃতি অবতার ও তাঁহাদের নিত্যপার্ষদগণের জীবনী বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুজাতি যখন আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ে অবনতির নিম্নতম সোপানে অতি দ্রুতগতিতে অবরোহণ করিতেছিল এবং যখন ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ দুর্ভেদ্য অন্ধতমিস্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল তখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপী শশধর ভারতীয় গগনে উদিত হইয়া স্বীয় নির্মল ও শুভ্র আলোক সহায়ে দিঙ্‌মণ্ডল পুনরুদ্ভাসিত করেন এবং সহস্র বৎসরের দাসত্বজনিত জাতীয় অধঃপতনের গতি অবরুদ্ধ করিয়া পুনরায় এই প্রাচীনতম আর্যজাতির চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ নির্দেশ করেন। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মানুসারে সেই নিশানাথ সদৃশ অবতারের সহিত কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রও আকাশে উদিত হইয়া উহার শোভা পরিবর্ধন করেন। কালক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী চন্দ্র অস্তমিত হইয়া স্থূললোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেও উক্ত তারকামণ্ডলী "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" ধর্মের বাণী ঘোষণা দ্বারা রজনীমুগ্ধ পথিকের ন্যায় বহু মানবের গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। আজ স্বামী সারদানন্দের মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সহচর আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র লোকনয়নের বহির্ভূত হইয়াছে। মহামহিমময় প্রবুদ্ধ-ভারতের দীপ্তশীর্ষ শোভিত করিবার জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক কিরীট স্বীয় হস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা হইতে আর একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড স্থূল দৃষ্টিতে খসিয়া পড়িয়াছে।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী যৌবনের প্রারম্ভেই নরেন্দ্র প্রভৃতি মধুকরের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের শতদল সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুবক সাধকের প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ছেলেটির দেখছি তীব্র বৈরাগ্য।" শরৎ সেই সময় কলেজে পড়িতেন এবং ধর্মোপদেশের জন্য কেশববাবুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। পরে বোধ হয় শ্রীযুত কেশব সেনের বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় অবগত হইয়া তদীয় পূতসঙ্গলাভের নিমিত্ত তৎপদপ্রান্তে উপস্থিত হন। সেই সময় তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুত শশীও (পরে ইনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন) ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। আশ্চর্যেব বিষয়

এই যে, দুই ভাই একই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিলেও প্রায় এক বৎসর যাবৎ তাঁহারা কেহই পরস্পরের আগমনের বিষয় অবগত ছিলেন না। পরে ঠাকুরই একদিন উভয়কে এই বিষয় জ্ঞাত করেন।

জহুরি-শিরোমণি শ্রীরামকৃষ্ণদেব হীরক ও মণি চিনিয়া লইতে অদ্ভুত পারদর্শী ছিলেন। সুতরাং উজ্জ্বল ও চাকচিক্যশীল বহু সংখ্যক কাচ ও স্ফটিকখণ্ড মধ্যে কয়েক টুকরা মণি বাছিয়া লইতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তিনি এই বালকশিষ্যগণকে শীঘ্রই অবতারের নিত্য-লীলা-সহচর আপনার জন বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে সর্বদা সাধনপথের নূতন নূতন তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অলৌকিক বিজ্ঞান সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনও দুই জন শিষ্যের জন্য একরূপ পন্থা নির্দেশ করিতেন না। বিভিন্ন রুচি ও সংস্কার অনুসারে শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন সাধন মার্গে দীক্ষিত করিতেন। প্রত্যেক অন্তরঙ্গের সহিত তাঁহার এক বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কাহাকে সাকার উপাসনায়, কাহাকেও বা নিরাকারে, কাহাকে জ্ঞানমার্গে আবার কাহাকেও বা ভক্তি বা কর্ম্মমার্গে তিনি উপদেশ দিতেন। কিন্তু বিভিন্ন পথে গমন করিলেও সকলেই যেন অবশেষে এক অদ্বৈত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই বিষয়ে তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও "প্রকৃতি" ভাবাপন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতেন। আবার কাহাকেও বা "অখণ্ডের ঘর" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। যুবক শরতের সহিত তাঁহার কি অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহার ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। কারণ আমরা পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজের নিকট শুনিয়াছি যে এই সকল বিষয় অপর কাহাকে এমন কি স্বামী বিবেকানন্দকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। শরৎ মহারাজও এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুরের কয়েকটি বাণী আমরা তাঁহার নিকট বা অন্য কোনও বিশ্বস্ত-সূত্রে যাহা জানিয়াছি তাহা এস্থলে পাঠককে দিলে মন্দ হইবে না।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত ভক্তগণ সমক্ষে জিতেন্দ্রিয় সর্বসিদ্ধিদাতা পার্বতীসুত গণেশের প্রশংসা করিতেছিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া শরৎ মহারাজ

বলিলেন, "মহাশয়, আমারও ঐ ভাব ভাল লাগে। গণেশের আদর্শই আমার আদর্শ বলিয়া মনে হয়।" ঠাকুর ইহাতে উত্তর করিলেন, "তোর গণেশের ভাব নয়, ভৈরবের ভাব। তোর ভিতর শিব আছে, জানবি। আর আমার মধ্যে শক্তি আছে। তোর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য আমার মধ্যে বিদ্যমান।" এই সকল কথার গভীর অর্থ আমাদের ন্যায় অজ্ঞ মানবের বোঝা অসম্ভব। শিব ও গণেশ ভাবের প্রকৃত মর্ম তিনিই অবগত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে পূজনীয় শরৎ মহারাজের অদ্ভুত ত্যাগ বৈরাগ্য, অলৌকিক সংযম ও প্রেম, অদৃষ্টপূর্ব গাম্ভীর্য ও শান্তভাব দেখিয়া যোগীশ্বর কৈলাসপতির অটল অচল মহিমা-মণ্ডিত ছবি স্বতঃই দর্শকের মনে উদিত হইত।

আর একদিবস ঠাকুর শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই দুই ভাইকে পূর্বে ঋষিকৃষ্ণের দলে দেখিয়াছিলাম।" বাল্যকাল হইতেই শরৎ মহারাজের যিশুখ্রিস্টের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি ঈশা কথিত বাইবেল শাস্ত্রের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই দুই ভাই পূর্বকালে যিশুখ্রিস্টের পার্ষদরূপে গ্যালিলি দেশে জন্মিয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? তবে আমরা ইহা অবগত আছি যে, ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পর শরৎ, স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে মার্কিন দেশে যাইবার পথে রোম নগরে উপস্থিত হন। একদিন উপাসনা কালে উক্ত শহরের সুপ্রসিদ্ধ ভজনাগার সেণ্ট পিটার গির্জায় গমন করেন। সমবেত শতসহস্র নরনারীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অপূর্ব ভাব পরিবর্তন লক্ষিত হয় এবং তিনি কিয়ৎকালের জন্য সমাধিতে মগ্ন হন। কোন্ পূর্বস্মৃতি তাঁহার মনকে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ ভগবান ঈশা মসির ভাবে উদ্বেলিত করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে?

পূজনীয় শরৎ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, একদিন ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে তাঁহাদের সাধন প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ধ্যানে কাহার কোন্ দেবমূর্তির দর্শন হয় এই সকল বিষয় কথাবার্তা হইতেছিল। হঠাৎ ঠাকুর শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কোন্ মূর্তি দেখতে চাস?" ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেরই মনে হইতেছিল তিনি যেন ইচ্ছা মাত্রই

সাধককে ধ্যানে দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করাইতে সমর্থ ছিলেন। যুবক শরৎ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি কোন দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করিতে চাই না। আমি সর্বজীবে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাই।" ঠাকুর ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "ওরে, উহা যে সব শেষের কথা। সাধনার শেষেই ঐরূপ উপলব্ধি হয়।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "তা হোক গে। আমি উহাই চাই। কোনও বিশেষ দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা নাই।" তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, "আমি বাস্তবিকই কোনও দেবদেবীর বিশেষ মূর্তি দর্শন করি নাই। তবে ঠাকুরের নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাঁহার কৃপায় উহার কিছু উপলব্ধি হইতেছে।" একজন অপরিণত বয়স্ক যুবকের মনে ধর্মের এইরূপ গভীর প্রেরণা দেখিয়া কে মনে করিবে যে, ইনি আমাদের মতই একজন সাধারণ সংস্কার বিশিষ্ট মানব ছিলেন।

ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন শরৎচন্দ্র প্রথমে হিন্দু দেবদেবীতে বড় বিশ্বাসবান ছিলেন না; বরং নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিই তিনি সমধিক অনুরাগ সম্পন্ন ছিলেন। সেই জন্য দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ঠাকুরের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া শরৎ মহারাজ প্রথমটা কিছু কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিলেন। অনেক সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত কালীমন্দিরে বা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গমন করিতেন এবং ঠাকুরকে সর্বদাই উক্ত দেবদেবীর সম্মুখে ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দেখিতেন। অন্তরের সহিত না হইলেও ঠাকুরের প্রতি গভীর ভালবাসাবশত শরৎ মহারাজও দেবদেবীর সম্মুখে ঐরূপে মস্তক অবনত করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রথমে তাঁহার অনুকরণে ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করিয়াছি। পরে তাঁহারই কৃপায় ঐ সকল দেবদেবীর মহিমা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছি।" আর একবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "যৌবনকালে আমরা কেবলমাত্র পুরুষকারে বিশ্বাসবান ছিলাম। অদৃষ্ট বা ঈশ্বর ইচ্ছায় কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন সমস্ত কার্যই নিজ পুরুষকার সহায়ে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতাম। ছোট বড় সমস্ত কার্যেই ঐরূপে কৃতকার্য হইয়াছি। ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুদিন পরে ঐ বিষয়ে প্রথম ধাক্কা

পাইলাম। যে সকল কার্য পূর্বে ইচ্ছামাত্র-সহায়ে অবলীলাক্রমে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই সকল কাজে অক্ষম বোধ করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের কৃপায় অচিরে বুঝিতে পারিলাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য করিবার কাহারও কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই।"

অদ্ভুত ঠাকুরের অদ্ভুত শিক্ষা প্রণালী ছিল। এই ক্রান্তদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে মানুষ তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলেও কিছু লুকাইয়া রাখিতে পারিত না। তিনি মানুষের মন লইয়া কাদার তালের ন্যায় নাড়াচাড়া করিতেন ও ইচ্ছা মাত্রই উহাকে বিশিষ্ট আকৃতিতে পরিণত করিতে পারিতেন। শরৎ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া দ্রুত গতিতে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কখনও বা পঞ্চবটীতে ধ্যান জপে, কখনও বা মধুর কীর্তনে আবার কখনও বা ঠাকুরের শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে শরৎ মহারাজ অন্য যুবক ভক্তগণের ন্যায় পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি, নরেন্দ্র, রাখাল প্রমুখ ঠাকুরের অপর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইলেন। এই পরিচয় পরে যাবজ্জীবন বন্ধুত্বে ও আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ঠাকুর দেহত্যাগের পূর্বে এই সকল বালক শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক জীবন গড়িবার ভার নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করেন। ঠাকুরের অপর একজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মুখে শুনিয়াছি, "আমরা সকলে নরেন্দ্রের নূতন নূতন ভাবোদ্দীপক কথা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতাম। আমি সর্বদাই তাঁহার মুখে নূতন কথা শুনিতে ভালবাসিতাম। তিনি অনেক সময় একই বিষয়ের বারংবার অবতারণা করিতেন, বারবার একই বিষয় শুনিয়া আমি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতাম। কিন্তু শরৎ মহারাজ পুরাতন কথাও বিশেষ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, 'তুমি একই কথা বারবার কিরূপে আগ্রহের সহিত শুনিতে পার! ঐ সকল কথা তো অনেকবার শুনিয়াছ।' তাহাতে শরৎ মহারাজ উত্তর করিতেন, 'তুই বুঝিস না, নরেন্দ্রের নিকট একই বিষয় বারংবার শুনিলেও আমি প্রত্যেক বারই উহাতে নূতন অর্থ দেখিতে পাই। নরেন্দ্রের কথা কখনও আমার নিকট পুরাতন

বলিয়া মনে হয় না।'" স্বামী বিবেকানন্দের উপর তাঁহার কি অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল!

দেহত্যাগের সময় সমীপাগত জানিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কয়েকজন সর্বত্যাগী যুবক শিষ্যকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্যের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে দুরারোগ্য গলরোগে আক্রান্ত হইলেন তখন এই সকল যুবক অন্য গৃহস্থ ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও ঠাকুর তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মিগণের চরিত্র গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অপার্থিব ভালবাসা-সূত্রে গ্রথিত করিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কাশীপুর বাগানে স্থানান্তরিত করার পর নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, শরৎ, শশী প্রভৃতি যুবকগণ বাড়ি ঘর পরিত্যাগ করিয়া গুরুসেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিনিয়োগ করিলেন। এই সময় যে দ্বাদশজন শিষ্য ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন শরৎ মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ক্রমে দীপ নির্বাণ হইল। ঠাকুর ভক্তগণকে কাঁদাইয়া ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্থূল লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে শিষ্যগণ নিজেদের পিতৃহীন অনাথ শিশুর ন্যায় অসহায় বোধ করিলেন। এমন কি তাঁহার যুবক শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় পাঠাদি কার্যে পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন। শরৎ মহারাজ সেই সময় কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। বীর নরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় যুবকগণ আবার গৃহত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে সমবেত হইলেন। তাঁহার তেজোময় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জীবন উৎসর্গ করিতে যুবকগণ পুনরায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

বরাহনগর মঠে যে তপস্যার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে তাহার তুলনা দুর্লভ। যুবকগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান-জপ ও শাস্ত্রাদি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, সামান্য আহারই জুটিত; আবার কোন দিন তাহাও জুটিত না। কোন দিন কেবল মাত্র ভাতের জোগাড় হইত, অন্য কোনও ব্যঞ্জন হইত না। আর যেদিন কোন আহার্যই জুটিত না সেদিন

তাঁহারা মঠের দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কীর্তনে বা তপস্যায় অতিবাহিত করিতেন। নিকটবর্তী শ্মশানে যাইয়া ধ্যান ও জপে যুবকগণ কত বিনিদ্ররজনী যাপন করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ শরতের ধ্যান ও ধর্মানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। একদিন এই সকল যুবক অগ্নি-সাক্ষী করিয়া নিয়মিত অনুষ্ঠানের সহিত সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিলেন। শরৎচন্দ্র—স্বামী সারদানন্দরূপে নবজন্ম লাভ করিলেন।

কিছুদিন পর বরাহনগর মঠের কঠোর জীবনও যুবক সন্ন্যাসিগণের নিকট ভগবান লাভের পক্ষে যথেষ্ট তপস্যা বলিয়া মনে হইল না। ভগবদ্দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করিতেছিল। তাঁহারা কৌপীন ও বহির্বাস মাত্র সম্বল করিয়া ভিক্ষুবেশে দেশ পর্যটনে নির্গত হইলেন। ভিক্ষালব্ধ পবিত্র অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া সাধন ভজনে দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ দুই জন গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে পুরীধামে যাত্রা করিলেন। তথায় কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছুকাল পর তিনি তপস্যা মানসে উত্তরাখণ্ড অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কেদারনাথ ও বদরী-নারায়ণ দর্শন করিয়া আলমোড়ায় কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়জন গুরুভ্রাতার সহিত হিমালয়ের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। স্বামী সারদানন্দ হৃষীকেশে কিছুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। হিমালয় ভ্রমণকালে একটি সামান্য ঘটনায় তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন দুই জন গুরুভ্রাতার সহিত তিনি এক পাহাড়ের উচ্চ শিখর দেশ হইতে অবরোহণ করিতেছিলেন। পথ অত্যন্ত বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল ছিল। তাঁহারা যষ্ঠি সহায়ে পথ অতিক্রমণ করিতেছিলেন। ঐ রাস্তায় কিঞ্চিন্মাত্র পদস্খলন হইলে মৃত্যু একরূপ অবশ্যম্ভাবী ছিল। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধার সহিত তাঁহাদের রাস্তায় দেখা হয়। বৃদ্ধার নিকট যষ্টিও ছিল না। তিনি অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবনের সম্বল যষ্টিখানি উহার হস্তে অর্পণ করিলেন। বন্ধুগণ ইহাতে আপত্তি করিলে তিনি ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "বেচারির বড় কষ্ট হইতেছে।

আমা হইতেও উহার লাঠির অধিক প্রয়োজন।" পরে এটোয়া ও এলাহাবাদ হইয়া স্বামী সারদানন্দ বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতোমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দুন্দুভিনাদে মার্কিন দেশে বেদান্তের মহিমা ঘোষণা করেন। চিকাগো ধর্মসভায় ও আমেরিকার বিভিন্ন নগরীতে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আমেরিকার নানা স্থানে বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্বামীজীর নিকট চারিদিক হইতে সাদর আহ্বান আসিতে লাগিল। কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপে বেদান্ত প্রচারের জন্য উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তাঁহার কর্মের সহায়তা মানসে স্বামী সারদানন্দকে পাঠাইবার জন্য কলকাতায় চিঠি লিখিলেন। স্বামী সারদানন্দ অচিরেই তাঁহার গুরুভ্রাতার সহিত লণ্ডনে মিলিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুযোগ্য গুরুভ্রাতাকে পাশ্চাত্য দেশেব কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহাকে নিউইয়র্কে প্রেরণ করিলেন। স্বামী সারদানন্দ মার্কিন দেশে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা ও অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চরিত্র ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইযা বহু সংখ্যক নরনারী ধর্মশিক্ষার জন্য তদীয় পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব উদার শিক্ষা ও সবল উপদেশে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার ভূয়োদর্শিতা ও গভীর জ্ঞানে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কয়েকটি সভায় হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিবাব নিমিত্ত তিনি আহুত হন। তিনি মার্কিন যুক্তরাজ্যের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নিউইয়র্ক শহরে নিয়মিতরূপে বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় স্বামী সারদানন্দ একটি অলৌকিক ঘটনার বিষয় পরিজ্ঞাত হন। একদা তিনি কোনও নগরে জনৈকা ভদ্রমহিলার বাটিতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। সেই মহিলাটি তাঁহার একখানা পুস্তকে ঠাকুরের ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "স্বামীজী, আপনি এই ছবি কোথায় পাইলেন। আপনি এই লোকটিকে চেনেন কি? আমি বহুদিন যাবৎ ইঁহার খোঁজ করিতেছিলাম। আজ আপনার নিকট তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলাম।" স্বামী সারদানন্দ এই কথায় চমৎকৃত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই ছবিতে অঙ্কিত মহাপুরুষের বিষয় কিরূপে অবগত হইলেন?" উক্ত মহিলা উত্তরে বলিলেন, "আমি কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন স্বপ্নে এই মহাপুরুষের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। স্বপ্নে ইঁহার বিষয় অধিক কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল মাত্র বুঝিয়াছিলাম যে ইনি প্রাচ্যদেশবাসী কোনও মহাপুরুষ হইবেন। তাঁহার দর্শনের পর এক অপূর্ব শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। ভারত, চীন বা জাপানের লোক সন্ধান পাইলেই তথায় যাইয়া ঐ স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের বিষয়ে খোঁজ করিয়াছি। অদ্য আপনার নিকট তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া বিশেষরূপে আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আপনি নিশ্চয়ই ইহার বিষয় অবগত আছেন। আপনি আমাকে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু বলুন।" স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের অলৌকিক মাহাত্ম্যে চমৎকৃত হইয়া ঐ মহিলাটির নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় বর্ণনা করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। উহার কার্যভার পরিচালনার জন্য একজন সুদক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভব করিয়া তিনি স্বামী সারদানন্দকে এদেশে ফিরিয়া আসিতে চিঠি লিখিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি স্বামীজী কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। মিশনের নানা কার্যভার ব্যতীত পাশ্চাত্য ভক্ত ও মিশনের সাধু ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব স্বামী সারদানন্দের উপর অর্পিত হয়। তিনি বেলুড় মঠে নিয়মিতরূপে শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারিগণকে ধ্যান-জপে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, তিনি একবার এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন, যেন মঠের ঠাকুরঘরে সাধুগণ পালা করিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যান-জপের অভ্যাস করেন। তিনি নিজে অনেক সময় উদয়াস্ত জপ করিতেন এবং চণ্ডীর হোম ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। •

(২)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সমস্ত কার্যে স্বীয় দক্ষিণ হস্তরূপ জ্ঞান করিতেন। এই দুই জনের সমবেত চেষ্টায় বেলুড় মঠে উপ্ত ক্ষুদ্রবীজ বিগত ত্রিশ বৎসরের[১] মধ্যে প্রকাণ্ড মহীরুহাকারে বর্ধিত হইয়াছে এবং নানা দেশে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভারতের মূল ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ এই সঙ্ঘের অপর সমস্ত কার্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্বাহ করিয়াছেন। নূতন কেন্দ্র স্থাপন, সেবাকার্য, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারী প্রভৃতি আকস্মিক বিপদে সাহায্যদান, শিক্ষা-বিস্তার, ধর্ম-প্রচার প্রভৃতি মঠ ও মিশনের যাবতীয় কার্যাবলী তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্বাহ হইত, তিনি গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিশাল স্তম্ভ ছিলেন। সমস্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শরৎ মহারাজের জীবন ও সাধনার উজ্জ্বলতম সাক্ষী। তাঁহার অভাবে আজ আমরা নিজদেরকে যে কিরূপ অসহায় মনে করিতেছি তাহা অপরকে বোঝান অসম্ভব। এইরূপ মনীষা, প্রতিভা, কর্মকুশলতা, সর্ববিষয়ে বিচক্ষণতা, অপার্থিব উদারতা, লোকচরিত্র অভিজ্ঞতা, অনাবিল ভালবাসা ও সহানুভূতি সম্পন্ন নেতা আমরা আর দেখিতে পাইব কিনা জানি না। তাঁহার হৃদয় আকাশের ন্যায় উদার ও সমুদ্রের ন্যায় গভীর ছিল। কত নিরাশ্রয় ব্যক্তির তিনিই আশ্রয় ছিলেন। সংসারের কত ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারী এই সুমহান বিটপীমূলে আশ্রয় লাভ করিয়া জীবনের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেকেই মনে করিতেন, "যাহার কেহই নাই, তাহার শরৎ মহারাজ আছেন।" তিনি ক্ষমার প্রতিমূর্তি ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অনেক সময় মনে হইত, "মোর অধিকার অপরাধ করা, তোমার করিতে ক্ষমা", পরের ভার বহন করিবার এত শক্তি আর কাহারও আছে কিনা জানি না। কেহ তাঁহার প্রতি এক হাত বাড়াইয়া দিলে তিনি দুই হাতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। কেহ তাঁহার প্রতি এক পদ অগ্রসর হইলে

১ এই প্রবন্ধটি লেখা হয় বাংলা ১৩৩৫ সালে।

তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আপনার বিশাল বক্ষে জড়াইয়া ধরিতেন। অনেক সাধু ও গৃহস্থ ভক্তের তিনিই "গতি, সুহৃদ ও ভর্তা"-স্বরূপ ছিলেন। বাহ্যিক গাম্ভীর্যের অন্তরালে তাঁহার কোমল হৃদয়ে মাতৃপ্রেমের উৎস শতধারে প্রবাহিত হইত। এই প্রেম-মন্দাকিনীর সংস্পর্শে আসিয়া বহু দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়াছে।

তাঁহার ন্যায় কর্মকুশল ব্যক্তি অতি বিরল দৃষ্ট হয়। স্বামী সারদানন্দের মধ্যে গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের ধর্ম পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুখে দুঃখে তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। জয় পরাজয়ে তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল। তাঁহার মধ্যে স্বাস্থ্যে উদাসীনতা ও রোগে হাসি দেখিয়াছি। সাময়িক উত্তেজনায় তিনি কোনও কার্য করিতেন না। কর্মের মাদকতা তাঁহাকে কখনও অভিভূত করে নাই। নিজকে সাক্ষি-স্বরূপ ও উদাসীন করিয়া কিরূপে অনাসক্ত ভাবে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হয় তাহার পরিচয় তাঁহার সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। তিনি আদর্শ কর্মযোগী ছিলেন। যেরূপ উৎসাহের সহিত তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন আবার সেইরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেকে কর্ম হইতে ব্যবধানে রাখিতে পারিতেন। জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় কর্মের আবিলতা তাঁহার অনাবিল হৃদয় কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তিনি নিষ্কাম ও নিস্পৃহ ভাবে সমস্ত জীবন ধরিয়া কর্ম করিয়াছিলেন। কাজ কর্মের ভিতর থাকিয়া মানুষ কিরূপে আধ্যাত্মিক জগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে তাহা শরৎ মহারাজকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছি। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"-রূপ গীতার বাক্য তাঁহার জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সমস্ত কর্মের মধ্যে ভগবানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার কর্মের ধারা বহু দূর প্রসারিত থাকিত। তিনি যেমন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক আবার তেমনি ওজস্বী লেখকও ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" ভাষা-সৌন্দর্যে ও ভাব-সম্পদে বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

তিনি মুমুক্ষুকে যেমন কর্মে অনুপ্রাণিত করিতেন আবার সাধন ভজনেও তেমনি উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিতেন, "হাজার কর্মের মধ্যেও

ধ্যান-জপ করিবে। মানুষ সারাজীবন কর্ম করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের পর আমরা সাধারণত কর্মে অপটু হয়ে পড়ি। অভ্যাস থাকিলে তখন ধ্যান-জপকে জীবনের সম্বল করা যায়।" মানব-চরিত্রের আপাতদৃষ্ট বিরুদ্ধ ধর্মাবলী তাঁহার জীবনে ও সাধনায় অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে রমণী-সুলভ কোমলতা থাকিলেও বাহিরে তিনি বিবেক বিচারের সুদৃঢ় বর্মে সুরক্ষিত ছিলেন; তাঁহার জীবন কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়স্থল ছিল। তিনি কর্মী ছিলেন, কিন্তু কর্ম-সহজাত-আবিলতা তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইতে পারে নাই। তিনি ভাবুক ছিলেন, কিন্তু ভাবপ্রবণ ছিলেন না। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু কোনরূপ নীরসতা তাঁহার জীবনের মাধুর্য নষ্ট করে নাই। তাঁহার ভিতর মায়ের অসীম ভালবাসা, আচার্যের কঠোর শাসন ও গুরুর অনন্ত ধৈর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; তাঁহার চরিত্রে শালবৃক্ষের সারবত্তা ও চন্দনের সৌরভ বিদ্যমান ছিল।

কোন বিষয়েই তিনি বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। ঢাক ঢোল বাজাইয়া কাজ করা তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। অতি বৃহৎ ফলপ্রসূ কাজও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে লুক্কায়িত রাখিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন করিয়াছেন। নিরভিমানিত্বই তাঁহার কাজের মূলসূত্র ছিল। সাধারণ লোক তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইত না। সম্মান ও নিন্দা তিনি অতি সহজেই হজম করিতেন। শত শত লোক তাঁহাকে অসীম শ্রদ্ধা করিলেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য অহংকারে স্ফীত হইতেন না। তাঁহার কাজের একভাগ করিলেই আমরা অহংকারে আত্মহারা হই! সেই জন্যই আমাদের কাজের ফল অতি ক্ষণস্থায়ী। আতসবাজি মুহূর্তকালের জন্য দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া শান্ত তারকামণ্ডলীর প্রতি উপহাসপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সত্য, কিন্তু ক্ষণকাল পরে ঐ আতসবাজি অকিঞ্চিৎকর ভস্মমাত্রে পরিণত হয়।

শরৎ মহারাজের সমস্ত কার্য সংযমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কথাবার্তা, চালচলন ও আচার ব্যবহারে এইরূপ সংযত ভাব অন্য জীবনে দেখি নাই। সংযম যেন মূর্তিমান হইয়া শরৎ মহারাজের দেহ ও মনরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পবিত্রতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি তাঁহার জীবনে

পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সর্বোপরি তাঁহার ছিল অলৌকিক ধৈর্য ও অক্রোধ। একবার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অক্রোধে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "শরতের যেন মাছের রক্ত। কিছুতেই তাতে না।" একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালকেব কথাও তিনি ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিতেন। বালকের ন্যায় হইয়াই তিনি বালকের সহিত মিশিতেন। ধর্মোপদেশ ভিন্নও নানাবিধ সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য বিবিধ লোক তাঁহার নিকট সমাগত হইত। লোক-চরিত্রে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া সকল বিষয়ে তিনি দক্ষতার সহিত উপদেশ দিতে পারিতেন। তাঁহার সহিত আমরা শিক্ষক, বন্ধু, আচার্য ও গুরু সকল ভাবেই মিশিবাব সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।•

উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিযাই তিনি জীবনের সর্ববিধ সমস্যা সহজে সমাধান করিতে পারিতেন। শুনিয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মদৃষ্টিতেই সকল লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ইতর মানবের ন্যায় মানুষ-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা সংসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন না। মায়াতীত সাক্ষী ও দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া তাঁহারা যাবতীয় জাগতিক কার্য নিষ্পন্ন করেন। আমরা দেখিয়াছি, জাগতিক নানাবিধ অশান্তিতে নিরন্তর পরিবৃত থাকিলেও স্বামী সারদানন্দের শীর্ষদেশ সর্বদাই যেন উচ্চ গৌরীশৃঙ্গের ন্যায় ভগবদুপলব্ধিরূপ সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত। তাঁহার মনের সেই উচ্চ অংশে সংসারের কোলাহল প্রবেশ করিতে পারিত না। মায়ার রাজত্বের নানাবিধ দুর্যোগ সেই অংশের অনাবিল শান্তি কখনও বিক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হইত না। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত তাঁহার পাদদেশে আহত হইয়া দূরে প্রত্যাবর্তন করিত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠ মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। ইহাই তাঁহার কার্যকলাপ ও জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

ইংরাজিতে যাহাকে Gentleman বলে তিনি সেইরূপ আদর্শ ভদ্রলোক ছিলেন। সাধারণ লোকের ধাবণা সাধুগণ সামাজিক শিষ্টতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকেন। কিন্তু শরৎ মহারাজেব প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি নিজ জীবনে উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহিত সামাজিক শিষ্টতার উত্তম

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার বিনয়, ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহারে কত নবাগত ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে স্বল্পকাল বাস করিয়াও তিনি সেই দেশের রীতি নীতিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। এদেশে তাঁহাকে দেখিলে অতি নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু বলিয়া মনে হইত; আবার তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মুখে শুনিয়াছি তাঁহার সহিত দশ মিনিট বাক্যালাপ করিলেই মনে হইত যে তিনি পাশ্চাত্য দেশের শিষ্টাচারের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানব তাঁহার সুগভীর আধ্যাত্মিকতার মাপ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে মানব-ধর্মের আশ্চর্য সার্থকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। পূর্ণ-মানব ও দেব-মানবরূপে তাঁহার চরিত্র ধ্যান করিয়া শান্তি পাইয়াছি।

একবার বঙ্গদেশের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বেলুড় মঠ দেখিতে আসেন। মঠের ঠাকুর ঘরে জুতা পায়ে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বোধ হয়, গভর্ণর সাহেব এই নিয়ম জানিতেন না। তিনি পাদুকাসহ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে স্বামী সারদানন্দ হাঁটু পাতিয়া বসিয়া স্বহস্তে তাঁহার জুতার ফিতা খুলিয়া দেন। এই সামান্য ঘটনা হইতে তাঁহার উদারতা ও তীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দও একবার মঠে বৌদ্ধ ভিক্ষু অনাগরিক ধর্মপালের পাদদেশ স্বহস্তে ধৌত করিয়াছিলেন। প্রতি কার্যেই শরৎ মহারাজের তীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক কার্যে আমরা উহা লক্ষ্য করিয়াছি। সুস্থাবস্থায় কাশীধামে অবস্থান কালে তিনি প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিতেন। সেই সময় কোন কোন সাধু তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি কাহাকেও ঐরূপ করিতে দিতেন না; এবং অপরকে তাঁহার সহিত একত্রে চলিতে বিরত করিতেন। উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরে বুঝা গিয়াছিল যে, তিনি বাত রোগ হেতু সাধারণত ধীর গতিতে ভ্রমণ করিতেন, সেই সময় অপর ব্যক্তি তাঁহার সহিত গমন করিলে উহাকে অনর্থক কষ্ট পাইতে হইবে মনে করিয়া তিনি সকলকে ঐ কার্যে বিরত

করিতেন। অপর এক সময়ে তিনি শীতকালে কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে তাঁহার স্নান করার অভ্যাস ছিল। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে তাঁহার কষ্ট হইবে মনে করিয়া শেষ রাত্রে তাঁহার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ একদিন সেবকগণকে শীতের রাত্রে উঠিয়া জল গরম করিতে দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শয়ন করিতে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য ইহার পর হইতে তিনি বেলা করিয়া স্নান আরম্ভ করিলেন। একবার তাঁহার দাঁতের মাড়িতে যন্ত্রণা হয়। একদিন ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ঘোষকে এই বিষয় বলাতে ডাক্তারবাবু আসিয়া তাঁহার দাঁতের গোড়া হইতে একটি কাঁটা বাহির করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তারবাবু জানিলেন যে, প্রায় মাসাবধিকাল ঐ কাঁটা তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়াছে। এই সামান্য বিষয় তাঁহাকে এতদিন পরে জানান হেতু ডাক্তারবাবু দুঃখ প্রকাশ করিলে শরৎ মহারাজ বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত উহা অমনি সারিয়া যাইবে। অনর্থক তোমাকে কষ্ট দিয়া লাভ কি?" একবার অসুখের সময় আমরা বারংবার ডাক্তারবাবুর নিকট যাওয়াতে তিনি আমাদিগকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য অপরে বিন্দুমাত্র কষ্ট পায় ইহা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বহু লোক তাঁহার সেবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেও তিনি খুব কমই অপরের সেবা গ্রহণ করিতেন। বিগত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মিলনের সময় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। তখন তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি মঠে এক পক্ষকাল বাস করিয়া উক্ত মহাসম্মিলনের কার্য সুসম্পন্ন করেন। কলকাতাস্থ ভক্তগণের বিশেষত মহিলাগণের দর্শনেব সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি অস্বাস্থ্যকর কলকাতা শহরের স্বল্প পরিসর বাটিতে সর্বদা বাস করিতেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ সাধারণত স্বল্পভাষী ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে অতি জটিল সমস্যাও তিনি দুই এক কথায় অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেন, বোধ হয় তিনি নিজেও শ্রীশ্রীঠাকুরেব নিকট ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "একদিন ঠাকুর আমাকে বলিলেন, অত শাস্ত্রাদি

পড়িয়া কি হইবে? 'নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার' এই গানটির অর্থ বুঝিলেই সমস্ত হইয়া যাইবে। ঠাকুর তাল দিয়া নিজেই আমাকে এই গানটি শিখাইয়াছিলেন।"

"নাথ তুমি সর্বস্ব আমার।
প্রাণাধার সারাৎসার নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার ॥
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি বল।
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার ॥
তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম।
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু অনন্ত সুখেরি আধার ॥
তুমি হে উপায় তুমি উদ্দেশ্য, তুমি সৃষ্টিপাতা তুমি হে উপাস্য।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার ॥"

আজ তাঁহার অভাবে বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্ত্রীভক্তগণ সর্বাপেক্ষা মুহ্যমান হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমার স্থূল দেহত্যাগের পর শরৎ মহারাজই বোধ হয় তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। কলকাতাস্থ অনেক স্ত্রীভক্ত, বিশেষত নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ সর্বদাই তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার অক্লান্ত ধৈর্য লক্ষ্য করিয়াছি। পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তগণের সর্ববিষয়ে আবদার ও অনুযোগ সহ্য করা যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের একজন সাধু একদিন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "শরৎ মহারাজ পূর্বে আমাদের 'মা' ছিলেন, তিনি এখন আমাদের 'ঠাকুর মা' হইয়াছেন।" শ্রীশ্রীমা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের দেহমন আশ্রয় পূর্বক ভক্তমণ্ডলীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। স্ত্রীভক্তদের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি আশ্চর্যরূপে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ হইতেন। অনেকে বলেন যে, তাঁহারা পূজনীয় শরৎ মহারাজকে অনেক সময় নিজেদের একজন মনে করিয়া অকপটে নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁহার নিকট সর্ববিধ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। তিনি নিজেকে 'মায়ের দারোয়ান' রূপে অভিহিত করিয়া গর্ব অনুভব করিতেন। শ্রীশ্রীমারও তাঁহার উপর অদ্ভুত স্নেহ ও বিশ্বাস ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "একমাত্র শরৎই আমার সর্ববিধ ভার গ্রহণ করিতে

সমর্থ।'' শুনিয়াছি, মা শরীর ত্যাগের অল্পপূর্বে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, ''শরৎ, এরা সব রইল।'' উপযুক্ত স্কন্ধেই এইরূপ গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছিল। সমগ্র স্ত্রীজাতির মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে জগজ্জননীর প্রকাশ পরিস্ফুট দেখিয়া তিনি তাঁহাদের সেবায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতিকে তিনি ভগবতীর সাক্ষাৎ প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন। কেহ মাতৃজাতির অবমাননা-সূচক কোনও আচরণ করিলে তাঁহার ন্যায় ধীর ব্যক্তিও অতি সহজে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ 'সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে'র প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে উক্ত বিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি ও প্রসারতা হইয়াছে। তাঁহার অভাবে ঐ বিদ্যালয়ের যে কতদূর ক্ষতি হইল তাহা কে নির্ণয় করিবে?

জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর পূজনীয় শরৎ মহারাজ ধ্যান-জপেই বিশেষভাবে দিন অতিবাহিত করিতেন। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি অন্য কোনও কাজ করিতেন না। তাঁহার সমস্ত কার্যেই এক অপূর্ব অন্তর্মুখী ভাব পরিলক্ষিত হইত। বাজে কথাবার্তায় কালক্ষেপ করিতে তিনি বিশেষ বিরক্তি বোধ করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি নবপ্রকাশিত ইংরেজি জীবনচরিত তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বলা হইয়াছিল, ''মহারাজ, আপনি 'লীলাপ্রসঙ্গ' শেষ করিলেন না। উহার শেষ খণ্ড লিখিলে সর্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইত এবং ঠাকুরেরও একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবনী লোকের পড়িবার সুবিধা হইত।'' উত্তরে তিনি বলিলেন, ''শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা না হইলে কিছু হয় না। মা ও মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শরীর ত্যাগের পর হইতে মনে হইতেছে যেন নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য হারাইয়াছি। এখন আর কোনও কাজে তেমন উৎসাহ পাই না। তারপর এখন আবার দেখিতেছি যে, ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছুই বুঝি নাই। কিছুই উপলব্ধি না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লেখা বা বলা নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া মনে হয়। এখন ইচ্ছা হয় আর কিছু না বলিয়া বা লিখিয়া কেবল তাঁহাতে ডুবিয়া যাই।'' বাস্তবিকই জীবনের শেষ সময় তিনি যেন আধ্যাত্মিক ভাবে ডুবিয়া থাকিতেন। এই সময় বহু নরনারী তাঁহাকে

গুরুরূপে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সাধারণ লোক স্বামী সারদানন্দকে একজন কর্মী ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক বলিয়া জানেন। কিন্তু তিনি বহু নরনারীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বড় কেহই তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই।

আধ্যাত্মিক জগতে বা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে স্বামী সারদানন্দের স্থান ও মূল্য নিরূপণ করিবার এখন উপযুক্ত সময় নহে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক এই বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিবেন। এইমাত্র সেই দিন তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে যে আমরা প্রকৃতপক্ষে হারাইয়াছি ইহা ভাবিতেও মন শিহরিয়া উঠে। এখনও মনে হয় যে, 'উদ্বোধন কার্যালয়ে' যাইলে আবার তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিব; আবার তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধন্য হইব।

সাধারণত তিন শ্রেণির আচার্য দেখা যায়। এক শ্রেণির আচার্য শিষ্যগণকে কেবলমাত্র উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন। ইহাপেক্ষা উচ্চশ্রেণির আচার্য উপদেশ না দিয়া স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু সর্বোত্তম আচার্য উপদেশও দেন না এবং বিশেষরূপে দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করেন না। শ্রেষ্ঠ আচার্য স্বীয় সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদ দ্বারা নীরবে শিষ্যের মনে 'প্রভাব' বিস্তার করিয়া তাঁহাদের জীবন মধুময় করেন। এইরূপ শ্রেষ্ঠ আচার্যের কৃপা প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের সিদ্ধি সুনিশ্চিত। দেশ, কাল বা কোনও নিমিত্তের ব্যবধান শিষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ গুরুকে দূরে সরাইতে পারে না। গুরু নিত্যই শিষ্যকে সর্ববিধ অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন এবং স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া সর্বদা আশ্রিতের মঙ্গল সাধন করেন। আচার্য স্বামী সারদানন্দের জীবনে শেষোক্ত দুই শ্রেণির গুরুর ধর্ম বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার নিকট ধর্মের উপদেশ খুবই বিরল শোনা যাইত। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিবার সুযোগও বহু লোকের ভাগ্যে হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কৃপালাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন তাঁহারা সকলে এই আচার্যের আশীর্বাদের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন। শিশির-সম্পাত যেরূপ নীরবে ও লোক-চক্ষুর অন্তরালে গোলাপ-

কোরকের উপর পতিত হইয়া উহাকে বহুদলে শোভিত ও প্রস্ফুটিত করে, আচার্যোত্তম শরৎ মহারাজের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছাও সেইরূপ অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুগত ভক্ত-হৃদয়ে বর্ষিত হইয়া তাঁহাদের অন্তরস্থিত আধ্যাত্মিকতা বিকাশে সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে। আজ আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি, তিনি স্থূল লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেও তাঁহার উদার আত্মা দেশ ও কালরূপ পরিচ্ছিন্নতার বাধা অতিক্রম করিয়া সর্বব্যাপী বিরাট আত্মারূপে সকলের কল্যাণসাধন করিতেছেন। তাঁহার জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যা তাঁহার শরীর ত্যাগের পর লিখিয়াছেন,

"The days of his illness were the most difficult to bear for me. I nearly went mad--longing to be with my beloved. Now I know no one can separate me from my Beloved Guru except my own mind. I can be with him all the time and through his mercy and grace I feel his presence. He will not forsake his children. He will help us. He never failed anyone. He never failed me even before I met him in his physical body. He was with me long before I prostrated before his body in 1, Mukherjee Lane. He himself achnowledged this when I spoke to him of it. The relationship is eternal--he has said it. So I don't feel so sad now."

অর্থাৎ—"তাঁহার অসুখের কয়েক দিন আমার পক্ষে দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। আমার প্রিয় গুরুদেবের নিকটে থাকিবার প্রবল ইচ্ছায় আমি প্রায় উন্মত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি বুঝিতেছি যে, আমার নিজের মন ব্যতীত আর কেহই আমাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। এখন হইতে আমি সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিব। তাঁহার কৃপায় আমি তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিতেছি। তিনি কখনও তাঁহার সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। কেহই তাঁহার নিকট বিফল মনোরথ হয় নাই। এমন কি তাঁহার স্থূলদেহের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেও তিনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১ মুখার্জি লেনে

তাঁহার চরণ প্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই তিনি আমার সহিত ছিলেন। তাঁহার নিকট এই কথা বলিয়াছিলাম এবং তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ নিত্য। সুতরাং এখন আমি আর তত দুঃখ অনুভব করিতেছি না।"

পূজনীয় শরৎ মহারাজের শরীর ত্যাগের পর তাঁহারই একজন মহামান্য গুরুভ্রাতা আমাদিগের জনৈক বন্ধুকে এক সান্ত্বনাপূর্ণ চিঠি লেখেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"শরৎ মহারাজ চলিয়া গেলেন। আমরাও যাইব। ঠাকুর যখন যাহাকে ডাকিবেন—যাইতে হইবে। আমরা যে তৈয়ার হইয়া আছি। কিন্তু ঠাকুর বা আমাদের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ কি কেবল মাত্র স্থূলদেহ লইয়া? তাহা যদি হইত তাহা হইলে তো ঠাকুরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইত! কিন্তু যত দিন যাইতেছে দেখিতে পাইতেছ না ভক্ত এবং অভক্তদের হৃদয়ে তাঁহার অস্তিত্ব বিরাট এবং বিরাটতর ভাবে বোধ হইতেছে এবং সম্বন্ধ দৃঢ় ও দৃঢ়তর হইতেছে। তেমনি শরৎ মহারাজ গেছেন কোথায়? তিনি এতদিন একটি শরীরে আবদ্ধ ছিলেন, এখন হইতে তাঁহার পূত—পবিত্র চরিত্র, তাঁহার প্রেম ভালবাসা, বিশ্বাস ভক্তি, ধীর স্থির বুদ্ধি, অচল অটল সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য তোমাদের সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে—তাঁহার কৃপায় তোমরা তাঁহাকে চোখে দেখিয়া যে আনন্দ পাইতে এখন হইতে তাঁহার চবিত্র ধ্যানে আরও শতগুণ আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশীর্বাদ এখন সদাসর্বদা অনুভব করিবে। যখনই ইচ্ছা করিবে আর কলকাতায় নয়—অতি নিকটে হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁহার দর্শন পাইবে। কোন ভয় নাই। তাঁহার শরীর-ত্যাগে ঠাকুরের কৃপায় তিনি তোমাদের আরও আপনার জন হইয়াছেন। অধিক আর কি লিখিব। তাঁহার কৃপায় তোমরা ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিবে।"

(উদ্বোধন ঃ ৩০ বর্ষ ৬ ও ৭ সংখ্যা)

স্বামী সারদানন্দ

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

(১)

একাধারে শরীর, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সম্যক উৎকর্ষ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সমন্বয়ে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার স্ফূর্তি এবং পরিশেষে লোক কল্যাণে উহাদের নিয়োগ যদি বর্তমান যুগের সার্বজনীন আদর্শের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে ইহা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতে পারা যায় যে, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের জীবন ঐ আদর্শের একখানি নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর অভিব্যক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মুষায় দ্রুত-চরিত্র, শ্রীবিবেকানন্দের একান্ত আনুগত্যে গঠিত জীবন স্বামী সারদানন্দের চরিত্রে সর্বভাবের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ও প্রকাশ ছিল। তথাপি, শক্তিপূজা ও শক্তি সাধনার ভাবটিই যে তাঁহার অন্তরের নিগূঢ়ভাব ছিল, ঘটনা পরম্পরায় তাহা বুঝা যায়। যথা—একদিন কথাচ্ছলে ঠাকুর শরৎ মহারাজকে বলেন, ''তোর ভৈরবের ভাব; তোর ভিতর শিব আছে জানবি, আর আমার মধ্যে শক্তি আছে; তোর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য আমার মধ্যে বিদ্যমান।'' যথা—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রণাম মন্ত্র লিখিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন, ''যথাগ্নের্দাহিকাশক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা''—অগ্নির দাহিকাশক্তি যে প্রকার অগ্নি হইতে অভিন্ন এবং অগ্নিতেই অবস্থিত, সেই প্রকার যিনি রামকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী, রামকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন এবং রামকৃষ্ণেই অবস্থিত। মায়িক সংসারবন্ধন ছিন্ন কবিয়া বহুজনহিতায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকালে সাগ্রহে ও সানন্দে তাঁহার নামানুযায়ী 'শ্রীসারদানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের লীলাবসানে সংসার পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনায় তিনি স্বামীজীর নির্দেশানুযায়ী বিশিষ্ট তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করত দ্রুত সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং 'ভারতে শক্তিপূজা' নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া উহাতে শক্তিপূজার নিগূঢ় তথ্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।(শক্তি সাধনার সমূহ সিদ্ধি

যে তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল, ঐ গ্রন্থ উৎসর্গ করিতে যাইয়া তিনি স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়াছেন—"যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্ত্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অর্পিত হইল।"

নারীপ্রতীকে শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি নারীর মাহাত্ম্য এরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে উহার বিন্দুমাত্র অপমানে অটল অচল সদৃশ স্থির ধীর হইয়াও এই মহাপুরুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িতেন। ঐ নারীত্বের অবমাননা হইতে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া ভারতের বর্তমান অধঃপতন এবং নারীকে সর্ববন্ধন মুক্ত করিয়া তাঁহার মহিমান্বিত মাতৃত্বগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা, ভারতের পুনরুত্থানের প্রশস্ত বর্ত্ম এবং সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে স্ত্রী গুরু গ্রহণ, স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ নির্দেশ করিতেন। 'ভারতে শক্তিপূজায়' নারীর অন্তর্নিহিত দেবীত্ব, নারীর জগন্মাতৃত্ব এমন গৌরব ও সম্মানসূচক ভাষায় কীর্তিত হইয়াছে যে অন্যত্র উহার তুলনা দুর্লভ।)

প্রত্যেক অবতারই সযত্নে শক্তিপূজা করিয়া গিয়াছেন; শক্তিপূজা করিয়া ব্রহ্মশক্তিরূপিণী মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিলে এই মায়িক জগতে বহুজনহিতকর সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা যায় না—ঠাকুর এই কথা বলিয়াছেন। নিজেও সর্বাগ্রে বিশুদ্ধ মাতৃভাবে শক্তির আরাধনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যুগাবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ তাঁহারই ইচ্ছায় একমাত্র তাঁহারই কার্য সম্পাদনের জন্য ধরাতলে আগমন করেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের কার্যাবলীর অন্য উদ্দেশ্য অনেক সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বরিশালে শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনার জীবনে কি কোন বিশেষ বাসনা আছে?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "কই একমাত্র ঠাকুরের আদেশ পালন করা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজিয়া পাই না।" সুতরাং তাঁহার এই শক্তিপূজা—যাহা পরবর্তী কালে ঘটে ঘটে জগন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণীকে অবস্থিত দেখিয়া তাহাদের ক্লেশহরণে নিজের শেষ শোণিত বিন্দু পর্যন্ত মোক্ষণ করিতে প্রেরণা দিয়াছিল—তাহা এই বিপুল শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মূলে যে কিরূপ শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, কে বলিবে!

স্বামী সারদানন্দের শক্তিপূজা—পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দের দেহরক্ষার পর হইতে শ্রীশ্রীমার স্থূল শরীরে লোকচক্ষুর অন্তরাল না হওয়া পর্যন্ত, তাঁহার সেবাকার্য সম্পন্ন করিয়া নিজ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। এই মার সেবা বলিতে একমাত্র শ্রীশ্রীমার সেবাই বুঝায় না, পরন্তু তাঁহার সমস্ত পরিজন ও ভক্তমণ্ডলীর সেবা। সেই সেবাকার্য যে কিরূপ শক্ত ব্যাপার এবং কতটুকু যোগ্যতার সহিত তিনি ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন, অনেক সময়ে মার নিজের কথায় উহা ব্যক্ত হইয়াছে—"শরৎ আর যোগীন—এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।" "শরৎ যে কয়দিন আছে, সে কয়দিন আমার ওখানে থাকা চলবে; তারপর আমার বোঝা নিতে পারে, এমন কে দেখি না। যোগীন ছিল। শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে; শরৎ হচ্চে আমার ভারী। এই রাধুর বিয়ের কথা—এটি মায়ের বোঝা। অনেক ভক্ত সাহায্য করতে সক্ষম; দশহাজার টাকাও দিতে পারে; আপনার মায়ের বোঝা কে মনে করছে? আপনার জন কয়টি আর? দু-চারটি।"

ইহার উপরে আর কথা বলা চলে না। কলকাতায় নিজের কোন আবাসবাটি না থাকায় মা কলকাতায় আসিয়া যথেচ্ছ বাস করিতে পারেন না বলিয়া শরৎ মহারাজ সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে টাকা ধার করিয়াও মার বাসের জন্য বর্তমান উদ্বোধন মঠ-বাড়ি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সেই বাড়িতে বাসকালে নিজেকে মার বাড়ির দারোয়ানস্বরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ নামে স্বয়ং অভিহিত হইতে গৌরব বোধ করিতেন। তিনি যখন কলকাতায় না থাকিতেন, তখন মা জয়রামবাটি হইতে কলকাতায় আসিতেই চাহিতেন না। একবার শরৎ মহারাজ কাশীতে আছেন; সেই সময়ে শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটি হইতে কলকাতা আসিবার কথা হইয়াছিল। ভক্তেরা চিঠিতে পুনঃ পুনঃ জানিতে চাহিতেছিলেন, কখন মা কলকাতা আসিবেন। মাকে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন, "আগে শরৎ কলকাতা আসুক; তারপর যাওয়ার কথা। শরৎ কলকাতা না থাকলে আমার যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই হতে পারে না। শরৎ ভিন্ন, আমার ঝক্কি পোয়াতে পারে এমন কে আছে!"

জয়রামবাটিতে পিত্রালয়ে অবস্থানকালে মা বড় মামার সংসারে বাস

করিতেন। ক্রমে ভক্তসমাগম এত বাড়িয়া উঠে এবং নিত্য এত ভিড় হইতে থাকে যে মার ঐ স্থানে বাস করা কষ্টকর হইতেছে বুঝিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহার জন্য এক বৃহৎ পুষ্করিণীসংলগ্ন জমি ক্রয় করিয়া তদুপরি নূতন বাটি নির্মাণ করাইয়া দেন। পরবর্তী কালে মা ঐ বাড়িতে বাস করিতেন। ইহার অনেক পরে মার দেহাবসান হইলে বেলুড় মঠে এবং জয়রামবাটি গ্রামে মার জন্মস্থানের উপর সুদৃশ্য মাতৃমন্দির নির্মাণ করাইয়া নিত্যসেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এই মাতৃগতপ্রাণ, মার জন্য এতটুকু করিতে পারিলে নিজেকে যে কতটুকু কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন বলিয়া বুঝাইবার নহে। জয়রামবাটিতে মার বাসের জন্য নূতন বাড়ি নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়া যাইবার কিছুকাল পরে, যখন উহা মঠের নামে লেখাপড়া হইয়া রেজিস্ট্রি হইবে, কোয়ালপাড়া মঠে কোতলপুর হইতে পালকি করিয়া রেজিস্ট্রার আসিলেন। শরৎ মহারাজ স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কারকরত তাহাকে অভিনন্দিত এবং স্বহস্তে চা, পান, সিগারেট, বিস্কুট ইত্যাদি প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত অন্যান্য সাধুদের চক্ষে তাঁহার মতো লোকের ঐরূপ করা কতকটা বিসদৃশ বোধ হইলেও এবং তরুণ যুবক মুসলমান রেজিস্ট্রার ইহাতে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও, শরৎ মহারাজ ঐ কার্য সুসম্পন্ন হইয়া যুবকটি বিদায় না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে বিরত হন নাই। হেতু—মায়ের কাজ বলিয়া। জয়রামবাটিতে মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে যাহারা তথায় যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার এই আত্মহারা মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে, কৃতার্থ হইয়াছে। আর এই মাতৃগতপ্রাণ শিশুর দেহমন আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও অসংখ্য তাপিতের ত্রিতাপ জ্বালা অপসারিত করিয়া তাহাদিগকে জন্মমৃত্যুর ভয় হইতে চিরতরে অব্যাহতি দান করিয়াছেন।

শোনা যায়, শেষ অসুখের সময় শ্রীশ্রীমা একবার বলিয়াছিলেন, "জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে; শরৎকে কোলে নিয়ে এবাব চলে যাব; যেখানেই যাই শরৎ আমার সঙ্গে থাকবে।" শরৎ মহারাজের কানে এই কথা পৌছিলে তিনি শিশুর

মতো কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। মাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য তিনি কোন চেষ্টারই ক্রুটি করেন নাই; গ্রহশান্তি পর্যন্ত যথাবিধি অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! মা যে বহু লোকের পাপভার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া নিজ অপাপবিদ্ধ শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধিকে স্থান দিয়াছেন—চিকিৎসা তাহার কি প্রতিকার করিবে? দেহরক্ষার পূর্বে মা শরৎ মহারাজকে কাছে ডাকাইয়া "শরৎ, এরা রইল।" এই বলিয়া, তাঁহার অন্তর্ধানে যাহারা যথার্থই অনাথ হইয়া পড়িবে, তাহাদের ভার তদুপরি অর্পণ করত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিরূপ উপযুক্ত পাত্রে যে এই গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছিল এবং কতটুকু যোগ্যতার সহিত তিনি এই দায়স্বরূপে প্রাপ্ত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য কৃপাপ্রাপ্ত বহু সংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত এখনও বিদ্যমান। তাঁহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি, শরৎ মহারাজ সশরীরে বর্তমান থাকিতে তাঁহারা মায়ের অভাব তেমন করিয়া অনুভব করিতেই পারে নাই। তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার নিজ জীবনের গভীর সংশয় ও কঠোর সমস্যাসমূহের সম্পূর্ণ নিরসন ও সম্যক সমাধান, তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া শ্রীশ্রীমা-ই যে শরৎ মহারাজের মধ্য দিয়া উহা সম্পন্ন করিলেন, ইহা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমহারাজের দেহরক্ষার পরেও শরৎ মহারাজ তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে এমন সস্নেহভাবে ব্যবহার করিতেন, যাহাতে তাহারা মহারাজের অভাব ততটা বুঝিতে না পারে।

শ্রীশ্রীমার লোকলোচনের অন্তর্ধান হওয়ার পর শরৎ মহারাজই যেন ভক্তদের মাতৃস্থানীয় হইয়া পড়িলেন। কঠোর পুরুষত্বের আবরণে যে নারীসুলভ স্নেহপ্রবণ হৃদয় এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল এবং যাহার সন্ধান বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিজন ব্যতীত অন্য সকলে তেমন অবগত ছিল না, তাহা যেন আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিল না; শতধা বিচ্ছুরিত হইয়া সকলের ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গলসাধনে আত্মনিয়োগ করিল। গুরুভাবে, শুধু দীক্ষা দান করিয়াই যে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহা নহে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাহিনী, সকল অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে এবং যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিতে হইত।

কাহাকেও চাকরির জোগাড় করিয়া, কাহাকেও বা কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় করিয়া দিতে হইত। যাহাদের কেহ দেখিবার নাই, এমন কত অনাথা বিধবার টাকা তাঁহার কাছে গচ্ছিত ছিল; ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া মাসে মাসে সুদ আদায় করিয়া তাহাদিগকে পাঠাইতে হইত। তাঁহার কাছে নিজ নিজ দুঃখের কথা মুখে বলিতে না পারিলে অন্তত পত্রে লিখিয়া জানাইয়াও অনেকে দুঃখভার লাঘব হইল জ্ঞান করিত। যেখানে প্রতিকার অসম্ভব হইত মহারাজ উত্তরে লিখিতেন, "তোমার দুঃখ ঠাকুরকে ও মাকে জানাইতেছি।"

শ্রীশ্রীমা জনৈক ভক্তকে একবার বলিয়াছিলেন, "শরৎকে দেখ না, কত কাজ করে, কত হাঙ্গামা পোয়ায়—মুখটি বুজে থাকে। ও সাধু মানুষ, ওর এত সব কেন? ওরা ইচ্ছা করলে দিন রাত ভগবানে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারে। কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্য এদের নেমে থাকা।"

তাঁহার হৃদয়বত্তার কাহিনী বলিয়া শেষ হইবার নহে। যত তাড়িত লাঞ্ছিতদের আশ্রয়স্থল ছিলেন শরৎ মহারাজ। সঙ্ঘে যে যেখান হইতে আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে, শরৎ মহারাজের নিকটে আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে। এই সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা মনে পড়ে। প্রজ্ঞানন্দ স্বামী প্রভৃতি পূর্বজীবনে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি-ভাজন হন। পরবর্তী কালে যথার্থ আন্তরিকতার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিতে আসিলে পুলিশের উপদ্রব ভয়ে অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে তাঁহারা শ্রীশ্রীমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, "মা, আমাদের কি মঠে স্থান হবে না? মহারাজ যে স্থান দিতে চান না!" তদুত্তরে মা সস্নেহে বলেন, "কেন হবে না বাবা, রাখাল তো ছেলেমানুষ, তোমরা শরতের কাছে গিয়ে থাক।" আশ্রিতবৎসল শরৎ মহারাজ তাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্থান দান করিয়াছিলেন। কাহারও অপরাধবশত সঙ্ঘ হইতে সরাইয়া দিবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে, তিনি অনেক সময় সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছেন, "জুড়াতে এসেছে, কোথায় যাবে! ভাল হবার জন্যই এসেছে, ভাল হবার চেষ্টা তো করছে; থাকুক না।" কেহ কেহ তাই সাধুজনোচিত জীবনযাপনে অক্ষম হইলেও শরৎ মহারাজের

উপর একদিনের জন্যও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে পারেন নাই এবং ঐ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেককে বিপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনিয়াছে, পরেও অনেককে আনিবে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নিষ্কাম মহাপুরুষের নিঃস্বার্থহৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে উৎসারিত মঙ্গলেচ্ছার গতি কে রোধ করিতে পারে!

(২)

স্বামী সারদানন্দের শক্তিপূজা—সর্বভূতে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের দুঃখ বিমোচন রূপ সেবাব্রত গ্রহণ করত রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই এই সেবাপরায়ণতা তাঁহার মজ্জাগত ছিল। গুরু ভ্রাতাগণের হাতের কাজ ছিনাইয়া লইয়া নিজে একাকী সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে এবং রোগ শয্যায় তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া প্রাণঢালা শুশ্রূষায় তাঁহাদিগকে নিরাময় করিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার স্নেহাকুল হৃদয়ের আবেগমাখা কোমল হস্তস্পর্শ রোগীর মনে যাদুমন্ত্রের মতো কার্যকরী হইত এবং আশায় উৎফুল্ল হইয়া রোগী সহজেই সুস্থ হইয়া উঠিত। তাঁহার এই সেবাপরায়ণতা শুধু গুরুভ্রাতা কিংবা এবংবিধ স্বজনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সকলের প্রতিই উহা সমভাবে প্রযুক্ত হইত। যাহাদের কেহ দেখিবার নাই, তাহাদের জন্য তিনি অধিকতর ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার সেবা গ্রহণে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে বুঝিতে পারিলে, তিনি পরোক্ষ ভাবে বা অলক্ষ্যে থাকিয়া উহা সম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন।

স্বামীজী কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়া যখন শরৎ মহারাজ উহার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার এই সেবাপরায়ণতা দেশের দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট, বন্যা-পীড়িত, মহামারীগ্রস্ত প্রভৃতি যাবতীয় দুঃস্থ নরনারায়ণের দুঃখ বিমোচনে প্রযুক্ত হইয়া বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। চারিদিকে অভাবগ্রস্ত নিরন্নের হাহাকার, রুগ্ণের আর্তনাদ, তাঁহার স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয়ে সমবেদনার লহরি তুলিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া

ফেলিত। একবার শরৎ মহারাজ, শ্রীশ্রীমহারাজ ও পূজনীয় হরি মহারাজের সঙ্গে পুরীধামে আছেন। সেই সময় হরি মহারাজের পায়ে কার্বঙ্কল হওয়ায় অস্ত্রোপচার করিতে হয়। রোগীকে অচৈতন্য না করিয়া এই প্রকার গুরুতর অস্ত্রোপচার করিতে ডাক্তাররা সাহসী হন না; কিন্তু হরি মহারাজ সংজ্ঞাহীন হইতে অস্বীকৃত হইয়া হাসি মুখে তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই অস্ত্রোপচার কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে উড়িষ্যা অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। তদঞ্চলে সেবাকার্যে প্রেরিত সেবকদের নিকট হইতে নিত্য দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর করুণ কাহিনী সকল আসিতে থাকায় শরৎ মহারাজ একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অগ্রে হরি মহারাজের অদ্ভুত অস্ত্রোপচারের কথা লিখিয়া, পরে অনশনক্লিষ্ট জনগণের শোচনীয় অবস্থা সকল বর্ণনা করত শ্রীশ্রীমাকে প্রায় আট পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন এবং সেই পত্রে, যাহাতে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়া তাহাদের সকল দুঃখের অবসান হয়, তাহার জন্য শ্রীশ্রীমার শ্রীপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। পত্রখানি শুনিতে শুনিতে করুণাময়ী মার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "লোকের দুঃখ কষ্ট আর দেখতে পারি না; ঠাকুর তাদের সকল দুঃখ জ্বালার অবসান কর। (নিকটস্থ ভক্তদের প্রতি) শরতের দিল দেখলে! নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ অনেকে আছেন, শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই, সমস্ত পৃথিবীতে নাই। জীবের দুঃখে প্রাণ কাঁদা! যেন পালনকর্তা, সকলকে অন্নদান করছে।" শ্রীশ্রীমা স্বয়ং যাঁহার মহাপ্রাণতার কথায় এইরূপে শত মুখ হইয়া উঠিতেন, আমরা স্বার্থান্ধ মানব, তাঁহার মহত্ত্বের কতটুকুই বা ধারণা করিতে পারি! আর একবার মা বলিয়াছিলেন, "শরতের সমান কেউ নাই; শরতের যত বড় বুকখানি, তত বড় হৃদয়খানি।"

একবার জয়রামবাটিতে অবস্থানকালে রোগের জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে মা বলিতেছিলেন, "শরতের শরীর কি ঠাণ্ডা! শরতের শরীর কি ঠাণ্ডা!" সমীপস্থ ভক্তেরা তখনই শরৎ মহারাজকে জয়রামবাটি আসিবার জন্য তার

করিবার অভিমত প্রকাশ করিলে মা বাধা দিয়া বলিলেন, "না তার করো না, শরতের কত কাজ!" অবশ্য সেইবারে শরৎ মহারাজকে টেলিগ্রাম করিয়া আনা হইয়াছিল। শেষ অসুখের সময়, যখন রোগের জ্বালা একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিত, মা শরৎ মহারাজের ঠাণ্ডা শরীরের উপর দুহাত রাখিয়া যেন কতকটা যন্ত্রণার লাঘব বোধ করিতেন। শরৎ মহারাজের অলৌকিক পবিত্রতা ইহাতে কথঞ্চিৎ অনুমিত হইবে। ৎ

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে যাঁহার এইরূপ অলৌকিক দিব্য সম্বন্ধ, তিনি স্বয়ং মার সম্পর্কে কি বলিতেন, তাহা জানিবার একটা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য জন্মে। মাকে তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা, সুতরাং নিজ ইষ্টদেবতা বলিয়াই জানিতেন; সুতরাং তাঁহার সকল কার্য একমাত্র মার প্রীতির জন্যই যে অনুষ্ঠিত হইত, ইহা বলা বাহুল্য। একবার কথাচ্ছলে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "মাকে কি বুঝব, তবে এ কথা বলতে পারি—এত বড় মন দেখিনি, আর দেখবও না।" আর একবার শরৎ মহারাজ কাশীতে কিরণবাবুদের বাড়িতে আছেন; সঙ্গে যোগীন মা, সাণ্ডেলমশায় প্রভৃতি। নিত্য সন্ধ্যা আরতির পর দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হইত। সেবাশ্রমের চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ) পাঠ করিতেন, অন্য সকলে একমনে শুনিয়া যাইতেন। কোথাও কাহারও কিছু দুর্বোধ্য হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেই মহারাজ বুঝাইয়া দিতেন। পাঠ হইয়া যাওয়ার পর নানাবিধ প্রশ্নোত্তরও চলিত।

পরদিনই মহারাজ কলকাতা চলিয়া যাইবেন বলিয়া সেই দিন আর শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ না হইয়া সাধুদের তপস্যাদি সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা হইতেছিল। জনৈক সাধু এই সময়ে মার কৃপাপ্রাপ্ত একজনের কোন গর্হিত আচরণের উল্লেখ করিয়া মার কৃপা লাভ সত্ত্বেও সে এমন অসাধুজনোচিত কার্য কি করিয়া করিল, এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্ন শুনিয়া একটু চুপ থাকিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "যে ভাবের চিন্তা মনে স্থান দিলে নিজের ক্ষুদ্র বিশ্বাস ভক্তির হানি হয়, সে ভাবের চিন্তা কখনও মনের মধ্যে স্থান দিও না। আজ তোমরা বা তাকে এমন দেখছ, দশ বছর পরে সে যে একজন

মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়াবে না—কি করে জানলে? তখন তোমরাই বলবে, তা হবে না? সে যে মার কৃপা পেয়েছিল! মার মহিমা, মার শক্তি কতটুকু—আমাদের কি সাধ্য বুঝি! এমন আসক্তিও দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি! যে 'রাধু রাধু' করিয়া অস্থির—শেষকালে বললেন—'একে পাঠিয়ে দাও।' মাকে বললাম 'মা আপনি এখন রাধুকে পাঠিয়ে দিতে বলছেন, পরে যখন আবার দেখতে চাইবেন, তখন কি হবে?' মা বললেন, 'না, আর আমার ওর ওপর কিছুমাত্র মন নেই।' "

এইভাবে মার কথা বলিতে বলিতে মহারাজ যেন তন্ময় হইয়া গান ধরিলেন—"তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি। হাসিব কি কাঁদিব, তাই বসে ভাবিতেছি ॥ বিচিত্র ভাবের মেলা, ভাঙো গড়ো দুটি বেলা; ঠিক যেন ছেলেখেলা, বুঝতে পেরেছি ॥ এতকাল রইলাম কাছে, বেড়াইলাম পাছে পাছে; চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি ॥" এই গানটি গাওয়ার পর ভিতর হইতে যোগীন মা "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।" এই গানটি গাহিতে বলিলে, মহারাজ যে উহাও গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন, বেশ স্মরণ আছে।

বিজ্ঞ বক্তা, শাস্ত্র ও অবতারজীবনী-ব্যাখ্যাতা, আচার্য, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ধর্মোপদেশক, সুরজ্ঞ গায়ক স্বামী সারদানন্দের বহুমুখী প্রতিভা অল্প কথায় ব্যক্ত হইবার নহে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপ্রসঙ্গ প্রণয়ন করিয়া তিনি সমস্ত মানবজাতিকে চিরকালের জন্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, মনস্তত্ত্ব বিদ্যা, আধ্যাত্মিক রাজ্যের সুগভীর স্তরসমূহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বিষয়ের অনুরূপ ভাষার অপূর্ব গাম্ভীর্য ও শ্রী ইত্যাদি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এই গ্রন্থে সর্বোপরি তাঁহার বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে অবতার-জীবনী ব্যাখ্যার নূতনতায়। ঐ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন, "প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার চরিত্রের মানব ভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানব ভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে—বর্তমান ক্ষেত্রে

আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব।" জগতে এই সম্পূর্ণ নূতন ভাবে অবতার চরিত্রের ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যোপযোগী 'দেব-মানব' ইত্যাদি গভীর অথচ সুদূর প্রসারী ভাবদ্যোতক শব্দ নিচয়ের সৃষ্টি—তাঁহার অসাধারণ মনীষার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কর্ম কুশলতার ক্ষেত্রেও শরৎ মহারাজ অদ্বিতীয়। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অন্য সকল অংশ ছাড়িয়া দিলেও, কেবল মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদকের কার্য যাবজ্জীবন নির্বাহ করিয়া সমস্ত বাধা বিপত্তির মুখে উহার সর্বাঙ্গীণ গঠন ও পরিপুষ্টিসাধন—কর্মজগতে তাঁহার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান করে। প্রত্যেক অঙ্গের ব্যক্তিগত ভাব ও স্বাধীনতা, বিকাশ ও রক্ষার যথেষ্ট অবসর দিয়া, আত্মনিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম কোলাহলের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, বিভিন্ন সংস্কার বিশিষ্ট সংসার ত্যাগী সাধুবৃন্দ দ্বারা সঙ্ঘটিত বিপুলকায় সঙ্ঘ পরিচালনা যে কত বড় শক্ত ব্যাপার, ঐ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। ঐ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য, ক্ষমা, উদারতা, সমদর্শিতা, দোষদর্শনশূন্যতা ইত্যাদি সদ্‌গুণনিচয় একান্ত অপরিহরণীয়। শরৎ মহারাজের মধ্যে ঐ সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নেতার উপযুক্ত সদ্‌গুণরাশিতে তিনি আবাল্যভূষিত ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যেই মহতের মহত্ত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হয়। শরৎ মহারাজ সকল সময়ে, সকলের সকল ব্যথার সমান ব্যথী, সকল কাজের সমান ভাগী ছিলেন। নিজের জন্য অযথা সুবিধা গ্রহণ করা দূরে থাকুক যথাসাধ্য অন্যের শ্রমলাঘব করিতে পারিলেই নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন, বৃদ্ধ বয়সেও অপরের সেবা গ্রহণে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতেন। একদিন মঠে দেখিয়াছি—সকলে একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছেন। শরৎ মহারাজের পাতের কাছে কিঞ্চিৎ ঠাকুরের প্রসাদী ফল মিষ্টি খাইবার জন্য সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য সকলকে না দিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে ঐরূপ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করত

প্রসাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন; বাকি সবই প্রায় যেমন তেমনি পড়িয়া রহিল। সেইবারে আরও দেখিয়াছিলাম—একদিন দুপুরে খাওয়ার পর শরৎ মহারাজকে ভুলক্রমে পান দেওয়া হয় নাই; তিনিও ঐ বিষয়ে খেয়াল করেন নাই। পরে বিকালবেলা কি কারণে আয়নাতে মুখ দেখিতে যাইয়া তাঁহার যে পান খাওয়া হয় নাই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "আজ আমায় পান খেতে দিসনি? আয়নাতে মুখ দেখে বুঝলুম, আমার পান খাওয়া হয়নি।" সেবককে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া, এই আত্মহারা মহাপুরুষের দেবদুর্লভ চরিত্রে যে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, বলিয়া বুঝাইবার নহে। স্বয়ং স্বামীজী একদিন তাঁহার ধৈর্যের পরীক্ষা করিতে গিয়া হার মানিয়াছিলেন। হরি মহারাজ একবার তাঁহার পরের নিন্দা শ্রবণ মাত্রে বিশ্বাস না করায় আবাল্য স্বভাবের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর ক্ষমার কথা তো বলিবারই নহে।(অন্যায় করিয়া আসিলে "কেন এমন করলে?"—জিজ্ঞাসা না করিয়া, যাহাতে ভবিষ্যৎ অকল্যাণ রুদ্ধ হয়, তাহার জন্যই সচেষ্ট হইতেন; এবং তজ্জন্য ঠাকুর ও মার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। তিনি জানিতেন, দুর্বল মানুষ তো অপরাধ করিবেই; অপরাধ করার পর উহা হইতে আত্মরক্ষার বিধান না করিয়া উল্টা শাসন করা নিষ্ঠুরতা মাত্র।)

কঠোর বৈরাগ্যে জীবনের সমস্ত ভোগ সুখ তুচ্ছ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে সকল কার্যের অনুষ্ঠান এবং তাঁহাকেই সর্বঘটে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলের সেবায় তিলে তিলে পলে পলে আত্মবিসর্জন—এই মহাপুরুষের সমগ্র জীবনের সারসংক্ষেপ। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তাঁহাকে কোন ঈশ্বরীয় রূপাদি দর্শন করিতে চান কি না জিজ্ঞাসা করিলে শরৎ মহারাজ তাহাতে নিজ অসম্মতি জানাইয়া কেবল সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের বাসনা মাত্র নিবেদন করিয়াছিলেন। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর যেদিন কল্পতরু হইয়া সুষুপ্ত অধ্যাত্ম শক্তিকে জাগাইয়া দিয়া অনেককে বিশেষ ভাবে কৃপা করিয়াছিলেন, শরৎ মহারাজ জানিতে পারিয়াও ঠাকুরের পরিচর্যার বিঘ্ন হইবে বলিয়া তিনি সেই সময়ে পূজনীয় লাটু মহারাজের সাহচর্যে ঠাকুরের বিছানাপত্রগুলি রৌদ্রে

দিতেছিলেন—উহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত ঘটনা আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহার উচ্চ অধিকার সূচনা করে এবং দ্বিতীয়টি, তিনি যে শ্রীভগবানের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ তাহার স্পষ্টতম নিদর্শন। ইতঃপূর্বেও তিনি ঐরূপে শ্রীভগবানের কার্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "শরৎ, শশী, ঋষিকৃষ্ণের (যিশুখ্রিস্টের) দলে ছিল।"

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের একটি লক্ষণ এই যে সকলেই স্বামীজীর অত্যন্ত অনুগত। শরৎ মহারাজ বিশেষ ভাবে স্বামীজীতে অনুরক্ত ছিলেন এবং সর্ববিষয়ে স্বামীজীর শিক্ষা ও উপদেশ দ্বারা নিজ জীবন গঠিত ও নিয়মিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের এক জায়গায় দেখিতে পাই স্বামীজী বলিতেছেন—"শরতের ভার (ঠাকুর) আমার উপর দিয়েছেন।" সঙ্গীত বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয়েও শরৎ মহারাজ স্বামীজীর নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর জন্মতিথির দিন রাত্রে তাঁহাকে ভজন শুনাইতে বসিয়া তানপুরায় কান টিপিতে টিপিতে রহস্য করিয়া বলিতেন, "আজ আমার ওস্তাদের জন্মদিন; দুই একটি গান গাইতেই হবে।" শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা স্পষ্টতই লক্ষিত হয় যে, ঠাকুর, মা এবং স্বামীজী—এই তিনটি বিভিন্ন উৎস হইতে শক্তি ও ভাবধারা আসিয়া এই মহাপুরুষ চরিত্র বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই ত্রিধারার সম্মিলিত ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া, এমন কি উহা দর্শন স্পর্শন করিয়াও বহু সংখ্যক নরনারী পবিত্র ও ধন্য হইয়া গিয়াছে!

(উদ্বোধন ঃ ৩২ বর্ষ, ৬ ও ৮ সংখ্যা)

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী নিখিলানন্দ

মনে হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে বা উদ্বোধনে সর্বপ্রথম স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের দর্শনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করি। কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সন্তানের দর্শন লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলাম। স্বামী প্রেমানন্দজী, শঙ্করানন্দজী, অম্বিকানন্দজী, মাধবানন্দজী, স্বামীজীর ভ্রাতা মহিমবাবু এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অপর কয়েকজন সদস্য সমভিব্যাহারে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে ঢাকা সফরে গেলে আমার ঐ স্বপ্ন সফল হয়। তখন ঢাকাতে পড়ি।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ছুটির সময় বেলুড় মঠে যাবার অনুমতি লাভের জন্য বাবুরাম মহারাজকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। তিনি কৃপা করে অনুমতি দেন। মঠে কয়েক দিন থাকবার সুযোগ পাই। তখন নিশ্চয়ই স্বামী সারদানন্দজীকে দর্শন করে থাকব। কিন্তু কোনও বিশেষ কথাবার্তা হয়েছিল কিনা মনে নাই।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংস্রব থাকায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আমাকে আটক করা হয় এবং প্রায় দুই বৎসর এক বন্দিশিবিরে বাস করতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পূর্বে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো। কলকাতা গিয়ে মাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করার উদ্দেশ্যে উদ্বোধনে উপস্থিত হই। তখন শ্রীশ্রীমা অসুস্থ, কাউকে দর্শনের অনুমতি দেওয়া হতো না। স্বামী অরূপানন্দ বা স্বামী অনুভবানন্দ এঁদের একজন কেউ হবেন, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার জন্য আমার অধীর আগ্রহের কথা স্বামী সারদানন্দজীকে জানান। সারদানন্দজী মহারাজ অনুগ্রহ করে দর্শনের অনুমতি দেন, তবে বলে দেন বেশিক্ষণ যেন না থাকি। শ্রীশ্রীমায়ের একজন শিষ্য, বিষ্ণুপুরের সুরেন্দ্র কর আমার সঙ্গেই কাকদ্বীপে বন্দি ছিলেন এবং বন্দি শিবিরের কড়াকড়ি অসহ্য

হওয়ায় সেখানেই আত্মহত্যা করেন। মাতাঠাকুরানীকে এই দুঃসংবাদ জানাইলে যন্ত্রণাকাতর স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "এই সরকারের অবিচার আর কত সইবে ঠাকুর?" ঐ সময় আমি অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজ করি এবং বাগবাজারে থাকি। সাধারণত শনি-মঙ্গলবারে মাতাঠাকুরানী ও স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম করতে উদ্বোধনে যেতাম। এসব সাক্ষাতের সময় সারদানন্দজী মহারাজের সঙ্গে কোনও বিশেষ আলাপ হয়েছে বলে মনে নাই। বলরাম মন্দিরেও মহারাজকে প্রায়ই দেখতে যেতাম।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সঙ্গে মায়াবতী গিয়ে আশ্রমের অতিথি হই। পরে স্বামী যতীশ্বরানন্দজী আমাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক হন।

মায়াবতীতে মাধবানন্দজীর কথামত ইংরেজিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি জীবনীগ্রন্থ লিখি। গ্রন্থটির উপাদান অধিকাংশই স্বামী সারদানন্দজী-প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হতে গৃহীত। লীলাপ্রসঙ্গে কাশীপুর উদ্যানবাটির কথা কিছু ছিল না; বিভিন্ন বাংলা পুস্তক থেকে যতখানি সম্ভব তা সংগ্রহ করে লিখি। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা সম্পূর্ণ হয় এবং মাধবানন্দজী পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখে দেন। স্বামী সারদানন্দজীকে গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি দেখাবার জন্য আমি কলকাতায় আসি। এই সময়কার দু-একটি কথা মনে আছে। আমার গ্রন্থে লিখেছিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামী সারদানন্দজীকে 'গণেশ' বলতেন। বোধ হয় তিনি লীলাপ্রসঙ্গ লিখেছেন বলেই চিন্তাটি আমার মনে বসে গিয়েছিল। সারদানন্দজী সংশোধন করে দিলেন; বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে আমার শক্তি বলে ভাবতে বলেছিলেন।" আমি সান্যাল মশায়ের (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) কাছে শুনেছিলাম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধিকালে গোটা ঘরটি দিব্যজ্যোতিতে ভরে গিয়েছিল। স্বামী সারদানন্দজী বললেন, "আমাদের সকলেরই মন তখন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন ছিল। আমি কোন জ্যোতি দেখতে পাই নাই।" কল্পতরু দিবসের ঘটনার কথায় বললেন যে তিনি তখন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘর ঠিকঠাক করে রাখছিলেন; জানলা দিয়ে ঘটনাটি দেখেছিলেন, তবে এ দিনের ব্যাপার তাঁর কাছে মোটেই নতুন কিছু নয় বলে ঘটনাস্থলে যাবার কোন আগ্রহ জাগেনি।

জীবনীটি প্রকাশিত হবার পর প্রথম বইখানি স্বামী সারদানন্দজীকে উপহার দিলাম। দেখে তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, "ঠাকুরের একখানি ইংরেজি জীবনী লেখার ইচ্ছা আমার ছিল। তা দেখছি, ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল সেটা অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো।"

মায়াবতীতে প্রায়ই প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনতাম যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের সেবা করার সময় কী দুর্লভ আনন্দই না তাঁরা পেতেন। ঠাকুরের কোনও সন্তানের সঙ্গে বাস করার সৌভাগ্য আমার না হওয়ায় মনে খুব দুঃখ হতো। প্রায়ই এই প্রার্থনা করতাম, অন্তত তাঁদের একজনেরও সঙ্গ যেন লাভ করতে পারি। অবশেষে আমার বাসনা পূর্ণ হলো। সদ্যপ্রকাশিত 'সমন্বয়' নামক হিন্দি পত্রিকার জন্য গ্রাহক এবং অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এবং বক্তৃতা দেবার জন্য স্বামী মাধবানন্দজী আমাকে রাজপুতানা, গুজরাট, কাথিয়াওয়ার ও যুক্তপ্রদেশ সফরে পাঠান। এই সফরে প্রায় এগার মাস কাটিয়ে বহু মহারাজা ও অপরাপর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতার শাখায় ফিরে আসি। সেই সময় অদ্বৈত আশ্রম শঙ্কর ঘোষ লেনে ছিল। বৈকাল প্রায় চারটে। স্বামী মাধবানন্দজী তৎক্ষণাৎ আমাকে উদ্বোধনে গিয়ে স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম করে আসতে বললেন। কারণ পরদিন সন্ধ্যাতেই তিনি কাশী রওনা হবেন। স্বামী সারদানন্দজী বহু বৎসর পূর্বে কাথিয়াওয়ার এবং গুজরাট পরিদর্শন করেছিলেন; আমার অভিজ্ঞতার কথা তিনি জানতে চাইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন যে পরের দিন তিনি কাশী যাবেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক কিনা। আমি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কারণ আমি এতদিন প্রাণ থেকে এইটাই চাইছিলাম। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী, কাজেই বললাম, "মাধবানন্দজীর অনুমতি নিয়ে আসা প্রয়োজন।" সারদানন্দজী বললেন, "ও

নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না," এবং তখনি স্বামী সম্বিদানন্দজীকে আমার জন্য টিকিট কাটতে বললেন। মাধবানন্দজী আমার মুখে সব শুনে স্বামী সারদানন্দজীর কাছে গিয়ে জানালেন যে তিনি আমাকে তখন রাজকোট পাঠাবার কথা ভাবছিলেন। সারদানন্দজী বললেন, "সে স্বামীজীর তিথিপূজার পর জানুয়ারিতে গেলে চলবে।"

অন্য কয়েকজন সেবক ও আমি স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে কাশী গেলাম। বোধ হয় এইটিই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা বেশি আনন্দের সময়। তাঁর ঘর পরিষ্কার করা, তাঁর থালাবাসন ও জামাকাপড় ধোয়া ছিল আমার প্রধান কাজ। কাশীতে কিরণবাবুর বাড়ির তেতলায় আমরা সকলে থাকতাম। প্রথম ঘরটিতে সেবকেরা, মধ্যের ঘরে স্বামী সারদানন্দজী ও সান্যাল মশায় এবং শেষের ঘরে আমাদের সঙ্গে যে মহিলারা গিয়েছিলেন তাঁরা থাকতেন। ঐ সময়ের কয়েকটি ঘটনা স্মরণে আছে। যে মহিলাটি আমাদের খাবার পরিবেশন করতেন তিনি একদিন আমাকে দুই তিনখানা লুচি দেন। আমি তাঁকে বলি আর আমি খেতে পারব না। সারদানন্দজী মহারাজ বলেন, "দেখ ওর হজমশক্তি! তিনখানা লুচির বেশি খেতে পারবে না!" তারপরে তিনি বললেন যে তাঁদের তপস্যার সময় হৃষীকেশে মাধুকরী করে ১৭।১৮ খানা ভারি চাপাটি পেতেন। তিনি আমাকে বললেন, "এত সামান্য আহার করে তপস্যা করবে কিরূপে?"

একদিন তিনি আমাকে মাসাজ করতে বলেন। আমার হাত ঘামতো, সেজন্য স্বামী অশেষানন্দকে মাসাজ করতে বলা হলো। এমন একটি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হলো বলে মনে খুব লাগল।

একদিন স্বামী সারদানন্দজীকে বলি যে মাঝে মাঝে আমার হৃষীকেশে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা হয়। তিনি এই বলে আমাকে নিরুৎসাহ করেন যে তিনি কয়েক বৎসর ঐরূপে জীবন অতিবাহিত করে পরে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি হন। সেই থেকে তিনি মিশনের কষ্টসাধ্য কাজে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত আছেন। তিনি কিন্তু মনে করেন না যে, হিমালয়ে তপস্যার তুলনায় তাঁর এই নূতন কর্মের আধ্যাত্মিক মূল্য কোনও অংশে কম।

আমি তর্কচ্ছলে বললাম, "কিন্তু আপনিও তো তপস্যার জন্য হিমালয়ে গিয়েছিলেন।" তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিলেন, "আমার হিমালয়ে যাবার পূর্বে যেমন টান হয়েছিল, তোমার যদি সে রকম হতো তাহলে আমার অনুমতির অপেক্ষায় থাকতে না, আমাকে জিজ্ঞেস না করেই চলে যেতে।"

কয়েক বৎসর পরে আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, আমার আধ্যাত্মিক সাধনা কোন্ পথে হওয়া উচিত, স্বামীজীর কাজ করে যাব কিংবা তপস্যা করে জীবন কাটাব। এ কথাও বললাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রধান শিষ্যদের কার কোন্ বিশেষ পথে আধ্যাত্মিক সাধন অভ্যাস করা প্রয়োজন তা বলে দিতেন। আমার দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, "আমার মনে হয় তোমার শুধু তপস্যা করা অনুচিত। কর্ম ও যোগ একসঙ্গে অভ্যাস করার চেষ্টা কর।"

শীতকালের অপরাহ্ন। সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। সারদানন্দ মহারাজ বিশ্বনাথের মন্দিরে গেছেন। বাসায় আমি একা আছি। অদ্বৈত আশ্রম থেকে একজন সন্ন্যাসী আমাদের বাসায় এসে আমাকে বললেন, "স্বামী সারদানন্দজীর সামান্য বাত আছে, স্নানের ঘরে এক বালতি গরম জল রাখ। তিনি গরম জলে হাত-পা ধুলে বেশ আরাম বোধ করবেন। মহারাজের সেবকেরা ঠাণ্ডার দিনে তাঁর হাত-পা ধোয়ার জন্য সর্বদা গরম জল রাখত।" আমি স্নানের ঘরে এক বালতি গরম জল রেখে দিই। সারদানন্দ মহারাজ ফিরে এসে ঐ জল ব্যবহার করেন এবং ইহাও নিশ্চিত যে তিনি বেশ আরাম বোধ করেছিলেন। পরে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে ওখানে ঐ জল রেখেছে? আমি বলি যে আমিই রেখেছি। তিনি কারণ জানতে চান। আমি বলি, শীতের সন্ধ্যা, তাই রেখেছি। মূর্খের ন্যায় আরও বলি যে, মহারাজের সেবকেরাও তাঁর জন্য শীতকালে ঐরূপ করে। তিনি খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখছি, তুমি আমাকে মহারাজের সমপর্যায়ে ফেলতে চাও।" আমার মনে কষ্ট হলো। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে সেদিকে পিছন ফিরে বসে ধ্যানের ভান করতে লাগলাম। কয়েক মুহূর্ত পরেই সারদানন্দ মহারাজ ধীরে দরজা খুলে খুব মিষ্টস্বরে তাঁকে এক পেযালা কফি করে খাওয়াতে বললেন। আমার অভিমান জল হয়ে গেল। পরে তিনি

আমাকে এক খিলি পান খেতে দিলেন। অন্য সময়েও আমি এইরূপ ঘটনা লক্ষ্য করেছি। মনে হয় ঠাকুরের সন্তানদের ভক্তদিগকে কৃপা করবার সম্ভবত এই একটি পন্থা।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি আগত। অদ্বৈত আশ্রমে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলায় বিভিন্ন বক্তার ভাষণের ব্যবস্থা ছিল। স্বামী সারদানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। কাজ ছিল বলে আমি প্রথমে সভায় যাই নাই। পরে ইংরেজি ভাষণ দেবার লোক নেই বলে ঐ কাজের জন্য স্বামী সারদানন্দ আমাকে ডেকে পাঠান। ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে আমি ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু সারদানন্দজীর আদেশে আমাকে সেদিন বলতেই হলো। ঐ দিন লক্ষ্য করেছিলাম, সভাপতির ভাষণ দেওয়ার সময় অন্তত তিনবার স্বামী সারদানন্দজী অল্পক্ষণের জন্য থেমে যান। পরে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে বক্তৃতাকালে তিনি স্পষ্ট ঠাকুরকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

স্বামী সারদানন্দজীর আশ্চর্য স্থৈর্যের পরিচায়ক একটি ঘটনা মনে পড়ছে। তিনি পুরীতে ও উদ্বোধনে প্রাতঃকালে দীর্ঘকাল ধ্যান করতেন। তখন তাঁকে প্রস্তরমূর্তিবৎ মনে হতো। কাশী সেবাশ্রমের স্বামী শুভানন্দ একদিন প্রাতঃকালে আমাদের বাসায় এসে বলেন যে সেবাশ্রমের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দজীকে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। সারদানন্দজী সেই সময় ধ্যান করছিলেন। আমি বলি যে তাঁকে ধ্যান করবার সময়ে বিরক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বামী শুভানন্দ বলেন যে বিষয়টি খুবই জরুরি, অধিকন্তু সেক্রেটারি অসুস্থ, কিরণবাবুর বাড়িতে তিনি আসতে পারবেন না, সারদানন্দজীকেই প্রায় ১০ মিনিটের পথ হেঁটে সেবাশ্রমে যেতে হবে। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি স্বামী সারদানন্দজীর ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক দরজার নিকট সান্যাল মশায়ও অভ্যাসমত বিছানায় বসে ধ্যান করছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী ঘরের বাঁদিকে দেয়ালের পাশে তাঁর বিছানায় ধ্যানে বসেছিলেন। গলা না বাড়িয়ে দরজা থেকে দেখা যাচ্ছিল না। সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সান্যাল মশায় চোখ

খুলে ইশারায় জানতে চাইলেন আমার কি প্রয়োজন। আমি সারদানন্দজীকে দেখিয়ে দিই। সান্যাল মশায় খুব রাগত ভাবে আমাকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু স্বামী শুভানন্দ জিদ করতে লাগলেন যে, স্বামী সারদানন্দজীর সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অবশ্য প্রয়োজন। দু-তিনবার চেষ্টার পর আমি তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, "সারদানন্দজীর সঙ্গে কথা বলতেই হবে!" স্বামী সারদানন্দজী চোখ খুলে জানতে চাইলেন ব্যাপার কি? আমি তাঁকে সেক্রেটারির ইচ্ছা জানাই। তিনি বললেন, "ওঃ এরা দেখছি আমাকে শান্তিতে ধ্যান করতেও দেবে না।" তিনি সেক্রেটারিকে নিয়ে আসতে বললেন। আমি জানালাম, সেক্রেটারি অসুস্থ এবং তাঁকেই সেবাশ্রমে যেতে হবে। তিনি তাড়াতাড়ি জামা-জুতা পরে সেবাশ্রমে গেলেন। আমার কিন্তু এ ঘটনা মনে পড়লে এখনও বুক কাঁপে—তাঁকে ধ্যানকালে বিরক্ত করতে কী ভয়ই না পেয়েছিলাম!

আমার কাজের ধাত। একদিন স্বামী সারদানন্দজী বললেন, "কর্মপর হওয়া ভাল। কিন্তু তা কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য ভাল হওয়া দরকার আর সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেও পারা চাই। ধর, তোমার একটি অঙ্গ যদি নষ্ট হয়, তখন কাজ করা খুবই কঠিন হবে। সুতরাং পড়াশুনার অভ্যাসও রাখতে বলছি। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। মনে কর কেউ অন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ধ্যানের অভ্যাসও রাখা ভাল। যখন কাজ বা পড়াশুনা করা সম্ভব হবে না তখন ধ্যান করতে পারবে।"

কিরণবাবুর বাড়িতে স্বামী সারদানন্দজীর সম্মুখে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ হতো। তিনি মাঝে মাঝে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সেই অভিজ্ঞতা সত্যই ভুলবার নয়। সাধারণত সন্ধ্যাকালে অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সকল ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী স্বামী সারদানন্দজীকে প্রণাম করতে কিরণবাবুর বাড়িতে আসতেন। বেশি সময়ই তাঁরা চুপ করে বসে থাকতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে তোমরা প্রশ্ন কর না কেন?" তবুও তাঁরা চুপ করে রইলেন। তখন তিনি একজনকে বললেন, "নিখিলানন্দকে ডেকে নিয়ে এস। সে হয়ত প্রশ্ন করতে পারে।" মনে পড়ে, একদিন আমি বলেছিলাম, "আমার উপর ঠাকুরের কৃপা

আছে, নয়ত সাধু হতে পারতাম না। আপনার কৃপাও পেয়েছি, কিন্তু কোনও আধ্যাত্মিক অনুভূতি তো হচ্ছে না।" উত্তরে তিনি বলেন, "যদি পূর্বে না-ও হয়, মৃত্যুকালে ঠাকুরের কৃপার ফল বুঝতে পারবে। কিন্তু এখনই যদি ফল পেতে চাও তবে খুব খাটতে হবে।"

কাশীতে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা আরও একটি ঘটনার সঙ্গে একযোগে আমার নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একদিন স্বামী সারদানন্দজীর দলের মহিলারা মন্দির দর্শনে যান। তাঁরা ফিরতে দেরি করেন। তাঁরা তাঁদের শাড়ি-জামা ছাদে শুকুতে দিয়েছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি এল। আমাদের নেতা স্বামী সম্বিদানন্দ শাড়ি-জামাগুলি এনে মহিলাদের ঘরে রাখতে বললেন। আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্বিদানন্দ বলেন যে, বহুকাল উদ্বোধনে বাস করে তিনি স্বামী সারদানন্দজীর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছেন। শাড়ি-জামাগুলি ভিজে গেলে সারদানন্দজী রাগ করবেন। স্বামী সম্বিদানন্দের একটা পায়ে ব্যথা হয়েছিল নচেৎ তিনি নিজেই নিয়ে আসতেন, বললেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ছাদে গিয়ে শাড়ি-জামাগুলি মহিলাদের ঘরে এনে রেখে দিলাম। স্বামী সারদানন্দজী বারান্দায় বসে সব দেখছিলেন। তিনি রাগত ভাবে প্রশ্ন করলেন, কেন আমি জামাকাপড় তুলে এনেছি। আমি বৃষ্টির অজুহাত দেখালাম তবুও তিনি জানতে চাইলেন, কে আমাকে আনতে বলেছে। সহকর্মী সন্ন্যাসীর নাম প্রকাশ করা অনুচিত ভেবে চুপ করে রইলাম। আমার মনে আঘাত লাগল; বিশেষ করে এই ভর্ৎসনা ন্যায়ত আমার প্রাপ্য নয় মনে হলো। পূর্বের ন্যায় আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে যেই ধ্যানে বসেছি, দরজা খুলে ঘরে ঢুকে স্নেহমাখা কণ্ঠে তিনি এক পেয়ালা কফি করে দিতে বললেন। আমি শিক্ষা পেলাম, যে কাজ আমার নয় তাতে নাক গলানো অনুচিত। কিন্তু এখনই আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করব যাতে প্রমাণ হবে সত্যদ্রষ্টা পুরুষের চিন্তাধারা বোঝা কত কঠিন।

কাশীতে স্বামী সারদানন্দের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তিনি উদ্বোধনে ফিরে আসেন। ফিরে এসেই জ্বরে পড়লেন। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ তাঁর চিকিৎসা শুরু করলেন। আমি তাঁর কাছে যাতায়াত করতাম সারদানন্দজীর অবস্থা

জানাবার জন্য। একদিন সকাল ১১টার সময় দুর্গাপদবাবু এসে তাঁকে দেখে দুটো ওষুধ দিয়ে গেলেন—একটা জ্বর কম থাকলে দিতে হবে, আর একটা বেশি হলে। ওষুধ দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন। পরে দেখি জ্বর খুব বেড়েছে। কি করব বুঝতে না পেরে দুর্গাপদবাবুর কাছে চললাম। যাবার পথে সান্যাল মশায়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হলো এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে তিনি জানলেন যে সারদানন্দজীর জ্বর খুব বেড়েছে। দুর্গাপদবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখি তিনি খাবার পর বিশ্রাম করছেন। সব শুনে তিনি আমার সঙ্গে উদ্বোধনে এলেন। উদ্বোধনে আসামাত্র একজন সন্ন্যাসী আমাকে বললেন, "শরৎ মহারাজের ঘরে এখন যেও না, দুর্গাপদবাবুর বিশ্রামের ব্যাঘাত করেছ শুনে তিনি তোমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" ইতোমধ্যে সান্যাল মশায় এসে যাওয়ায় সারদানন্দজী তাঁর কাছে সব শুনেছেন। আমি অবশ্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘরে গেলাম। যাবামাত্র সারদানন্দজী আমাকে খুব বকতে লাগলেন, অনর্থক উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তারবাবুর বিশ্রামের ব্যাঘাত করেছি বলে। আর বললেন যে পরে আবার এ রকম করলে আমাকে আর তাঁর কাছেই যেতে দেবেন না।

স্বামী সারদানন্দজী তখন প্রায়ই আমাকে ভর্ৎসনা করতেন, যা তখন অন্যায় মনে হতো এবং রাগ হতো। কিন্তু এখন চল্লিশ বৎসর পরে যখন সেসব কথা মনে হয় তখন বুঝি, বাস্তবিক ওসব হলো বকুনির ছদ্মবেশে আশীর্বাদ। এখন ওরূপ আরও ভর্ৎসনার জন্য মন লালায়িত। বোধ হয় স্বামী সারদানন্দজী ঐ ভাবেই আমার অহমিকা দমন করতে চেয়েছিলেন।

স্বামী সারদানন্দজী কিছুটা সুস্থ বোধ করলে পুরী যাওয়া স্থির করেন। আমাকে এবার দলের তদারক করার ভার দিলেন।

যথা দিনে সবাই মিলে হাওড়া স্টেশনে গেলাম। আমাদের দলে তিন জন মহিলা ছিলেন। তাঁদের কামরা ইঞ্জিনের কাছাকাছি, স্বামী সারদানন্দজীর (২য় শ্রেণি) মাঝামাঝি জায়গায়। আমাদের কামরা ট্রেনের একেবারে পিছনের দিকে। কাশীতে মহিলাদের কাপড় তোলার ঘটনা স্মরণ করে আমি মহিলাদের কামরার দিকে গেলামই না। কয়েকজন ভক্ত তাঁদের ট্রেনে তুলে দিলেন। রাত্রি দশটায়

খড়গপুরে গাড়ি থামলে সারদানন্দজীর কামরায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলাম কোন প্রয়োজন আছে কিনা। খুব সকালে ভুবনেশ্বরে ট্রেন থামলো। ওখানকার আশ্রমের কয়েকজন সাধু স্টেশনে এসেছিলেন। এখানেও আমি সারদানন্দজীর কামরায় গেলাম, কোন প্রয়োজন আছে কিনা জানতে। তিনি আমাকে একটু কড়া সুরেই বললেন, "মেয়েদের কামরায় গিয়ে খোঁজ নাও ওঁদের কোন প্রয়োজন আছে কিনা।" আমি গেলাম, তাঁদের কিছু জল এনে দিলাম। সকাল ১০টায় পুরী স্টেশনে ট্রেন থামলো। স্বামী শঙ্করানন্দজী স্টেশনে এসেছিলেন। আমি সারদানন্দজীর বিছানাপত্র বেঁধে নামাতে লেগে গেলাম। শঙ্করানন্দজী মহিলাদের কামরায় গিয়ে তাঁদের মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করলেন। স্বামী সারদানন্দজী ও মহিলাদের নিয়ে শঙ্করানন্দজী মোটরে করে 'শশী নিকেতনে' চলে গেলেন। সেখানেই মহারাজের থাকার কথা। আমরা সব ঘোড়ার গাড়িতে চললাম। এসে দেখি একতলার বড় ঘরটিতে বসে সারদানন্দজী কফি খাচ্ছেন। আমি তাঁর মালপত্র নিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। একজন সাধুর নির্দেশমত (ইনি দীর্ঘকাল স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে ছিলেন) একটি বড় খাটে রাতে শোয়ার বিছানা এবং মেজেতে দিনের জন্য বিছানা করে দিলাম। আমি এসবের কিছুই জানতাম না, সাধুটি যেমন বললেন তেমনি করলাম। সব ঠিক করে সারদানন্দজীকে ওপরে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি ঘরে ঢুকেই আমাকে বকতে শুরু করলেন, গৃহস্থদের ব্যবহৃত খাটে তাঁর বিছানা করা হয়েছে বলে। আমি তো এর জন্য এত বিরক্ত হবার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হলো, তাঁর বিরক্তি যেন বেড়েই চলেছে।

তিনি জানতে চাইলেন কে আমাকে তাঁর বিছানা পালঙ্কে পাততে বলেছে। কয়েক মিনিট আমি চুপ করে থাকলাম; তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি এত বিরক্ত হচ্ছেন, বললেই তো আমি তাঁর বিছানা মেজেতে পেতে দিতে পারি। তখন আমার মনে হচ্ছিল তাঁর রাগের বাস্তবিক কারণ বিছানা পাতার ত্রুটি নয়, অন্য কিছু। তিনি বললেন, "আমি তোমার ওপর খুব রাগ করেছি। তোমার অদ্ভুত ব্যবহারেও আমি অবাক হয়েছি। আমি নিজে মহিলাদের

তত্ত্বাবধানে অশক্ত, জান আমি বাতে পঙ্গু। হাওড়া স্টেশনে তুমি মহিলাদের একটুও খোঁজ খবর করলে না, অন্যান্য ভক্তেরা তাদের ট্রেনে তুলে দিলেন। ভুবনেশ্বরেও তুমি আমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলে। মহিলাদের কোনও প্রয়োজন আছে কিনা দেখে আসার কথা আমাকেই বলতে হয়েছিল। পুরীতেও তুমি মহিলাদের নিকটেই গেলে না। শঙ্করানন্দ তাঁদের মালপত্রের ব্যবস্থা করল। আমি কলকাতায় বলেছিলাম, তুমি দলের সকলকে দেখাশুনা করবে। তুমি সন্ন্যাসী বলে যদি মহিলাদের কাছে না গিয়ে থাক, তবে আমার সঙ্গে আসা তোমার উচিত হয় নাই। ভেবে দেখ, তোমার মা-ভগিনী যদি ঐ দলে থাকতেন তবে তুমি কি এরূপ অবহেলা করতে পারতে?'' আমার শিক্ষা হলো। আমার বিশ্বাস স্বামী সারদানন্দজী আমাকে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী কাজ করতে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

স্বামী সারদানন্দজী সিগারেটের ছাই ফেলবার জন্য একটা সাধারণ সিগারেটের টিনের কৌটো ব্যবহার করতেন। তাঁর ঘরের সব জিনিসই ছিল সস্তা কিন্তু দেখতে সুন্দর। তাঁর ধনী ভক্তদের মধ্যে একজন তাঁর ঘরের জন্য কিছু একটা উপহার রূপে কিনে দিতে চান। আমি একটি কাঁচের 'ছাইদানি' কেনার প্রস্তাব করি, দাম বোধ হয় আট আনা। আমি নিজেই জিনিসটি কিনে এনে রাত্রে তাঁর বিছানার পাশে রেখে দিই। প্রাতঃকালে ঐটি দেখে কে দাম দিয়েছে জিজ্ঞাসা করেন। আমি ভক্তটির নাম বলি। তিনি বিরক্ত হন এবং গৃহস্থদের এইভাবে টাকা খরচ না করানোর বিষয়ে সাবধান করে দেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে আমরা সন্ন্যাসী এবং আমাদের উচিত সাধারণ জিনিসেই সন্তুষ্ট থাকা। তিনি বললেন আমি যেন 'ছাইদানি' ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা ফেরত আনি, আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে ঐ পয়সায় কাপড় কাচার জন্য সাধারণ সাবান কিনে আনি। পরে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, ছাই যাতে চারিদিকে উড়ে না যায় তাই তিনি সিগারেটের টিনের কৌটো 'ছাইদানি' হিসাবে ব্যবহার করেন।

কেন আমাকে স্বামী সারদানন্দজী তাঁর একজন সেবক রূপে কাশীতে যেতে বলেন, তা প্রথম প্রকাশ করেন পুরীতে। কোন প্রসিদ্ধ মঠের মহন্ত কয়েকজন

সেবকসহ একটি সুন্দর ফিটন গাড়িতে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেন। তিনি একটি জাঁকাল হলুদ রঙের পোশাক পরতেন; তাঁকে একটি বিগ্রহের ন্যায় দেখাত। প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণেই আমি আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়িটি যেতে দেখতাম। একদিন নৈশ-ভোজনের পরে স্বামী সারদানন্দজী বিছানায় শুয়ে আছেন; আমি তাঁকে হাওয়া করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, একজন সন্ন্যাসীর, বিশেষ করে একটি মঠের মহন্তের পক্ষে সমুদ্রের ধারে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য সুন্দর গাড়িতে চড়ে যাওয়া কি উচিত? স্বামী সারদানন্দজী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "ঐ মঠের মহন্ত একজন বিশিষ্ট লোক। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। সম্মান হজম করা কি এতই সহজ?" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যখন থেকে মায়াবতীতে যোগদান করেছ, আমি তখন থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছি। প্রথমে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী লিখেছ। তারপর তুমি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহু স্থান ভ্রমণ করেছ এবং সেখানে কয়েকজন মহারাজা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর খাতির-যত্ন পেয়েছ। আমি সব শুনে মনে করলাম, 'এই যুবকটি সন্ন্যাসী হতে চায় কিন্তু সে ভুল পথে জীবন শুরু করেছে—বই লেখা ও বক্তৃতা দিয়ে আরম্ভ করেছে। সন্ন্যাসীর জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই লাভ করে নাই। অচিরেই সে আঙুলফুলে কলাগাছের মতো অহংকারে ফুলে উঠবে। সন্ন্যাস-জীবনের সঙ্গে তার কখনও পরিচয় ঘটবে না।'" তারপর তিনি বললেন, "আমরা প্রথম কৃচ্ছ্রসাধন করেছি। তারপরে বই লেখা বা বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেছি। আমি বাস্তবিকই তোমার জন্য উদ্বেগ বোধ করতাম। এই জন্যই বক্তৃতা-সফর থেকে ঘুরে এলে তোমাকে আমার কাছে থাকতে বলেছিলাম, যাতে তুমি দেখে শিখতে পার সাধুর কিভাবে থাকা উচিত। আমি নিশ্চিত জানি তুমি বুঝতে পার নাই, কেন কাশীতে আমি তোমাকে আমার একজন সহকারী করে নিয়ে যাই।" আমি তাঁর কৃপায় অভিভূত হয়ে পড়ি। এখনও ঐ কথা মনে হলে আমার চোখ জলে ভরে যায়।

কাশীতে স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব সমাপ্তির পরে স্বামী মাধবানন্দজী স্বামী সারদানন্দজীকে লেখেন যে, পূর্বব্যবস্থানুযায়ী আমাকে যেন কলকাতা পাঠিয়ে

দেওয়া হয়, যাতে আমি রাজকোট কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। সারদানন্দ মহারাজ আমাকে পত্রখানা দেখিয়ে আমার মত জানতে চাইলেন। আমার মনে হলো আমি আরও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকি, এইটাই তাঁর ইচ্ছা, নইলে তিনিই আমাকে রাজকোটে যেতে বলতেন। সুতরাং আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকাই আমার ইচ্ছা; অবশ্য আপনি আদেশ করলে কলকাতায় ফিরে যাব।" শুনে তিনি বললেন, "তাহলে তাঁকে (মাধবানন্দজীকে) লিখে দাও যে তুমি আরও কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকতে চাও।" স্পষ্টই বোঝা যায়, মাধবানন্দজী এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, পত্রে আমারই মতামত প্রকাশ পেয়েছে, স্বামী সারদানন্দজীর নয়। সুতরাং পত্রোত্তরে তিনি স্বামী সারদানন্দজী আমার সম্বন্ধে কি স্থির করেছেন তা তাঁর স্বহস্ত-লিখিত পত্রের মাধ্যমে জানতে চাইলেন। সারদানন্দজী তখন লিখে পাঠান যে, আমার রাজকোটে যাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না; বহু বৎসর পূর্বে তিনি ঐ স্থান দর্শন করেছেন। ঐ স্থানের জনসাধারণের জন্য একজন ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবার মতো সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নাই; বরং আমি তাঁর নিকট থাকি এইটাই তাঁর ইচ্ছা। তখন আমি অনুভব করলাম, ঠাকুরের একজন সন্তানের সঙ্গ করার জন্য আমার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, স্বামী সারদানন্দজী এভাবে তা পূর্ণ করলেন।

এই স্মৃতিকথা শেষ করবার পূর্বে আরও একটি ঘটনার বিবৃতি দিতে চাই। কাশীযাত্রার পূর্বে আমার সাক্ষাতে স্বামী শুদ্ধানন্দ সারদানন্দজী মহারাজকে 'লীলাপ্রসঙ্গে'র কাশীপুর অধ্যায় শেষ করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন তিনি কয়েকটা বিষয় টুকে রেখেছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রবন্ধাকারে লেখা তখন সম্ভব নয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন বলেন, "আপনি বলে যান, নিখিলানন্দ লিখে নেবে।" তিনি উত্তরে বলেন, কি করা যায় তা ভেবে দেখবেন। আমার বিশ্বাস তিনি তাঁর নোটবই সঙ্গে নিয়ে যান। পূর্বে বলা হয়েছে তিনি কাশীতে খুব সুস্থ বোধ করেন নাই, সেজন্য কিছুই করা হয় নাই। আমরা পুরী রওনা হবার পূর্বে স্বামী শুদ্ধানন্দ পুনর্বার তাঁকে লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দেন

এবং আমাকে দিয়ে লেখাতে বলেন। স্বামী সারদানন্দজী নিম্নলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন, "শ্রীশ্রীমা যখন স্থূলদেহে ছিলেন, ভিতরে খুব একটা জোর পেতাম; তখন লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে শুরু করি। তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমার সব শক্তি চলে গেছে। মহারাজকে দেখে আবার বল পেতে আরম্ভ করি। তিনিও যখন চলে গেলেন, মনে হলো যেন আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে। বইটি শেষ করা আমার সাধ্যাতীত।" পরে আরও বললেন, "যখন লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে আরম্ভ করি, মনে করেছিলাম ঠাকুরকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন পরিষ্কার দেখছি ঠাকুরেব জীবন অতি গভীর। আমি শুধু উপরের ডালপালা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি কিন্তু শিকড় মাটির অনেকখানি নিচে।"

স্বামী সারদানন্দ সম্বন্ধে আরও বহু ঘটনা আছে। প্রায়ই নিজের মনে ভাবি, তাঁর উপদেশের এক অংশও যদি জীবনে কাজে লাগাতে পারতাম তবে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ হয়ে যেতাম।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতি স্বামী সারদানন্দজী অনুপম শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের ভাব পোষণ করতেন। একদিন তাঁকে বলতে শুনি, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা স্বাভাবিক ভাবে ভগ্নোদ্যম হন এবং তাঁদের অনেকে কর্মত্যাগ করে নিভৃত জীবনযাপন করতে ইচ্ছা করেন। স্বামী সারদানন্দজী সন্ন্যাসীদের এক সভা আহ্বান করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের গুরুদায়িত্বের কথা বিবৃত করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই গুরুদায়িত্ব বহন করে চলতে হবে সকলকে। তিনি প্রশ্ন করেন, তিনি স্বামীজীর মনোনীত সেক্রেটারি, তাঁকে সাহায্য করতে কে কে ইচ্ছুক আছেন, সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করতে কে কে প্রস্তুত আছেন এবং কে কে তপস্যায় জীবন কাটাতে পছন্দ করেন। তিনি স্বয়ং পাঁচ বৎসর সঙ্ঘের কাজ করবেন বলে এগিয়ে আসেন। আমার বিশ্বাস, মাত্র একজন ব্যতীত অপর সন্ন্যাসীরা সকলেই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হন। পাঁচ বৎসর পরেও স্বামী সারদানন্দজী সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করেন নাই, কাজ করেই চলেছিলেন। বেলুড় মঠে ১৯২৬

খ্রিস্টাব্দে প্রথম সন্ন্যাসী সম্মেলনের পরে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং উপযুক্ত সাধুদের বিভিন্ন কর্তব্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামী সারদানন্দজী বলতেন, স্বামীজী তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারি করে গেছেন, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন তিনি ঐ পদেই বহাল থাকতে চান। কার্যকরী সমিতির সভ্যদের তিনি সক্রিয় ভাবে কর্তব্য সম্পাদন করতে বলেন, তিনি শুধু নামে মাত্র সেক্রেটারি থাকবেন। ঐ সময় তাঁর শক্তি ও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল কিন্তু তবুও তিনি তাঁর সঙ্কল্প অটুট রেখেছিলেন।

স্বামী সারদানন্দজীর আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা মাত্র। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে খুব কমই বলতেন, অন্তত আমি শুনি নাই। এই দেবতুল্য পুরুষের অন্তরের গভীরতা একমাত্র দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই অনুভব করতে পারতেন। তবু সাধারণ দর্শকেরও তাঁর জীবনধারা ও সাধারণ ব্যবহার থেকে তাঁর অসীম ধৈর্য, ধীরস্থির কার্যাবলী, অপরিসীম করুণা, মানব-চরিত্রের গভীর জ্ঞান, আচরণে পূর্ণ সততা শিশুসুলভ সরলতা ও অশেষ সৌজন্য নজরে পড়ত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারির গুরুভার কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণ অহংবুদ্ধিশূন্য হয়ে সম্পাদন করতেন। এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। সকল সমস্যাতেই তিনি বিচক্ষণতা ও সাহসের সঙ্গে সমাধানে অগ্রসর হতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এবং তাঁর খামখেয়ালী আত্মীয়বর্গেরও দেখাশুনা তাঁকে করতে হতো। শ্রীশ্রীমা বহু বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। তাঁর ওপর দিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলে যেত, তিনি কিন্তু অবিচলিত থাকতেন। যখনই আমি সারদানন্দজীর কথা ভাবি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি আমার স্মরণ হয় ঃ

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

যখন স্বামী সারদানন্দজী সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন, আমি পেটের ক্ষতের জন্য ডাক্তার অঘোর ঘোষের চিকিৎসাধীনে ছিলাম। আমরা তারযোগে এই

দুঃসংবাদ পাই। আমি অবিলম্বে কলকাতা এসে উদ্বোধনে উঠি। তাঁর দেহের একটা দিক সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনে হতো তাঁর ভিতরের জ্ঞান অব্যাহত আছে। তাঁর মহাসমাধির দিন প্রাতে দুই জন সাধু তাঁর বিছানার চাদর বদল করছিলেন। স্বামী সারদানন্দজীকে একপাশে ধরবার জন্য আরও একজন লোক দরকার; আমাকে সাহায্য করতে বলা হলো। আমি বিছানার ধারে বসলাম। তাঁকে একপাশে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। চাদর বদলাবার সময় যেন পড়ে না যান, সেভাবে আমি ধরে রাখলাম। সেই সময় সহসা তাঁর বিশেষ কৃপা অনুভব করলাম। এই অভিজ্ঞতা এতই নিজস্ব যে তার বর্ণনা দেওয়া যায় না।*

(উদ্বোধন ঃ ৬৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা)

* ইংরেজি হইতে অনূদিত।

স্বামী সারদানন্দ-স্মৃতি

স্বামী অশেষানন্দ

যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শিব, হিন্দুধর্মের মধ্যে যা কিছু শুভ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক। সমীপাগত শত শত ব্যক্তির মধ্যে মাত্র কয়েকজন যুবককে বেছে নিয়ে তিনি তাদের সন্ন্যাস-জীবনে দীক্ষিত করেছিলেন; তাদের মধ্য দিয়েই প্রাচীন ভারতের বাণী আধুনিক যুগে নবরূপে মূর্ত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাচীন রীতি-নীতিতে নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও সুপ্রাচীন অতীতের গৌরবেই তৃপ্ত সন্ন্যাসীর মতো ছিলেন না; সে অতীতকে ভিত্তি করে অধিকতর গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চাইতেন তিনি। তাঁর যুবক ভক্তদেরও তাই 'আরও এগিয়ে গিয়ে' উচ্চতর অনুভূতি লাভ করে সত্যদ্রষ্টা ঋষি হতে বলতেন। এইসব হৃদয়স্পর্শী কথা বলে তাদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিতেন—"এ জন্মে ভগবান লাভ না হলে পরজন্মে হবে—এরূপ আলসে ভাব মনে আনবি কেন? এমন মেদাটে ভক্তি ভাল নয়। এই জন্মে, এই মুহূর্তেই ভগবান লাভ করব—এ রকম দৃঢ়সঙ্কল্প না হলে কি তাঁকে পাওয়া যায়? কুঁড়েমি করলে চলবে না। মনে বল এনে জোর করে বলতে হয়—এই মুহূর্তেই ভগবান লাভ করবো। তবে তো হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম আমেরিকায় এসে বেদান্তের জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করেন, সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণ প্রচারক মাত্র ছিলেন না, নিজে সত্য উপলব্ধি করে তবে তা প্রচার করতেন। তাঁর জীবনের শ্রম সার্থক হয়েছিল, পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতা-প্রচারকার্য খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আরব্ধ কার্যটিকে সুসংহত করবার জন্য তাঁর একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হলো; এ কার্যের জন্য নিজ গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দকে চাইলেন তিনি। অবিলম্বে স্বামী সারদানন্দকে

পাঠিয়ে দেবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি পত্র দিলেন। ব্যবস্থামত স্বামী সারদানন্দ বোম্বাই বন্দরে এসে জাহাজে উঠে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে লন্ডনে পৌঁছিলেন। লন্ডনে অল্প কিছুদিন কাজ করার পরই তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করেন; নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিতে কাজের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তাঁর চিত্তজয়ী ব্যক্তিত্বে সেখানে বহু বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী আকৃষ্ট হলেন। তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যায় দক্ষতা সকলের প্রশংসা অর্জন করল, গভীরভাবে সকলের হৃদয় স্পর্শ করল। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার জন্য আহূত 'গ্রীনএকর কনফারেন্সে' তিনি অন্যতম আচার্য রূপে নিমন্ত্রিত হলেন। তাঁর কথা শুনে এই সভায় সকলেরই মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে তিনি একজন গভীর চিন্তাশীল, উপলব্ধিবান পণ্ডিত। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম জেমস এব দেশের অন্যান্য বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আন্তরিক প্রশংসা তিনি অর্জন করেন। বেদান্ত সোসাইটি হতে তাঁকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়; তাতে ডক্টর ই. জি. ডে—বলেন ঃ "আমাদের অতি প্রিয় মহান আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে যাঁরা সমাগত হতেন, তাঁদের অনেককে এ সভায় উপস্থিত দেখছি। যাঁকে নিজেদের বন্ধু ও শিক্ষক বলে মনে হতো সেই বিবেকানন্দ যখন এদেশ থেকে চলে গেলেন, তখন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন এমন বহুজনকেও দেখছি এখানে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, স্বামীজীর সেই অভাব পূরণ করার কাজের ভার যোগ্য ব্যক্তির স্কন্ধেই দেওয়া হয়েছে—তিনি হলেন স্বামী সারদানন্দ, তিনিই আমাদের বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। স্বামীজীর প্রতি যে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা আমরা নিবেদন করেছি, এঁকেও তাই-ই আমরা নিবেদন করব—আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এ কথা আমার একার নয়, এখানে সমবেত সকলেরই কথা।"

স্বামী সারদানন্দ বেদান্ত সোসাইটির কাজ যথাযোগ্যভাবেই আরম্ভ করেছিলেন এবং সঠিক পথেই তাকে চালিত করেছিলেন। যেসব ভাষণ তিনি দিতেন, সভায় উপস্থিত সকলেই তাতে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন, তাঁকে অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করলেন। ব্রুকলিন এবং বোস্টনে বক্তৃতা দেবার

জন্য তিনি আহূত হন। 'ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশন'-এ তিনি "হিন্দুদের নৈতিক আদর্শ" বিষয়ে ভাষণ দেন। কাজ যখন নির্ধারিত পথে দ্রুত অগ্রসর হতে শুরু করেছে এবং স্বামী সারদানন্দও যখন জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে আসীন, সেই সময়ই তাঁর নেতা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ভারতে ফিরে যেতে বললেন। বিনা দ্বিধায় তিনি তখনি যাত্রা করলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তিনি জাহাজে উঠলেন। ভারতে ফিরে এলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারি করেন। ত্রিশ বছর এই পদে থেকে তিনি সর্বপ্রযত্নে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

স্বামী সারদানন্দের সংস্পর্শে আমি আসি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে। কলকাতায় উদ্বোধন-এর বাড়িতে আমি তাঁকে প্রথম দেখি; তাঁর বাইরের কঠিন ভাব দেখে ভয়ই পেয়েছিলাম, তাঁর গাম্ভীর্য মনে বেশ ভয়ের সঞ্চার করেছিল। উদ্বোধনের বাড়ির প্রবেশদ্বারের পাশে যে ছোট ঘরটি, সেখানেই তিনি বসতেন, বাড়িতে যারা ঢুকতো তাদের সকলেরই ওপর নজর রাখতেন। আগে স্বামী সারদানন্দের নিকট না গিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে কেউ-ই দোতলায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতে পারত না। নিজেকে তিনি মায়ের বাড়ির দারোয়ান বলতেন। আমি তখন ছাত্র ছিলাম। বাইরে থাকতাম। সঙ্ঘে যোগ দেবার পর এই মায়ের বাড়িতেই কর্মিরূপে আমাকে পাঠানো হলো। এখানে স্বামী সারদানন্দের সেবক হয়ে থাকার সময়ই ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সংস্পর্শে আসি, আর তখনই বুঝতে পারি, আগে তাঁর সম্বন্ধে কী ভুল ধারণাই না করেছিলাম! বাইরে থেকে দেখে তাঁকে কঠোর বলে মনে হলেও তাঁর হৃদয় ছিল অতি কোমল, সকলের জন্যই স্নেহধারা ঝরে পড়ত সেখান থেকে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি বলেই তাঁর অনুগত হই নাই, তাঁর অসীম ভালবাসাই আমাকে বশ করেছিল। একা আমি নই, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যান্য যেসব সন্ন্যাসী তাঁর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরাও একবাক্যে স্বীকার করবেন যে তাঁর ভালবাসার দুর্বার শক্তিই তাঁদেরও হৃদয় অধিকার করে নিয়েছিল।

আদেশ করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও স্বামী সারদানন্দ সব সময় প্রস্তাব বা

পরামর্শের আকারে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। আমার এবং আরো অনেকেরই কাছে তিনি শিক্ষকের চেয়েও বড় ছিলেন—তিনি ছিলেন আমাদের পরামর্শদাতা ও বন্ধু। এই জন্যই সঙ্ঘের প্রত্যেকেই তাঁর অধীনে কাজ করতে পাওয়াকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন, তাঁর ইচ্ছামত কর্মসাধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং দুর্ভিক্ষ বা বন্যাত্রাণ সেবাকার্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতেন। "সর্বত্র জয়মিচ্ছেত্তু পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"—এই সংস্কৃত শ্লোকটি তিনি প্রায়ই বলতেন—এই কথাগুলির ভেতর দিয়ে তাঁর হৃদয়জোড়া ভাবটিই বাণীরূপ নিত যেন!

"প্রচণ্ড কার্যতৎপরতার মধ্যে পূর্ণ প্রশান্তি"—গীতার এই আদর্শই স্বামী সারদানন্দের জীবনাদর্শ ছিল। অবিশ্রান্ত কাজ করতেন তিনি, কিন্তু বিন্দুমাত্র আসক্তি কোথাও থাকত না। শ্রীশ্রীমায়ের সেবাই হোক বা হিসাবরক্ষার কাজই হোক—তাঁর কাছে সব কাজই ছিল পূজা। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি হিমালয়ের মতো অটল হয়ে থাকতেন। তাঁর মধ্যে বিরক্তির ভাব কখনো দেখিনি। প্রবীণ সন্ন্যাসীদের মুখে শুনেছি, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্থৈর্যের খুব প্রশংসা করতেন; ঠাট্টা করে বলতেন, 'শরতের মাছের রক্ত, কখনও তাতে না।'

যা শুনেছিলাম, তার পরিচয়ও পেয়েছি বহু ঘটনায়। একটি ঘটনার কথা বলছি এখানে। সঙ্ঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মব্যপদেশে একবার তাঁকে জনৈক বিশিষ্ট পুলিশ অফিসারের সহিত দেখা করতে হয়। অফিসারটি কিন্তু তাঁর সঙ্গে মোটেই সহৃদয় ব্যবহার করলেন না; তাঁর প্রতি সৌজন্যের সহিত আলাপও করলেন না, তাঁকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। স্বামী সারদানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যা বলবার ছিল বললেন, ধীর স্থির ভাবেই বললেন। সঙ্ঘভুক্ত জনৈক সাধুর নিরাপত্তার জন্যই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সাধুটি রাজনৈতিক বিষয়ে জড়িত, পুলিশের এরূপ ধারণা ছিল; কিন্তু সে ধারণা ভিত্তিহীন। ফেরার সময় সেই সাধুটি (তিনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন) সারদানন্দজীকে দুঃখিত চিত্তে বললেন, "মহারাজ, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার জন্যই আপনাকে, আপনার মতো

লোককে এই অপমান ও অসম্মান সইতে হলো।'' শুনে স্বামী সারদানন্দ বললেন, ''আমার অপমান কে করতে পারে? আমার মন যদি একে অপমান বলে গ্রহণ না করে, তাহলে আমি আর অপমানিত হলাম কি করে? আমি কি নিজের বলে কিছু রেখেছি? ঠাকুরের শ্রীচরণে দেহ, মন, প্রাণ সবই তো সমর্পণ করেছি—সেখানে ভাল-মন্দ, মান-অপমানের কোন স্থানই থাকতে পারে না। আমার জন্য কোন দুশ্চিন্তা কোরো না।'')

ঘটনাটি শুনে বুদ্ধদেবের জীবনের অনুরূপ একটি ঘটনা আমার মনে পড়েছিল। বুদ্ধদেবকে একদা এক ব্যক্তি এসে খুব গালাগাল দিতে থাকে; লোকটি সে সময় বুদ্ধদেবের নামে যা তা বলে বেড়াত। এতে তাঁর শিষ্যদের মনে খুবই আঘাত লাগে, এর প্রতিকার করার জন্য তাঁরা বুদ্ধদেবের অনুমতি চান। বুদ্ধদেব স্থির হয়ে সব শুনলেন। পরে শিষ্যদের বললেন, ''কেউ যদি কাউকে কিছু উপহার দেয় এবং যাঁকে দেওয়া হচ্ছে তিনি যদি তা গ্রহণ না করেন তাহলে সে উপহার কার কাছে যায়? ঠিক সেভাবেই আমি যদি নিন্দা গ্রহণ না করি তাহলে তা তো নিন্দুকের কাছেই ফিরে যাবে।''

স্বামী সারদানন্দকে একজন মহান কর্মিরূপেই আমি দেখতাম। মনে মনে প্রশ্ন কবতাম 'স্বামী সারদানন্দ এত মহান, অপরের এত প্রিয়পাত্র, সর্বগুণান্বিত শ্রীশ্রীঠাকুরের এত যোগ্য সন্তান হলেন কি করে?' তাঁর অন্তর্জীবনেই আমি আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি। তাঁর বাইরের কৃতিত্ব হলো গৌণ; মুখ্য জিনিস তাঁর অন্তর্জীবন, তাঁর আধ্যাত্মিকতা-সচেতনতা—যার মূল্য কর্মের চেয়ে অনেক বেশি, যা কর্মের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী। জনহিতকর কর্মে অতন্দ্রভাবে কার্যরত একজন মানবপ্রেমিক মাত্র তিনি ছিলেন না। জনহিতকর কর্ম যে শুভকার্য, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কেবল তা দিয়ে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। সমাজসেবী প্রচারকগণ প্রায়ই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে অহংকার এবং নাম-যশের জালে জড়িয়ে পড়েন। জগতের কল্যাণসাধন তো একটি মহান আদর্শ। কিন্তু কয়জন এই আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে এবং তাকে কর্মে পরিণত করতে পারেন? ভগবানকে নিরন্তর স্মরণে না রাখলে কর্ম ভগবানলাভের সহায়ক না

হয়ে প্রতিবন্ধকই হয়ে দাঁড়ায়। জীবকে বন্ধনমুক্ত না করে তা বরং নতুন বন্ধনে আরও বেশি করে জড়িয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'বর্ষায় গঙ্গার জলে কেমন কাঁকড়ার ছোট ছোট বাচ্চা জন্মায় দেখেছিস? এই বিশ্বের বিরাটত্বের তুলনায় তুই ঐ কাঁকড়ার বাচ্চার চেয়েও ক্ষুদ্র, জগতের উপকার তুই কি করবি? ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হলে তখনই মাত্র সে অপরের উপকার করার কথা ভাবতে পারে। আগে মানুষকে অহঙ্কার মুক্ত হতে হবে; তখন বিশ্বজননী তাকে জগৎকল্যাণ-সাধনে আদেশ দেবেন।'

স্বামী সারদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে জিনিসটি আমার মনে সব চেয়ে বেশি গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল, তা হচ্ছে তাঁর সাধুত্ব। সর্বাগ্রে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, তারপর নিঃস্বার্থ কর্মী। সন্ন্যাসী কাকে বলে? যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনিই সন্ন্যাসী। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। অধিকাংশ লোক যে বিষয়ে কিছুই জানে না, নিদ্রিত, সেই চরম সত্য সম্বন্ধে তাঁর চেতনা সদা-জাগ্রত। সমাধিতে ভগবানের সহিত নিরন্তর সংযুক্ত থেকে তিনি ভগবৎ-আনন্দ উপভোগ করেন। একমাত্র সমাধিতেই মানুষ নিজের যথার্থ 'আপন ঘর', দৃঢ় অবিচল আশ্রয়স্থল খুঁজে পায়। বিবেকচূড়ামণিতে (৪২৫) শঙ্করাচার্য এই অবস্থার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্মুক্তবাহ্যার্থধী-
রন্যাবেদিত-ভোগ্যভোগকলনো নিদ্রালুবদ্‌বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্‌
ক্বচিল্লব্ধধীরাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্‌ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি ॥"

বাইরে থেকে স্বামী সারদানন্দের মতো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক গভীরতা পরিমাপ করা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী সারদানন্দের একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছিলেন; বলেছিলেন যে তিনি (স্বামী সারদানন্দ) যিশুখ্রিস্টের দলের লোক। এ কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী বোঝাতে চেয়েছিলেন বলা কঠিন; পূর্বজন্মে স্বামী সারদানন্দ যিশুখ্রিস্টের পার্যদরূপে এসেছিলেন, এ কথাই বোধ হয় তিনি মনে করতেন। স্বামী সারদানন্দের মুখে শুনেছি, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে

লন্ডন যাবার পথে রোমে সেন্ট পিটারস ক্যাথিড্রাল দর্শনকালে তাঁর এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, বাহ্য সংজ্ঞা হারিয়ে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আর, থামগুলির পরিবর্তে তিনি দেখেছিলেন, সেসব জায়গায় এক একজন জ্যোতির্ময় সাধুপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে সমগ্র স্থানটি পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করে রেখেছেন। এইসব সাধুদের মধ্যস্থলে তিনি দিব্যশিশু-ক্রোড়ে কুমারী মেরির অপরূপ কমনীয় মূর্তিও দর্শন করেন। কুমারী মেরির স্নিগ্ধ দিব্য সৌন্দর্য দেখে তিনি অতিমাত্রায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ পূর্ণমাত্রায় সংযত পুরুষ ছিলেন। নিজের ব্যাপারে একেবারে মৌনী থাকতেন, আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বলতেনই না একরকম। তাঁর দেহত্যাগের পর তবে আমরা তাঁর দিনপঞ্জি দেখতে পাই; তার ভেতর বহুবার জগন্মাতার সহিত তাঁর আলাপের কথা উল্লিখিত রয়েছে। জীবিতকালে নিজের উপলব্ধির কথা খুব কমই বলেছেন তিনি। তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে কিনা সে কথা জানবার জন্য একবার একজন সেবকের খুবই আগ্রহ হয় এবং সে এ বিষয়ে সোজাসুজি তাঁকে প্রশ্ন করে। শুনে স্বামী সারদানন্দ প্রথমে চুপ করে রইলেন। পরে সেবকের আগ্রহাতিশয্য দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে কি বৃথা কালক্ষেপ করেছি? আমার লেখা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পুস্তকে ভাব, সমাধি ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা পড়নি? নিজে উপলব্ধি করিনি এমন একটি কথাও আমি লিখিনি।"

স্বামী সারদানন্দের আধ্যাত্মিকতা যে কত গভীর ছিল, পূর্ববঙ্গের একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। স্বামী সারদানন্দ একবার বরিশাল গিয়েছিলেন এবং সেখানে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। কয়েকজন যুবক তা শুনে খুবই অনুপ্রাণিত হয় এবং বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি শেষ হবার পর স্বামী সারদানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করে। খুব ক্লান্ত হলেও তিনি রাজি হলেন এবং হেসে বললেন, "অহংকারের লেশমাত্র থাকা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বোঝার চেষ্টা বৃথা। আমাদের বহু ভাগ্য তাই

এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসার সুযোগ পেয়েছিলাম যাঁর কোন দেহবোধ ছিল না, বিন্দুমাত্র ভোগবাসনা ছিল না। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বার বিগ্রহরূপে দেখতেন। তাঁর চিত্ত এত পবিত্র এবং এত নিখুঁতভাবে উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল যে জগন্মাতার সূক্ষ্মতম ইচ্ছাতরঙ্গও সেখানে যথাযথরূপে স্পন্দিত হতো এবং ঠিক যেন যন্ত্রের মতই তাঁকে তদনুযায়ী চালিত করত। তাঁর চিন্তার প্রতিটি স্পন্দন, তাঁর কর্মের প্রতিটি ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হতো জগন্মাতার আদেশানুযায়ী। শুধু ধ্যানকালেই যে তিনি জগন্মাতার আদেশ পেতেন তা নয়, সদাসর্বদা তাঁর কথা শুনতে পেতেন—ঠিক যেভাবে দুজন মানুষ কথা বলে। জগন্মাতার বাণী শব্দের রূপ নিয়ে তাঁর কর্ণে প্রবেশ করত, আর তদনুযায়ী তিনি লোকশিক্ষা দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান কর। তাঁর গুণগুলি জীবনে ফুটিয়ে তোল। তখন তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে সব বুঝিয়ে দেবেন। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশ্বাস কর। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা আর কতটুকু বুঝেছি? তাঁর অনন্ত ভাবের, তাঁর অসীম অভিব্যক্তির কতটুকুই বা জেনেছি? সত্যি বলতে, বুঝেছি খুব সামান্যই।'[১]

এসব কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি স্থাণুর মতো স্থির হয়ে গেলেন। কিছুকাল এভাবে কাটার পর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসার লক্ষণ দেখা গেল। দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত তিনি ভাবস্থ হয়েছিলেন, একটি কথাও বলেননি। এসব দেখে যুবকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হলো; ভাবতে লাগল, যাঁর চিন্তামাত্রে বাহ্যজগতের জ্ঞানশূন্য হয়ে ইনি সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন, না জানি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কত মহান! শিষ্য যেখানে এত বড়, তাঁর গুরু না জানি কত বড় হবেন!

শেষের দিকে স্বামী সারদানন্দ বাহ্য কর্ম থেকে বিরত হয়ে প্রয়োজন মতো নির্দেশ দিতেন শুধু। আর দীর্ঘকাল ধরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া সত্ত্বেও একদিনও এই জপ-ধ্যানে বিরত হননি। এ সময় আসনের উপর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় স্থাণুর মতো নিশ্চল হয়ে কিভাবে তিনি বসে থাকতেন, তা দেখার জিনিস। বদনমণ্ডল প্রশান্ত, চারিদিকে শান্তি ও আনন্দ বিকীর্ণ হচ্ছে। গীতোক্ত 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র সব লক্ষণ যে তাঁর মধ্যে ছিল, তা

নিঃসন্দেহ; জীবনের শেষের দিকে পরিপূর্ণভাবে তা প্রকাশ পেত—পরব্রহ্মের সঙ্গে সদাসংযুক্ত, অন্তর্মুখী শান্ত ভাব এবং 'আত্মরতিঃ', 'আত্মতৃপ্তঃ', 'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ' হয়ে থাকতেন তিনি।

স্বামী সারদানন্দের জীবন ছিল আদর্শ জীবন—নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার নিখুঁত আদর্শ ছিলেন তিনি। তাঁর দৈনন্দিন জীবন চলত ঘড়ির কাঁটার মতো। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সকালে একটানা তিন ঘণ্টাকাল তিনি ধ্যান করতেন। জনৈক সেবক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনার মতো লোকের এতক্ষণ ধরে ধ্যান করার প্রয়োজন কি? এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে যে!" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ডাক এসেছে। মহাযাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছি। এখন ধ্যানই আমার জীবনের খাদ্য, তাঁর নামকীর্তন আমার আনন্দের উৎস।"

আমাদের জীবনের যা উদ্দেশ্য, যে ব্রত আমরা গ্রহণ করেছি, এইকালে সর্বদা তিনি আমাদের তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় গভীরভাবে ডুবে যাওয়া এবং ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার আগে তৃপ্ত না হওয়া—এই একটি দিকেই তিনি সর্বদা জোর দিতেন। কথা আছে, পবিত্রতা সংক্রামক। আগুনের কাছে গেলে তার তাপ লাগবেই। এ কথার সত্যতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে যখনই ধ্যান করতে বসতাম, সময় যেন কোথা দিয়ে চলে যেতো, সংশয় ও নৈরাশ্যের অতীত শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে মন চলে যেতো। যথার্থ পবিত্রতার বিকাশ যাঁদের মধ্যে ঘটে, তাঁরা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস এনে দিতে পারেন, আধ্যাত্মিক পথে তার গতি দ্রুততর করে দিতে পারেন। এইটাই তাঁদের কাজ। স্বামী সারদানন্দ তাই-ই করতেন।

মায়ের স্মৃতিমন্দির এবং স্বামী সারদানন্দের আবাসস্থল উদ্বোধনের বাড়িটি সত্যিই শান্তির স্বর্গরাজ্য ছিল। মনের সংশয় নিরসনের এবং স্বামী সারদানন্দের মুখে আশা ও উৎসাহের বাণী শোনবার জন্য প্রতিদিনই কত ভক্ত আসতেন সেখানে। কোন কোন দিন স্বামী সারদানন্দ কোন কথাই বলতেন না, সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতেই কাজ হতো, প্রশান্তি

বিকীর্ণ হয়ে একটি অনবদ্য পরিবেশ সৃষ্টি করত, ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করত সকলেই। অন্যান্য দিন তিনি প্রশ্নের উত্তর ও উপদেশ দিতেন।

জীবনের শেষের দিকে স্বামী সারদানন্দ শতাধিক আগ্রহশীল ভক্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে অধ্যাত্ম জীবনপথে তাদের উন্নীত করেছিলেন, তাদের সব ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাদের তিনি বলতেন, "গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হয় না। এ সম্পর্ক চিরদিনের। কিন্তু শিষ্যকে অবশ্যই গুরুর কথা শুনতে হবে, তাঁর কথামত চলতে হবে। যদি কোন বাধা আসে, গুরু তা সরিয়ে দেন। শিষ্যের আন্তরিকতা ও চেষ্টার উপরই সিদ্ধি নির্ভর করছে। পরীক্ষায় পাস করার জন্য ছেলেরা কত পরিশ্রম করে; ঠিক সেই রকম আর কি। আন্তরিকতা থাকলে ভগবান লাভের জন্য ততখানি পরিশ্রমও করতে হয় না। দুঃখের বিষয়, মানুষ অন্তর দিয়ে ভগবানকে চায় না। আন্তরিক হয়ে চাইলে তাঁর দেখা পাবেই। খুব খাটো। অচলা ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম জপ করবে। বীজ বপন করা হয়েছে। তোমাকে এখন স্থির বিশ্বাস নিয়ে জলসেচন করতে হবে। একাগ্রতার সহায়তার জন্য মালা ব্যবহার করতে পার। 'মালা উপোসী রাখতে নেই'—এ কথার উদ্দেশ্য হলো জপে অভ্যস্ত করা এবং জপের সময় মনকে বিক্ষিপ্ত হতে না দেওয়া। ঈশ্বর লাভার্থে ব্যাকুলতা আনার জন্যই এসবের প্রয়োজন। ব্যাকুলতা এলে ভগবান লাভে আর বিলম্ব নাই। তিনি দেখা দেবেন, তোমার অন্তর অসীম আনন্দ ও শান্তিতে ভরিয়ে দেবেন।"*

(উদ্বোধন ঃ ৬৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা)

* ইংরেজি হইতে অনূদিত।

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী অশেষানন্দ

কবি গাহিয়াছেন—"একে একে নিবিছে দেউটি।" প্রদীপমালার পর পর নির্বাণের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচরগণও একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন। উজ্জ্বল আভায় দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া তারাগণ জ্বলিতেছিল। ক্রমে তাহারা ধরণীর বক্ষে খসিয়া পড়িল। কাল বলবান। পার্থিব জগতের যাহা কিছু সকলই কালের নিকট পরাজিত। ক্ষণভঙ্গুর দেহকে সর্বস্ব মনে করিয়া মানুষ বজ্রমুষ্টিতে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রিয়জন-বিরহে অভিভূত হইয়া তখন সে দিশেহারা ও শোকে মুহ্যমান হইয়া কাঁদিতে থাকে। মহামায়া দেখিয়া হাসেন। অবোধ শিশুর খেলার ঘর ভাঙিয়া গেলে যেমন দুঃখ হয়, আমাদেরও তেমনি পরিজনগণের বিচ্ছেদে অপরিসীম যন্ত্রণা হয়। প্রাণে সর্বদা হাহাকার ধ্বনি উঠিতে থাকে। কিন্তু মায়ের প্রকৃত সন্তান হাসি-কান্না মিলন-বিরহ সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে কিছুতেই অবসন্ন হন না। শক্তি উপাসক জন্ম-মৃত্যু উভয়ই করুণার দান মনে করিয়া অবিচলিত রহেন। জগন্মাতা তাঁহাদের কর্ণে অভয়বাণী শুনাইয়া বলেন—"মা থাকিতে সন্তানের ভয় কি? সকলে ছাড়িলেও আমি কখনও ছাড়িব না। যাহার আনন্দময়ী মা রহিয়াছেন তাহার আর ভাবনা কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ সকল মহাপুরুষদিগের পূতসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন এমন দেবদুর্লভ বস্তু সংসারে পাওয়া দুর্ঘট। উঁহাদের তুলনা নাই। দেখা গিয়াছে কত শোকাতুরা জননী ইঁহাদের প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা পাইয়া পুত্রশোক একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। কত পথহারা পথিক পথের সন্ধান পাইয়া নূতন উৎসাহে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর

হইয়াছেন। সাধক তাঁহাদের অগ্নিময়ী বাণীর প্রবলচ্ছটায় এবং উজ্জ্বল ভাস্বর জীবনের জ্বলন্ত তেজে উদ্দীপিত হইয়া উৎসাহ আনন্দে সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কালের করাল স্পর্শে সকলকেই একদিন এই রঙ্গভূমির নাট্যলীলা শেষ করিয়া বিদায়ের সঙ্গীত গাহিতে হইবে। জীবন তাঁহাদেরই ধন্য যাঁহারা কোনও ভগবদ্দর্শী মহাত্মার কৃপালাভ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিবার এবং তাঁহার অপূর্ব ছাঁচে জীবন গড়িবার প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিবার নহে। লাখ টাকার বিনিময়েও 'তেমন মনের মানুষ মেলা ভার।' শরীরের সঙ্গে সঙ্গে যদি সকলই ধ্বংস হইত তবে মানবের আপনার বলিবার আর কি থাকিত? দেহ গেলেও স্মৃতি যায় না। পথিক চলিয়া গেলেও তাহার পদচিহ্ন রহিয়া যায়। অপর পথিক তাহাই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয় এবং গন্তব্য ধামের সন্ধান করিয়া লয়। কথায় বলে 'কীর্তির্যস্য স জীবতি'। যশস্বী মানব মরিয়াও অমর। পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি চিরস্মরণীয়। তেমন একজন কীর্তিমান, পরদুঃখে কাতর, বিগলিত হৃদয়, অহেতুকী ভালবাসার চলন্ত মূর্তি, করুণার জীবন্ত বিগ্রহ মহাপ্রাণ অসাধারণ মানুষ ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। কথা প্রসঙ্গে একদিন জনৈক আশ্রিত যুবক বলিতেছিল—"এমন করিয়া আমাদের কেহই তো আর ভালবাসে নাই। জানি না দুই দিন না মিশিতেই কেন যে তাঁহার কেনা গোলাম হইয়া গেলাম। বাপ-মার ভালবাসা এঁর কাছে কত তুচ্ছ মনে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কাছে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। ছেড়ে যেতে মন এতটুকু চায় না। এমনি বাঁধনে বেঁধে ফেলেছেন যে, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, সব একেবারে ভুল হয়ে গেল। এমন স্নেহ জগতে আর কারু কাছে পাইনি" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের বিশেষত্ব এই যে, বক্তৃতা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা নহে শুধু কোমল হৃদয়ের স্নেহের দ্বারাই তাঁহারা ধনী-নির্ধন, অন্ধ-আতুর, বিদ্বান-মূর্খ, সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিয়া আপনার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের দেহরক্ষার পর অন্য আর একজন গৃহী ভক্ত অনুশোচনা করিতেছিলেন—"কাণ্ডারি হারা হয়ে আমরা অকূল পাথারে ভাসছি। পারের কোনও সাড়া সন্ধান পাচ্ছি না। মাতৃহারা বালকের ন্যায় পথে পথে ঘুরছি। কেবল কান্নাই সার হচ্ছে। খেই হারা হয়ে চারদিক অন্ধকার দেখছি! কোথায়

ছিলুম আর কেমন করে ঠাকুরের সংসারে এসে পড়লুম। আমাদের সাধ্য কি যে মহামায়ার শক্ত বাঁধন কেটে বের হই। শরৎ মহারাজের ভালবাসায় পড়ে ঠাকুরের পদে মাথা বিকিয়েছি। সংসারের শত প্রলোভনও কিছু করতে পারেনি। তাঁর নামে শান্তি পেয়েছি। তিনি যে আমাদের হাত ধরে সকল বাধাবিঘ্নের ভেতরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজ তিনি কোথায়?" প্রাপ্তবয়স্ক প্রৌঢ়ের বেদনার বাণী সত্যই বড় মর্মান্তিক! এইরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস হতশ্বাস শোকের অশ্রুবারি কতই না সংসার দাবদগ্ধ, চিন্তাতাপক্লিষ্ট জীর্ণদেহ সংসারী ভক্তগণের নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে! শুধু স্বামী সারদানন্দের নহে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহারাজগণের অনুরাগী ও আশ্রিতগণের মুখ হইতেও এই প্রকার বিষাদের আর্তনাদধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িবে সেই কয়েকটা দিন যাহা হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া একসময় তাহাদের জীবন একান্ত মধুময় করিয়া ফেলিয়াছিল। এই বরণীয় মহানুভবগণ ছিলেন তাহাদের সংসার সমুদ্রের কর্ণধার ও জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যেক সন্তানের ভিতরই একটা না একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"আমার পাঁচ ফুলের সাজি।" স্বামী সারদানন্দের জীবনে অদ্ভুতভাবে প্রকটিত হইয়াছিল তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য ও হিমালয় সদৃশ গাম্ভীর্য। বাহির হইতে তাহাকে চেনা বড়ই শক্ত। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে তিনি একজন সুবিশাল দেহ, গজানন সদৃশ লম্বোদর বপু, গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় ভিতরে ছিল এমন একটি সরস, প্রেমমাখা, সহানুভূতিপূর্ণ কোমল প্রাণ, যাহা মৃদুমন্দভাবে নিঃশব্দে সদাই বহিয়া যাইত। যাহারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ না পাইয়াছে, তাহারা কখনই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। তাঁহার স্বভাব ছিল এতই চাপা যে গভীর জলের মাছের মতো তাহা বাহিরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইত না। অন্তর্হৃদয়ের গুপ্ত কথা শুনিবার সৌভাগ্য কৌতূহলাক্রান্ত মানবের ঘটিয়া উঠিত না। দুর্ভেদ্য দুর্গ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশের সাহসও তাহাদের সাধারণত হইত না। কিছুদিন তাঁহার সঙ্গ কর। আইস যাও। শুষ্ককণ্ঠ পিপাসিত জনের ব্যাকুল তৃষ্ণা

মিটাইবার ন্যায় আন্তরিকভাবে মিশিবার ইচ্ছা প্রাণে প্রাণে পোষণ কর। দেখিবে তিনি কি মধুর, কত আপনার—অসামান্য প্রেমিক হৃদয়, যেন ভালবাসার জীবন্ত মূর্তি। আর সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই। মনে হইবে 'যেন নিজের ঘরের আপন মানুষ'—তোমার যুগ-যুগান্তের সাথি, হৃদয়ের দেবতা, আপনার হইতেও অতি আপনার!

"হেসে দুটো কথা কইলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, গায়ে হাত দিয়ে বললেন আবার এসো"—সংশয় ছিন্ন হইল, অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিল, পথের সকল বাধা দূরে অপসারিত হইল। উৎফুল্ল প্রাণ সহসা নাচিয়া উঠিল। সংসারের সকল জ্বালা, সকল ব্যথা কোথায় অন্তর্হিত হইল। শ্রীভগবানের দুয়ারে মন একমাত্র কামনা জানাইল—"জীবনে মরণে যেন না ভুলি তোমায়, ওহে প্রিয়তম মোর।"

কেবল ভক্ত শিষ্যদের প্রতি স্নেহে নহে গুরুভাইদের প্রতিও স্বামী সারদানন্দের অসামান্য প্রণয় ও গভীর অনুরাগ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপর তাঁহার কি অদ্ভুত টান ও শ্রদ্ধাই না দেখা যাইত। তাঁহার প্রতি কথাটি বেদবাক্যের ন্যায় অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে যত্নপর হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার মানসপুত্রে কিছুমাত্র পার্থক্য বোধ ছিল না। যেন স্বয়ং গুরুদেব অন্য মূর্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। একদিন বলরাম মন্দির হইতে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণামপূর্বক ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেখলুম, যেন ঠাকুরই বসে রয়েছেন। ঠিক তাঁরই মতো মধুর হাসি, রঙ-বেরঙের ফষ্টিনষ্টি, আরও কত কি।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দেহরক্ষার পর ব্যথিত হৃদয়ে একসময়ে বলিয়াছিলেন—"এক অঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে। কুটো গাছটি নাড়াবার শক্তি নেই। এখন কাজকর্ম তোমরা সব বুঝে পড়ে নাও।"

শরৎ মহারাজের হৃদয় যে কত উচ্চ ও মহান তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব কেমন করিয়া ধারণা করিবে? এখনও অনেকে বর্তমান আছেন, যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানেন যে তাঁহার ন্যায় 'হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক' মাতৃগতপ্রাণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিরানুগত সেবক সংসারে বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয়

না। অনুরাগী ভক্তগণ বলিবেন—"তাঁহার চরণছায়ায় বসিতে পারিলে আমাদের মনে হইত যেন দিব্যসঙ্গে অজানা দেশের কোন এক আনন্দের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছি। সেখানে ক্ষুদ্র সংসারের পঙ্কিলতা নাই, আবিলতা নাই, আছে কেবল শান্তি, ভালবাসা ও প্রেম। তথায় দুঃখদৈন্যের ক্রন্দন নাই, ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, আছে শুধু একটানা ভাব—মন্দাকিনীর সুমধুর কলকল ধ্বনি ও জগৎভোলা আনন্দের সুবিমল হাসি।" স্থূল শরীর ধারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ আমাদিগকে সুখের সাগরে ভাসাইয়াছিলেন, প্রাণে উৎসাহ ও ভরসার সঞ্চার করিয়া কর্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাই গললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা করিতেছি—"হে পথপ্রদর্শকগণ, যদিও তোমরা বাহ্যদৃষ্টির অগোচর তথাপি একেবারে অন্তর্হিত হও নাই। চক্ষুর আড়ালে থাকিলেও মনের অন্তরালে নহ। আমাদিগকে আশীর্বাদ কর, যেন তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে পারি। আমাদের উৎসর্গীকৃত প্রাণ যেন তোমাদের পূজার অর্ঘ্যরূপে নিয়োজিত হয়। আমরা ভুলিলেও তোমরা কিন্তু ভুলিও না। দেহ মন যেন তোমাদের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম হয়।" পরিশেষে নরনারায়ণের চরণসরোজে আমাদের এই ব্যাকুল মিনতি—

"তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।
দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি ॥"

(উদ্বোধন ঃ ৩৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা)

স্বামী সারদানন্দের আলাপন

স্বামী নির্লেপানন্দ

এবারের (১৩৪৮-সাল) শারদীয়া সংখ্যা উদ্বোধনে শ্রদ্ধেয় শরৎ মহারাজের কথা কিঞ্চিৎ উপহার দিব। উদ্বোধনের সহিত এই শ্রেষ্ঠ সাধু-পুরুষের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেবী শ্রীশ্রীসারদামণির কলকাতা বাগবাজার গঙ্গাকূলবর্তী নিজস্ব এই যে ক্ষুদ্র বাটি—শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ যাহাকে শ্রীশ্রীমার বাড়ি আখ্যা দেন—ইহার নিম্নতলে দেবীর জীবদ্দশায় এবং অবস্থিতি সময়ে উদ্বোধন কার্যালয়ের গ্রন্থাবলী ও সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সর্বকার্য সম্পন্ন হইত। মাথার উপরে মা থাকিতেন। মার প্রসাদে শরৎ মহারাজ উদ্যোগী হইয়া দায়িত্বভার লইয়া এই আশ্রম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। পরম সুখের বিষয়, যে গলির উপর ইহা অবস্থিত, তাহা অধুনা উদ্বোধন লেন নাম পাইয়া সার্থক হইল।

শ্রীশ্রীমার প্রায় বিশ বৎসরের একনিষ্ঠ অনন্য-সাধারণ আদর্শ সেবক শরৎ মহারাজ—এই রূপটি সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয়। দুই জনেরই দেহত্যাগ পাশাপাশি দুই ঘরে—উদ্বোধন মঠে। আবার উদ্বোধন পত্রের বহু বর্ষের সম্পাদকও শরৎ মহারাজ। এখান হইতে স্বামীজীর যাবৎ গ্রন্থাবলীও তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় মুদ্রিত। তদ্‌ভিন্ন তাঁহার নিজের রচনাও সর্বজনবিশ্রুত।

বর্তমান টুকরা টুকরা কথাগুলি ১৯২১ হইতে ১৯২৭—বিভিন্ন সময়ে উদ্বোধনে ঢুকিতে বাম দিকের ছোট বৈঠকখানায় সাধু-ভক্তের মজলিশে আচার্য শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন। অধুনা লোকান্তরিত স্বামী পূর্ণানন্দের রোজনামচা হইতে বাছিয়া যৎসামান্য এবারের দেবীপূজার অর্চনা-স্বরূপ অর্পণ করিলাম। এই কথাগুলির পিছনে সাধু বক্তার খাঁটি ভাগবত জীবনের উপলব্ধি রহিয়াছে। প্রথম—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থাকিতে থাকিতে ও বিশেষ ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর স্বামী সারদানন্দের কঠোর তপ। স্বামীজীর আহ্বানে পাশ্চাত্যে গমন। আবার নেতা নরেন্দ্রনাথের আদেশে ভারতে

পুনরাগমন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্ম-তরণীর ত্রিশ বৎসর আজীবন সম্পাদকরূপে হালধারণ। দীর্ঘকাল একটানা নিষ্কাম কর্মোপাসনা। সেবাদর্শ সফলীকরণ। পুনর্বার সকল কিছুর স্বর্ণশৃঙ্খল ছেদন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসাগরে নিমজ্জন। অতি সংক্ষেপে এখানে তাঁহার চরিত্রের এই মূল রেখাগুলির উল্লেখ প্রয়োজন।

—বিধি-বিধানের সাফল্য ও নৈষ্ফল্য—মানুষের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য দেখে ঠিক করতে হয়। কার নিয়ম পালন করা দরকার? —যার শরীর ভাল করে বিষয় ভোগ করতে চায়। মানসিক ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে মূলাপ্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক টানে ভোগাসক্ত—বহির্মুখী। তাদের পক্ষেই কড়া শাসন দরকার। যদি মন অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়েই থাকে, তবে অতো খুঁটিনাটি নিষ্ঠা, আঁটসাঁট কি দরকার?

বহুকালের পরাধীনতায় প্রকৃতি এত মৃদু, নিস্তেজ, কোমল হয়েছে—যেন জড়ভাবাপন্ন হতেই থাকে। প্রাচ্য সভ্যতার প্রধান লক্ষণই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে—অধীনতা। বাল্যে পিতামাতা, কৈশোরে শিক্ষকের, প্রৌঢ়ে গুরুর—ইত্যাদি। অসহায় অসভ্য, অশিক্ষিত থাকলে কাহারও না কাহারও অভিভাবকতায় থাকতে হয়। বেশি দিনে—এই বশ্যতা প্রায়শ দাসত্বে পরিণত হয়। সব উন্নতির পথ বন্ধ। ভারতে, ইজিপ্টে—পুরোহিত প্রভুত্বের ফলে—জাতি নিস্তেজ। জাতীয় সভ্যতার প্রসার নাই, উন্নতি নাই। কিছু দূর উঠেই থমকে দাঁড়ায়। ব্যাপক শিক্ষা নাই বলে অধীনস্থ লোকদের দাবিয়ে রাখায় সমাজের এই হীন দশা—ক্ষমতাহীনতা, অপটুতা হবেই। আবার স্বাধীনতা স্ফূর্তি পেলে প্রকৃতি সবল পরিপুষ্ট হবেই। স্বাধীনতার সঙ্গে বিদ্যাপ্রচলনের এই ফল। অগ্রে জ্ঞান—পরে কার্য। দরিদ্রে ঘৃণা জাতীয় পতনের প্রধান কারণ। ধনী দেখলেই আদর, গরিবকে ঘৃণা আরম্ভ হলেই পতনও আরম্ভ। সন্ন্যাস মানে হীনতা নয়। সন্ন্যাসের মূল কথা সংযম। ঐশ্বর্যে সন্ন্যাসীর কুণ্ঠা প্রকাশ কেন? ভোগে মানুষের অন্তর শিথিল করে।

আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রিয়তাবশত কেহই নিজের দোষ দেখতে চায় না। প্রদীপ সর্বস্থানের অন্ধকার দূর করে বটে কিন্তু আপনার নিম্নে যে অন্ধকার

থাকে তাহা নষ্ট করতে পারে না। সর্বস্তিমিরং নশ্যতি দীপঃ। নাত্মমূলং তিমিরং বিনশ্যতি ॥

লোকে কেবল মনের বেগ অনুভব করে মাত্র। অথচ মনের কথা আপনি বুঝতে পারে না। যাঁরা অন্তরের কথা জানেন না—অনধিকারীরাই এক্ষণে দেশের শিক্ষক। আধুনিক যাত্রার দোষে (কবিদের মূর্খতার পাপে—presentation উপস্থাপিত বা পরিবেশন করার ভঙ্গির জন্য) রাধাকৃষ্ণকে গোয়ালা বলে বোধ হয়। পূর্বে তাঁহাদিগকে দেবতা বোধ হইত।

ঐক্যমত না হওয়াও অনেক সময়ে প্রার্থনীয়, ভাল ও দরকারি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই জন্য ইচ্ছা করিয়া অনৈক্য আনা অনুচিত। সকলের সহিত সহৃদয়তা—বিদ্যা ও গাম্ভীর্য থাকা দরকার। এসব গুণ সকলের নিকট আশা করা যায় না। অনেকে সাধু মহন্ত হওয়া খুব সহজ কাজ ভেবে—সকল কাজে অকর্মণ্য হয়েও গেরুয়া পরে। কতকগুলো ভণ্ডামি বেশি দিন স্থায়ী হয় না সত্য কিন্তু অল্প দিনেই সমাজের খুব ক্ষতি করে।

ব্যবস্থা-শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত কার্যকরী প্রণালী—স্কুলে বা শিক্ষালয়ে, পাঠাগারে হয় না। যোগ্যতা, বিচক্ষণতা—অধ্যবসায় সাপেক্ষ। আলস্যে, লোভে ও অবস্থার পীড়নে তাহা ভুললে চলবে কেন? সদ্‌গুরুর প্রভাব বা শিক্ষা সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হলেও, শিষ্যের মনের শক্তির তারতম্যানুসারে সে শক্তির কার্য ফলপ্রদ হয়, ফলে বহু ভেদ হয়। সেই অবস্থাই সমাজের শ্রেষ্ঠ অবস্থা যেখানে সকল লোকের স্বাধীন শক্তি ইচ্ছামত নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পায়। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব শক্তির বিশেষত্ব আছে, চক্ষের দর্শন শক্তি, মস্তিষ্কের চিন্তা ইত্যাদি। এই জন্যই সকলকে স্বাধীন হতে দেওয়া দরকার। যাহা ভারতের তাহা যেন মিথ্যা, কুসংস্কার জড়িত, যাহা পাশ্চাত্যের তাহাই মঙ্গলপ্রদ, সুফলদায়ক, সর্বাঙ্গসুন্দর; অতএব অনুকরণীয়—অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছে।

উপস্থিতকে অগ্রাহ্য করে শুভ সুযোগ আসবে, এই আশায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা দুরাশা। কিছু না কিছু গোলযোগ, অসুবিধা, অবস্থার হেরফের লেগে

থাকবেই। এই রকম ভাব প্রথম থেকে ধরে নিতেই হবে। সুতরাং ঐ ভাল-মন্দ, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়েই যা করবার তা করে যেতেই হবে। মনে মনে স্থির জেনে রাখতে হবে যে, শক্তির ব্যবহারেই শক্তির বৃদ্ধি। চলতে যখন আরম্ভ করা গিয়েছে তখন মাঝখানে কি স্থির হয়ে বসে থাকা যায়? শিক্ষার মধ্য দিয়েই মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঝড় আসতে পারে। ও পারের কিনারার রেখা পর্যন্ত দেখা না যেতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করে, অকূলে কূল পাব, এই দৃঢ় ধারণায় ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। চুপচাপ করে স্থির ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে বিশ্বাস জিনিসটা আসবে কি? পরাজয়, বিফলতার মধ্যেই দৃঢ় বিশ্বাস হয়। সংসারের দিকে যখন কিছু নাই-ই তখন দিক নির্ণয়ের ভয় কি? সুতরাং যা পারি, যতটা সাধন করতে পারি তা করে যাবই। ফলাফলের ভার আমার উপর নয়।

জীবনটা শুধু মিলন, মাধুরী, সৌন্দর্য, আনন্দ, হাসির হিল্লোল নয়। প্রকৃতির অপর একটা করাল ভয়াল মূর্তি—আধিব্যাধি, ধ্বংস, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি কঠোর সত্য-রূপ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে জীবনটা বেশ কিছুদিন শান্তিতে নিরীহভাবে কাটে বটে—মঙ্গলময়ের কেবল শিব মূর্তিরই পূজা কোরে। কদমতলা, বাতাবি ফুল, মুরলীবাদন, সখীর নৃত্য, যমুনার উজান, চাঁদের জ্যোৎস্না, প্রেমহাস্য—ইত্যাদি কেবল ভেবে ভেবে মন দুর্বল, জড় হয়ে পড়ে। ভয়ে ভয়ে—কঠোর মহাকালের রূপ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে সাহস কমে যায়। অথচ ভগবানের রুদ্রমূর্তির পূজা করলে হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়।

আমাদের সে উদারতা কই? পর-গুণের পরমাণুগুলিকে পর্বতপ্রমাণ করে তোলা তো বহু দূরের কথা—ভিন্ন জাতির, ভিন্ন বর্ণের লোকদিগের বিশেষ বিশেষ সদ্‌গুণগুলিকেও কল্পিত মিথ্যার দ্বারা ঢেকে তীব্র শ্লেষ নিন্দা করে। গুণী গুণের আদর করতে পারে। সদ্‌গুণ আয়ত্ত করবার মতন উন্নত মন কি সবার হয়?

প্রত্যেক কাজই বেশি দিন ধরে করলেই সেই কাজের জন্য একটা নেশার মতো মাদকতা, ঝোঁক এনে দেয়। সেবককে সেই দিকে চুম্বকের মতন মোহাচ্ছন্ন

করে টেনে নিয়ে যায়। কুফল অন্তরে অন্তরে বুঝলে কি হবে? অভ্যাসের জন্য পুরাতন কার্য অল্প আয়াসে করতে পারা যায়। অভ্যস্ত কাজে সহজে একটা দক্ষতা আসে, ঝোঁক হয়। কিন্তু তাহা অতীত বা পুরাতন ছাড়া—বড় একটা নূতন হয় না। প্রতিভা—সেই সবই শিক্ষা করিয়া আরও একটা নূতন সৃষ্টি করে—কেবল অভ্যাস তাহা করতে পারে না। যে টেলিস্কোপ-গড়া মিস্ত্রী সে সহজে হয়ত টেলিস্কোপ করে ফেলবে, কিন্তু গ্যালিলিও হতে পারে কি? পারদর্শী দক্ষ লোক পুরাতন তত্ত্বগুলি বেশ কাজে দেখাতে পারে—প্রতিভাশালীর বিশেষ গুণ—সৃষ্টি করা—নূতন কিছু আবিষ্কার। স্মৃতি, মনোযোগ, অভ্যাস—প্রয়োজনীয় সহকারীর মতো। শিক্ষার দ্বারা তাহা আরও উজ্জ্বল হয়। প্রতিভার বিকাশের জন্য অনুকূল শিক্ষার প্রয়োজন। অমুক পালনী শক্তি পেয়েছেন কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি শক্তিতে তিনি বঞ্চিত। আদ্যন্ত রামায়ণ হয়ত পণ্ডিতের কণ্ঠস্থ কিন্তু আবৃত্তিকারী তো কবি বাল্মীকি নহেন। আবার এও ঠিক—বিনা শিক্ষায় বড় একটা প্রকাশ হয় না।

দৈব অর্থে এমন কতকগুলি প্রকৃতির অবস্থা যাহার উপর আমাদের কোনও হাত নাই। যেমন অনাবৃষ্টি হলে শস্যহানি হয়। অন্নাভাবে হাহাকার করবে, তখন মনস্থির করে ঈশ্বর-চিন্তা হয় কি? হয়ত কুপিত বায়ুতে এমন অস্বস্তি আনলে যে কোন প্রকারে নিঃশ্বাস লওয়া যায় না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। কার্যহানি হলো।

শরীর, বাক্য, মন দ্বারা যে কোনও কার্য আরম্ভ হয়েছে তার সাফল্যের জন্য এইসব চাই—অধিষ্ঠান (উপযুক্ত দেশ)—কর্তা (উৎসাহী লোক, অহঙ্কার)—করণঞ্চ পৃথক্‌বিধম্‌, নানাপ্রকারং করণম্‌ চক্ষুরাদি। বিবিধাঃ চ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারম্‌। পঞ্চমম্‌ দৈবমেব চ।

ন্যায্যং ধর্মং। অধর্মং বিপরীতং। মানুষ কায়মনোবাক্য দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কার্য আরম্ভ করে—এই পাঁচটাই তাহার কারণ।

যখন দৈব প্রতিকূল—তখন তামসিক কার্যে আসক্তি। চঞ্চল মনে অন্যায় বা বিপরীত অনিষ্ট কর্মেরই যোগাযোগ সঙ্ঘটন হয়। এমন সব ঘটনার একত্র

সমবায় হয়ে পড়ে যে লোকটি যেন মন্দ কর্ম করতেই উৎসাহ পায়। কে যেন ঠেলে ঐ রকম করায়—প্রবল তৃষ্ণা—কাম।

কৃতকার্যতায় অনেকের এত দাম্ভিকতা আনে, সকলকে ব্যঙ্গ করাই যেন আনন্দ। কেহ আবার কোনও বলবান শত্রুর শক্তিতে আচ্ছন্ন। সে শক্তি ভেদ করবার ক্ষমতা নাই, সামর্থ্য এত অল্প যে তাঁর চিন্তামাত্রই হীনপ্রভ, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সে শত্রু—অন্তরের ইচ্ছারই আকারমাত্র। ইচ্ছাই নিরাকার হতে পারে।

অবিদ্যাপুত্র 'মার' বা শয়তান প্রকৃত ক্ষমতাশালী না হলেও তার স্বভাবই জীবের অমঙ্গল সাধন। কিন্তু প্রেম—অমঙ্গল হতে শতগুণে বলশালী। মহা দৈব দুর্যোগান্তে বাহ্যপ্রকৃতি সুন্দর, নির্মল হয়। সেইরূপ ঘোরতর মানসিক অশান্তির পর, আন্তব বিপ্লব-অন্তে মন শান্ত নির্মল ভাব ধরে।

অবিদ্যার, প্রলোভনের অস্ত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ইত্যাদি। মানবদেহ ঐ সকল স্থূল উপাদানে গঠিত। বাসনা—এইসব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় নিয়েই প্রতারণা আনে। প্রতারণাজনিত ঘোর অন্তর্দাহ থেকে যাতনা বোধ। এই কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টায় সাধনার আবশ্যক। মনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও জিদ করে সাধন করবেই। আত্মরক্ষার সহজ উপায়—বদ সংসর্গ ত্যাগ।

জড়ত্ব প্রাপ্তিই মানুষের সব চেয়ে বড় অমঙ্গল—সব চেয়ে বড় বিপদ। আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যবহারেই মানুষ ক্রমশ উচ্চপদবী থেকে নেমে অধোগতি পায়, জীবত্বে, জড়ত্বে পরিণত হয়। জড়ত্বপ্রাপ্তিই যথার্থ মৃত্যু—পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কাজেই যে শিশু হাঁটতে শিখেছে সে যাতে অভ্যাসের জড়ত্ববশত, কষ্ট হয় বলে মাটিতে হামাগুড়ি না টানে, সেই ব্যবস্থাই করা বড় দরকার।

ভগবান কপাল-মোচক, ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান। তিনি মনে করলেই জীবের প্রারব্ধ কর্মভোগ ক্ষয় করে দিতে পারেন। অথচ করেন না কেন? এর উত্তর কে দেবে? কর্মবাসনা গুরু নিবারণ করে দিলে শিষ্য হয়ত সংসারের ইচ্ছা, কামনার চিন্তা, পাপ চিন্তা গুরুর কথায় সাময়িক পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু চিরদিনের

জন্য তার অন্তরের অন্তস্তলে একটা পাপ ছবি, ভোগের প্রতি টান, মনে মনে গূঢ় ইচ্ছা অঙ্কিত থাকবে। রূপমোহ, ভোগাসক্তি—অতীব বলবান। এই সবে দোষ-দর্শন ভিন্ন গতি নাই। (তাই কি শঙ্কর বলেছেন—অনাত্মশ্রী—বিগর্হণং?) ইন্দ্রিয়গ্রাম অতি দুর্দান্ত। সামান্য মাত্র প্রশ্রয় দিলেই দানবের ন্যায় বলবান। হৃদয় ইন্দ্রিয়াসক্ত হলে এত কঠিন হয় যে ঈশ্বর-বাক্যেও সংশয় হয়।

সংসারে ধৈর্য অবলম্বনই একমাত্র উপায়। অন্যথা শান্তি হয় না। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাময় কণ্টকশয্যা—সংসার। যদি তা না হতো তবে কে নির্বাণ কামনা করত? ঈশ্বরকৃপা না হলে বিষবৎ সংসার—ত্যাগ-ইচ্ছা হয় না। খারাপ জিনিসের প্রতি চক্ষুলজ্জা ভাল। একমাত্র পাষাণেরই চক্ষুলজ্জা হয় না।

আমার সর্বনাশ কি হবে—কিছুই ছিল না। দ্বিধাভাব থেকে বড় প্যাচে পড়বে। চণ্ডীতে আছে যে সুরথ রাজা ও সমাধিকে আত্মীয়গণ নিরাকৃত করলেও তাদের মন তথাপি মমতাক্লিষ্ট ছিল। পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে মেধস-আশ্রমে গিয়ে মহামায়ার উপাখ্যান শুনত। অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কৌরবদের অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য দাঁড়িয়ে দ্বৈধভাবে ভয়ে মোহে পীড়িত হয়ে যুদ্ধ করতে নারাজ—কি করব কিছুই স্থির করতে পাচ্ছিলেন না—রাজ্যলাভ দরকার নাই, ভিক্ষা করব—ইত্যাদি মনের বিরুদ্ধভাব এসেছিল।

যে সাধক সাধনবলে ভগবৎকৃপায় আপনার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় শক্তিকে জাগিয়ে ফুটিয়ে তোলেন তিনি সদ্‌গুরু। সেই শক্তির নিকট নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে তিনিই শ্রীভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। ভাগবতী তনু লাভ করেন। তাঁহার সকল চেষ্টা, কর্ম, ভাব—ঈশ্বর প্রেরণাতে অনুষ্ঠিত হয়, স্ফুরিত হয়, নিজের বলতে কিছু থাকে না। সেই সাধকই নিজের মধ্যে শ্রীভগবানকে প্রকট করে তোলেন। তাঁর মধ্যে ভগবত্তা আরোপ করতে হয় না। প্রকাশ—প্রত্যক্ষ হয়। তিনিই সদ্‌গুরু।

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের ভাব নিয়েই বামদেব বলেছিলেন—আমি সূর্য, আমি মনু—ইত্যাদি। প্রথমে বহু কর্মের দ্বারা দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি লাভ করে ধাতু-প্রসন্নতা লাভ করতে হয়। ধাতু প্রসাদাৎ...ইত্যাদি।

আমাদের শরীরের উপাদানগুলি বা স্নায়ু যদি স্থির না হয়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য বন্ধ না হয়, চিত্ত বিষয় বাসনায় বিক্ষিপ্ত হয়, মন ছুটাছুটি করে—তাহলে ধ্যানের শক্তি হয় না। দেহশুদ্ধি হলেই ব্রহ্মানুশীলনের যোগ্যতা হয়। নির্বিকার চিত্তাবস্থার পর সর্বসংস্কার-বর্জিত শুদ্ধমনের যে প্রথম বিকার হয় তাহাই ভাব, রস। ধীর বা নির্বিকার চিত্তের লক্ষণ এই ঃ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যকর ভোগের বিষয় বিদ্যমান—অথচ ইন্দ্রিয় কিছুতেই বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হবে না। ...সেই স্থির মনে যে প্রথম চিদানন্দ তরঙ্গ বা সাত্ত্বিক বিকার হয়, তাহাই ভাব। এই বিকারের সঙ্গে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের সাদৃশ্য আছে। স্বেদ কম্প পুলকাদি প্রকাশ হয়। কিন্তু কোনরূপ রিপুর উত্তেজনা থাকে না। পিতার ইচ্ছার সঙ্গে পুত্রের ইচ্ছা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে যায়। পিতার অতিরিক্ত কোনও কামনা পুত্রের থাকে না। এইজন্য গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি করলে গভীর একাত্মতা হয়।

(উদ্বোধন ঃ ৪৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা)

স্বামী সারদানন্দ ও বালকবৃন্দ

স্বামী নির্লেপানন্দ

স্বামী সারদানন্দ স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধি-উপলব্ধিবান পুরুষপ্রবর ছিলেন। ভ্রম প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া বীরের ন্যায় এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন ও অপর হস্তে পথভ্রষ্ট পতিতের আত্মসম্বিৎ লাভ ও উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অলোকসামান্য সাধু মহাত্মার ক্ষুদ্রতম লোকব্যবহার প্রণিধানের যোগ্য। আদর্শ মানবকে কেমন হইতে হয় তিনি তাহারও দৃষ্টান্তস্থল।

স্বামী সারদানন্দকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের (মিশন উত্তরকালে রেজিস্ট্রি হয়) সেক্রেটারির পদে আচার্যপাদ বিবেকানন্দ মহারাজ বসাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ঐ কঠিন কর্তব্য 'শরীর-বিমোক্ষণ'-ক্ষণ পর্যন্ত যথাসাধ্য পালন করিয়া আজি হইতে আট বৎসর[১] হইল সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। মাথার উপর সর্বদা গুরুদায়িত্ব থাকিলেও এবং বড় বড় 'পাবলিক' (সর্বসাধারণের) কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও যেসব ছোট ছোট ছেলের ভার শ্রীভগবান তাঁহার উপর দিয়াছিলেন তাহাদের জীবন-প্রণালীর অতি ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির উপর মায়ের মতন নজর রাখিতেন। বালকদিগের খুব যত্ন লইলেও তাহাদের সহিত বহু বরষের দীর্ঘ আচরণ ব্যবহারে কোন দিন মোহভাবের ছায়ামাত্র তাঁহার ভিতর দেখা যায় নাই। বালকদের ভিতর নারায়ণকে দেখিতে পাওয়া তাঁহার ন্যায় সাধুর পক্ষে অসম্ভব নয়। সর্বদাই মুক্ত পুরুষের, ঈশ্বর-জানিত-জনের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসকল প্রকট ছিল। আরও দেখা যাইত অধিনায়ক হইয়াও তিনি আশ্রিতজনের সহিত সমান সমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন। বালকদিগের কাহাকেও বলিতেন—কিরে, অমুক জায়গায় মিশনের ব্যাঙ্কের খাতাখানি পৌঁছাইয়া দিতে, অমুকের সহিত দেখা করিতে

১ প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৩৪২ সালে।

হইবে, তোর সুবিধা হইবে কি? ইস্কুলের ফেরতা আমার এই কাজটা করতে পারবি? ইত্যাদি।

আড়ম্বরে অনেক সময় মানুষ চেনা দায়। লোক-লোচনের সম্পূর্ণভাবে অন্তরালে শ্রীসারদানন্দ চরিত্র দিনের পর দিন কি অপরূপ পরম সুন্দর আকার ধারণ করিত এবং ধীরে ধীরে তিলে তিলে সেই পূর্বতন যুগের তাঁহার শ্মশ্রুবিশিষ্ট আপাত প্রতীয়মান বাহ্যিক সর্বগাম্ভীর্যের ভিতর—পুরাতন কবি বর্ণিত মধুঋতুর মতো—স্বচ্ছন্দ গতি নিঃশব্দ ও স্বাভাবিকভাবে লোকহিত আচরণ করিত—তাহা দেখিবার ক্ষমতা থাকিলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আপাতত 'ফালতু' বোধ হইলেও বর্তমান ছোট ঘরোয়া চিঠিখানি পাঠ অন্তে পাঠক-পাঠিকা বেশ সুস্পষ্টভাবেই উক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। বিরাটকায় পাহাড়ের ভিতরে যে স্নেহের ফল্গুধারা সর্বদা প্রবাহিত ছিল তেইশ বৎসর পূর্বের পত্রে তাহা প্রকট।

তিনি ইদানীং স্থূলকায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সেই থপথপে ঝোলানো স্তন দুটি এরূপ বালকদের কাহারও কাহারও কাছে যে স্বাভাবিকভাবে মাতৃস্তনের সৌসাদৃশ্য নয়নে আনিয়া দিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বিশেষত যে বালকের কাছে নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি লেখা সেই বালকের বয়স তখন বারো। পত্রলেখক স্বামীর বয়স ছেচল্লিশ। বালক ইহার দুই বৎসর পূর্বে সাধকোক্ত সুবর্ণময়ী বারাণসীর মণিকর্ণিকার ঘাটে তাহার মাটির মাকে হারাইয়া অন্ধকার দেখিয়াছিল। হৃদিস্থ সান্ত্বনার পেটিকা লইয়া স্বামী তখন কাশীতেই বালকের অতি নিকটে।

এমনিধারা দেখা গিয়াছে ডাক্তার হারাণবাবুর ছেলে ক্ষিতীশ তখন ছোট। উদ্বোধন মঠের বাহিরে ছোট কামরাটিতে বসিয়া স্বামী কতই না শ্রদ্ধামিশ্রিত স্নেহ-ভালবাসার সহিত তাহার কথাবার্তা, তাহার অভিজ্ঞতা অতিশয় আনন্দে শুনিতেছেন। শ্রীশ্রীমার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পর বালকটি তাঁহাকে বলিয়াছিল—আমাকে শ্রীমার দর্শন পাইয়ে দিতে পারেন? তিনি তখনই উত্তর দিলেন—আমি পারি না। তুমি ডাকো। ডাকলে তাঁর দেখা পাবে। বালক আরও বলিল—আপনি তাঁকে দেখতে পান?

উত্তর—স্বরূপ মূর্তিতে কখনো কখনো দেখতে পাই। তবে পটেতে তাঁকে

রোজ দেখতে পাই। তোরা যদি এসব অবিশ্বাস করবি তো কি হবে? হাজার বছর পরে যারা আসবে এসব শুনতে শুনতেই তাদের ভেতর শ্রদ্ধার উদয় হবে এবং তারাও দেখা পাবে। তুই ছবি আঁকছিস কেমন (বালক আর্টস্কুলে পড়িত)? আমিও ঠাকুরের ছবি মনে মনে আঁকছি।

অপর একটি মনভঙ্গে ভীত বালককে বলিয়াছিলেন—বড় হতে গেলে সংসারে অনেক ঠোক্কর খেতে হয়। বিবাহ করলেই কি সব সমস্যা মিটে? সামাজিক নিন্দার হাত থেকে মানুষ বাঁচে বটে, কিন্তু মনের উন্নতি করতে গেলে সংযম একান্ত দরকার। একটা নিয়ম মাফিক চলবি। Routine করবি। খুব খানিকটা খেলুম, খুব খানিকটা বেড়ালুম—তাতে হবে না। দুর্বলতা এলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবি। খুব ভগবানকে ডাকবি। আমরা তাঁর সন্তান। আমাদের ভেতর নীচভাব আসবে কেন? তাঁর অংশ। ভগবান লাভের চেয়ে বড় জিনিস নাই। তাঁকে পাবার শক্তি তোমার ভেতরই আছে। আন্তরিক হলে তিনি শোনেন। মানুষ আমরা বড় দুর্বল। গৃহস্থই হও, সাধুই হও, সংযম চাই। আমাদের আশীর্বাদ তো আছে। তবে তোমাকেও চেষ্টা করতে হবে।

১৯২৬ গ্রীষ্মকাল, শেষবার যখন তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান তখনও শশী নিকেতনের দোতলার বড় গোল বারান্দায় মনে পড়িতেছে, একদিন সন্ধ্যায় আরও একটি অতিশয় ক্ষুদ্র সুদর্শন নিতাই নামক বালকের (ডাঃ দুর্গাবাবুর পুত্র) সহিত তাঁহার সেই সুপ্রশান্ত হাসিমুখে আলাপাদি করিতেছেন। সম্মুখে সম্প্রসারিত নিদাঘের প্রশান্ত সমুদ্র। বেষ্টনী চমৎকার। স্বামীর কাছে একটি ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান ছিল। সেদিনকার সেই ছোট্ট নিতাইটিকে তিনি বলিতেছেন—আচ্ছা, তোদের বাড়ি যদি (ব্রহ্মচারী) মহারাজ যান তুই তাঁকে কি খাওয়াবি? ডাক্তারের ছেলে। অতীব স্বাভাবিকভাবে আধ-আধ বুলিতে বলিয়া উঠিল—কেন? আমাদের বাড়িতে অনেক ও—ষু—ধ আছে। তা-ই খেতে দেবো!

স্বামী ও ব্রহ্মচারী উভয়েই এই কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইংলন্ডের প্রথিতযশা প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের এইরূপ নাতিপুতিদের সঙ্গে রঙ্গরস ও বলখেলার

কাহিনী ঠিক এমনতরই—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আজীবন 'সচিব ও বালক-সংবাদের' ন্যায় চিত্তাকর্ষক। অমুকে আবার কি জানে, তার কথা, তার পরামর্শ আবার কি লইব, অমুক তো কালকের ছেলে—এবম্প্রকার হঠকারী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইতে দীর্ঘ একুশ বৎসর দেখার ভিতর কোন দিন তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই।

শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজের নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানিতে তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নাই। ইহা শ্রীশ্রীমার কলকাতা উদ্বোধন বাটি হইতে লেখা, ১৯১২। বালকটি তখন দেওঘরে।

শ্রীমান কা—

তোমার পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম, কিন্তু পূজার ভিড়ে উত্তর দিতে পারি নাই। তুমি নাকি রোজ ৪।৫টি আতা খাও? দেখো, যেন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর না হয়। সতীশবাবুর (তাঁহার পূর্বাশ্রমীর তৃতীয় সহোদর ভ্রাতা, ডাক্তার) ঠিকানা—শ্রীযুক্ত চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটি, কাষ্টর টাউন, দেওঘর। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ম-কে চিঠি দিতে বলিবে। ভূ—কাশী গিয়াছে (ম ও ভূ—অপর দুইটি তদীয় আশ্রিত বালক)। শুনিলাম তুমি মাঝে মাঝে দুষ্টুমি কর ও দিদিদের কথা শুন না। ছিঃ ওরূপ করিতে নাই। কথা শুনিয়া চলিবে। তোমার জ্বর হইয়াছিল। এখন সারিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়। রোজ বেড়াইবে। তোমার দিদিমার (যোগীন মার) আশীর্বাদ জানিবে। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে। জ্ঞান মহারাজ (ইনি বালক ও যুবক মহলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাব প্রচার বহুকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছেন) কাশীতে দুর্গাপূজা করিয়াছেন। এখানে মণিবাবুর বাড়িতে জ্ঞান মহারাজের ছেলেরা ঠাকুর গড়িয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিল। বালক নারায়ণদের Ice cream দেওয়া হইয়াছিল। আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম।

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে এবং ম—প্রভৃতি সকলকে দিবে।

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীসারদানন্দ

পুঃ—সতীশবাবুকে যেদিন দেখিতে যাইবে সেদিন আমার আশীর্বাদ দিবে। বড়মা (যোগীনমার মা) ভাল আছেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীসারদানন্দ

এই সকল বালকদের লক্ষ্য করিয়া তিনি কাশীতে বুড়ো বাবা সচ্চিদানন্দ স্বামীকে পত্র লিখিতেন—"ছেলেরা ভাল আছে। তুমি তাহাদের প্রণাম জানিবে।" একসময়ে বলিয়াছিলেন—ঠাকুরের মানসপুত্র ছিল। আর এরাই আমাদের মানসপুত্র।

স্বামী সারদানন্দ

(যেমন দেখিয়াছি)

স্বামী ভূমানন্দ

ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে দুর্বল ব্যক্তিও মহৎ কার্য করিতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন ছোটখাট কাজগুলিতে যিনি উদারতা, সহনশীলতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, হৃদয়বত্তা ও পবিত্রতা দেখাইতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহৎ—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে স্বামী সারদানন্দ মহত্তম ছিলেন।

বিংশতি বৎসর ধরিয়া দেখিতেছিলাম, এই সবল স্থূলকায় পুরুষসিংহ কিছুমাত্র ভাবপ্রবণতা না দেখাইয়া, অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তঃপ্রেম প্রবাহে যত বড় বুকের পাটা ততোধিক হৃদয় লইয়া স্বামীজীর নির্দিষ্ট পথে ধীর গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। স্বামী সারদানন্দের দৃঢ়তার সহিত অগ্রগমন-নীতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হইত, অবনত ভারতে কর্মযোগ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর এমন একনিষ্ঠ চিরবিশ্বস্ত সহকর্মী স্বামীজীর অপর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রমুখ স্বামীজীর গুরুভ্রাতাগণ সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন—কর্মবিমুখ তমসাচ্ছন্ন ভারতে শক্তিপূজার প্রেরণা প্রদান করিতে, সেবা ও সহানুভূতি সহায়ে দরিদ্র নরনারায়ণকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিতে।

প্রকৃত কর্মীর যে সকল গুণ থাকা একান্তই প্রয়োজন সেই সকল গুণ তাঁহাতে বিশেষভাবে প্রকাশিত ছিল। এমন হৃদয়বত্তা, পবিত্রতার সহিত একাধারে এমন প্রাণভরা সহানুভূতি, কর্মে অদম্য উৎসাহ, কর্মপ্রবাহের মধ্যে অচল অটল স্বামী সারদানন্দ ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিয়াছি এমন মূর্তি—কই মনে তো পড়ে না!

সংহতি গঠন করিবার পক্ষে যে সকল গুণ অতি আবশ্যক, তাহা তাঁহার

মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ছিল। তিনি পরনিন্দা-বিমুখতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, অসীম সহনশীলতা, আশ্রিত-বাৎসল্য—এই সকল সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দের যে সকল দোষে সংহতি-বিচ্ছেদ ঘটে তাহার সামান্য মাত্রও স্বামী সারদানন্দে ছিল না। তিনি কাহারও কথা শুনিয়া অপরের প্রতি ভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেন না, 'এক তরফা' কথা শুনিয়া নিজ মত ত্যাগ করিয়া কখনো কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধ হইতেন না।

সে খুব বেশি দিনের কথা নহে, তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) কাশীধামে আছেন, কলকাতা হইতে স্বামী সারদানন্দও কাশী গিয়াছেন। উভয় গুরুভ্রাতা কথা বলিতেছেন, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি অপর একজনের নামে দোষ উদ্ঘোষণে তৎপর হইলে একজন সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ?"

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আমার কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হয়।"

যিনি 'প্রমাণ' বলিয়াছিলেন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু মুহূর্তকাল যাইতে না যাইতেই চিরমধুর স্বরে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "হরি মহারাজ, আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না।"

তখন হরি মহারাজ বলিলেন, "আমাদের কেমন স্বভাব—কারু দোষের কথা শুনলেই বিশ্বাস করে থাকি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখছি—তুমি তা কর না।"

আত্মপ্রশংসা শুনিলে স্বামী সারদানন্দ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতেন। বেগতিক দেখিয়া তিনি বলিলেন, "স্বামীজী আমাকে 'এক কানে কথা শুনবে, অপর কান দিয়ে তা বের করে দেবে'—এই আদেশ করেছিলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি।"

তখন সে প্রসঙ্গ থামিয়া অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। আত্মপ্রশংসা শুনিবার দায় হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এই সময় কাশী·শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নূতন ব্যবস্থাদি হইবার কথা চলিয়াছে। স্বামী সারদানন্দ সকলকে তাঁহার নিকট নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিবার

জন্য আহ্বান করিয়াছেন। একদিন হরি মহারাজের ঘরে চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ) তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিতেছিলেন। চারুবাবুর কথা বলিবার সময় একটি 'মুদ্রাদোষ' ছিল। তিনি কথায় কথায় 'কি বলেন মশাই' বলিতেন। কখনো কখনো 'কি বলেন দুর্লভবাবু'ও বলিয়া ফেলিতেন। স্বামী সারদানন্দ সকলের কথা চিরদিন শুনিয়া যাইতেন। সে কথার মধ্যে কোন প্রশ্ন ভিন্ন কখন 'হাঁ' 'না' বলিতেন না, যাহাতে কেহ মনে করিতে পারে তিনি commit (স্বীকার) করিতেছেন। সুতরাং যখন চারুবাবু অভ্যাসবশত 'কি বলেন মশাই' বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন স্বামী সারদানন্দ বেশ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শেষে আর 'কি বলেন মশাই' বরদাস্ত করিতে না পারিয়া, বলিয়া ফেলিলেন, ''যা বলবার তুমিই তো বলছো—মশাই আবার কি বলবেন?''

স্বামী সারদানন্দ জানিতেন না, চারুবাবুর এইরূপ মুদ্রাদোষ ছিল। কিন্তু চারুবাবুও ঐ কথা শুনিয়া কেমন nervous হইয়া পড়িলেন এবং একান্ত নিরুপায় হইয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

হরি মহারাজ বালকের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) সেই হাসির কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন জনৈক সন্ন্যাসী শরৎ মহারাজকে চারুবাবুর 'মুদ্রাদোষের' কথা বলিলেন। তিনি 'কে জানে বাপু'—বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এই ঘটনার পরে একদিন চারুবাবুর সহিত শরৎ মহারাজের কথা হইয়াছিল। সেদিনও অভ্যাসবশত 'কি বলেন মশাই' চারুবাবু বলিলেও তিনি পূর্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া চারুবাবুকে সস্নেহে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে চারুবাবুর মনে কোন ক্ষোভই রহিল না। শরৎ মহারাজ কিন্তু গত দিনের কথা একটি বারের জন্যও উল্লেখ করিলেন না।

সে বৎসর স্বামী সারদানন্দ কাশীধামে যাইয়া সেবাশ্রমের কর্মীদের বলিয়াছিলেন, ''পূর্বের তুলনায় কাজ শত গুণ বাড়িয়াছে—এখন একজনের উপরে নির্ভর করিয়া এত বড় কাজ চালাইতে সাহস করা উচিত নহে—সুতরাং

আমি তোমাদের নিকট নূতন কর্মপদ্ধতির (plan of reorganization) জন্য মতামত জানিতে চাই।"

এই কথার পরে অনেকে আসিয়া শরৎ মহারাজের নিকট মৌখিক মতামত দিয়াছিলেন। মাত্র তিনজন স্বেচ্ছায় ও একজন শরৎ মহারাজের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া লিখিত কর্মপদ্ধতি দাখিল করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে যত কথা হইত তিনি তাহা নিঃশব্দে শুনিয়া যাইতেন। কোন কথার দরুন তাঁহার অপরের প্রতি বিশ্বাস বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইতে দেখি নাই। কিংবা যেদিন সংস্কার-পন্থীদেরই একজন শরৎ মহারাজের নূতন ব্যবস্থা সমর্থন না করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থাই সমর্থন করিয়াছিলেন—তখনও মুহূর্তের জন্য কেহ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দেখেন নাই।

শরৎ মহারাজ কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিলেন। মাসিক দুইশত টাকা বেতনে একজন Resident Doctor (হাসপাতালের ডাক্তার) নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করাতে তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা এতদিন পরে কার্যে পরিণত হইতে চলিল। সেবাশ্রম হইতে শরৎ মহারাজকে জানান হয়—"যেভাবে কাজ চলিতেছে তাহার পরিবর্তন করিতে হইলে একবার শ্রীশ্রীমহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) জানান প্রয়োজন; তাঁহার মত হইলে আমাদের আর কোন অমত নাই।" যে কেহ সংস্কারকামী হইয়া সামান্য বাধা প্রাপ্তে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে স্বামী সারদানন্দ আন্তরিক আনন্দের সহিত বলিয়াছেন, "তোমরা ঠিক বলেছো, মহারাজ আমাদের সকলের ওপরে—তিনি যা বলবেন তাই বলবৎ থাকবে।"

যথা সময়ে সেবাশ্রম হইতে ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সকল কথা নিবেদন করা হইল। উত্তর আসিল—"শরৎ মহারাজ যাহা করবেন তাহা আমারই ব্যবস্থা বলে জানবে।" কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি পরিবর্তনের (reform) একটা ধারা নির্দেশ করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিবার ভার পূর্বের ন্যায় চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ) প্রভৃতির হস্তেই ন্যস্ত করিলেন।

সেবাশ্রমের প্রথম পত্তনের সময় 'রামাপুরা'তে ভাঙা ভাড়া বাড়িতে যে

পরিমাণ কাজ ছিল, আলোচ্য সময়ে আশ্রমের কার্য তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বহু নূতন বাড়ি নির্মিত হওয়ায়, মেডিকেল কলেজে পড়িবার কালীন যে সকল ভাল ব্যবস্থা শরৎ মহারাজ দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকমভাবে কাজের বিভাগ—পুরুষ রোগী একদিকে, মেয়ে রোগী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে—রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; আর এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি Working Committee (কার্যকরী সভা) গঠন করিলেন। ইহার সভ্যগণ কর্মীদের মধ্য হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মনোনীত হয়। তদবধি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের সকল ব্যবস্থাদি, কর্মীদের কার্যকরী সভা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে যখন পূজনীয় হরি মহারাজ পুরী হইতে অসুখ লইয়া 'উদ্বোধনে' চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন শ্রীশ্রীমহারাজও 'উদ্বোধনে' থাকিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট শরৎ মহারাজ বলিতেছিলেন, "মহারাজ এইবার আমাকে অব্যাহতি দাও।" শ্রীশ্রীমহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, শরৎ?" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "সেদিন উ—কে গালাগালি করেছিলুম—কেন সে আমাকে না বলে বৃন্দাবন ছেড়ে এলো? উ—কিন্তু বলেছিল, চিঠি দিয়েছি। আমি সে কথা মানতে পারিনি। আজ দেখলুম কেমন করে সেই চিঠিখানা পুরানো চিঠির মধ্যে মিশে গেছে। সে সত্যি কথাই বলেছিল—আমিই অযথা তাকে গাল দিয়েছি। উ—কে একদিন আনিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।" মহারাজ বলিলেন, "অতটা না করলেও চলবে।" কিন্তু সে কথা শরৎ মহারাজ রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরবর্তী সময়ে উ—র নিকট নিজের ভুলের জন্য সত্যই তিনি ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। আমরা জানিতাম, কর্তৃপক্ষের কখনও ভুল স্বীকার করিতে নাই; এক্ষেত্রে কিন্তু দেখিলাম, স্বামী সারদানন্দ ভুল স্বীকার করিলেন ও ক্ষমাও চাহিলেন। চিরদিন তিনি মানুষের সহিত মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পদগৌরবে কদাচ অপরকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। কদাচ এমন কথা কাহাকেও বলেন নাই যাহাতে তাহার আশা ভঙ্গ কিংবা তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

যাহারা কর্ম ভালবাসিত শরৎ মহারাজ তাহাদের কাজ লক্ষ্য করিতেন এবং উত্তরোত্তর অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার অর্পণ করিয়া সেবকের আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করিতে সহায়তা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ইঁহার কৃপায় অনেক 'মূক' 'বাচাল' হইয়াছে, অনেক 'পঙ্গু' 'গিরি লঙ্ঘন' করিয়াছে। যে ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই অন্তরের সহিত ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত শিষ্য-স্থানীয় ও শিষ্যদের সহিত ব্যবহার করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিলেন।

খড়দহ—বিশ্বাসদের পরিবারে যোগীন্দ্র মোহিনীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী-ভক্তগণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতমা কৃপাপাত্রী ছিলেন। উত্তরকালে ভক্তগণের নিকট যোগীন্দ্রমোহিনী—'যোগীন-মা' নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন এবং যতদিন শ্রীশ্রীমা জীবিতা ছিলেন, যোগীন-মা ও গোলাপ-মা মায়ের সেবিকারূপে 'উদ্বোধনে' মায়ের নিকট থাকিতেন।

যোগীন-মার মেয়ের চারিটি পুত্র। বড় নাতিটির মাথা খারাপ হওয়ার ফলে কনিষ্ঠ তিনটির লেখাপড়া কেমন করিয়া চলিবে ভাবিয়া যখন তিনি কূল কিনারা কিছু করিতে পারিলেন না, তখন শরৎ মহারাজ কনিষ্ঠ তিনটিকে 'উদ্বোধনে' আপনার নিকট রাখিলেন। 'রাখিলেন' বলিলেই সকল কথা ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজের শয়নঘরে পৃথক বিছানায় ছেলে তিনটিকে নিত্য শোয়াইতেন এবং পাছে তাহাদের ঠাণ্ডা লাগে এই আশঙ্কায় গরমের দিনেও ঘরের জানালা খুলিতেন না। নিজে তিনি স্থূলকায় ছিলেন, গরম সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঐ ছেলে তিনটির জন্য গ্রীষ্মের রাত্রে তিনি যে অসহ্য গরম সহ্য করিয়াছেন—এ কথা বাহিরের লোক তো দূরের কথা আমাদের মধ্যে কয়জনই বা সে সংবাদ রাখেন?

এমন পলে পলে নিজেকে পরের জন্য বিলাইয়া দিতে স্বামী সারদানন্দ অতুলনীয় ছিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের দেহরক্ষার পরে মঠের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ এতদূর পর্যন্ত ভাবিতেন, স্বামী সারদানন্দ অর্থে—মঠ ও মিশন। শ্রীশ্রীমহারাজ জীবনব্যাপী মঠ-মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, আর স্বামী সারদানন্দ জীবনব্যাপী উহার সম্পাদক ছিলেন।

আমরা শ্রীশ্রীমহারাজকে একাধিকবার বলিতে শুনিয়াছি, "সকলেই চায় আমি কাজ করি, এক শরৎ চায় কিসে আমি শান্তিতে থাকি। শরৎ চিরদিন আমার হাতের কাজ টেনে নিয়ে করেছে।" পূজনীয় মহাপুরুষের (শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী) নিকট আমরা শুনিয়াছি, "শরৎ মহারাজ সকলের কাজ একা করিবার জন্য সর্বদা উৎসাহী ছিলেন; এবং একলার পক্ষে যতখানি বেশি কাজ করা সম্ভব তিনি তাহা করিতেন।" পূজনীয় কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) বলেন, "আমার পায়ে যখন পোকা হয়েছিল তখন শরৎ তিন মাস অক্লান্ত সেবা করে আমার প্রাণ দান করেছিল।" আজও পূজনীয়া গৌর মা জীবিত; যে কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, তাঁহার যখন ভীষণ বসন্ত রোগ হইয়াছিল তখন কিভাবে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের অগ্রজ শ্রীযুত তুলসীরামবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা জানিতে পারিব, দারুণ যক্ষ্মারোগে দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর তাঁহাদের গুরুপুত্র 'ফকিরের' শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া স্বামী সারদানন্দ কি রকম প্রাণ দিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। চিরহৃদয়বান স্বামী সারদানন্দ তখন বলিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এত স্থূলকায় ছিলেন না।

কি নিজ গুরুভ্রাতাগণের রোগশয্যায়, কি শিষ্যস্থানীয় সন্ন্যাসীদের রোগে, স্বামী সারদানন্দ এক অদ্ভুত অলৌকিক পুরুষ ছিলেন। কেমন করিয়া যে তিনি রোগীকে নিজ বশে আনিয়া ফেলিতেন তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয় ছিল।

শ্রীশ্রীমহারাজের একবার 'টাইফয়েড' জ্বর হয়। আরোগ্য লাভ করিয়া মহারাজ স্নানের নামও করেন না, বলরামবাবুর বাড়ি হইতে গঙ্গার ধার—এই সামান্য পথটুকু বেড়াইতে যাইবার উৎসাহও দেখান না। মহারাজের এ অবস্থা দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ প্রমাদও গণিলেন না, ধৈর্যও হারাইলেন না। শেষে শরৎ মহারাজের ধৈর্যই জয়যুক্ত হইল। মহারাজ স্নানও করিলেন, গাড়িতে গঙ্গার ধারে যাইয়া বেড়াইতেও আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেড়াইতে যাইবার পূর্বে যে কাণ্ড নিত্য ঘটিত—মহারাজও যাইবেন না, শরৎ মহারাজও ছাড়িবেন না—তাহা বলিয়া আর কি হইবে?

সে বেশি দিনের কথা নহে, জনৈক সন্ন্যাসী কালাজ্বরে ভুগিতেছিল। 'উদ্বোধনে' থাকিয়া তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল। যেদিন তাহার অসুখ খুব বাড়িয়া গেল, সকলেই উহার জীবনে হতাশ হইল। সে বায়না ধরিল—"হরিনাম করবো আর ডাব খাবো;" কিছুতেই সে ইনজেকশন লইবে না! তখন শরৎ মহারাজ আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। যেমন করিয়া ওঝা সাপের বিষ ঝাড়িয়া থাকে তেমনি করিয়া তিনি তাহাকে পোষ মানাইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হরিনাম করা আর ডাবের জল পান করার—বহু প্রশংসা করিয়া তবে তাহাকে তিনি ইনজেকশনে রাজি করিতে পারিয়াছিলেন। সে যাত্রা সে বাঁচিয়া গেল।

সম্প্রতি জনৈক সাধুর 'বেয়াড়া' ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ক্রমাগত কাশি, দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। একান্ত অস্থির হইয়া শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া আনিতে বলিল। শরৎ মহারাজ ঐ স্থূল দেহ লইয়া, একটি হাঁটু বিছানার উপর রাখিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর রয়েছেন, মা আছেন, ভয় কিরে?" তাহার অবস্থা খুব খারাপই হইয়াছিল, কিন্তু ঐ স্পর্শে ও 'ঠাকুর, মা আছেন'—এই কথা শুনিয়া সে কিন্তু শান্ত হইয়া গেল। তাহার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল, অসুখ নাই বলিলেও চলিত। এহেন লোকের 'বেয়াড়া' ম্যালেরিয়া জ্বর ও কাশিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম, সুতরাং সময়ে সময়ে সে এত অধৈর্য হইয়া উঠিত যে, কেহ তাহার সেবা করিতে ভরসা করিতেছে না শুনিয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "যা, তোদের সেবা করতে হবে না, আমি অথর্ব মানুষ, যা পারি সেবা করবো।" পরে সেবকগণ তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। কয়েক দিনের ভিতর সে ভাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই ঘটনার মাস কয়েক পূর্বে গোবিন্দর (স্বামী তত্ত্বানন্দ) বসন্ত হইয়াছিল। ঐ রোগ ক্রমশ ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। উদ্বোধন 'অফিসে' শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবাও রহিয়াছে, সুতরাং পুস্তকক্রেতা ও ভক্তের সমাগম বন্ধ করিবার উপায় ছিল না। যাহার অসুখ হইয়াছিল, সে কিন্তু অসুখ হইতেই হাসপাতালে যাইতে চাহিয়াছিল—এ কথা শরৎ মহারাজও শুনিয়াছিলেন। নানা

দিক লক্ষ্য করিয়া শরৎ মহারাজ একজনকে বলিলেন, ''কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে হাসপাতালে যাইতে তাহার বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা আছে কিনা, যদি থাকে তবে যেন তাহাকে পাঠান না হয়।''

যাঁহার উপরে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিবার ভার দিয়াছিলেন তিনি অন্য একজনকে উহা জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। তিনি আবার, রোগীর যে সেবা করিতেছিল তাহাকে বলিলেন, ''উহাকে জানাইবে—তাহাকে কাল হাসপাতালে যাইতে হইবে।'' প্রথম হইতেই হাসপাতালে যাইবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল, সুতরাং হাসপাতালে যাইবার কথা শুনিয়া সে অম্লান বদনে সম্মতি দিল। সে কি কথার উপরে সম্মতি দিয়াছিল, শরৎ মহারাজ তাহা জানিতেন না। গোবিন্দ, হাসপাতালে দেহরক্ষা করিল। তখন তাহাকে হাসপাতালে পাঠান লইয়া কতিপয় বাহিরের লোক 'সেবাধর্ম' সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কিন্তু একদিনও রোগীকে দেখিতে আসেন নাই, কিংবা কি করিলে হাসপাতালে না পাঠাইয়া তাহার সেবা চলিতে পারে তাহাও বলিয়া দেন নাই। কিন্তু তবুও অযাচিত মন্তব্যগুলি যথা সময়ে শরৎ মহারাজ শুনিলেন। একদিন জনৈক সাধুর কাছে তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, ''তোমরা যদি কথা মতো কাজ না কর, আমি অথর্ব মানুষ—কি করতে পারি বল?''

জগতে দলপতিদের জয় ততদিন অব্যাহত থাকে যতদিন অধীনস্থ সকল লোক ব্যক্তিগত বুদ্ধি খরচ না করিয়া অধ্যক্ষের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে। যেখানে অধ্যক্ষের আদেশের সহিত অধীনস্থ লোকের ব্যক্তিগত বুদ্ধি যোগ হয় সেখানেই বিভ্রাটের উপর বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হইবে। সাধুটিকে হাসপাতালে পাঠান দোষের হইয়াছিল, কিংবা গুণের হইয়াছিল, সে বিচার করিতে কেহ এ সময় পুঁথি খুলিয়া বসিবে না! আমরা শুধু দেখাইতে চাই, অধ্যক্ষের আজ্ঞা অব্যাহত না থাকিলে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাহার জন্য অধ্যক্ষকেই মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীমহারাজ ও শরৎ মহারাজকে স্বামীজী কথায় কথায় বলিতেন, ''তোদের

ঐ ছটাকে বুদ্ধি রেখে দে, সুদে আসলে বাড়ুক, পরে কাজে লাগাবি। এখন যা বলি করে যা।'' মহারাজ, শরৎ মহারাজ—স্বামীজীর আদেশ মতো ঠিক ঠিক কথা বলা, কাজ করা গৌরবেরই জানিতেন। অতএব যাহারা অধীনস্থ তাঁহাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত—"Soldiers do not choose, they obey."

আমি কখনও শরৎ মহারাজকে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের বিরুদ্ধে নিন্দা বা অমর্যাদাসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। গ্রাম্যভাষা তিনি কখনো প্রয়োগ করিতেন না। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরে ঈর্ষা—ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা হইলেও, সে পাপে কেহ কখনো স্বামী সারদানন্দকে লিপ্ত হইতে দেখেন নাই।

মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে ছিল আমার পূর্বাশ্রম। ১৩১৪ সালের চৈত্র মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বেলুড় মঠ হইতে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী), তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) এবং নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) সেই ক্ষুদ্র শহরে শুভাগমন করেন। আমার পূর্বাশ্রমেই পূজ্যপাদ মহারাজগণের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উৎসবানন্দে সাত দিন গত হইল। মঠে ফিরিবার সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধীনেই আছি।

বাগবাজার—বলরামবাবুর বাড়িতে শরৎ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া প্রীতি হইলেও স্বস্তি অনুভব করিতে পারি নাই। প্রতি মুহূর্তে মনে হইতেছিল অন্য ঘরে গিয়া বসিলে মন্দ হয় না।

গৃহে থাকিতে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিয়াছি তাহারা সকলেই হিন্দুস্থানী। প্রজ্বলিত ধুনির পার্শ্বে বৃক্ষতলশায়ী, গঞ্জিকাসেবী, কৌপীন ও কম্বল মাত্র সম্বল; রোগে যা তা ঔষধ প্রদান, অর্থের বিনিময়ে হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনা, যাতায়াতের ভাড়ার অর্থের জন্য গৃহীর দ্বারে শুভাগমন—ইহাই সাধুর লক্ষণ বলিয়া জানিতাম। ইহা ছাড়া স্থানীয় লোকের মধ্যে যাহারা ধার্মিক বলিয়া অভিহিত, দেখিয়াছি—তাহারা প্রায় সকলেই প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ বাক্য

প্রয়োগ করিতেন, ক্বচিৎ কেহ মৌন থাকিতেন। ধার্মিকের মধ্যে প্রায় অনেকেই ভাবের আতিশয্যে কখনো হাসিতেন, কখনো কাঁদিতেন, কখনো নৃত্য করিতেন আবার কখনো বা কুৎসিত ভাষাতে গালমন্দ করিতেন। সে সকল ধার্মিকেরা কথা বলিতে যাইয়া 'ভুলিয়া গেছি' বলিয়া জানাইতেন—এ জগতে তাঁহাদের মন বেশিক্ষণ থাকিতেছে না। তখন বুঝিয়াছিলাম, 'ভুল হওয়া' ধার্মিকের একটা বড় গুণ।

বেলুড় মঠে আসিয়া পূর্ব ধারণা নিতান্তই অসার বলিয়া প্রতীত হইল। সেখানে দর্শক ছিলাম, এখানে শিষ্য; শিখিতে আরম্ভ করিলাম, " 'ভাব' খুবই ভাল কিন্তু তাহার সহিত 'প্রবণতা' যুক্ত হওয়া ভাল নহে," যেমন 'শুচি' ভাল কিন্তু তাহার সহিত 'বাই' যুক্ত হওয়া সমীচীন নহে। জানিলাম, 'ভুল হওয়া' ধার্মিকের লক্ষণ নহে, উহা নিছক ব্রহ্মচর্যের অভাবের ফল মাত্র। শুনিলাম, সাধুর হইবে—muscles of iron, nerves of steel, gigantic will which nothing can resist। কারণ, সাধুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করিতে হইবে, ভাবের বেগ, রিপুর বেগ ধারণ করিতে হইবে, কর্মের মধ্যে ধীরস্থির থাকিয়া কাজ করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে শুনিলাম, "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"

প্রাচীনগণের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ আমাদের ভাগ্যগুণে এক অপূর্ব উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি কখনো স্বামীজীর কথা বলিতেছেন, কখনো বা উপনিষদ্, গীতা—শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া যাইতেছেন—আর আমরা মুগ্ধ হইয়া সেই বাক্যলহরী শুনিয়া রাত্রির অধিক অংশ কাটাইয়াছি। কিন্তু আজ আমাদের ভাগ্যদোষে স্বামী শুদ্ধানন্দ বৃদ্ধ, রোগে শক্তিহীন। তিনিও প্রথম প্রথম শরৎ মহারাজের গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া একটু একটু ভয় পাইতেন। যথাসময়ে স্বামীজীর বিরচিত মঠের নিয়মাবলিখানা পড়িয়া দেখিলাম, নিয়মগুলি সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার্থে এবং বিজয় অভিযানে (defensive and offensive) স্বামীজীর একান্ত দূরদর্শিতাই সূচিত করিতেছে। এখনও আমার মনে বিশেষভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে—

"বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচ দশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকিবে।"

"ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অতএব ত্যাগ ও তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।"

"প্রচারকার্য দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য হইতে কখনো বিরত থাকিবে না।"

"আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয় চরিত্র গঠনের একমাত্র উপায়। অতএব এই মঠের প্রত্যেক কার্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য থাকে।"

"আজ্ঞাবহতাই কার্যকারিতার প্রধান সহায়, অতএব প্রাণভয় পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।"

"অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব-বিচ্ছেদের প্রধান কারণ, অতএব কেহ তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে তবে একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।"

"এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্যে তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থায়ই থাকুন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে।"

পরবর্তী সময়ে যতই শরৎ মহারাজকে দেখিয়াছি ততই মনে হইত, স্বামীজীর এই সকল নিয়মাবলি যেন তাহাতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে।

তখন শ্রীশ্রীমহারাজ গরমের সময়ে পুরীতে থাকিতেন। পূজনীয় মহাপুরুষ (শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী) ও বাবুরাম মহারাজ মঠের কাজ দেখিতেন। গোপালদা (শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ স্বামী), নিত্যানন্দ স্বামী, গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) মঠে থাকিতেন।

সে সময় শরৎ মহারাজ কলকাতা হইতে মঠে আসিতেন। কখনও দু-এক দিন থাকিতেন, প্রায়ই যেদিন আসিতেন সেদিনই কলকাতায় ফিরিতেন।

সম্মুখে ঝুলনযাত্রা। একদিন শরৎ মহারাজ মঠে আসিয়াছেন। তখন বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর পূজা করিতেন। প্রায় ১১টার সময় তিনি পূজা শেষ করিয়া শরৎ মহারাজের পাশে চায়ের টেবিলের নিকটে বেঞ্চিতে গিয়া বসিলেন। তারপর আমার ডাক পড়িল। স্থির হইল, তিন মাসের জন্য আমাকে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে যাইতে হইবে। এই সময় আমাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া শরৎ মহারাজের সহিত কথা বলিতে হইয়াছিল। সেখানে লোক গিয়া কি করিবে তাহা তিনি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। এই কথাবার্তার মধ্যে আমার ধারণা হইয়াছিল—ইঁহাকে দেখিলে যতটা ভয় আসে ইনি ঠিক ততটা ভয়ের বস্তু নহেন।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পূজার তিন চারি দিন পূর্বে শিব-চতুর্দশী রাত্রে হোমের ঘরে বসিয়া শরৎ মহারাজকে চারপ্রহর একাসনে বসিয়া পূজা করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তখন চার পাঁচ জনের বেশি ব্রহ্মচারী মঠে ছিলেন না। পূজা অন্তে গান, গান অন্তে পূজা। এইভাবে সমস্ত রাত্রি গত হইল। গান গাহিয়াছিলেন শরৎ মহারাজ তানপুরা সহযোগে, সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাইয়াছিলেন প্রবোধবাবু। এই পূজার প্রথম প্রহরে ব্রহ্মচারী— কলকাতা হইতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "পুজো করবি আয়।" ব্রহ্মচারী—বলিলেন, সমস্ত দিন তাহার কাপড় বদলাইবার অবসর হয় নাই, তাছাড়া সে আহার করিয়াছে। "তা হোক, ব্যাধ যেমন পুজো করেছিল, তেমনি পুজো করবি"—বলিয়া একটু গঙ্গাজল তাঁহার মাথায় দিয়া, পাশে বসাইয়া পূজা করাইলেন।

ব্যাধের সহিত উপমা আর সস্নেহে পাশে বসাইয়া পূজা করানোর মধ্যে বোধ হয় আরও কিছু ছিল যাহার জন্য ব্রহ্মচারী—'না' বলিয়া পাশ কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহাকেও সেই অবস্থায় পূজা করিতে হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার রাত্রিতে শরৎ মহারাজকে প্রতি বৎসর 'দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে' গানটি ঠাকুরঘরে বসিযা গাহিতে শুনিয়াছি। আর শুনিয়াছি, স্বামীজীর তিথিপূজাতে 'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ

অতীত-আগামিকাল-হীন দেশ-হীন সর্ব-হীন নেতি নেতি বিরাম যথায়।' ইহা ছাড়াও তাঁহাকে অনেক গান গাহিতে শুনিয়াছি।

সে বৎসর 'উদ্বোধনের' বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে শরৎ মহারাজের কাছে চিঠি আসিল—মামারা পৃথক হইবেন—শরৎ মহারাজকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া দিতে হইবে। মঠে আসিয়া শরৎ মহারাজ সে সংবাদ জানাইলেন। আমি বাবুরাম মহারাজকে ধরিয়া বসিলাম, মাকে কখনো দেখি নাই—আমি শরৎ মহারাজের সঙ্গে যাইব। বাবুরাম মহারাজ অনুমতি দিলেন।

একদিন 'গুমো প্যাসেঞ্জারে' শরৎ মহারাজের সঙ্গে রওনা হইলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিবার কিছুক্ষণ পরে তিনি একটি চুরুট ধরাইয়া আমাকে একটি চুরুট লইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "না।"

তিনি বলিলেন, "লজ্জা করে আর কি করবে? অনেক রাস্তা যে একসঙ্গে যেতে হবে।" তখন—আমি ধূমপান করি না—নিবেদন করিলাম।

তিনি বলিলেন, "তবে আর নিয়ে কাজ নেই।"

তিনি যে উদারতাবশত আমাকে চুরুট নিতে বলিয়াছিলেন—জন্মগত সংস্কার প্রবল থাকার জন্য, তাহা ভাবিবার মতো সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

বৈকালে বিষ্ণুপুরে নামিয়া চটিতে রান্না করিয়া ভাত খাওয়া গেল। তারপরে ঠিক হইল, গরুর গাড়িতে কোয়ালপাড়া পর্যন্ত যাইতে হইবে। সমস্ত রাত্রি গাড়ি চলিবে। ইতঃপূর্বে কখনো B. N. R. (Bengal Nagpur Railway)-এর গাড়িতে উঠি নাই। সুতরাং এদিকের হালচাল কিছুই জানিতাম না।

যথাসময়ে গরুরগাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎ মহারাজ গাড়িতে উঠিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উঠে পড়।" সর্বনাশ—'উঠে পড়' কি! এক গাড়িতে উভয়কে শয়ন করিতে হইবে নাকি? এ যে একেবারেই অসম্ভব! একে তিনি স্থূলদেহী আর আমি স্থূল না হইলেও কম যাই না; কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাহস তখন ছিল না। তারপর সমস্ত রাত শরৎ মহারাজের

পার্শ্বে একপাশ হইয়া কাটাইয়া রাত যখন তিনটা তখন গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিতে লাগিলাম। তখন কিন্তু মনে হইতেছিল—এমন বিপদে যেন আর না পড়িতে হয়।

পরদিন গাড়ি সকাল নয়টার সময় কোয়ালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও কোয়ালপাড়া-মঠ হয় নাই, তবে বয়ন-বিদ্যালয় ছিল। কেদারবাবু (পরে—স্বামী কেশবানন্দ) বাক্স ও বিছানা বহন করিবার লোক ঠিক করিয়া দিলেন। আমরা পদব্রজে জয়রামবাটি চলিলাম। বেলা ১১টার সময় আমোদর নদী পার হইয়া শরৎ মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া পড়িলেন। আমাদের পশ্চাতে একজন ঐদেশী বর্ষীয়সী মহিলাও আসিতেছিলেন। শরৎ মহারাজকে ঘর্মাক্ত দেখিয়া তাঁহার সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। মহিলা বলিয়া ফেলিলেন, "আহা ভোঁদা (মোটা) মানুষ, বড্ড কষ্ট হয়েছে, না?" পরবর্তী সময়ে শরৎ মহারাজ কিন্তু এ কথা বলিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন।

পরে মহিলাটিও চলিয়া গেলেন। শরৎ মহারাজের সঙ্গে আমোদরে স্নান করিয়া ক্ষুদ্র মাঠখানা অতিক্রম করিয়া জয়রামবাটি গ্রামে প্রবেশ করিলাম। তারপরে একেবারে ধুলোপায়ে শরৎ মহারাজ অগ্রে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রথমে তিনি প্রণাম করিলেন, মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ ও চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন। পরে আমি প্রণাম করিলাম। মা আমারও মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ এবং চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন।

ইহাই আমার ভাগ্যে সর্বপ্রথম মাতৃদর্শন। যাঁহার কৃপায় আমার ভাগ্যে মাতৃদর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ, আপনারা সকলে আশীর্বাদ করুন যেন জীবনে কিংবা মরণে তাঁহার সেই অহৈতুকী কৃপা আমার উপর সমভাবে বর্তমান থাকে। সঙ্ঘের শুভ ইচ্ছা—শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আশীর্বাদ, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা।

স্বামী সারদানন্দের কথা

অজ্ঞাত

৭ মার্চ, ১৯২৭

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, কয়েকদিন পরে উৎসব হবে; উৎসবটা দেখে যাবে। ২৪,০০০।২৫,০০০ লোক বসে প্রসাদ পায়, আর কত লোক যে হাতে প্রসাদ নেয়, তার ইয়ত্তা নেই। এ রকম বিরাট ব্যাপার এখন আর ভারতের কোথায় আছে? (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ, তবে এক জায়গায় আছে বটে—শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে। ওখানেও যত লোকই যাক, সকলেই প্রসাদ পায়। (তৎপরে ওখানকার রান্নার প্রণালী ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল।)

ওখানেও বিরাট আয়োজন। ওখানকার রাঁধুনিদিগকে 'শোয়ার' বলে। 'শোয়ার' কিনা 'শবর'। প্রবাদ আছে, অতি প্রাচীনকালে এই শবরজাতির এক বিগ্রহ ছিল। তারা জঙ্গলে এই বিগ্রহের পূজাদি করতো; এমন গোপনে করতো যে, এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না। পরে এক ব্রাহ্মণ এ কথা জানতে পারেন, তারপর রাজাকে (স্থানীয় রাজা) শবরদিগের গুপ্ত পূজার কথা জানান। রাজা (ধৃষ্টদ্যুম্ন) বিগ্রহ দেখতে ইচ্ছা করলেন। ঐ ব্রাহ্মণ শবর-কন্যাকে বিয়ে করে শবর হলেন। তখন শবরেরা তাঁকে তাদের বিগ্রহ দেখালে। কিন্তু চোখ বেঁধে নিয়ে গেল ও নিয়ে এল। বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ সঙ্গে সরষে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তাই ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন। পরে সরষে গাছ ধরে একাই একদিন বিগ্রহ দেখে এলেন এবং রাজাকে একদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখলেন, সেই বিগ্রহের স্থানটি ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে বিগ্রহাদি কিছুই নেই। তখন তাঁরা খুব দুঃখিত হলেন।

দৈববাণী হলো যে, তাঁদের সামনে একখণ্ড কাঠ ভেসে আসবে। তাতে জনৈক মিস্ত্রির দ্বারা বিগ্রহ তৈরি করালে শ্রীভগবান তাতে আবির্ভূত হবেন।

দৈববাণী সত্য হলো! —কাঠ ভেসে এল। জনৈক বৃদ্ধ আগন্তুক মিস্ত্রি মূর্তি নির্মাণে প্রস্তুত হলেন। তবে তাঁর এই একটি condition (শর্ত) রইল যে—সে এই কাঠটি নিয়ে একটি ঘরে ঢুকবে। সেই ঘরে সে ছাড়া আর কেউই থাকতে পারবে না। ঘরের তালা বন্ধ করে দিতে হবে। সে নিজে যতদিন না ইঙ্গিত করে ততদিন কেউই তালা খুলতে পারবে না। যদি খোলে, তবে সে আর মূর্তি তৈরি করবে না। মিস্ত্রি কাঠটি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ঘরের তালাও বন্ধ করা হলো। দু-একদিন ভেতর হতে যন্ত্রাদির শব্দ শুনা গেল; পরে আর কিছুই শুনা গেল না। তখন সন্দেহ হলো—বুঝি বৃদ্ধ মারা গেছে। দ্বার খোলা হলো। ঘরে কেউই নেই। মূর্তিটি আধ-গড়া হয়ে পড়ে আছে। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আবার দৈববাণী হলো—"আমি বিশ্বকর্মা, তোমাদের মূর্তি নির্মাণ করে দিতে গিয়েছিলাম। তোমরা আমার কথামত কাজ কর নাই, তাই চলে এসেছি। মূর্তিও সম্পূর্ণ হয় নাই। যা হোক, চিন্তা করো না। ওতেই প্রতিষ্ঠা কর। ওতেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হবে।" সেই মূর্তিটিই প্রতিষ্ঠা করা হলো। এই উপাখ্যানটি 'সুতসংহিতা' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি বোধ হয় 'স্কন্দপুরাণে'র অন্তর্গত।

প্রঃ আচ্ছা, স্কন্দপুরাণ তো ব্যাসদেব-কৃত?

উঃ ব্যাসদেবের নামে অমন কত গ্রন্থ চলে যাচ্ছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি এখন যে সমস্ত research (গবেষণা) করছেন, তাতে কিন্তু অন্য রকম বুঝা যায়। এঁরা বলেন—শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার যে তিনটি মূর্তি আছে, তা পূর্বে শ্রীবুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের symbols (প্রতীক) ছিল। সেইগুলিকেই কিছু রূপান্তরিত করে আধুনিক মূর্তি তিনটি তৈরি করা হয়েছে। এই মতের সমর্থনের অনুকূল অনেক facts and materials (প্রমাণ) পাওয়া গিয়েছে, যেমন—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের compound-এর (আঙিনার) ভিতর একটি মন্দিরে শ্রীবুদ্ধের ধ্যান-মূর্তি

রয়েছে। হিন্দুরা ঐ মূর্তির সামনে একটি দেওয়াল নির্মাণ করে তাতে হিন্দু দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছে। শুনা যায়—পূর্বে যেখানে যেখানে বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান মঠ বা চৈত্য ছিল, সেইখানেই হিন্দুরা দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করে, সেইগুলিকে eclipsed (হীনপ্রভ) করবার চেষ্টা করেছিল। আরও দেখা যায়, এই যে শ্রীক্ষেত্রে কোনরূপ জাতি-বিচার নেই, তাহাও বোধ হয় বৌদ্ধদেরই প্রভাবের ফল। শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত গোবধর্ন মঠ, পূর্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের compound-এর মধ্যেই ছিল। তখন শুনা যায়—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মূর্তি শিব-বিগ্রহরূপে উপাসিত হতো এবং প্রত্যহ গাড়ি গাড়ি বিল্বপত্র ঐ বিগ্রহের উপর বর্ষিত হতো। পরে যখন বৈষ্ণবদের প্রাধান্য হয়, তখন পুনরায় ঐ বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুমূর্তি রূপে উপাসিত হতে থাকে এবং তাহার উপর তখন রাশি রাশি তুলসীপত্র বর্ষিত হতে থাকে। এখন যেভাবে উপাসনাদি চলেছে তার সূত্রপাত বৈষ্ণবদের সময় হতে হয়েছে।

প্রঃ আচ্ছা মহারাজ, বুদ্ধদেব কি কোথাও জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন?

উঃ না, তিনি প্রকারান্তরে তাঁর নিজের ভাবে জ্ঞানকাণ্ডে যা আছে তাই বলে গিয়েছেন। তাঁর উপদেশাবলী তিনি তখনকার চলিত ভাষা 'পালি'তে দিয়েছিলেন।

প্রঃ তাহলে বেদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যেরূপ বলে গিয়েছেন সেরূপ বোধ হয় জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই?

উঃ না, তা বলেন নাই। তখন অনেক পশু বধ করা হতো। এই জন্যই তিনি অহিংসার উপর এত জোর দিয়ে গিয়েছেন। বৌদ্ধদের দুইটি প্রধান শাখা আছে (হীনযান ও মহাযান)। যে শাখাটি (হীনযান) সিংহলে দৃষ্ট হয় তারা হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা করে না, মাত্র শ্রীবুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকে। আর যে শাখাটি (মহাযান) তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে দৃষ্ট হয়, তারা হিন্দুদেব দেবদেবীতে বিশ্বাস করে এবং নিজেরাও পূজাদি করে থাকে।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭

শ্রীবুদ্ধদেবের কথা চলছিল। তিনি নিজে কত কঠোরতা করেছিলেন, অথচ অপরকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন—এইসব সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

জনৈক ভক্ত—সাধারণ মানুষের শরীর-মনে অত্যন্ত কঠোরতা সহ্য হবে না বলেই, তিনি মধ্যপন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

একজন মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন—কেউ কেউ যে কঠোরতা করে শরীর ভেঙে ফেলে, তা কিরূপে করে? আনন্দে বিভোর হয়ে কি শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে ভুলে যায়?

মহারাজ বলিলেন—সব সময় যে আনন্দ পায়, তা নয়। কেউ কেউ আবার আনন্দ পাবে এই আশায় ওরূপ করে থাকে।

প্রঃ মহারাজ, শরীর-মন শুদ্ধ হলে সাধক কি নিজে বুঝতে পারে?

উঃ হাঁ, পারে বৈকি। তখন সে নিজেই বোঝে যে, পূর্বের মতো বাজে চিন্তা আর হচ্ছে না, তাছাড়া শান্তি অনুভব করে।

প্রঃ আচ্ছা, আমাদের মুক্ত করে দিলে ভগবানের ক্ষতি কি?

মহারাজ মৃদু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন—বৃদ্ধিও তো নেই।

প্রঃ তবে তাঁকে ডেকে লাভ কি? না ডেকে থাকতে পারি না বলেই কি ডাকি?

উঃ হাঁ।

প্রঃ মনে যে দুঃখ কষ্ট হয় এর কারণ কি?

উঃ বিশ্বাস নেই বলে।

প্রঃ কখনো কখনো এমনও দেখা যায়—সাধন-ভজন না করেও বেশ বিশ্বাস লাভ করেছে; এ কেমন করে হয়?

উঃ হয়তো পূর্বজন্মে খুব করেছিল।

প্রঃ কর্মযোগ ও নিষ্কাম ভক্তিযোগ—উভয়ই কি এক?

উঃ নিষ্কাম ভক্তিযোগ কর্মযোগের মধ্যে, তবে এ ছাড়াও কর্মযোগ আছে।

প্রঃ নিষ্কাম ভক্তিযোগ বললে কি বুঝায়?

উঃ পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু করা যায় সকলই তাঁর উদ্দেশ্যে—একেই নিষ্কাম ভক্তি বলে।

প্রঃ আচ্ছা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজকার্য পরিচালনা প্রভৃতি এর মধ্যে পড়ে কি না?

উঃ না, ওসব নয়।

প্রঃ কর্মযোগ কাকে বলে?

উঃ ফলাফলের দিকে নজর না দিয়ে কেবল কর্তব্য-বুদ্ধিতে কাজ করার নামই কর্মযোগ। স্বর্গাদি কামনাও থাকবে না।

প্রঃ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বললেন, আর উদ্ধবকে উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করতে বললেন—এর কারণ কি?

উঃ অধিকারিভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা।

প্রঃ নিবৃত্তি-মার্গই যখন শ্রেয়, তখন কখনো কখনো ওর মধ্যেও প্রবৃত্তি-মার্গের সংযোগ দেখা যায় কেন?

উঃ সাধারণকে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিবৃত্তি-মার্গে যেতে হবে বলেই ওরূপ বিধান।

প্রঃ যা ভাল তা অপরে গ্রহণ করতে না চাইলেও, force (জোর) করা তো উচিত?

উঃ Force (জোর) করলে কিছু ফল হয় না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া ভাল। স্বেচ্ছায় নিবৃত্তি-পরায়ণ হবে। জোর করে চাপাতে গেলে অনেক সময় উল্টো ফল হয়। বাইরে এক রকম দেখায় আর ভিতরে গোপনে গোপনে অন্য রকম আচরণ করে।

প্রঃ বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ?

উঃ Highest ideal (উচ্চ আদর্শ) যদি কেউ follow (অনুসরণ) করতে না পারে, তবে সে জায়গায় বিবাহ দেওয়াই ভাল।

প্রঃ স্বামীজী তো এর against-এ (বিরুদ্ধে) বলে গিয়েছেন।

উঃ—তিনি বলে গিয়েছেন ওসব সামাজিক বিষয়, এত কিছু important (প্রয়োজনীয়) নয়। ধর্মের উচ্চ আদর্শ সামনে ধর, সমাজ ঠিক হয়ে যাবে।

২৭ জুন, ১৯২৭

মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—ভগবান মানুষকে তাঁর বিষয় চিন্তা করবার যে শক্তি দিয়েছেন—এ একটা মস্ত privilege (সুবিধা)।

প্রঃ তাহলে তাঁর সম্বন্ধে doubtful way তে (সন্দিগ্ধ মনে) চিন্তা করা কি মানুষের পক্ষে audacity (ধৃষ্টতা)?

উঃ Audacity (ধৃষ্টতা) তো নিশ্চয়ই। দেখ না, এমন কি তাঁর origin (মূল) পর্যন্ত question (প্রশ্ন) করছে। কেউ বলছে 'আছে', কেউ বলছে 'নেই' ইত্যাদি।

প্রঃ একটা কি সিদ্ধান্ত হয় না?

উঃ কেন হবে না? পূর্বকালের ঋষিরা তো সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন। যাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাঁরাই নিশ্চিন্ত, অপরে ঘুরে মরে।

প্রঃ তাহলে যতদিন না সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ততদিন বিচার করতে হবে?

উঃ হাঁ, যতদিন না হয় ততদিন মাথা খুঁড়তে থাক।

প্রঃ আচ্ছা, মানুষ এই যে তাঁর সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করছে, অথচ জানতে পারছে না—এটা তাঁর পক্ষে অন্যায় নয়? তিনি সব নিজের হাতে লুকিয়ে রেখেছেন, কাকেও কিছু জানতে দিচ্ছেন না!

উঃ তিনি যদি বলেন, "আমি যে নিজেই সব হয়েছি। তুই বকছিস কি?"

(ইহা শুনিয়া প্রশ্নকারী চুপ করিলেন।)

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার জনৈক ভগিনীকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন, তিনি যত শীঘ্র পারেন যেন 'উদ্বোধনে' পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজ এই কথা বলিয়া বলিলেন, "কই আমাকে তো কিছুই স্বপ্ন দেন নাই!"

জনৈক সাধু—হাঁ, ঐ রকম দুজনে একই রকম স্বপ্ন দেখলে তবে স্বপ্ন সম্বন্ধে একটা theory তে (সিদ্ধান্তে) আসা যায়।

প্রঃ শুনা যায় নাকি স্বামীজী আমেরিকা যাবার পূর্বে শ্রীশ্রীমা ও তিনি একই প্রকার স্বপ্ন দেখেছিলেন? বইয়ে পড়েছি।

উঃ না, তা ঠিক নয়; তবে স্বামীজী আমেরিকা যাবার পূর্বে 'মা' ঐ সম্বন্ধে একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন; তা এই—শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী গঙ্গায় নামলেন। ঠাকুর গঙ্গায় মিশে গেলেন; স্বামীজী সেই জল তুলে তুলে উপরে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন—(অর্থাৎ জীবের উদ্ধারের জন্যে তিনি ঠাকুরের ভাব ছড়াতে লাগলেন।)

(স্বামীজীর অলৌকিক শক্তি-সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।)

মহারাজ—হাঁ, ও রকম শক্তি তাঁর ছিল। একবার আমেরিকায় একটা দুষ্ট লোক তাঁকে পরীক্ষা করতে আসে। তিনি তার হাত দেখে তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বলে দিয়েছিলেন। লোকটা অবাক হয়ে গেল, আর তাঁর কাছে এলো না!

প্রঃ ওরকম শক্তি কি সব সময় তাঁর থাকতো?

উঃ না, সব সময় থাকতো না। (ইহার প্রমাণ-স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিলেন।) তাঁর প্রথম শক্তির বিকাশ আমরা দেখি কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির দিনে। তিনি অভেদানন্দ স্বামীকে তাঁর পা ছুঁয়ে থাকতে বললেন। তিনি যখন ধরে রইলেন তখন তাঁর হাতটা যেমন electric shock (তড়িৎ

প্রবাহ) লাগলে কাঁপতে থাকে সেই রকম কাঁপতে লাগলো। তিনি ওদেশে lecture দিয়ে এসে বলেছিলেন, "আমার সমস্ত শক্তিটা ওদেশে ছড়িয়ে দিয়ে এলুম। যখন lecture দিতুম, তখন দেখতুম যে, ভিতর থেকে একটা শক্তি বেরিয়ে গিয়ে লোককে অনুপ্রাণিত করছে।" স্বামীজীর অনেক সময় অনেক দর্শনাদি হতো। তিনি বলতেন, ওগুলো symbolical representations (যেমন শ্রীশ্রীমায়ের উক্ত স্বপ্ন-দর্শন)। তিনি দর্শনাদিতে—যেমন retina তে (চক্ষুগোলকে) inverse pictures (উল্টা ছবি) পড়ে—সেই রকম দেখতেন।

স্বামী সারদানন্দজীর সহিত কথোপকথন

শ্রী—

১৩ জুন, ১৩২৬

ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া শাস্ত্রাদি আলোচনা মনকে শাস্ত্রীয় তথ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। বহুকালের যত্ন-পোষিত সংস্কারাবলির মূলে আঘাত লাগায় মানসিক চাঞ্চল্য, শান্তি ও স্থৈর্যকে অতিক্রম করিল। অব্যবস্থিত মন লইয়া স্বামী সারদানন্দের সমীপস্থ হইলাম।

শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—তুমি দীক্ষা নিয়েছ কি?

উত্তর—আজ্ঞে, নিয়েছি। ...আমার গুরু।

স্বামীজী—তবে তোমার প্রশ্নগুলি তোমার গুরুকে জিজ্ঞেস করলেই সবচেয়ে ভাল হতো। আমায় জিজ্ঞেস করতে চাও, কর, আমি যা জানি বলছি।

প্রশ্ন—যখন দীক্ষা নিই, ইষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগেনি। আজকাল জাগছে।

উত্তর—সন্দেহ তো একটা রোগবিশেষ। ওটা তো মনের normal (সহজ) অবস্থা নয়। সন্দেহ জাগলে কি আর করা যায়! ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যা বলে গেছেন, ঠাকুর নিজে যা বলে গেছেন, সেসবে যদি তোমার বিশ্বাস না জেগে থাকে, তবে আমার কথায় কি হবে বল?

প্রশ্ন—ওঁদের কথা কত রকম ভাবে represented (বর্ণিত) হয়ে এসেছে, কে জানে! আমি আপনার কাছ থেকে আপনার নিজের কথা জানতে চাই।

উত্তর—এই যে ঠাকুরের যেসব কথা আছে সেসব কি আমরা বানিয়ে লিখেছি?

প্রশ্ন—তা না হলেও, তাঁর সন্তানগণের তাঁর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসার

ফলে হয়তো তাঁরা প্রতি ব্যাপারকেই magnify (বড়) করে দেখতেন ও দেখেন। তাঁরা হয়তো তাঁদের এই mental process (মানসিক ক্রিয়া) সম্বন্ধে conscious (অবগত) নন।

উত্তর—দেখ, আমরা তো প্রথম থেকেই কিছু ভক্ত হয়ে তাঁর কাছে যাইনি। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলাম। নাস্তিকতা, অবিশ্বাস আমাদের ভেতর পুরো মাত্রায়ই ছিল। ঠাকুরকে এক অবতার খাড়া করবার জন্যে আমরা তাঁর কাছে যাইনি। ধীরে ধীরে বাধ্য হয়ে সব মেনে নিতে হয়েছে। যখন দেখলাম, আমরা নিজেরা নিজেদের সম্বন্ধে যা জানতাম, উনি আমাদের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি জানতেন, আর তাঁর কথাই সব সময়ে ঠিক হতো, তখন কী আর করি! তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য হলাম।

প্রশ্ন—ঠাকুরের ideal existence (মানসিক সত্তা) ছাড়া real existence (বাস্তব সত্তা) কিছু আছে কি?

উত্তর—হ্যাঁ, আছে বই কি? অনেকে তাঁকে দেখছে, কথা কইছে।

প্রশ্ন—আপনি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি?

উত্তর—কিছু কিছু পেয়েছি বই কি? নইলে কি এমনি পড়ে আছি!

প্রশ্ন—যদি ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামীজী (বিবেকানন্দ স্বামী) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারতেন না কেন?

উত্তর—কথাবার্তা কইতেন বইকি! এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক এমনিভাবে কথা বলেছেন, আমরা জানি। তবে ইচ্ছামাত্র হতো না। যেমন, তুমি শাঁখারিটোলায় থাকো, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, ট্রামে চড়ে বা বাসে চড়ে এখানে এসে দেখা করে তবে কইতে হবে। স্বামীজী তো আর ঠাকুরের সমান plane-এ (ভূমি) ছিলেন না। কর্মের মধ্যে থাকলে মন একটু নিচে থাকে। তাই কথাবার্তা হতে হলে মনকে সংযত করে উপরের plane-এ (ভূমি) নিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন—আপনারা ইচ্ছমত দর্শন পান কি?

উত্তর—ঐ যে বললাম, ঠাকুরের সমান plane-এ (ভূমি) তো বাস করি না যে সব সময় কথাবার্তা কইতে পাবো। তুমি প্রথম থেকে ভুল ধারণা করে রেখেছো। তাইতে এতো গোল হচ্ছে। তুমি ঠাওরেছো, তাঁর সন্তানগণ সব দিনরাত তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন, আলাপ করছেন, তা তো নয়।

প্রশ্ন—যদি আপনাদের তাঁর সঙ্গে communion (কথাবার্তা) থাকে তবে আপনাদের মধ্যে মতের বৈষম্য হয় কেন? যেমন স্বামীজীর মিশন সংগঠনের সময়ে।

উত্তর—মিশন গঠনের সময়ে কেউ তো ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু করেনি। সবই অনুমানের উপর তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কাজেই বৈষম্য ঘটেছিল। তাঁর সন্তানগণ সবাই যে তাঁর সঙ্গে দেখাশোনা কথাবার্তা কইতে পাচ্ছে, তাই তোমায় কে বললে? বিরূপ অবস্থাতে পড়ে অনেকেই হয়তো তাঁর দেখা পাচ্ছেন না। তবে কেউ কেউ পাচ্ছেন।

প্রশ্ন—কোন active real (সক্রিয় বাস্তব) ভগবানের অস্তিত্ব আছে কি?

উত্তর—আছে বইকি।

প্রশ্ন—তাঁর সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ সম্পর্ক হয় কি?

উত্তর—তাই যদি না হবে তবে এখানে পড়ে আছি কি করতে?

প্রশ্ন—এই সম্পর্কে যেসব কথা বইয়েতে, জীবনীতে পাই, সেসব নিরন্তর ভাবনার ফলে সংস্কারাবদ্ধ অনুমানও হতে পারে।

উত্তর—তা হতে পারে। তবে ঐ অনুমানের পেছনে একটি বাস্তব সত্তাও তো আছে। যেমন ধর, তুমি একজন স্ত্রীলোককে ভালবাস। প্রথমে তুমি তার সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করলে। ধর, তার সঙ্গে পরে তোমার বিয়ে হলো। হলে পর দেখলে, তার সম্বন্ধে ধারণা অনেক বদলে যাচ্ছে—তুমি ক্রমেই disillusioned (নির্মোহ) হচ্ছ। তাকে যত গুণবতী মনে করতে, আর তত কর না। এ ক্ষেত্রে কি হলো? object (বস্তু) ঠিকই আছে। কেবল তোমার মনের অবস্থা তাকে ভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ দেখল। ভগবান সম্বন্ধে

exaggerated (অতিরঞ্জিত) ধারণা হতে পারে। তবে পেছনে যা হোক একটা কিছু আছে। স্বামীজী একটা উপমা দিতেন। ধর, এখান থেকে সূর্যের একটি ফটো নিলে, আর পনের হাজার ফিট উচ্চে উঠে আরো একখানি নিলে। দুখানিতে তফাত হয়ে গেল। একখানি বড়, একখানি ছোট। ফটো কিন্তু দুখানিই ঐ একই সূর্যের, অবস্থাভেদে তফাত হয়ে গেল। তেমনি এক এক plane (ভূমি) থেকে ভগবানকে এক এক জন এক এক রূপ দেখে।

প্রশ্ন—বিশেষ শক্তির বিকাশ ছাড়া 'অবতারবাদের' আর কোন অর্থ আছে কি? অর্থাৎ সত্যই কেহ অবতীর্ণ হন কি?

উত্তর—অবতীর্ণ হন বইকি! ঠাকুরকে বলতে শুনেছি—যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ। অর্থাৎ একই power (শক্তি) প্রয়োজনমত বিকাশ প্রাপ্ত হন। আবার বলেছেন, দুশো বছর পরে আবার অবতীর্ণ হবেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে; বলতে শুনেছি। কি জান, সমস্ত জীব-জগৎই তাঁরই বিকাশ বই তো নয়! তবে প্রয়োজনমত কোন কোন সময়ে কোন কোন স্থলে বিশেষ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ পার্শ্বে আসনোপরি উপবিষ্ট শিষ্যত্বের মর্যাদা-প্রার্থীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য আচার্যত্বের নিরহঙ্কার দাবি লইয়া মহামুনি বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, সন্দেহ যখন জাগে তখন কি আর করা যায়! এখন হয়তো আমার কথা তোমার বেশ লাগবে, বাড়ি গেলেই আবার সন্দেহ হবে। ঠাকুর বলতেন, কারো কারো জন্মাবধিই বিশ্বাস হয়, আর কারো কারো জন্মাবধিই সব তাতে সন্দেহ জেগে থাকে—তার সঙ্গে আর কোন মতেই পারা যায় না। অবশ্য তুমি সেরূপ নও, বুঝতে পারছি। তোমার উপর তাঁর কৃপা রয়েছে। তবে এও একটি অবস্থা মাঝে মাঝে আসে। কদিন পর দেখবে, সন্দেহ যেভাবে এসেছে, সেই ভাবেই আবার চলে যাবে। ধরে রাখতে ইচ্ছে করলেও কিছুতেই পারবে না। চলে যাবেই। তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। সন্দেহ হয় বেশতো, 'হে ভগবান, তুমি যদি থাক, তবে আমার এই কর'—এইভাবে প্রার্থনা করে যাও। তাতেও উপকার হবে। দেখ, উপাসনাতে objective (বাস্তব) কিছু লাভ

যদি নাও হয়, subjective (মানসিক) একটা লাভ আছে। সেটা এই—তাতে করে মন স্থূল বিষয় ছেড়ে higher plane-এ (উচ্চভূমি) উঠতে চেষ্টা করে। এই হিসাব থেকেও মনের একটি gain (লাভ) আছে।"

কিছুকাল পূর্বে একদিন যখন গভীর রাত্রে কিছুক্ষণ ধ্যানান্তে শয্যা গ্রহণ করিয়াছি, দেখিলাম, ঠাকুরের দীপ্তিমান মূর্তি আমার প্রতি অগ্রসর হইয়া আমার শিরোপরি হস্ত স্থাপন করিতেছেন। ভয়ে চমকিয়া উঠাতে সেই মূর্তি তিরোহিত হন। সেই সম্পর্কে কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"আপনাকে একখানি চিঠি দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উহা hallucination (ভ্রান্তি) কি-না। আপনি উত্তরে লিখেছিলেন, 'hallucination (ভ্রান্তি) হলেও ভাল।' —কেন?"

উত্তর—ভাল এই জন্যে যে, দেবদেবীর স্থান যদি অন্যান্য সবের উপরে হয়, তবে অন্যান্য সবের স্বপ্ন অথবা দর্শন নিশ্চয়ই দেবদেবীর দর্শন—সেটা hallucination (ভ্রান্তি) হলেও—তাহা অপেক্ষা নিম্নতর। তোমার চিঠিখানি মনে পড়ছে বটে।

অপর একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—একে একে অবতার পুরুষগণ দ্রুত আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমি তাঁহাদের পাদস্পর্শের চেষ্টা করিলাম। প্রথম কয়েকজনের চরণ স্পর্শ সম্ভব হইল না। শংকরের চরণ স্পর্শ করিলাম। অধিকতর সহজে শ্রীচৈতন্যের চরণ স্পর্শ করিলাম। আর সর্বশেষ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শের চেষ্টা করায় তিনি উপবিষ্ট হইয়া প্রণত আমার মস্তকোপরি দুই পদ স্থাপন করিলেন। এই স্বপ্ন-ব্যাপার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই সম্বন্ধে আপনাকে পত্রে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে আপনি লিখেছিলেন, ঠাকুর বলিতেন, 'দেবস্বপ্ন সত্য।' হাজার স্বপ্নের ভিতর দেবস্বপ্ন সত্য হবে কেন?"

উত্তর—দেখ, স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আছে। কতকগুলি স্বপ্ন দেখবে ঠিক ফলে যায়, আর কতকগুলি বাজে। বাজে স্বপ্নগুলি দেখে লোকে ঠাওরায় সব স্বপ্নই বাজে। কিন্তু যেগুলি ফলে যায়, তার সম্বন্ধে কি বলবে? স্বামীজী

বলতেন, এরূপ স্বপ্ন মনের উচ্চতর অবস্থার vision (দর্শন) ছাড়া কিছুই নয়।

জনৈক ভদ্রলোক এই সময়ে একটি সংবাদ লইয়া আসায় আলোচনায় ব্যাঘাত হয়। তিনি চলিয়া গেলে পর জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সংসার ত্যাগ করাতে মা বাপের যদি physical (শারীরিক) কোন অনিষ্ট হয়, তাতে কোন ক্ষতি হবে কি?"

উত্তর—তাঁদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তো অন্তত বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রশ্ন—তা তাদের আছে। তবে দেখবার লোকেরই যা একটু দরকার।

উত্তর—তা দেখ না। দেখ, বেরিয়ে আসলেই যে হবে, তার তো কোন মানে নেই। বরং সংসারে resistance (বাধা) থাকাতে তাঁর দিকে একটা টান থাকে। বেরিয়ে আসলে resistance (বাধা) না থাকাতে সে টানটুকুও চলে যায়। কার যে কিসে হয় বলা তো যায় না। আর দেখ, plan (মতলব) করে বেরুনো হয় না। যখন ব্যাকুলতা জাগে, তখন কোন consideration (ভাবনা) মনে জাগে না। ওসব নিজে নিজে ঠিক করতে হয়। কারুকে জিজ্ঞেস করে কি হয়? যেমন করছো, করে যাও, যদ্দিন তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব না কর। সত্যিকার টান হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুর জন্যে ভাবতে হবে না। আর অনেকের বেরিয়ে আসার সঙ্গে selfish motive (স্বার্থপরতা), ফাঁকি দেবার ভাব ইত্যাদি থাকে। তাতে তাদের অনিষ্টই হয়। আমরা কি আর plan (মতলব) করে বেরিয়েছি? আমাদের ধারণা ছিল, সংসারে বড় হব, টাকা রোজগার করব; আর সাধ্যমত লোকের উপকার করা—এ ভাবও একটু আধটু ছিল। কিন্তু সব উল্টে পাল্টে গেল। এ কি আমরা plan (মতলব) করে করেছি? কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। টান এলে আর কিছুই ধরে রাখতে পারে না। ঐ যে চিঠিতে লিখেছো, "ধর্মকর্ম আগে কত সহজ মনে করতাম, এখন আর তা করি না।" ঐ ঠিক কথা, ঐ ঠিক বুঝতে পেরেছো। তিনটে পথ আছে—বিশ্বাস করে চলা, অবিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া, আর open mind (খোলা মন) নিয়ে সত্যানুসন্ধান করা। এই শেষটাই হলো scientific spirit

(বৈজ্ঞানিক বৃত্তি)—এইভাবেই সাধন-ভজন করে যাও। আর জেনো, atheist (নাস্তিক) হওয়া সহজ নয়। ঠিক ঠিক atheist (নাস্তিক) হতে মনের খুব জোর দরকার।

মহারাজের শরীর ভাল নয়। কাজেই তাঁহাকে অধিকক্ষণ কষ্ট দেওয়া অনুচিত এ কথা বারবার মনে জাগিতেছিল। তাই এইবারে প্রণাম করিয়া বলিলাম—

"আশীর্বাদ করুন, আমার এসব সন্দেহের ভাব যেন কেটে যায়।"

"হ্যাঁ বাবা, সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি তোমার ওসব ভাব কেটে গিয়ে মন নির্মল হয়ে যাক। আসবে? তবে এস। কোন ভাবনা করো না। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"মহারাজ, বহুদিন থেকে ঠাকুরকে জীবনের আদর্শ ধরে আসছি, আজ এইসব সন্দেহ জাগাতে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

"তা তো হবেই। তা কেটে যাবে, ঠিক কেটে যাবে। একমনে ডাক। সর্বদা নিজের সম্বন্ধে বিচার করবে। যে যত জপতপ প্রার্থনা করবে সে ততই পাবে, না করলে কে পায়? সর্বদা বিচার করবে তাহলে কি রকম progress (উন্নতি) হচ্ছে না হচ্ছে নিজেই বুঝতে পারবে। তোমার গুরু তোমায় একটা কিছু দিয়েছেন তো—সেটা ধরে চলে যাও। করলেই তার ফল বুঝতে পারবে। এস, তবে এস। তোমার কল্যাণ হোক।"

স্বামী সারদানন্দের বৈশিষ্ট্য

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে (২) শ্রেষ্ঠ মানবের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন—

জন্তূনাং.নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্ বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥

জীবগণের মধ্যে নরজন্ম দুর্লভ, মানব মধ্যে পুরুষ; পুরুষ মধ্যে বিপ্র, বিপ্র মধ্যে বেদ-বিহিত ধর্মনিষ্ঠ, তাহার মধ্যে বেদের মর্মবেত্তা দুর্লভ। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত আছেন। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতম, যিনি একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলে; পরন্তু শত কোটি জন্মার্জিত পুণ্য বিনা তাদৃশী মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

নিজ বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত পরানুকরণপর, বিদেশীর উপেক্ষাস্থল, দুর্ভিক্ষ মহামারীর ক্রীড়াভূমি, ম্যালেরিয়া বিসূচিকার প্রধান কেন্দ্র ভারতে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, কপিল, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি, জৈমিনী, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, রামদাস, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষ-প্রসবিনী ভারতে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অজাতশত্রু, পুরু, পৃথ্বিরাজ, রানাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, শিবাজী প্রভৃতি বীর প্রসবিনী ভারতে—মৈত্রী, গার্গী. দেবহূতি, অদিতি, সীতা, সাবিত্রী, লীলাবতী, মীরাবাই, অহল্যাবাই, লক্ষ্মীবাই. রানী ভবানী প্রসবিনী—এই দুঃখিনী ভারতমাতার ক্রোড়ে দ্বিসপ্ততি বর্ষ পূর্বে, পৌষ শুক্লাষষ্ঠীতে এমন এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁর জীবনে ভগবান শঙ্করাচার্যের ঐ শ্লোকটির সম্যক সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃ-মাতৃদত্ত

নাম ছিল শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি সন ১২৭২ সালে (ইং ১৮৬৫) হুগলি জেলার অন্তর্গত মামরুল গ্রামে গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা কার্যোপলক্ষে কলকাতায় আসিয়া বাড়ি করিয়াছিলেন। ইনি বাল্যে যখন এলবার্ট স্কুলে পড়িতেন সেই সময় হইতে খুব মিশুক, বিনয়ী, সরল, পরমতসহিষ্ণু ও হৃদিবান ছিলেন। স্কুলে শিবানন্দজীর মুখে শুনিয়াছি, "আমাদের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে স্বামীজীর পরেই শরৎ। নিরঞ্জন খুব হুড়ুম দুড়ুম করত কিছু কায়দাও জানত বটে কিন্তু শরতের সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠত না।" তিনি কিরূপ মেধাবী ছিলেন তাহার পরিচয় যাঁরা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন কিংবা তাঁহার লেখা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ভারতে শক্তিপূজা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন ঐ সকল পুস্তকের রচয়িতা কিরূপ পণ্ডিত ছিলেন।

অন্তঃসারশূন্য আপাত মনোরম পাশ্চাত্য শিক্ষাযুগে, যে যুগে প্রকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ, প্রমাণ মধ্যেই গণ্য নহে, যেই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই নব প্রবর্তিত ভাবধারার উপর স্বামী সারদানন্দের কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাহার আভাষ তাঁহার লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলে সহজেই বুঝা যাইবে। "দেখিতেছ না ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর হইতে ঐ কার্য কত দ্রুত পদ সঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে? দেখিতেছ না কিরূপে গুরুগতপ্রাণ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে ঠাকুরের ভাব প্রবেশ লাভ করিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই চিন্তাজগতে কি যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যতই চলিয়া যাইবে ততই এই অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল কর্মের ভিতর, সকল সমাজের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিবে। কাহার সাধ্য ইহার গতিরোধ করে? অদৃষ্টপূর্ব তপস্যা ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক তেজদীপ্ত এ ভাবরাশির সীমা কে উল্লঙ্ঘন করিবে? যে সকল যন্ত্রসহায়ে উহা বর্তমানে প্রসারিত হইতেছে কালে হয়তো সে সকল ভগ্ন হইবে, কোথা হইতে উহা প্রথম উত্থিত হইল তাহাও হয়তো বহুকাল পরে

অনেকে ধরিতে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এ অনন্ত মহিমোজ্জ্বল ভাবময় ঠাকুরের স্নিগ্ধোদ্দীপ্ত ভাবরাশি হৃদয়ে যত্নে পোষণ করিয়া তাহারই ছাঁচে জীবন গঠিত করিয়া পৃথিবীর সকলকেই একদিন ধন্য হইতে হইবে নিশ্চয়ই।"

আজীবন মাতৃভাবের সাধক স্বামী সারদানন্দ ব্রহ্মোপলব্ধি প্রথম মাতৃভাবেই করিয়াছিলেন; তারপর "মা-ই দেখিয়ে দিয়েছিলেন তুমি আমাতেই অবস্থিত।" তাঁর নিজের ডায়েরিতে (ইং ১৯২৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি) তিনি লিখিয়া গিয়াছেন "You are in me." মাতৃজাতির উপর স্বামী সারদানন্দের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাহা তাঁহার লেখা ভারতের শক্তিপূজার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। "অস্বাভাবিক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্বর! তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই না হইয়াছে? একবার বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্জন নয়ন হইতে অপসৃত করিয়া ভূ-জগতে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের আদর্শস্থানীয়া দিব্য নারীকুল একমাত্র ভারতেই হিমাচল স্তরের ন্যায় অনুলঙ্ঘনীয়া শ্রেণিতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মানা। তাঁহাদের পদরজে কেবল ভারত নহে কিন্তু সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমগ্র পৃথিবীই সর্বকালের জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন। ভারতের ধূলি সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধৈকপ্রাণা যশোধারা, চৈতন্য-ঘরনি বিষ্ণুপ্রিয়া, ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাই বা চিতোরের বীররমণীকুলের দেবারাধ্য-পাদস্পর্শে পবিত্রিতা। ভাব দেখি, ভারতের বায়ু যাহা প্রতি নিঃশ্বাসে তোমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা ঐ সকল দেবীদিগের পবিত্র হৃদয়ে যুগে যুগে প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়া করিয়া তাহাদের পবিত্রতায় ওতঃপ্রোতভাবে পূর্ণ রহিয়াছে—দেখিবে—তোমার জগন্মাতা নারীকুলের উপর বিশেষত ভারতের নারীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্তি প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমার কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমায় পরিণত করিবে।"

জানি না পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারত ভারতীর নিকট আচার্য স্বামী সারদানন্দের এই ভাব ও ভাষা কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে; তবে দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি স্বামী সারদানন্দ নিজ জীবনে মাতৃজাতিকে মাতৃজ্ঞানে

শ্রদ্ধা, ভগিনীজ্ঞানে ভালবাসা, কন্যা জ্ঞানে স্নেহ ও করুণা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অদর্শনের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্ত্রীভক্তদের যাবতীয় অভাব অভিযোগ পূরণ করিবার জন্য সারদার বরপুত্র স্বামী সারদানন্দ সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। মেয়ে ভক্তদের নানাবিধ সাংসারিক কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিয়াও তিনি কোন দিনই অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হন নাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দেহত্যাগের পর সমস্ত বৈকাল প্রায় তাঁহার ঐ এক কাজে কাটিয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানায় আমাদের অনেক দিন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সমস্ত বৈকাল এমনি কাটিয়াছে। উপরে গিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, "এখনকি নিচে যাবেন?" তাতে তিনি গম্ভীর হইয়া বলিতেন, "এখন এঁদের সঙ্গে কথা বলছি!" মাতৃপূজক স্বামী সারদানন্দজী মার দেহত্যাগের পর বলিয়াছিলেন, "পার্থ সারথি শ্রীকৃষ্ণ চলে যাবার পর অর্জুন যেমন গাণ্ডীব তুলতে পারেননি, আমারও অবস্থা আজ তাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননীর দেহত্যাগের পর হইতে অক্লান্ত কর্মী স্বামী সারদানন্দের কর্মে বিরাগ ও ধ্যান জপে ডুবিয়া যাওয়ার ভাব আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সকাল হইতে ধ্যান জপ করিতে বসিতেন বেলা ১১টা/১১½টা পর্যন্ত। গোলাপ-মা যোগীন-মার দেহত্যাগের পর তিনি বলিয়াছিলেন, "মা এঁদের ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।" তিনি যেমন মুখে বলিতেন, "আমি মার বাড়ির দারোয়ান" কাজেও ঠিক তাই করিতেন। ভক্তদের দেওয়া প্রণামির টাকা প্রায় সমস্তই তিনি মার সেবার জন্য মার মন্দির জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীমার পালিতা কন্যা রাধুর পাছে কষ্ট হয় সেজন্য তাহার জন্য যৎসামান্য টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামী যোগানন্দ মার সেবা করিতেন। ১৯০০ সনে তাঁহার দেহত্যাগের পর হইতে স্বামী সারদানন্দ মার সেবাধিকার পাইয়াছিলেন এবং এমন যোগ্যতার সহিত উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে মা একসময় বলিয়াছিলেন, "শরৎ না হলে কে আমার দায় পোয়াবে।" মা তাই বলিতেন, "শরতের যত বড় ছাতি তত বড় হৃদয়।" আমরা দেখি মার সংক্রান্ত জয়রামবাটী বা তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত যেন তাঁর আরাধ্য দেবতা। ধন্য মাতৃভক্ত সাধক! আর আমরাও ধন্য, কারণ সেই দেব দুর্লভ চরিত্র চক্ষে

দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহার মধুময় বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছি। এইরূপ মাতৃভক্ত সাধকের মুখেই শোভা পায়—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥

হে ভারত! সর্বত্র আমরা নিত্যই ঐ স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু হায় আমরা কয়জন কতক্ষণ দেবী বুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীর অবলোকন করিয়া ঐরূপ যথাযথ সম্মান দিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে উদ্যম করিয়া থাকি? শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ প্রকাশের আধার-স্বরূপিণী স্ত্রীমূর্তিকে হীন বুদ্ধিতে কলুষিত নয়নে দেখিয়া কে না দিনের ভিতর শতবার সহস্রবার তাঁহার অবমাননা করিয়া থাকে? হায় ভারত ঐরূপ পশুবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা করা এবং শিবজ্ঞানে জীব সেবা করিতে ভুলিয়াই তোমার বর্তমান দুর্দশা! কবে জগদম্বা আবার কৃপা করিয়া তোমার এ পশুবুদ্ধি দূর করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

স্বামী সারদানন্দ অপরের দুঃখ কিরূপ অনুভব করিতেন, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেখাইলে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ অনুভব করিতে পারিবেন। একসময় একটি যক্ষ্মা রোগী মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁহার বাড়ি হইতে তাঁহার দুঃখ জানাইয়া একখানি চিঠি দিয়াছিলেন। সেই চিঠিখানি পাইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পরদিন দুপুরবেলা যে সময় উদ্বোধনের সকলে বিশ্রাম করিতেছেন সেই সময় একা নিঃশব্দে উদ্বোধন হইতে বাহির হইয়া, কোথায় যাইতেছেন তাই দেখিয়া তাঁহার সেবক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিলেন, তিনি যেখানে সেই যক্ষ্মা রোগী সেখানে গিয়া হাজির। ঐ রোগী তো এতদূর আশা করে নাই; হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার দর্শন পাইয়া রোগীব শত বৃশ্চিক দংশনবৎ রোগ যাতনা ক্ষণেকের তরে তিরোহিত হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রোগী হৃদয়ের আবেগাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া শরৎ মহারাজ বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবেন এমন সময় ভক্তের বিশেষ ইচ্ছা মহারাজকে কিছু খাওয়ায়। অন্য কিছুই ছিল না, শেষে নিজের

জন্য যে কমলালেবু ছিল তাহাই ছাড়াইয়া দিলেন এবং শরৎ মহারাজও নিঃসঙ্কোচে উহা ভক্ষণ করিয়া আসিলেন। না খাইলে পাছে রোগীর প্রাণে আঘাত লাগে তাই বিনা বিচারে যক্ষ্মা রোগীর ছাড়ান কমলা খাইয়া আসিলেন। উদ্বোধনের অন্যান্য সাধুগণ জানিলে পাছে যক্ষ্মা রোগীর নিকট যাইতে নিষেধ করেন, তাই তিনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দুপুরবেলা নিঃশব্দে রওনা হইয়াছিলেন।

আর একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিব। ১৯২৪ সালে গরমের দিন মঠের একজন সাধুর হাঁপানি হয়েছে। অনেক দিন ধরে নানা রকম চিকিৎসা চলেছে অথচ কিছু উপকার হচ্ছে না, খুব কষ্ট পাচ্ছেন। রোগী জ্ঞান মহারাজের ঘরের একটি খাটে শুয়ে আছেন। শরৎ মহারাজ উদ্বোধন থেকে বেলুড় মঠে গিয়েছেন। চন্দন গাছের নিকট যেখানে এখন বাঁশের বেড়া রয়েছে ঐ বেড়াটি পার হয়ে শরৎ মহারাজ ঠাকুর মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় পূর্বোক্ত হাঁপানি রোগীটি জ্ঞান মহারাজের ঘর থেকে বাহির হয়ে শরৎ মহারাজের পায়ে ধরে প্রণাম করলেন ও রোগ যন্ত্রণার কথা বলতে না পেরে কাঁদতে লাগলেন। রোগীর এই অবস্থা দেখে শরৎ মহারাজের প্রাণে খুব লাগল; তিনি রোগীর নাম ধরে বললেন, "কোন চিন্তা নাই শীঘ্রই সেরে যাবে" এই বলে মাথায় বার কয়েক হাত বুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য তার পরেই রোগ যন্ত্রণা কম হয়ে গেল ও শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেলেন। তিনি কাশীধামে থাকাকালে কোন বিশেষ সাধুর কথার মীমাংসায় বলেছিলেন—ঠাকুর যদি অনন্ত শক্তিমান হন, তবে কি তাঁর সন্তানদের একটু শক্তিও থাকবে না?

তাঁর সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। শাস্ত্রে দেখি, "উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ্ বিভাগে, প্রচলতি যদি মেরু, শীততাং যাতি বহ্নিঃ। বিকসতি যদি পদ্মং পর্বতাগ্রে শিলায়াং, ন ভবতি পুনরুক্তং ভাষিতং সজ্জনানাম্॥" এই বাক্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বামী সারদানন্দের জীবনের একটি ঘটনায় দেখি। "মঠের একজন সাধু একদিন সকালে উদ্বোধন হতে বেলুড়ে আসবেন শুনে শরৎ মহারাজ তাঁর নিকট বলে দিলেন, "বাবুরামদাকে

বলে দিও যে আমি আজ বৈকালে মঠে যাব।" তিনিও বেলুড় মঠে এসে বাবুরাম মহারাজকে বললেন। তখনকার দিনে এখনকার মতো নানাবিধ যানবাহন ছিল না। একমাত্র উপায় গঙ্গার জোয়ারের সঙ্গে গয়নার নৌকা; অথবা পায়ে হেঁটে বাগবাজার হইতে আহিরীটোলা সালকে খেয়া পার হয়ে, সালকে হতে হেঁটে বেলুড়ে যাওয়া। বলে তো পাঠালেন, কিন্তু বৈকালে ভীষণ কালবৈশাখীর মেঘ, জল, ঝড় হওয়ায় যথাসময়ে তাঁর বেলুড় মঠে আর যাওয়া সম্ভব হলো না; বৃষ্টি যখন থামল, প্রকৃতি যখন শান্ত হলো তখন মঠে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু গঙ্গার জোয়ার, সে কাহারও অপেক্ষা করে না। কাজেই এখন আর দ্বিতীয় পন্থা আহিরীটোলা সালকের খেয়া পার ব্যতীত অন্য উপায় নেই। সত্যরক্ষার জন্য এই সামান্য ক্লেশ তিনি অবাধে বরণ করে নিলেন। বেলুড় মঠে গিয়ে যখন পৌছিলেন, তখন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ নৈশাহারের পর বসে আছেন; তিনি শরৎ মহারাজকে ঐ সময় ঐভাবে যেতে দেখে একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ এমন সময় যে, বিশেষ কোন কাজ আছে নাকি?" শরৎ মহারাজ বললেন, "বিশেষ কোন কাজ নাই, তবে, সকালে বলে পাঠিয়েছিলাম, তাই এলাম।" এই কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, "যেমনি গুরু তেমনি চেলা। ঠাকুরেরও যদি একবার কোন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত তো তাই করা চাই। যদি বলে ফেলতেন যে শৌচে যাব তাহলে শৌচের বেগ না হলেও ঝাউতলায় গাড়ু নিয়ে শৌচে যেতেন। এমনি সত্যের আঁট ছিল।" এক্ষেত্রে শরৎ মহারাজও ঐ দিনে অত কষ্ট করে ঐ রাত্রে না গিয়ে পরদিন গঙ্গার জোয়ারের সময় গয়নার নৌকায় স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সকালে বলে পাঠিয়েছিলেন বলে অত কষ্ট করে ঐ দিনেই মঠে গেলেন।

(উদ্বোধন ঃ ৩৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা)

সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৬ সনে বড়দিনের পরদিন মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের খ্রিস্টান-সাধনা সম্বন্ধে শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) সহিত আলোচনা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সেন্ট জন 'word' তত্ত্বটি কোথা থেকে পেলেন?"

উত্তর—"Word হচ্ছে হিন্দুশাস্ত্রের পরা-শব্দ বা শব্দব্রহ্ম। এটি নিও-প্লেটনিকরা আলেকজেন্দ্রিয়াতে হিন্দুদের কাছ থেকে বোধ হয় প্রাপ্ত হয়। সেন্ট জন ঐ Neo-Platonic School-এর ছাত্র ছিলেন। Word হচ্ছে প্লেটনিকদের 'Logos' পরা-শব্দ, আদি স্পন্দকারিকা মহামায়া। খ্রিস্টান mysticদের কেউ একে মাদারহুড অব গড বলে স্বীকার করেন। ঠাকুর বলতেন, পিতা স্বীকার করলে মাতাও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু নব্য-প্লেটনিক প্লটিনাস God the father মানে নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারপর 'Nous' অথবা Logos হচ্ছেন সগুণ ঈশ্বর এবং Universal Spirit হচ্ছেন আমাদের হিরণ্যগর্ভ, খ্রিস্টানদের Holy Ghost. সেন্ট অগাস্টাইন ঐ কথাই স্বীকার করে গেছেন—Nous হচ্ছে Eternal Wisdom of God of Eternal Christ, কিন্তু পরবর্তী কালের খ্রিস্টান মিসটিকরা 'গড দি ফাদার'কে Absolute-ই বলেন, কিন্তু লোগস্ হচ্ছে God the Son, Eternal Christ, first begotten; অর্থাৎ আমাদের হিরণ্যগর্ভ। আমরা বলি 'সেতু' ওরা বলে 'bridge' between the Absolute and the creature, আর Holy Ghost হচ্ছে প্রেম বা ভক্তি বা আকর্ষণ। Historical Christ হচ্ছেন eternal wisdom 'in flesh,' অর্থাৎ আমরা যাঁকে অবতার বলি। তবে আমরা ঐতিহাসিক খ্রিস্ট মাত্র একজন বলে স্বীকার করি না, পরন্তু যুগে যুগে প্রয়োজন, ভাব ও অধিকারিভেদে অনেক স্বীকার করি। খ্রিস্টের দীক্ষার সময় এই Holy Spirit তাঁতে অবতীর্ণ হলেন—এই হলো জীবের new birth, নবজন্ম বা দ্বিজত্ব। জীব ঈশ্বরকে ছুঁতে পারে

না, ঈশ্বরই কৃপাপরবশ হয়ে জীবে ঐ Holy Spirit বা পরানুরক্তিরূপে আবির্ভূত হন। প্লটিনাস ও সেন্ট অগাস্টাইন ক্রাইস্ট বা Nous-এর মধ্য দিয়ে Absolute উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী খ্রিস্টান ফাদাররা একমাত্র খ্রিস্টোপাসনাই প্রধান করে ফেললেন। তার হেতু সাধারণের কাছে personal God বেশ ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসে।"

১৯১৬ সালের বড়দিনের পর দিন পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ সেন্ট জনের 'word' (শব্দ) -তত্ত্বটি ব্যাখ্যাকালে বলেছিলেন—"আমাদের ঠাকুর বলতেন, 'সচ্চিদানন্দ এবার দুভাবে প্রকট হয়েছেন, যেমন জলে একটা লাঠি ফেললে হয়—মা ও ছেলে।' সেই Brahman Absolute—সচ্চিদানন্দকেই তিনি 'মা' বলে উপাসনা করেছেন এবং ছেলে হলেন সনাতন পুরুষ ঈশ্বর—Nous, তিনিই নর-কলেবরে (in flesh) রামকৃষ্ণ অবতার (Incarnation); আর আমাদের 'মা' (সারদা দেবী) হলেন সেই সনাতন পুরুষের দিব্যা শক্তি। ঈশ্বর এবার বিশুদ্ধ বিদ্যাশক্তি-মাত্র আশ্রয় করে এসেছেন বলে তিনি এবার জগদ্‌গুরু। স্বামীজী প্রভৃতি তাঁর বিভিন্ন ভাবের ঋষি।"

দ্বিজেন (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) জিজ্ঞাসা করলে, "যিশু পূর্বজন্ম স্বীকার করেননি কেন? যখন একটি জন্মান্ধ লোকসম্বন্ধে শিষ্যেরা প্রশ্ন করলে, 'হে প্রভু, কে পাপ করেছিল? এ নিজে, না এর বাপ মা, যার জন্য এর জন্মান্ধত্ব?' (St. John, 9.2) কিন্তু যিশু উত্তর দিলেন, 'এ বা এর বাপ-মা কেউ এর জন্য দায়ী নয়—ঈশ্বরের ইচ্ছাই এতে প্রকটিত হয়েছে।' (St. John, 9.3) অথচ আবার জন দি ব্যাপটিস্টকে তিনি পূর্বজন্মে ইশায়াস্ (Esaias) ছিলেন বলেছেন।" (St. Luke 7, 27-28; John, 1.23)

বললেন, "অবতারদের একটা লক্ষণ হচ্ছে, তাঁরা পারতপক্ষে কারও ভাব নষ্ট করেন না। ইহুদীরা সাধারণত সেশ্বর দেহাত্মবাদী। দেহের অতিরিক্ত আত্মা তারা কল্পনাই করতে পারত না। স্বর্গে যাবে দেহটা, শেষ অভ্যুত্থান (final resurrection) হবে দেহের, এখন সব কবরে ঘুমুবে। মেশায়া (Messiah) এসে এই পৃথিবীকেই স্বর্গরাজ্য করবেন। দেহের উৎপত্তি দেখা যাচ্ছে, কাজে

কাজেই প্রথম জন্ম, কিন্তু প্রলয়ের পর ওল্ড টেস্টামেন্টে আবার অভ্যুত্থান রয়েছে, সেইজন্য পুনর্জন্ম মানে। কিন্তু ক্রাইস্ট নিজে এসব জানতেন ও মানতেন এবং গোপনে শিষ্যদের উপদেশও করতেন, কিন্তু সাধারণের কাছে দ্ব্যর্থক গল্পের ভেতর দিয়ে বলতেন, তোমাদের কাছে ঐশ্বর রাজ্যের রহস্য ভেঙে বলা হচ্ছে, যাতে তোমরা বুঝতে পার, কিন্তু বাইরের লোকদের গল্পের হেঁয়ালি করে বলা হয়। 'তারা শোনে, কিন্তু সব বুঝতে পারে না।' (St. Mark, 4.11-12) যখন অন্তরঙ্গেরা একলা থাকতেন, তখন তাঁদের রহস্য ভেঙে বলতেন—(St. Mark, 4. 34) নিওপ্লেটনিক য়ু, নোসটিক খ্রিস্টান, কাব্বালা য়ু, ইরানি খ্রিস্টান প্রভৃতি তখনকার ঐ দেশের অনেক সম্প্রদায়ই পূর্ব ও পুনর্জন্ম মানত। কিন্তু পরবর্তী খ্রিস্টান ফাদাররা রোমান সম্রাটদের সাহায্যে এ মতবাদ দাবিয়ে দিলেন।

"আমাদের ঠাকুরেরও এইরূপ অন্তরঙ্গ (esoteric), বহিরঙ্গ (exoteric) উপদেশ ছিল। বলতেন, 'ভক্তদের মধ্যে দেখি কেউ কেউ ভিতরের থাম, কেউ কেউ বা বাইরের থাম।'"

একবার আমি ও বলাই (স্বামী গোবিন্দানন্দ) 'উদ্বোধনে' কিছু দিনের জন্য থাকি। আমি ঠাকুর পুজো করি, বলাই হাটবাজার, রান্নাবান্না দেখে। আমাদের 'উদ্বোধনের' প্রুফও দেখতে হয়, সম্পাদক তখন দ্বিজেন (স্বামী গঙ্গেশানন্দ)। তখন মা-ঠাকরুন 'উদ্বোধনে'। আমি একাদশী করি, গোলাপ-মার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, সেই জন্য শ্রীশ্রীমা নিজেই নানান রকম ফল-টল আমার জন্য রেখে দেন; বলাই দেখাদেখি একাদশী আরম্ভ করলে, কিন্তু সেই দিনই গোলাপ-মা সেরে উঠে কাজ আরম্ভ করলেন, কাজেকাজেই দ্বিপ্রহরের ব্যবস্থা খুব সামান্য রকমেরই হলো; সন্ধ্যায় বলাইয়ের খুব খিদে, গোপীনাথ ঠাকুরকে খুব শাসাতে লাগলো, "তুমি রোজই বড় দেরি কর, আমি কিছু বলি না বলে।" শরৎ মহারাজ দূর থেকে শুনে বললেন, "কিরে, বলাই কি বলে?" আমি হাসতে হাসতে সব বললুম। শুনে বললেন, "বেশি চেঁচাতে মানা কর, গোলাপ-মা শুনলে এক্ষুনি দেখিয়ে দেবে। কিছু কিনে খেতে বল না।"

একদিন আমি ও বলাই পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে বললুম, "আমরা এখান থেকে গিয়ে হৃষীকেশ যাব।" তিনি বললেন, "বেশ তো আমাকেও তোমরা বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি যাও।" আমরা বললুন, "আপনি না থাকলে মঠ-মিশন চলবে কি করে?" তিনি বললেন, "তপস্যা করবে বলছ, তা এদেশে হয় না? ঠাকুর কোথায় তপস্যা করলেন, মা কোথায় তপস্যা করলেন? দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাটের শ্মশান, জয়রামবাটী, ঝামাপুকুর, বেলুড় মঠ, কাশীপুরের শ্মশান, এইসব জায়গায় ঠাকুর ও তাঁর ছেলেদের কত স্মৃতি রয়েছে। এইসব জায়গায় তপস্যা করে জাগিয়ে তোল। বাংলাদেশে ঠাকুর দেহধারণ করে এলেন, এখানে কত সিদ্ধ সাধকের পীঠ রয়েছে, সেইসব জায়গাগুলোকে তোমরা তপস্যা করে জাগিয়ে তোল—নবদ্বীপ, তারাপীঠ, কল্যাণেশ্বরী, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা প্রভৃতি কত পাহাড়-পর্বত, ঝরনা, জলপ্রপাত সব রয়েছে, সেইসব জায়গায় তপস্যা কর, দেশের লোক ত্যাগ-বৈরাগ্য শিক্ষা করুক।

"শ্রীশ্রীঠাকুর আসবার আগে এদেশের লোক যথার্থ সন্ন্যাসী কাকে বলে মোটে জানতই না, যত পেটবৈরাগী আর তথাকথিত কাপালিকের দল নেংটি গেরুয়া পরে ভিক্ষা করে খেত, বৈদিক শাস্ত্র বা সাধন কিছুই জানত না। যারা তীর্থে-টীর্থে যেত তারাই একটু-আধটু সন্ন্যাসীদের মুখ দেখতে পেত, এসে আবার সব ভুলে যেত। সন্ন্যাসীদের ত্যাগ, বৈরাগ্য, শাস্ত্র, সাধনের influence (প্রভাব) বাঙালি সমাজের উপর কিছুই পড়ত না। আর মাধুকরী পাওয়া যেত না বলে সাধুরা এদেশে আসতও না। তাই বাংলাদেশে গৃহস্থ গুরুরই চল। আবার শ্লোক করে নিয়েছে, গৃহস্থের সন্ন্যাসী গুরু করতে নেই! কিন্তু ভারতবর্ষের আর কোথাও এইরূপ প্রথা নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তাহলে ব্রাহ্মণদের সমাজের জন্য কি করণীয় ছিল?" বললেন, "গৃহস্থ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ড. পৌরোহিত্য, যজনযাজন, চিকিৎসা, সামুদ্রিক, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের উপর অধিকার ছিল। ন্যায় ব্যাকরণ কাব্য পূর্বমীমাংসা স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিও তাঁদের অধিকারে থাকত।

কিন্তু দীক্ষা, মোক্ষ, ত্যাগ-বৈরাগ্য, জ্ঞানভক্তিমূলক গ্রন্থ—যেমন উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন, শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতির শিক্ষক থাকতেন সন্ন্যাসীরা। তুলসীদাস তাঁর দোঁহাতে বলছেন, 'যারা গৃহী হয়ে জ্ঞান বাতায় তারা কলির ঠগ।' কিন্তু তা বলে কি তারা বেদান্তাদি চর্চা করবে না? করবে এবং তাতে তাদের অশেষ কল্যাণও হবে, কিন্তু কখনও শিক্ষকের আসন গ্রহণ করবে না—তাতে আদর্শের হানি হবে, lower truth (নিম্নকার সত্যের)-এর সহিত higher truth-এর (উচ্চতর সত্যের) compromise (আপস) করে ফেলবে।"

(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ ৩, ৬ ও ১০ সংখ্যা)

স্বামী সারদানন্দ স্মরণে

স্বামী সন্তোষানন্দ

স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ যখন দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন, তখন একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন, "কিরে, তুই যে কিছুই চাইলি না?" এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়েই যুবক শরৎ (স্বামী সারদানন্দজীর পূর্বনাম ছিল শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী; এই সময় তিনি ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র) জবাব দিলেন, "আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি, এই করে দিন।" উত্তর শুনে পরমহংসদেব বললেন, "ও, ওযে শেষের কথা রে!" প্রত্যুত্তরে সহজ ও সরল ভাবেই শরৎচন্দ্র বললেন, "তা আমি জানি না।" তখন ঠাকুর বললেন, "তা তোর হবে।" সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টির প্রার্থনা যেদিন তিনি করেন, সেদিন তিনি এই উক্তির পূর্ণ তাৎপর্য ঠিক বুঝেছিলেন কি না জানি না, তবে পরবর্তী জীবনে তিনি যে এই পরম দুর্লভ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা তাঁর নিজের একটি উক্তিতেই সুপ্রমাণিত হয়। তাঁর রচিত 'ভারতে শক্তিপূজা' নামক পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অর্পিত হইল।"

স্বামী সারদানন্দজী ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম ও প্রধান কর্মসচিব। স্বামী বিবেকানন্দজীর নির্দেশেই তাঁকে এই পদ গ্রহণ করতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই পদে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এই বিরাট সঙ্ঘের পরিপুষ্টি এবং বিকাশে তাঁর ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবনব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব ও

অশ্রুতপূর্ব সাধনলব্ধ মহান সত্য ও শক্তি তাঁর প্রধান সহচর বিবেকানন্দকে সমর্পণ করে তাঁরই স্কন্ধে ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন জগৎ-কল্যাণের গুরুভার। স্বামীজী তাঁর গুরুদেবের এই ভাবসম্পদ জগদ্বাসী সকলের মধ্যে বণ্টনের জন্য যে সম্পূর্ণ অভিনব আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে একটি বিরাট সংস্থা স্থাপন করেন তা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামে পরিচিত। স্বামীজী তাঁর জীবনের মাত্র শেষ দু-তিন বছর এই মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত করেন। কাজেই তাঁর অন্তর্ধানের সময় তাঁর পরিকল্পিত এই মহামহীরুহ অঙ্কুরিত মাত্রই হয়েছিল বলা যায়। এই সদ্যোজাত অঙ্কুরটিকে সযত্নে রক্ষা করার এবং এর বর্ধিত হবার সকল বাধা অপসারিত করবার ভার যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কর্মসচিব স্বামী সারদানন্দজীর উপরে বহুলাংশে ন্যস্ত ছিল—তা সহজেই অনুমান করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্কন্ধে আরও একটি অতি গুরু কর্মের ভার অর্পণ করে গিয়েছিলেন; সেটি হলো ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করা। এই সুমহান কার্য তিনি যে কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করে গেছেন, তা তাঁর লেখা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই অনুধাবন করতে পারবেন। ধর্মজগতে এই ধরনের জীবনী এই প্রথম বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। এ ভিন্ন তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদক। সর্বোপরি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে দেখাশোনা করার সকল ভার ছিল তাঁরই উপর। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে দেখিনা—শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে। শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।"

এই সমস্ত গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের বোঝা মাথায় নিয়েও তাঁর কোন দিন অন্যান্য কাজ করবার সময় শারীরিক বা মানসিক শক্তির কোন অপ্রতুলতা কখনই দেখা যেত না। তাঁকে দেখলে মনে হতো যেন তাঁর সময় অফুরন্ত আর আমি যে কাজটুকু নিয়ে তাঁর কাছে গেছি, কেবল সেই কাজটুকু যেন তাঁর একমাত্র করণীয়। তাই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজকর্ম ছাড়াও আরও যে কত কাজ তিনি স্বচ্ছন্দে মাথা পেতে নিতেন তার ইয়ত্তা নাই। একটি উদাহরণ

দেওয়া যাচ্ছে। স্বামী নির্বেদানন্দ তখন ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য, যাবেন কাশীধামে। পথে গয়াধামে নেমে তাঁর পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান করে যাবারও তাঁর ছিল সঙ্কল্প। তিনি তাঁর অভিপ্রায় পূজ্যপাদ সারদানন্দজীকে জানালেন। শুনে তিনি বললেন, "তুমি গয়া যাবে? আমার কাছে একজন কয়েকটি টাকা রেখে গেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের গয়া করাবার জন্য। গরিব মানুষ খরচ করে গয়া অবধি গিয়ে নিজে যে এই কাজ করবে, তা পারবে না। তা তোমাকে নামগোত্র সব বলে দিচ্ছি আর টাকাটা দিচ্ছি, এই কাজটি তুমি করতে পারবে?" বলা বাহুল্য, নির্বেদানন্দজী সানন্দেই এই কার্যভার গ্রহণ করলেন।

পূর্বেই বলেছি তাঁকে দেখে তাঁর সময়ের কোন অভাব আছে বলে মনে হতো না, তিনি যেন সর্বদাই অনন্ত কালেই বাস করতেন। সকালে ঘুম থেকে কখন উঠতেন জানি না। হয়তো ভোর তিনটা নাগাদই উঠে পড়তেন। কিন্তু ধ্যানজপ সেরে নিচে এসে বসতে একটু বেলাই হতো। ধীরে ধীরে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে বসলেন, তারপর একটি ছোট টেবিল (সেটি একপাশেই থাকত) সামনে এনে আর একপাশ থেকে একটু ন্যাকড়া এনে অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নসহকারে এই টেবিলটিকে পুঁছতে আরম্ভ করলেন। ন্যাকড়াটি গেরুয়া রঙের, সমকোণী চতুর্ভুজ আকারে ভাঁজ করা। সেটি দিয়ে অতি যত্নসহকারে টেবিলটির উপর-নিচ চারিধার, পায়াগুলি সবই পুঁছে সেটিকে তাঁর সামনে বসালেন, আর ন্যাকড়াটিকে সাবধানে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপরে একটি দেরাজ খুলে বার করলেন, বোধ হয়, একটি বিস্কুটের টিন, তার মধ্যে আছে একটি কালো আর একটি লাল কালির দোয়াত। দুটি সাধারণ নিবযুক্ত হ্যাণ্ডেলওয়ালা কলম আর একটু ন্যাকড়া। এই ন্যাকড়াটি রঙ করা নয়। এই ন্যাকড়াটুকু দিয়ে কলম দুটির হ্যাণ্ডেল, নিব, সব আস্তে আস্তে পুঁছলেন আর পুঁছলেন দোয়াত দুটি। তারপর বেরুলো চিঠির গোছা, ছোট ছোট বাণ্ডিলে ভাগ করা, বোধ হয়, বিষয় অনুসারে ভাগ। তাঁর কার্যক্রম দেখলে মনে হতো যেন এইসব জলচৌকি প্রভৃতি যেন সুখদুঃখসম্পন্ন সচেতন বস্তু। যাহোক এইখানে তাঁর প্রস্তুতি শেষ হলো। তারপর যে তাঁর কাছে যে প্রয়োজনে গেছে, তা যত সামান্য ব্যাপারই হোক না

কেন, অতি অভিনিবেশ সহকারে শুনবেন এবং সে সম্বন্ধে যা করণীয় তা করে দেবেন। এই দোয়াত, কলম, টেবিল প্রভৃতি সাজানোতে তাঁর যতখানি অভিনিবেশ দেখা যেত, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাতেও ততখানি অভিনিবেশ দেখা যেত; শাস্ত্রে যে আছে,

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥"

একি সেই অবস্থা!

এই 'নির্মম নিরহঙ্কার' মহান আচার্যের জীবনের আর একটি ছবি মনে পড়ছে। তখন অধুনাখ্যাত দেওঘর বিদ্যাপীঠ সবে স্থাপিত হয়েছে মিহিজামে। কলকাতার স্টুডেন্টস হোম আরম্ভ হয়েছে অবশ্য এর কয়েক বছর আগেই। কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের পরিচালনা অনাদি মহারাজ করছিলেন একাই। কিন্তু বিদ্যাপীঠের সূচনা থেকে তিনি ও স্বামী সদ্ভাবানন্দ একসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছিলেন। এই সমস্ত কাজের পত্তন ও পরিচালনা যাতে ঠিক ঠিক স্বামীজীর ভাব ও আদর্শ অনুযায়ী হয় এইজন্য কোন সমস্যার উদয় হলেই অনাদি মহারাজ যেতেন পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের কাছে। তিনিও সব শুনে তার সমাধান বলে দিতেন। একদিন এইরূপ প্রসঙ্গ শেষ করেই বলছেন—"দেখ আমি যা বলব তা যদি তোমার মত না হয় তবে মেনে নিও না। তোমার যা যুক্তি আছে তা বলবে। কারণ তুমি কাজের ওপর রয়েছ, আর আমি দূর থেকে শুনে বলছি। তাই আমার কথা ভুলও হতে পারে। তবে মহারাজ যদি কখনও কিছু বলেন, কোন প্রশ্ন না করে তা তখনই মেনে নেবে।" এতে দেখা যাচ্ছে অপর সকলের মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত কত না সহজভাবেই সমান আসনে বসিয়ে দিচ্ছেন! আর দেখা যাচ্ছে তাঁর গুরুভ্রাতা রাজা মহারাজের উপর তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা!

ক্রমে শ্রীশ্রীমা ও রাজা মহারাজের অদর্শন ঘটল। এতদিন তিনি দীক্ষাদি বড় একটা দিতেন না। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে কি করেছিলেন জানি না, তবে এদেশে এর পূর্বে বোধ হয় একজনকে সন্ন্যাস ও শ্রীশ্রীমার আদেশে একজনকে

দীক্ষা দিয়েছিলেন। এখন দীক্ষাদি দেওয়া আরম্ভ হলো। তাঁর এক মন্ত্রশিষ্য এক বাছনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কর্মে বিশেষ উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়। শিষ্যটি একদিন আপন গুরুকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মহারাজ, গুরুশিষ্য-সম্পর্ক তো চিরস্থায়ী?" মহারাজ বললেন, "তা তো বটেই!" শিষ্য বললেন, "আমাদের যে মন্ত্র দিয়েছেন তা আমরা নিয়মিত জপ করব এই তো নিয়ম।"

মহারাজ বললেন, "তা বৈকি।"

শিষ্য বললেন, এখন যদি আমরা জপ বন্ধ করি?

একটু চুপ করে থেকে মহারাজ বললেন, "বেশ তো, পারিস তো একবার ছেড়ে দিয়ে দেখ না। তুই কি ভাবলি, তুই জপ আর ধ্যান করবি, এই ভরসায় তোর উপর নির্ভর করে তোকে দীক্ষা দিয়েছি? বাপ যে ছেলের হাত ধরে সে পড়ে যায় না।"

শিষ্যটি আর একদিন প্রশ্ন করল, "মহারাজ, গীতা পড়তে এত করে বলা হয় কেন? গীতার এমন কি বিশেষত্ব আছে?" জবাব এল, "অনেক তো পড়েছিস, দেশ-বিদেশের অনেক সাহিত্যের সঙ্গে খানিকটা পরিচয়ও তো হয়েছে, গীতার মতন আর একখানা বইয়ের নাম করতে পারিস?"

তাঁদের গুরুভাইদের মধ্যে ভাব কত গভীর, কত মধুময় ছিল, আর তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবের কি রকম পূর্ণ বিকশিত মূর্তি ছিলেন তা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনায় কি সুন্দরভাবেই না ফুটে ওঠে। শ্রীশ্রীমা ও রাজা মহারাজের অদর্শনের কিছুকাল পরের ঘটনা। দুর্গাপূজা হয়ে গেছে। একাদশীর দিন সকালে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ দুই ক্যানেস্তারা রসগোল্লা নিয়ে মঠে এসেছেন। সাধু-ব্রহ্মচারীদের বিজয়ার মিষ্টিমুখ করাবার জন্য। তিনি মঠবাড়ির দ্বিতলে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে এসে তাঁকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করলেন। ইত্যবসরে একটিন রসগোল্লাও এনে সেখানে রাখা হলো। সহসা কোথা হতে খোকা মহারাজ দৌড়ে এসেই রসগোল্লার টিনে হাত ঢুকিয়ে একথাবা তুলে নিলেন; মহাপুরুষ মহারাজ বলে উঠলেন, "দেখ

দেখ, খোকা কি করছে! খোকা, তুই শরৎ মহারাজকে প্রণাম করলি না?” বলামাত্র বাঁ হাতে করে তাঁকে প্রণাম করেই সেই হাতে আর একথাবা রসগোল্লা তুলে খোকা মহারাজ একছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। ঠিক যেন একটি দুরন্ত ছোট ছেলে। মধ্যাহ্নে খাবার জায়গায় সকল সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে শরৎ মহারাজ এসে বসলেন। আর তাঁর কাছেই বসলেন খোকা মহারাজ। প্রথমেই থালা সাজিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হলো পূজনীয় শরৎ মহারাজকে ও খোকা মহারাজকে। কিছুমাত্র বিলম্ব না করেই খোকা মহারাজ আরম্ভ করে দিলেন খেতে। দুরন্ত ছোট ভাইটিকে স্নেহপূর্ণ শাসনের সুরে শরৎ মহারাজ বললেন, “এই খোকা, ব্রহ্মার্পণং বলা হলো না, খেতে আরম্ভ করলি যে?”

“ঠাকুরের প্রসাদ তো!” জবাব দিলেন খোকা মহারাজ। প্রত্যুত্তরে শরৎ মহারাজ বললেন, “সব সাধুব্রহ্মচারীরা বসে আছে!” এবার খোকা মহারাজ থামলেন। কোন অন্যায় কার্য থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিরত হতে হলে ছোট ছেলে যেমন অভিমান-আহত গম্ভীর মুখে বসে থাকে, পূজনীয় খোকা মহারাজজীর মুখের ভাবটি ঠিক সেই রকম। যা হোক সকলের পাতে প্রসাদ পড়ল। মন্ত্রপাঠ হলো এবং খাওয়াও আরম্ভ হলো। বাটি করে একবাটি প্রসাদি পরমান্ন দেওয়া হলো পূজনীয় শরৎ মহারাজকে। তিনি বাটিটি এগিয়ে দিলেন খোকা মহারাজের পাতের কাছে। খোকা মহারাজ দেখামাত্র এক চুমুকে পরমান্নটুকু নিঃশেষ করে শূন্য বাটিটি থালার পাশে রেখে পূর্বের মতনই খেতে লাগলেন। ক্রমে পরমান্ন পরিবেশন আরম্ভ হলো। খোকা মহারাজের পাতের পাশের শূন্য বাটিতেও পায়েস পড়ল। খোকা মহারাজ কোন প্রতিবাদই করলেন না। পূজনীয় শরৎ মহারাজ কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বললেন, “তোকে তো পায়েস দিলাম। আবার নিলি যে!” “এই জন্যই তো বাটি খালাস করে রাখলাম”—বললেন খোকা মহারাজ, আর তাঁর মুখে ফুটে উঠল দুরন্ত ছেলের দুষ্টু হাসি। খাওয়া শেষ হলো, পূজনীয় শরৎ মহারাজ গেলেন উপরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। পিছনে পিছনে খোকা মহারাজ। যেন কত ভয়ে জড়সড় হয়ে অতি সন্তর্পণে না এলে নয়, তাই আসছেন। পূজনীয়

শরৎ মহারাজ বললেন, "এই খোকা যেতে চাচ্ছে আমার সঙ্গে কলকাতায়।" "ঐ দেখ, যেই মোটর দেখেছে অমনি চড়তে হবে", বললেন মহাপুরুষ মহারাজ। খোকা মহারাজ একটু আর্তি জানালেন যেন কি একটু প্রয়োজন আছে, যা জ্যেষ্ঠ মহাপুরুষ মহারাজকে বলতে আটকাচ্ছে, লজ্জা ও সংকোচে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ বললেন, "ওকে বলেছি, আমার সঙ্গে যেতে চাস তো গাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাক।" তারপর খোকা মহারাজের দিকে ফিরে বললেন, "তুই গিয়ে গাড়িতে শুয়ে থাক আর আমি তোর বিছানায় বিশ্রাম করি।" সানন্দে সম্মতি জানিয়েই খোকা মহারাজ চললেন তাঁর বিছানাটি ভাল করে প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আর এক মহাপুরুষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কথা। ১৯২৬ সাল, মঠ ও মিশনের 'কনভেনশন', পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ এসেছেন সারগাছি থেকে। পূজনীয় শরৎ মহারাজও এসে কদিন বাস করছেন মঠে। দুজনে একঘরেই শুয়ে থাকেন। 'মন মুখ এক করা' যাকে বলে তার যেন একটি মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন ঠাকুরের এই সন্তানটি। এমন অপূর্ব সরলতা, এমন মান-অপমান-সমান জ্ঞান বোধ হয় একমাত্র এইরূপ মহাপুরুষেই দেখা যায়। তিনি একদিন বলছেন, "ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে, দেখি দাদা বসে ধ্যান করছেন। লজ্জায় মরে যাই! দাদা বুড়ো মানুষ বসে ধ্যান করছেন, আর আমি ছেলেমানুষ পড়ে ঘুমুচ্ছি! পরদিন খুব সাবধানে আছি। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেছে, দেখি দাদা ঘুমুচ্ছেন। এইবার! খুব সাবধানে উঠে মুখ ধুয়ে এসে মশারির মধ্যে বসে আছি। খানিক বাদে টের পেলাম দাদা উঠছেন। সকালে দাদা বললেন, "আজ যে ভারি সকাল সকাল ওঠা!" বয়সে কিন্তু ইনি দাদার অপেক্ষা অন্তত বছর খানেকের বড়।

এই সময়েরই আর একটি চিত্র। পরম পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের অহংশূন্য অপূর্ব সারল্যমিশ্রিত বর্ণনা—"দাদাতে আমাতে একসঙ্গে খেতে বসেছি, সামনে ভাতের থালা নিয়ে চোখ বুজে বসে নিবেদন করছি। চোখ চেয়ে দেখি দাদা তখনও চোখ বুজে বসে আছেন। আমি আবার চোখ বুজলাম।

ভাবছি দাদা কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! যাক, অনেক পরে দাদা চোখ চেয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। আমি বললাম—'তুমি কী কর? ঘুমিয়ে পড় নাকি?' দাদা বললেন, 'তুই খেতে আরম্ভ করলেই পারিস।' "

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজজীর শেষ অসুখের সংবাদে ব্যস্ত হয়ে পূজনীয় অখণ্ডানন্দজী সারগাছি হতে চলে আসেন এবং মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে অদ্বৈত আশ্রমে বাস করতে থাকেন। সেখান হতে তিনি প্রত্যহই আপন গুরুভাইকে দেখতে আসতেন এবং সর্বদা তাঁকে খবরও পাঠান হতো। সেদিন সকালে তাঁকে রোগীর খবর দেওয়ার ভার পড়ল আমার ওপর। অদ্বৈত আশ্রমে পৌঁছে দেখি তিনি দ্বিতল থেকে নেমে আসছেন। সিঁড়ির শেষধাপে এসে দাঁড়াতে তাঁকে প্রণাম করে জানালাম যে রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি খুবই গম্ভীর হয়ে রইলেন। কোন কথাই বললেন না। খানিক বেলায় উদ্বোধন বাড়িতে ফিরে এসে দেখি পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ আগেই এসে গেছেন এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরের সম্মুখে বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আছেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—"এই ভরত আমার সকালটা মাটি করে দিলে। সকালে উঠে ঠাকুরকে সামনে বসিয়েছি। আমরা তোমাদের মতন ধ্যান করি না। তাঁকে বসিয়ে কেঁদে কেঁদে বলছি, হীনের হীন দীনের দীন হয়ে পড়ে আছি, দাদাকে নিয়ে গেলে চলবে না। দেখি ঠাকুর সরে গেলেন, দাদা এলেন। তিনি বললেন, 'তুই কি আমাকে এইভাবে থাকতে বলিস?' ভাবলাম এই তো কথা পেয়েছি। তবে দাদা ভাল হবেন। আনন্দে প্রাণ ভরে গেল। নেমে আসছি। এমন সময় তুই গিয়ে বললি অবস্থা খারাপ। শুনেই ভাবলাম এ কথা আর নাইয়ের ওপরে উঠে কাজ নাই। এখন দেখ দেখি। এই তো দাদা ভাল আছেন।" কি যে আনন্দোৎফুল্ল আননে এই কথাটি বললেন, তা বর্ণনা করা যায় না। সেই রাত্রেই বা তার দু-একদিন পরে পূজ্যপাদ সারদানন্দজীর মহাপ্রস্থান ঘটে। শরীর যাবার পরদিন সকালে পূর্বপরিচিত স্থানে পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সহিত দেখা। সে কি বিষাদগম্ভীর মূর্তি! বললেন, "ভরত, আমি দাদার কথার অর্থ বুঝতে ভুল করেছিলাম। তিনি যে বললেন—'তুই কি আমাকে এইভাবে

থাকতে বলিস?' তার অর্থ যে তিনি থাকবেন না, তা বুঝতে পারিনি। ভাবলাম—দাদার কথা পেয়েছি তবে দাদা ভাল হবেন।" এই রকমই আর একটি ঘটনা। পরম পূজনীয় রাজা মহারাজজীর শরীর যাওয়া উপলক্ষে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, মহারাজ ভাল হয়ে উঠুন এই বাসনা খুব প্রবল থাকায়, তিনি ভাল হবেন, এটা যে ওই বাসনারই উক্তি তা বুঝতে পারা যায় নাই। মনের চালাকিটা বাসনার দরুন ধরা পড়ে নাই।

কি এক প্রয়োজনে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে একদিন স্বামী নির্বেদানন্দজী (তখন সুরেনবাবু) যান পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে। যে জন্য গিয়েছিলেন সে কাজ হয়ে যাবার পর মহারাজজী বললেন, "ওটা নিয়ে একা একা আর কতকাল থাকবে? ওটাকে মিশনের সঙ্গে অ্যাফিলিয়েট করে নাও না কেন?" জবাবে স্বামী নির্বেদানন্দজী বললেন, "মহারাজ, শুনেছি নিজস্ব বাড়ি এবং টাকাকড়ির ব্যবস্থা না হলে কোন সেন্টারের মিশনের সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন হয় না। এর তো কিছুই নাই।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর মঠ ও মিশনের প্রধান ও প্রথম কর্মসচিব বললেন, "আমরা টাকাকড়ি, জমিজায়গা এসব দেখি না। আমরা দেখি মানুষ। তুমি শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারবে তো?" অনাদি মহারাজ বললেন, "আমার আধ্যাত্মিকতার কোন ক্ষতি হবে না তো?" "না, সে আমরা দেখে নেব। তুমি ভাবসংশুদ্ধি বজায় রাখবে তো? যার ভাবশুদ্ধি নাই তার সেখানেও কিছু হবে না; আর যার তা আছে তার এখানেও হবে। তোমায় ভাব বজায় রাখতে হবে।"—বললেন স্বামী সারদানন্দজী। উত্তরে যুবক সুরেন্দ্রনাথ—তখন তাঁর ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস হয় নাই—বললেন, "তা আমি চেষ্টা করব।" "ব্যস তাহলেই হলো"—অভয় দিলেন মায়ের ভারী স্বামী সারদানন্দজী। এর কয়েক দিন পরেই স্টুডেন্টস্ হোম রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গীভূত হয়। নাম হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোম।'

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

এই ভগবদুক্তিটি প্রমাণ করার জন্য যেন শরৎ মহারাজজী উদ্বোধনের স্বল্পপরিসর বাটিতে আজীবন অতিবাহিত করে গেলেন। এই ছোট্ট বাটিটিই হলো উদ্বোধন কার্যালয়। তাঁর সময় এ বাটি ছিল আরও ছোট। এখান থেকে হতো উদ্বোধন পত্রিকা ও অন্যান্য যাবতীয় পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার। এটি শ্রীশ্রীমায়ের বাটি; মা যখন আসতেন তখন তাঁর সঙ্গে থাকতেন অনেক মেয়েরা, সাধুভক্ত প্রভৃতির ভিড়ও হতো প্রচুর। আর তাঁর নিজের কাছেও আসতেন অনেক সাধু ও ভক্ত তাঁদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্য। আর এই বিরাট মিশন পরিচালনা উপলক্ষে যত রকমের সমস্যার উদ্ভব হতো তারও সমাধানের জন্য কর্মিগণ আসতেন প্রধানত তাঁরই কাছে। আবার শ্রীশ্রীমা যখন উদ্বোধন বাটিতে আসতেন তাঁর সঙ্গে যাঁরা আসতেন তাঁদেব মধ্যে থাকতেন আমাদের পাগলী মামি—শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতৃজায়া, আর তাঁর কন্যা রাধু, সেও পাগল। আর যেসব সাধুদের অসহিষ্ণুতার জন্য মঠের অন্য কোন কেন্দ্রে স্থান হতো না, তাঁদেরও বাস এই মায়ের বাটিতে। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই সাধুদের একজন একদিন বের হলেন কাঁধে খদ্দর নিয়ে বড়বাজার অঞ্চলে ফেরি করবার জন্যে। এ সবকিছুর মধ্যেও তিনি তাঁর অন্যান্য কাজের সঙ্গে গীতাতত্ত্ব, ভারতে শক্তিপূজা, সর্বোপরি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গের মতন গ্রন্থ প্রণয়নে কোন অসুবিধাই বোধ করতেন না। মনে হতো যেন তিনি খুবই শান্তিপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসে আছেন। আর যে কাজটি যখন করতেন যেন সেই একটি মাত্র কাজই তাঁর করণীয়।

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজজীর অদর্শনের পর থেকে তিনি যেন ক্রমে সকল কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে লাগলেন। আর ডুবে যেতে লাগলেন আপনার ভিতর।

ক্রমে এসে উপস্থিত হলো ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগস্ট তারিখ। ঐ দিন রাত্রে সহসা শরীর অসুস্থ বোধ করেই তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পায়। চিকিৎসকগণ বললেন সন্ন্যাস রোগ। তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। অনুমান দিন দুই তিন পরে আবার পুরোপুরি

বাহ্যজ্ঞান লাভ করেন। এই সময় তিনি ছিলেন ডাঃ বিপিন ঘোষের চিকিৎসাধীন। রোগীর অবস্থার এই উন্নতিতে অনেকেরই এমনকি ডাক্তারবাবুরও হলো খুব আনন্দ। তিনি শরৎ মহারাজের গণ্ডদেশ ধরে বললেন, "কিরে শরৎ খাবি? নোলাটা বার কর না।" মহারাজ ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইলেন, মুখে তাঁর ফুটে উঠল একটু স্মিত হাস্য। অসুখের প্রথম থেকে কদিন দাড়ি কামান হয় নাই। তাই বাঁহাতে ওই শ্মশ্রু দেখিয়ে পূজনীয় নির্বাণানন্দজীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন। ইঙ্গিত বুঝেই তিনি অতি সাবধানে ক্ষৌরকার্য করে দিলেন। নির্বাণানন্দজী যখন তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিলেন সেই সময় তিনি তাঁর বাঁহাতের নখগুলিও দেখাতে লাগলেন। এই দেখেই নির্বাণানন্দজী বললেন, "নখ কেটে দিচ্ছি।" এই সময় আরও একটি আশ্চর্যের বিষয় দেখা গিয়াছিল—তিনি নিত্যই সকাল নটা-সাড়ে নটা আন্দাজ বামহস্তে কর জপ করতেন। বাহ্যজ্ঞান বিকাশে ক্ষণিক আশার সঞ্চার হলেও অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল। শরীর যাবার দিন কিংবা তার দু-এক দিন আগে নিজের বামহস্তে তাঁর অন্যতম সেবক স্বামী অসিতানন্দের একহাত ধরে আকর্ষণ করলেন। অসিতানন্দজী কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। নির্বাণানন্দজী বললেন, "উনি চাচ্ছেন, যাও না এগিয়ে।" অসিতানন্দ অগ্রসর হলেই তাঁকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন। যে সঙ্ঘকে এতদিন প্রাণ দিয়ে লালন-পালন করে আসছিলেন, এই কি তার প্রতি তাঁর সপ্রেম বিদায়-সম্ভাষণ?

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমি জয়রামবাটীতে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। আমি তখন বদনগঞ্জ স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ি। মহারাজের শুভাগমন সংবাদ আগেই জেনেছিলাম। যখন জয়রামবাটীতে পৌঁছিলাম তখন তিনি একটি বাঁশের তৈরি বড় মোড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ির বৈঠকখানা ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসেছিলেন। তাঁর বিশাল বপু দেখে কাছে যেতে ভয় হলো। তাই প্রথমে তাঁর দিকে একটিবার তাকিয়ে, সিধা শ্রীশ্রীমার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই মা খুব খুশি হয়ে বললেন, "শরৎ এসেছে দেখেছ?" আমি বললাম, "মা, রাস্তা থেকে দেখে এলাম—বারান্দায় বসে আছেন।" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "শরৎকে প্রণাম করনি?" আমি বললাম, "না, ভয় করছে।" মা বললেন, "বোকা ছেলে! শরতের চেহারাই ঐ রকম। ভিতরটা প্রেমে ভরা। যাও—প্রণাম করগে। দেখবে শরৎ তোমাকে কত ভালবাসবে।" আমি ভয়ে ভয়ে মায়ের ঘর থেকে ভিতরের দিক দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার নাম, কোথায় কোন শ্রেণিতে পড়ি, বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। সব উত্তর দিলাম। পরে জয়রামবাটীতে আমার কোন বন্ধু আছে কি না অথবা কেউ আত্মীয় আছেন কি না জানতে চাওয়ায়, "না" বললাম। তখন এদেশের ছেলে-মেয়ে কেউ সহজে মার কাছে আসত না জেনে আমি বললাম, "আমি শ্রীশ্রীমার কাছে সর্বদা আসি।" তার আগেই আমি শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে দীক্ষাও পেয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীমা আমাকে 'রামময়' বলে ডাকলেন। কি মধুর স্বর! 'যাচ্ছি মা' বলে মার কাছে যেতেই, মা আমায় মিষ্টি ও জল দিলেন। আমিও আনন্দে খেয়েদেয়ে আবার মহারাজেব কাছে গিয়ে হাতপাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করতে লাগলাম।

তামাকও সেজে দিলাম। তাঁর সেবক হিসাবে স্বামী ভূমানন্দ ও ব্রহ্মচারী বিমল (পরে স্বামী দয়ানন্দ) এসেছিলেন। তাঁরা মেজোমামার (কালীমামার) বৈঠকখানা ঘরে থাকতেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ, জ্ঞানদা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) ও আমি থাকতাম। তখন মেঝেতে সিমেন্ট ছিল না। মাটির মেজেতে খেজুর পাতায় তৈরি চ্যাটাই পেতে তার উপর বিছানা পেতে পূজনীয় মহারাজও শুতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজ জপ-ধ্যান করার সময় আমাকে বললেন, "দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বস।" আমি মনে করলাম মহারাজ ভিজিয়ে দিতে বললেন। তাই তাঁরই কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে দরজায় একটু ছিটিয়ে দিয়ে আমিও জপ করতে বসলাম—দেখে মহারাজ বললেন, কই, দরজাটা ভেজিয়ে দিলি না?" আমি বললাম, "মাটির মেঝে, বেশি ভিজালে যে কাদা হয়ে যাবে।" তখন সেই গম্ভীর মানুষ হো হো করে হাসতে লাগলেন ও আমাকে বললেন, "আমি কি তোকে দরজা ভিজিয়ে দিতে বলেছি? ভেজিয়ে দিতে বলেছি। মানে দরজায় খিল দিয়ে বন্ধ না করে, কেবল বন্ধ করে দিতে বলেছি। তোরা কি বলিস? আমি বললাম, "আমরা বেজিয়ে দেওয়া বলি।" তিনি বললেন, "তবে তাই কর।" আমি দরজা বেজিয়ে দিলাম।

তামাক সেজে তাড়াতাড়ি টিকেয় আগুন ধরবে বলে জোরে জোরে পাখার বাতাস করতে করতে কলকেতে পাখা লেগে কল্কে উলটে পড়লে বকতেন। বলতেন, "তুই বড় ছট্‌পটে! বাইরে রেখে দিয়ে আয়। হাওয়ায় আস্তে আস্তে ধরে যাবে।" তাই করতাম। আমার হেডমাস্টারমশায় শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতেই মহারাজ বললেন, "প্রবোধ! তোমার ছাত্র স্কুল পালিয়ে এখানে আড্ডা দিচ্ছে।" মাস্টারমশায় বিনীতভাবে বললেন, "আপনাদের একটু সেবা করলে ধন্য হয়ে যাবে। আমরা কি শিক্ষা দেব?" মহারাজ বললেন, "যা, তোর মাস্টারও তোকে ছেড়ে দিলে।"

মাস্টারমশায় মহারাজের জন্য বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ কিছু অম্বরী তামাক আশি টাকা সের দরে কিনে এনেছিলেন। ঐ তামাক তরল। কলকেতে সাধারণ তামাক

সেজে, তার উপরে একটি গোল মাটির চাকতিতে আঙুল দিয়ে একটু তরল তামাক লাগিয়ে রেখে তার উপর আগুন দিতে হয়। আমি জানতাম না যে, ঐ চাকতিটি কলকের সঙ্গে একেবারে চারিদিকে লেগে গেলে চলবে না। একটু ফাঁক থাকবে। কলকে থেকে ধোঁয়া বেরোয় না। মহারাজ দুঃখ করে বললেন, "রেখে দে তোর আশি টাকা দামের তামাক। আমরা গরিব লোক। আমাদের সাধারণ তামাকই ভাল। এমন সময়ে আমার মাস্টারমশায়ের প্রাণের বন্ধু ও গুরুভাই (শ্রীশ্রীমার শিষ্য) ডাক্তার নলিনীকান্ত সরকার এলেন। তিনি আমাকে বললেন, "ওরে ভুল করেছিস। ঐ তাওয়াটা একটু ঘষে ক্ষয় করে নিয়ে আয়—যেন একটু ফাঁক থাকে।" আমি ঘষে ক্ষয় করে এনে ঐ তাওয়ার পিঠে তামাক লাগিয়ে আগুন দিতেই খুব সহজে ধোঁওয়া বের হতে লাগল। সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। মহারাজও খুব খুশি হলেন। এইসঙ্গে বলে রাখি শ্রীশ্রীমার উনান থেকে আগুন আনতে গেলে তিনি কলকেতে আগুন দিতেন না। হাতায় করে আগুন দিতেন ও চিমটে দিতেন—কলকেয় আগুন তুলে নেবার জন্য। আমি, 'কলকেতেই দিন না' বললে, মা বলতেন, "বাবা, ছেলেকে আগুন দিতে নেই। তুমি নিজে তুলে নাও।"

একদিন মহারাজ বিকালে চা খেয়ে বেশ ঘেমেছেন দেখে, আমি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছি দেখে মহারাজ বললেন, "আমি একটু ঘেমে হালকা হব বলে গরম গরম চা খেলুম। আর তুই এলি চাষার মতো হুস হুস করে হাওয়া করতে।" আমি বললুম, "ঘাম দেখে হাওয়া করছি—আবার চাষা বলছেন কেন?" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "শোন, একজন চাষা তার মেয়ের বিয়ের জন্য গুরুদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গিয়ে গুরুমার কাছে জানল, গুরুদেব তাঁর এক বড়লোক শিষ্যের বাড়ি কলকাতায় গেছেন। চাষা সেখানে গিয়ে দেখল—ঐ ধনী শিষ্য জলে পাখা ভিজিয়ে গুরুদেবকে হাওয়া করছে। সে নূতন জিনিস শিখলো ও স্থির করল এবার গুরুদেব আমার বাড়ি এলে আমিও পাখা ভিজিয়ে বাতাস দিব। বেচারা গুরুদেব তার বাড়িতে শীতকালের সন্ধ্যার পরে গিয়ে হাজির। শিষ্য গুরুদেবকে বসিয়ে প্রণাম করেই

একখানা পাখা পুকুরের ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে এনে জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগল। গুরুদেবের প্রাণান্ত! বললেন, "তোর তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি শীতে মরছি আর তুই এলি ভিজে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে!" তখন শিষ্য বললে, "আপনার বড়লোক শিষ্য ভিজে পাখার হাওয়া দিচ্ছিল—তাকে আপনি কিছু বলেননি। আর আমি গরিব বলে আমাকে বকছেন?" গুরুদেব বললেন, "বেটা, সে যে গরমের দিনে দুপুরে হাওয়া করেছিল। আর তুই শীতের দিনে রাত্রে হাওয়া দিচ্ছিস!"

তখনকার দিনে জয়রামবাটী গ্রামে বা নিকটবর্তী গ্রামে কেউ চা খেতো না। মহারাজের জন্য কলকাতা থেকে চায়ের সরঞ্জাম আসত। বিমল মহারাজ চা তৈরি করে দিতেন। তখন কিছু এক পয়সা দামের প্যাকেটের গুঁড়া চা আরামবাগ থেকে কিনে এনে রাখা হতো। যদি চা না খেলে চলবে না এমন কোনও ভক্ত আসতেন, তবে শ্রীশ্রীমা অনেক কষ্টে বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটু দুধ কিনে আনতেন। একটি মাটির হাঁড়িতে জল, দুধ, চা ও চিনি বা গুড় দিয়ে বেশ করে ফুটিয়ে, ন্যাকড়ায় ছেঁকে কাঁসার গেলাসে করে দিতেন। চায়ের কাপ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ঐসব বাসনকে তখন লোকে সানকী বলত ও অপবিত্র মনে করত। বিমল মহারাজ আমাকে চা খেতে বললে আমি খেতাম না। তিনি যখন স্টোভ (Stove) জ্বালিয়ে কেটলিতে জল গরম করতেন, তখন মহারাজ বলতেন, "আমি তানপুরায় এমন সুর বেঁধে দিতে পারি যে, তুই তানপুরা বাজালে স্টোভের শব্দ শোনা যাবে না। মেজোমামার (কালীমামার) বড় ছেলে ভূদেবের একটি ছোট তানপুরা মহারাজের ঘরে ছিল। মহারাজ বিস্কুট আনতেন। আমাদেরও দিতেন। আমরা আনন্দ করে খেতাম। ভূদেব, রাধারমণ, ক্ষুদিরাম ও রাধু আমাদের সঙ্গে ভাগ বসাত। আমি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তরকারি কোটা, পান সাজা প্রভৃতি কাজ করতাম ও মধ্যে মধ্যে মহারাজের সেবা করতাম। মহারাজ বলতেন, "দেখ, তুই মাঝে মাঝে এসে মা কি করছেন আমাকে বলবি। নিজের বুদ্ধি খাটাবিনি যেমনটি বলি তেমনটি করবি।" আমি "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলতাম। মধ্যে মধ্যে গিয়ে বলতাম, "মা এখন তরকারি

কুটছেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কুটেছি। এখন পান সাজছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেজেছি। মার উনানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এলাম। মা ঠাকুরের জন্য হালুয়া রান্না করছেন'' ইত্যাদি। তিনিও বলতেন, ''যা করগে যা।'' পরে ''মা এখন ঘরে চুপ করে বসে আছেন'' বলতেই মহারাজ বলতেন, ''যা মাকে জোড় হাত করে জিজ্ঞাসা করে আয় আমি প্রণাম করতে যাব কি না।'' আমি জিজ্ঞাসা করলেই মা বলতেন, ''হ্যাঁ বাবা, শরৎকে ডাক।'' আমিও পিছে পিছে যেতাম। দেখতাম, মহারাজ হাঁটু গেড়ে বসে মাকে প্রণাম করে, ''মা, ভাল আছেন?'' জিজ্ঞাসা করতেন। মা বলতেন, ''হ্যাঁ বাবা, ভাল আছি। বাবা শরৎ, তুমি কেমন আছ?'' মহারাজও বলতেন, ''হ্যাঁ মা, আমিও ভাল আছি।'' রোজই এক প্রশ্ন ও উত্তর। পরে দেখতাম, আমরা যেমন মাকে প্রণাম করেই পিছন ফিরে চলে আসতাম, মহারাজ তেমন না করে মাকে সামনে রেখে জোড় হাত করে পিছিয়ে পিছিয়ে দরজার কাছে এসে বারান্দায় বেরিয়ে তবে সিধা হয়ে চলতেন। বেরিয়ে মা লম্বা ঘোমটা দিতেন বলে বলতেন, ''আমি যেন শ্বশুর! এতখানি ঘোমটা!''

শরৎ মহারাজ এলে মা যত্ন করে রেঁধে খাওয়াতে চেষ্টা করতেন এবং বলতেন, ''শরৎ কলকাতার ছেলে। পোড়া পাড়াগাঁয়ে ভাল ভাল জিনিস পাওয়া যায় না—ছেলেকে কি খাওয়াব?'' আমরা এবং কোয়ালপাড়ার দাদারা—স্বামী কেশবানন্দ (কেদারদাদা), স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরীদা), স্বামী বিদ্যানন্দ (রাজেনদা), বরদা, গগন প্রভৃতি কোতুলপুর থেকে ও আমি কয়াপাটের হাট থেকে সবজি, ফল প্রভৃতি কিনে এনে দিতাম। মা খুবই খুশি হতেন। নলিনীদি (মার ভাইঝি) রান্না করতে গেলে মা বলতেন, ''নলিনী, শরৎ কলকাতার ছেলে। ভাত যেন সুসিদ্ধ হয়, আবার ল্যাকট (গলা) না হয়, তাহলে শরতের খেয়ে আনন্দ হবে না। চচ্চড়ি শুকনো শুকনো হবে—পাড়াগাঁয়ের মতো ঘ্যাঁট হবেনি। পটোল ভাসা তেলে ভাজবিনি। কম তেলে ভাজবি, আর মধ্যে মধ্যে হাতে করে জলের ছিটে দিবি। তাতে পটোলগুলি নরম হবে ও শুঁটকে হবেনি।'' ইত্যাদি। মা নিজেও রান্না করতেন।

মহারাজ দুপুরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করতেন। আমি গা, হাত, পা টিপে দিতাম। কিন্তু পায়ের হাঁটুর উপরে হাত দিতে দিতেন না। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ দিতেন। হাঁটুর উপরে হাত দিতে গেলে বলতেন, "চাদরখানা দে তো।" আমি দিলে কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে বলতেন, "এবার এর উপরে টিপ।" তিনি অতিরিক্ত ভদ্র ছিলেন। আমাকে আঙুল ভাঁজা শিখিয়েছিলেন।

আমি একদিন বললাম, "মহারাজ! আমাকে দয়া করে সন্ন্যাস দিন।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "তুই তো ছেলেমানুষ। সন্ন্যাসের কি বুঝিস? বি. এ. পাস করে আয়। তারপরে যদি চাস তবে সন্ন্যাস নিবি।" আমাকে খুব ভালবাসতেন বলে এত সাহস পেয়েছিলাম যে, আহাম্মকের মতো বলে ফেললাম, "আপনি কি বি. এ. পাস করেছিলেন? আপনি যদি না করে থাকেন, তবে আমাকে কেন দিবেন না?" তিনি বললেন, "পাস করে এলে আমাদের মঠ মিশনের অনেক কাজ করতে পারবি। দেখছিস, বিমল লেখাপড়া জানে বলে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, আরও কত কাজ করে।" আমাকে বলতেন, "একটা বিদ্যে শিখবি? তুই মাটিতে লম্বা চিমটে ফুঁড়বি। আর তরতর করে মাটি ফেটে গঙ্গাজল এসে তোর মুখে পড়বে।" আমি বললাম, "না মহারাজ! ওসব শিখব না।" তিনি বললেন, "কেন রে?" আমি বললাম, "ঠাকুর বলেছেন, ওসব করলে অহংকার হবে, আর ঐসব দিকে মন গেলে ভগবানের দিকে মন যাবে না।" তিনি শুনে খুশি হলেন।

তিনি আমাকে অনেক গল্প বলতেন। একদিন বললেন, "একবার স্বামীজী, আমি ও গঙ্গা (পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী) পাহাড়ে ঘুরছিলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। সঙ্গে পয়সা ছিল না। গঙ্গা আমাদের চেয়ে বেশি বেশি হিমালয়ে ঘুরেছিল। তাই সে বললে, 'দাঁড়ান, আমি ভিক্ষার ব্যবস্থা করছি।' এই বলে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে মাটিতে জোরে জোরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'এ পধান, এধার আও। দেখো সন্ত লোক ভুখে হ্যাঁয়। খিলাও।" লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আটার রুটি, তরকারি, ডাল প্রভৃতি

দিয়ে আমাদের পেট ভরে খাওয়াল। স্বামীজী তো গঙ্গার কাণ্ড দেখে হেসে কুটিপাটি! গঙ্গা বললে, 'এদেশে প্রবাদ আছে, গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহীঁ, পর লাঠ্‌ঠি বেগর্ দেতা নহীঁ। মানে গাড়োয়ালিদের মতো দাতা নাই। কিন্তু তারা লাঠি না দেখালে দেয় না—মানে তারা চায় সাধুরা জোর করে আমাদের সেবা নেবেন।' আর একবার স্বামীজী, রাজা মহারাজ, আমি ও কৃপানন্দ (সান্যাল মশায়) কোথাও যাচ্ছিলাম। মাঠের পথ। পথে একটি টাকা পড়েছিল। প্রথম তিনজন টাকাটি দেখেও চলে গেলেন। সান্যাল মশায় দেখেই হাতে উঠিয়ে বললেন, 'এখানে একটা টাকা পড়েছিল। কোনও গরিব লোককে দেওয়া যাবে।' স্বামীজী বকলেন। বললেন, 'টাকা যেখানে ছিল ফেলে দে সেখানে। আমি টাকাটা দেখেছি, কিন্তু হাতে নিইনি। রাখালও দেখেছে, শরৎও দেখেছে। কেউ হাতে নেয়নি। তুই কেন নিতে গেলি? টাকা ফেলে দে। যার টাকা সে বেচারা যদি খুঁজতে বেরোয় তো পেয়ে গেলে খুশি হবে। নতুবা গরিব লোক পায় তো কুড়িয়ে নেবে।' "

আর একটি মজার গল্প বলেছিলেন, "একবার স্বামীজী, গঙ্গা ও আমি হিমালয়ে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজীর একটু শরীর খারাপ হওয়ায় একটি গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'একটু বেগুনের ঝোল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।' আমরা দুজনে বললাম, 'হাতে নেই পয়সা। ডাল-রুটি ভিক্ষে মিলে না। কোথায় পাব বেগুন?' স্বামীজী বললেন, 'দ্যাখনা, কোথাও পাওয়া যায় কি না।' আমরা দুজনে ঘুরতে ঘুরতে এক সাধুর আশ্রম দেখলাম। সেখানে অনেকগুলি বেগুন গাছও আছে, গাছে বেগুনও হয়েছে। সাধু আমাদের অভিবাদন করে বসালেন ও বেদান্তের প্রকরণের কথা শুরু করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বেদান্তের আলোচনায় যোগ দেওয়ায় তিনি খুব খুশি হলেন। কিছুক্ষণ পরে, 'আমাদের বড় গুরুভাই একটু অসুস্থ। আমরা তাঁর কাছে যাব', বলে তাঁর জন্য দুটি বেগুন ভিক্ষা চাইলাম। কিন্তু তিনি দিলেন না। তাঁর আশ্রমে আমাদের ভিক্ষা নেবার কথা তো বললেনই না। ফিরে স্বামীজীকে বলতে তিনি বললেন, 'তোরা দুজনে আবার যা। একজন তাঁর সঙ্গে বেদান্ত আলোচনা

করবি। আর একজন তাঁর বাগান থেকে বেগুন নিয়ে আসবি। সাধুর বেগুন থাকতে চাইতেও যখন দেননি, তখন জোর করে নিলে কিছু দোষ বা অন্যায় হবে না। যদি হয় সে দোষ বা অন্যায়ের জন্য আমি দায়ী। তোরা যা।' তখন আমি গিয়ে, 'ওঁ নমো নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ' বলে, অভ্যর্থনা করতেই তিনি খুশি হয়ে, আমাকেও অভিবাদন করে ভিতরে ডাকলেন ও আমরা তাঁর বেদান্ত আলোচনায় খুশি হয়ে আবার এসেছি মনে করে আবার বেদান্ত আলোচনা শুরু করলেন। এদিকে গঙ্গা চারটি বেগুন তুলে নিয়ে একটু দূরে এসে জোরে জোরে হাততালি বাজাতেই কার্য উদ্ধার হয়ে গেছে জেনে আমিও সাধুকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে ও ভিক্ষার ব্যবস্থায় বেরোতে হবে বলে সরে পড়লাম। স্বামীজী তো বেগুন পেয়ে হেসে কুটিপাটি! বললেন, 'বেশ করেছিস। এখন দুটি ভাতের চেষ্টা দেখ দিকি।' গঙ্গা ভাত ডাল ভিক্ষা করে আনল তিন মূর্তির জন্য। আমি বেগুনের ঝোল রাঁধলাম। তিনজনে খেয়ে খুব আনন্দ করলাম।''

একদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজের প্রসাদ পাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল। সুযোগ খুঁজছিলাম। কারণ শ্রীশ্রীমার অন্নপ্রসাদ (দুধ বাতাসামাখা ভাত) তো রোজই পেতাম। আর মাকে শরৎ মহারাজের প্রসাদ পাবার কথা বলতেও পারছিলাম না। একদিন সুযোগ জুটে গেল। আমি পুকুরে (পুখুরিয়া) গ্রামের দোকান থেকে আটা, তেল প্রভৃতি কিনতে গিয়েছিলাম। তখন জয়রামবাটীতে একটি মাত্র এত ছোট দোকান ছিল যে, মা আড়াই পোওয়া পোস্ত কিনতে পাঠিয়েছিলেন—চাইতে দোকানদার বলেছিল, ''তোমাকেই আড়াই পোওয়া দিব তো আমি খুচরা বেচব কি? আমার দোকানে মাত্র আড়াই পোওয়া পোস্ত আছে।'' পুকুরে গ্রামে বড় দোকান ছিল। আমি একদিন দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে রাখতেই মা বললেন, ''বাবা রামময়, হাত মুখ ধুয়ে এসে জলখাবার খাও। শরতের পাতেই বস।'' মহারাজ সেই মাত্র জলখাবার খেয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রসাদী ২।১খানি লুচি ও কিছু হালুয়া ছিল। মা আরও কিছু দিলেন। পরে যখন মা মুড়ি দিতে এলেন, তখন আমি বললাম, ''আর মুড়ি চাই না। এতেই হবে।'' মা বললেন, ''তা কি হয় বাবা। দেশের ছেলে দুটি মুড়ি না

খেলে কি পেট ভরে?" এই বলে কিছু মুড়িও দিলেন। আমি খাচ্ছি এমন সময়ে জ্ঞানদা এসে আমাকে বকলেন। বললেন, "তুই বড় হচ্ছিস? না, রোজ রোজ বোকা হচ্ছিস? সেদিন মায়ের পাথরের থালায় বসে খেয়ে থালাখানি এঁটো করে দিলি। এদেশে ঐ থালা পাওয়া যায় না। আজ আবার শরৎ মহারাজের কাঁসার থালাখানা এঁটো করে দিলি?" মা শুনে জ্ঞানদাকে বললেন, "জ্ঞান, তুমি চুপ কর। আমিই রামময়কে শরতের পাতে খেতে দিয়েছি। ছেলে খেলে থালাও নষ্ট হয় না, দোষও হয় না।" এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমার পাথরের থালা এঁটো করার ঘটনাটিও বলা দরকার। ছোটমামি (রাধুর মা) পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বাবা বলতেন। মহারাজ বলতেন, "আমার মেয়েটি বেশ ভাল। তবে মাথাটি একটু গরম হয় মধ্যে মধ্যে।" মামি মুচকি মুচকি হাসতেন ঐ কথা শুনে। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। মধ্যে মধ্যে ডেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সিংহবাহিনীর প্রসাদী ফল, মিষ্টি খাওয়াতেন। শ্বশুরের নাম রামচন্দ্র বলে আমাকে গোপাল বলে ডাকতেন। আবার ভাসুরের নাম বরদা বলে বরদা মহারাজকেও গোপাল বলতেন। মামি একদিন মহারাজকে ও আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে, রান্না করে খাওয়ালেন। মহারাজকে বড় বড় বাটিতে মাছ, সিংহবাহিনীর প্রসাদী মাংস প্রভৃতি দিলেন। পায়েস, মিষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছু ছিল। মহারাজ অল্পই খেলেন। জ্ঞানদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সিলেটি উচ্চারণে প্রায়ই বলতেন, "কি কাইবো (খাব) মহারাজ। আমোদর নদ যদি দুই অইতো (হইতো) ও আতী (হাতি) যদি ফাটা (পাঁঠা) অইতো (হইতো) তো প্যাট (পেট) ভইর্যা (ভরিয়া) কাইতাম (খাইতাম)।" মহারাজ মাছ, মাংস ও পায়েস প্রভৃতি জ্ঞানদার কাছে ঠেলে দিয়ে তাঁরই উচ্চারণ নকল করে বললেন, "কা (খা) জ্ঞান কা।" জ্ঞানদা তো খুব খেলেন। পরের দিন পেটের অসুখ! মহারাজ বললেন, "কি জ্ঞান, আর মাংস কাইবি (খাবি)?" এদিকে ছোটমামি শ্রীশ্রীমার জন্যও নিরামিষ তরকারি ও ডাল-ভাত প্রচুর পাঠিয়েছিলেন। মার থালায় তাই বেশ কিছু প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল। মা বললেন, "আজ বৌমার (মণিবাবু উকিলের মা—মার শিষ্যা) জ্বর হয়েছে। নৈলে সে এই প্রসাদ খেতো।" তখন আমি বললাম, "মা, আমি খাব।" মা, "এস বাবা এস" বলে তাঁরই পাতে আমাকে

বসিয়ে দিলেন এবং বেশ করে ডালভাত মেখে খেতে দিলেন। আমি খাচ্ছি এমন সময় জ্ঞানদা দেখে আমাকে এই মারেন তো সেই মারেন! বললেন, "তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? এদেশে পাথরের থালা পাওয়া যায় না। আর তুই মায়ের থালায় খেয়ে থালাটি এঁটো করে দিলি?" শ্রীশ্রীমা তখন জ্ঞানদাকে খুব বকলেন, "তুমি বাপু চুপ কর। ছেলেকে খেতে দাও। থালায় খেয়ে, ধুয়ে নিলেই শুদ্ধ হয়।" ঠিক সেই সময়েই ছোটমামিও আবার আমাকে খেতে দেখে দুঃখ করে বলতে থাকেন—"ওঃ, গোপাল আমার বাড়িতে পেট ভরে না খেয়ে, আবার তার মায়ের কাছে খেতে বসেছে!" মা তাতে তখুনি জবাব দিলেন—"না, না, ছেলে তোর বাড়িতে পেট ভরেই খেয়েছে। আমাকেও বলেছে—মামি খুব খাইয়েছেন। তবে এখানে প্রসাদ বলে আবার খেতে বসেছে।"

একদিন মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, "রামময়, তুই তো এদিকের পাণ্ডা! বিমলকে কামারপুকুরের সব দেখিয়ে নিয়ে আয়। আর পূজনীয় শিবুদাকে আমার প্রণাম জানাবি।" আমি বললাম, "আচ্ছা মহারাজ, নিয়ে যাচ্ছি। সব দেখিয়ে আনব।" তিনি বললেন, "শিবুদাকে কি করে আমার প্রণাম জানাবি?" আমি বললাম, "বলব, পূজনীয় শরৎ মহারাজ আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।" তিনি শুনে বললেন, "না। তুই তো আগে শিবুদাকে প্রণাম করবি? প্রণাম করে বলবি—শরৎ মহারাজ আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন, এই বলে তুই আমার হয়ে তাঁকে আবার একবার প্রণাম করবি—বুঝলি?" আমি বললাম, "হাঁ মহারাজ, ঠিক ঐভাবেই প্রণাম জানাব।"

আমাদের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক অনুরোধ করে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে আমাদের স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতেই মহারাজের আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল। একটি বড় পালকি ও আট জন বাহকের ব্যবস্থা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছজন আগে পিছে কাঁধ দিয়ে ও দুজন পালাক্রমে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে মাস্টারমশায়ের বাড়ি শ্যামবাজারে নিয়ে গিয়েছিল। আমি পালকির সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলাম। আগে থেকে তালিকা

করে কত রকমের রান্না যে মাস্টারমশায়ের মা ও স্ত্রী করেছিলেন তার অন্ত নেই। বহু ভক্ত ও অভক্তের সমাবেশ হয়েছিল। কেউ কেউ নানা প্রশ্ন করেছিলেন। মহারাজ ধীরস্থিরভাবে তাঁদের এমন উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কেউ কেউ ঠকাবার উদ্দেশ্যেই আজেবাজে প্রশ্নও করেছিলেন। শেষে কিন্তু ভক্তিভরে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিলেন সবাই। শ্যামবাজার থেকে আমাদের স্কুলের দূরত্ব কত, মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, "বড় রাস্তা দিয়ে গেলে এক মাইল ও মাঠ দিয়ে গেলে আধ মাইল।" মহারাজ চুপি চুপি আমাকে বললেন, "তুই আমাকে সঙ্গে করে মাঠের রাস্তায় নিয়ে যাবি। আমি তোর সঙ্গে হেঁটে যাব।" আমি বললাম, "তাহলে মাস্টারমশায় আমাকে বকবেন।" তিনি বললেন, "না, তোকে বকবে না। আমি প্রবোধকে বলে দেব, আমি নিজে একটু হেঁটে পাড়াগাঁয়ের মাঠ দেখতে দেখতে যাব বলে এসেছি।" আসল কথাটি পরে জেনেছিলাম যে বাহকেরা খানিকটা রেহাই পাবে। কারণ আবার তাঁকে তো বয়ে নিয়ে জয়রামবাটী ফিরতে হবে। তাদের কিছুক্ষণ বেশি বিশ্রামও হবে। স্কুলে বিরাট অভিনন্দনের ব্যবস্থা হয়েছিল। বহু লোক এসেছিলেন। আমাদের স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষকমশায় একটি কবিতা সংস্কৃতে রচনা করে হারমোনিয়াম সহযোগে আমাকে ও আর চারজন ছাত্রকে গাইতে শিখিয়েছিলেন। একটু একটু মনে আছে। যথা—"বাসনা গৃহীতমেব যস্য মঙ্গলাগতম্। হর্ষবর্ষণং স দেব এষ মঙ্গলালয়ঃ। জীবনার্পণং বিধায় তং পরং শুভঙ্করম্। লোকতারকং ভজামি রামকৃষ্ণজীবিতম্॥ জীবনার্পণং জীবনার্পণং করোমি সন্ততং প্রভো জীবনার্পণম্। আটটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। আজকাল ৮।১০ বছরের ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে গান, আবৃত্তি ও থিয়েটার করে। কিন্তু লজ্জার কথা আমরা ভয়ে ভয়ে কোন রকমে আবৃত্তিটি করেছিলাম। মহারাজ ফিরে জয়রামবাটীতে ও উদ্বোধনে বলেছিলেন "প্রবোধ বিরাট ব্যবস্থা করেছিল—একেবারে Ovation!"

শরৎ মহারাজ খুব গম্ভীর ছিলেন। কিন্তু রসিকও ছিলেন। একজন আমার চেয়ে বড় ও প্রবীণ সাধু বই কিনবার জন্য মহারাজের কাছ থেকে কিছু টাকা

ভিক্ষা চান। মহারাজ কিছু টাকা দিয়ে বলেন, "প্রথমে পাঁচ টাকা দিয়ে একটি গাধা কিনবি। পরে বাকি টাকা দিয়ে বই কিনবি।"

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাজের সামনেই শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে শ্রীশ্রীমার শিষ্য ললিতদা (শ্রীললিত চট্টোপাধ্যায়) কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও বই কিনে পাঠিয়ে বিনামূল্যে ঔষধ দিবার জন্য ডাক্তারখানা শুরু করেন। শ্রীসজনীকান্ত রায় (জিবটে গ্রামের) প্রথম বিনা বেতনে চিকিৎসা করতেন। চেয়ার টেবিল কিছুই ছিল না। মাটিতে আসন পেতে বসে ঔষধ দিতেন। ললিতদা আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে বলে কখনও থিয়েটার প্রভৃতি দেখিনি জেনে কলকাতায় গেলে দেখাবেন বলেছিলেন। প্রথম যেবার কলকাতা যাই তাঁকে থিয়েটার দেখাবার কথা বলতে যাব এমন সময়ে কিশোরীদা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) ও বরদা (আমার চেয়ে বয়সে ছোট— তখন ব্রহ্মচারী) আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন। ললিতদা বললেন, "তুই একলা গেলে চিঠি দিতাম। সাধুদের থিয়েটার দেখার জন্য চিঠি দিতে শরৎ মহারাজ বারণ করেছেন।" কাজেই যাওয়া হবে না মনে করে উদ্বোধনে বসে আছি দেখে পূজনীয়া যোগীন-মা বললেন, "রামময়! তুমি আজ থিয়েটার দেখতে যাবে বলেছিলে না? তবে এখনও এখানে বসে আছ কেন? থিয়েটার যে আরম্ভ হয়ে যাবে?" তিনি আমার জন্য এত চিন্তা করায় ও আমি তো তাঁর নাতির বয়সী ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আমাকে জানেন?" তিনি যেমন টেনে টেনে কথা বলতেন তেমনই বললেন, "তো-মা-কে আবার চি-নি-না? তুমি জয়রামবাটীতে মার ডান হাত। সর্বদা মা সব কাজে রামময়কে ডাকেন।" তখন তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, "পাড়াগেঁয়ে ছেলে। বোকা ছেলে। বুদ্ধি নেই। থিয়েটার দেখবে তো ললিতের ন্যাজ ধরতে গেলে কেন? শরৎ চিঠি লিখে দিলে অপরেশ তোমাদের গুরুর মতো ভক্তি করে দেখাবে।" শরৎ মহারাজ শুনে বললেন, "ছেলে বোকা নয়। বুদ্ধি খুব আছে। কিন্তু শরৎ মহারাজকে থিয়েটার দেখার কথা বলে কি করে?" তিনি কিরণদাকে (স্বামী অশেষানন্দ) লিখতে বললেন। "প্রিয় অপরেশ, এই তিনজন" বলে মহারাজ

চুপ করায় লেখক "পরে কি লিখব বলুন" জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "সাধু, লিখে দে—(রামময় সাধু হবেই)—থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। এদের দেখার ব্যবস্থা করে দিও।" অপরেশবাবু আমাদের খুব যত্ন করে বেশি দামের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। শেষ হলে কিছু জলযোগও করালেন।

একদিন উদ্বোধনে বিশেষ পূজা হচ্ছে। বাসুদেবানন্দ মহারাজ পূজক ও আমি পূজার জোগাড় দিচ্ছি। শরৎ মহারাজ ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে সব বলে দিচ্ছেন। মধুপর্ক তৈরির জন্য তাঁর মধুর বোতল আনতে বলে দিলেন, "আমার ঘর থেকে বেরিয়ে দেওয়ালে যে কাঠের তাকগুলি আছে তার মাঝের তাকের বাঁদিক থেকে তৃতীয় বোতলটি মধুর বোতল।" আমি ভাল করে না শুনেই গিয়ে ফিরে এসে বললাম, "মধুর বোতল পেলাম না।" তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "তোর কি শোনবার ধৈর্য আছে? বলতে না বলতেই মারলি ছুট! কি করে পাবি?" তিনি আবার ভাল করে বলে দিলেন ও বোতলটি আনতে খুশি হলেন। দই, দুধ, ঘি, মধু ও চিনি কেমন করে মিশাতে হবে বলে, একটু জল দিতে হবে বললেন। শুনেই বাসুদেবানন্দ মহারাজ বললেন, "না জল দিতে হবে না।" মহারাজ তাঁকে জোরে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমিই সব জান। আমরা কিছু জানি না।" আমি একটু জল দিলাম। পরে শব্দকল্পদ্রুম বের করে দেখলাম তাতে 'কিঞ্চিজ্জলম্' লেখা আছে। একদিন শরৎ মহারাজের জন্মদিনে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ ভোরে উদ্বোধনে এসে মহারাজকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে বললেন, "দাদা, আজ আপনার চেলা-চেলিরা আপনাকে অনেক প্রণামী দেবে। সেগুলি সব আমার গরিব আশ্রমের জন্য দিতে হবে।" মহারাজও হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা গঙ্গা, আজ তুই সব টাকা পাবি।" সব টাকা তাঁকে দিলেন।

একবার মা কোয়ালপাড়ায় বেশ কয়মাস ছিলেন। মার জ্বর কয়েক দিন ধরে চলায় শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, ভক্ত ডাঃ কাঞ্জিলাল ও শরৎ মহারাজের ভাই ডাঃ সতীশবাবু প্রভৃতি এসেছিলেন ও কিছুদিন ছিলেন। মা একটু সুস্থ হলে ডাক্তাররা ফিরে গেলেন। মা একটু ভাল বোধ করায়

মহারাজ একদিন মাকে কলকাতা যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা করেন। কিন্তু মা যেতে রাজি হলেন না। তিনি জগদম্বা আশ্রম থেকে বিফল মনোরথ হয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। যোগীন-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শরৎ? মা কি বললেন?" মহারাজ দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "না, তিনি যাবেন না। এখানেই দেহ রাখবেন।" তখন যোগীন-মা বললেন, "ছিঃ ছিঃ শরৎ অমন কথা মুখে আনতে আছে?" তিনি আবেগভরে বললেন, "তা কি করব? যাঁকে ভালবাসি, ভক্তি করি, তিনি ভাল কথা না শুনলে এমন কথাই মুখ দিয়ে বেরোয়। এখানে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, ভীষণ ম্যালেরিয়ার জায়গা। কি করে সারবেন?" বারবার অনুরোধ করায় এবং যোগীন-মা ও গোলাপ-মা প্রভৃতি বিশেষ জিদ করায় শেষে মা রাজি হওয়ায় সকলের আনন্দ। মা জয়রামবাটী এসে কয়েকদিন থেকে পরে কলকাতা গেলেন। কোয়ালাপাড়ায় থাকাকালীন আমি ও গোপেশদা পুণ্যপুকুর থেকে কয়েকটি মাছ ধরেছিলাম। ঐগুলি নিয়ে গিয়ে মাকে দেখাতে খুব খুশি হলেন ও বললেন, "বাবা, আজ নিয়ে এলে? সতীশ ও কাঞ্জিলাল চলে গেল। আনন্দ করে খেত। তা শরৎ আছে, খাবে।" মহারাজ মাছ দেখে খুব খুশি হলেন। মহারাজের অপূর্ব ধৈর্য! তিনি দিনের পর দিন কোয়ালপাড়ায় দাদাদের কি কষ্টে যে "খণ্ডন ভব বন্ধন" প্রভৃতি সুরে ও তালে শিখিয়েছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। এক এক জনের এক এক রকম গলা! কিন্তু তিনি শিখিয়ে তবে ছাড়লেন। একদিন যোগীন-মা এক গেলাস জল চাইলেন। বলে দিলেন, "আধ গেলাস আনবে।" আমি গেলাস বেশ করে মেজে ধুয়ে ভর্তি করে জল দিতেই বললেন, "ছেলের বুদ্ধি নেই। আধ গেলাস আনতে বললুম। গেলাস ভর্তি করে এনেছে। শরৎ, তুমি একটু খেয়ে কমিয়ে দাও।" শরৎ মহারাজ এঁটো না করে কিছু খেয়ে কমিয়ে দিলেন। তখন তিনিও মুখ না ঠেকিয়ে জল খেলেন। আমি বললাম, "আপনি মুখ ঠেকিয়ে আরাম করে খাবেন ও আমি গেলাসটা মেজে ধুয়ে আনব বলে ভর্তি করে আনলাম। আপনি তেমন করে খেলেন না।" তখন মহারাজ বললেন, "দেখলে? ছেলের বুদ্ধি নেই বলছিলে? সে তোমার সেবা করতে চায়। তুমি তা দিলে না।"

একদিন কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটী ফেরবার সময় মা আমাকে কিছু সবজি দিলেন। তখন জয়রামবাটীতে আমি ও গোপেশদা থাকি। সবজিগুলি দেখে পূজনীয় রাসবিহারীদা কেবল পটোল নিয়ে যেতে বললেন, বাকি চেলো (খেড়ো) প্রভৃতি সাধারণ সবজিগুলি কোয়ালপাড়া মঠের জন্য রাখতে চাইলেন। কিন্তু রাজেনদা (স্বামী বিদ্যানন্দ) ও কিশোরীদা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) বললেন, "এসব মা তোমাকে জয়রামবাটী নিয়ে যাবার জন্য দিয়েছেন। আমরা তাই রাখব না।" এই নিয়ে খানিকক্ষণ ঠেলাঠেলি হয়। তখন শরৎ মহারাজ রাসবিহারীদাকে খুব বকেন। যাই হোক, আমি সব জিনিসগুলিই জয়রামবাটীতে নিয়ে আসি। উদ্বোধনেও যখন গোলাপ-মা ও গণেন মহারাজের মধ্যে কোনও তর্ক হতো, তখন মহারাজ জোরে ধমক দিতেন ও বলতেন, "যেমন গোলাপ-মা তেমনি গণেন। দুজনেই সমান।" ব্যস, উদ্বোধন ঠাণ্ডা! একদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার তিথিপূজার দিনে—মনে হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আমরা যারা কাজ করছিলাম তাদের জন্য মহারাজ আমার হাতে দুটি টাকা দিয়ে বললেন, "রামময়, বাগবাজার স্ট্রিটের অমুক দোকান থেকে খাবার কিনে নিয়ে আয়।" তখন এক পয়সায় বড় বড় কচুরি শিঙাড়া ও দু-পয়সায় বড় বড় রসগোল্লা, পান্তুয়া পাওয়া যেত। দু-টাকায় এক ঝুড়ি খাবার এনে মহারাজকে দেখাতেই বললেন, "যা, ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তোরা যারা যারা কাজ করছিস, প্রসাদ ভাগ করে খা।" আমি বললাম, "আমি ভোগ দিতে জানি না।" মহারাজ বললেন, "খাবার ঝুড়িটি ঠাকুরের সামনে রেখে ঢাকনা খুলে ঠাকুরকে প্রণাম করে জোড় হাত করে বলবি, 'ঠাকুর দয়া করে খান।' পরে একটু চোখ মুদে জপ করবি। পরে আবার প্রণাম করে নিয়ে আসবি।" আমি তাই করলাম ও সকলে আনন্দ করে প্রসাদ পেলাম। জয়রামবাটীতে একদিন বিকালে শরৎ মহারাজ জল খেতে চাইলেন। মাকে বলতে তিনি এক গেলাস জল দিলেন। আমি 'শুধু জল দিব' বলায় মা বললেন, "শরৎ এখন শুধু জলই খায়।" আমার পা চলছে না দেখে মা একটি ছোট রেকাবিতে একটি সন্দেশ দিলেন। মহারাজ দেখেই বললেন, "তোকে জল আনতে বললাম। তুই আবার মিষ্টি আনলি কেন?" আমি বললাম, "কেউ জল খেতে চাইলে আমরা শুধু জল

দিই না। একটু মিষ্টি দিই।" তখন তিনি শুধু জল খেলেন ও মিষ্টিটি আমাকে খেতে বলায় আমি খেয়ে ফেললাম।

মার ভাইঝি মাকুদির ছেলে নেড়া তখন খুব ছোট। আমাকে রাম্মো মামা বলত। মহারাজ আমাকে বললেন, "নেড়ার বগনমামাকে জানিস?" গগনমামা বলতে পারত না। নেড়ার Diphtheria রোগ হওয়ায় বাঁকুড়ার পূজনীয় ডাক্তার মহারাজ বশীদার ভাইপো কালোকে (ডাকনাম কালু) কলকাতা থেকে Serum কিনে আনতে পাঠালেন। পাঁচ হাজার বা তার চেয়ে বেশি unit-এর আনতে বলেছিলেন। সে বি. কে. পালের দোকান থেকে পাঁচ হাজারের বেশি না পেয়ে তাই কিনে আনে। কিন্তু তখন রোগ বেড়ে গেছে। ওতে কাজ হলো না। নেড়া মারা গেল। মা দুঃখ করে বললেন, "কালো কলকাতা গেল আর শরতের সঙ্গে দেখা করেনি জেনেই বুঝেছি ছেলে আমার বাঁচবেনি। নইলে কালোর এমন বুদ্ধি কেন হলো?" পরে জানা গেল মহারাজ কলকাতায় বড় বড় ঔষধের দোকানে আগে থেকেই খোঁজ করিয়ে Frank Ross-এর দোকানে দশ হাজার unit পর্যন্ত ছিল জেনে রেখেছিলেন। একবার আমার একটু পেটে কিছুদিন ধরে ব্যথা হচ্ছিল, (তখন আমি ব্রহ্মচারী গোপালচৈতন্য) উদ্বোধনে গিয়ে কয়েক দিন থেকে চিকিৎসা করাব বলে মহারাজের অনুমতি চেয়েছিলাম ও গণেন মহারাজ আমাদের ওখানে ২।৩ দিনের বেশি থাকা পছন্দ করেন না লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, "তুমি অবশ্যই আসবে ও যতদিন ইচ্ছা থাকবে। আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাব। গণেন বা অন্য কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। আমি বলে দিব। আমি জানি তুমি মার কত সেবা করেছ—তারা জানে না।" তিনি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় কয়দিনেই সেরে যাই। ফেরবার সময়ে যেদিন ভোরে রওনা হব তার আগের দিন রাত্রে মহারাজকে প্রণাম করে বলতেই তিনি বললেন, "তুই তো সেরে গেছিস এই কথা আমাকে বলিসনি। বেশ খুশি হলাম শুনে।" তখন তাঁর সেবক সাতুকে (স্বামী অসিতানন্দকে) বললেন, "ওরে সাতু, রামময় যে ভোরে জয়রামবাটী রওনা হবে। মার বাড়ি থেকে খালিমুখে যাবে?" সাতু উত্তর দিল, "না, বাল্যভোগের প্রসাদি সন্দেশ ও পাউরুটি দেব।" তিনি শুনে খুব খুশি হলেন।

উদ্বোধনে পূজ্যপাদ সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দজী) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাঠ করবেন। আরম্ভ করার আগে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরম্ভ থেকেই পাঠ করব? না প্রথম দিকটা বাদ দিয়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করব?" মহারাজ বললেন, "তুমি আচার্য। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান দরকার। যাতে সেটি হয় তাই কর।" তিনি তৃতীয় ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করলেন।

মহারাজ যখন স্বামীজীর সঙ্গে লন্ডনে ছিলেন তখন স্বামীজী বক্তৃতা দিতেন, তিনি রান্না করতেন ও ঘরের কাজ করতেন। স্বামীজী তাঁকে বক্তৃতা দিতে বললে তিনি রাজি হতেন না। একদিন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছেন, "স্বামী সারদানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।" কাগজ এনে দেখালেন। মহারাজ তো খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বক্তৃতা করতে পারবেন না বলায় স্বামীজী অনেক বুঝালেন ও বললেন, "আমি একা খেটে খেটে মরে যাচ্ছি। তুইও আমার কাজে সাহায্য কর।" তথাপি রাজি না হওয়ায় স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তোকে কিছু করতে হবে না। বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে একটু ঠাকুরকে চিন্তা করে নিবি। তারপর তিনিই তোর মুখ দিয়ে যা বলাবার বলাবেন।" একদিন সেই প্রসঙ্গটি শরৎ মহারাজ বলেছিলেন ঃ "বাধ্য হয়ে তখন রাজি হলুম। স্বামীজী ঐ সভার সভাপতি। আমার খুব ভয় করতে লাগল। থতমত খাচ্ছি দেখে স্বামীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখ লাল ও আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তখন আমার দিকে তাকাতেই আমার মনে পড়ল ঠাকুরকে চিন্তা করতেই ভুলে গেছি। তখন চোখ মুদে ঠাকুরকে চিন্তা করার পর আমি বেশ বলতে লাগলাম। স্বামীজী খুশি হলেন ও 'তুই বাসায় যা। আমি একটু বেড়িয়ে ফিরব' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ওদেশে খবরের কাগজে সব খবর খুব ঝটপট বেরিয়ে যায়। স্বামীজী ২।৩খানা কাগজে আমার বক্তৃতার কিরূপ প্রশংসা করেছে এনে দেখালেন। ব্যস, আমার সাহস বেড়ে গেল। বেশ বক্তৃতা করতে লাগলাম। স্বামীজীও খুব খুশি হলেন।"

একদিন আমি উদ্বোধনে মহারাজের কলম দোয়াত নিয়ে চিঠি লিখেছি। তখন আজকালের মতো ফাউন্টেন পেন (fountain pen) বের হয়নি। কাঠের

তৈরি কলমের (pen holder-এর) মুখে নিব লাগিয়ে দোয়াতে কালি রেখে লেখা হতো। আমরা এক পয়সায় ৬টি 'G' মার্কা নিব কিনতাম। মহারাজও ঐ নিব ব্যবহার করতেন। তিনি লেখাপড়া করে ঐ নিবটিও জলে ধুয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে রাখতেন। তিনি লিখতে আরম্ভ করেই বললেন, "কে আমার কলম দোয়াত ঘেঁটেছে রে?" আমি দোষী (culprit) কাছেই বসেছিলাম। বললাম, "মহারাজ, আপনার কলম আমি ব্যবহার করেছি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?" তিনি বললেন, "তুই তো আহাম্মকের মতো কলমের মাথা এদিকে ওদিকে রেখেছিস। আমার কালো ও লাল কালির কলমগুলির মাথা একদিকে থাকে। আর তুই কালি সমেত নোংরা কলমই রেখেছিস। কাজেই বুঝলাম, আনাড়ি কেউ কলম না ধুয়েই এদিকে ওদিকে রেখেছে।" আমরা মহারাজের কলমে লিখতে ভরসা পেতাম। কিন্তু গণেন মহারাজের দোয়াত কলমে হাত দিতে ভয় করতাম।

মহারাজ কেমন করে তামাক খাওয়া ধরেছিলেন, তা একদিন বলেছিলেন। তামাক ধরিয়ে দিতে গিয়ে তামাক খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। বলেছিলেন, "তা কার তামাক ধরাতে গিয়েছিলাম—স্বয়ং স্বামীজীর!" কী শ্রদ্ধা স্বামীজীর উপর! বললেন, "স্বামীজী বলতেন, 'কেউ তামাকটা একটু ধরিয়ে দেয় না!' তাই একটু একটু টেনে ধরাতে ধরাতে তামাক খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল।" সান্যাল মশায় রোজ সন্ধ্যাবেলা মহারাজের কাছে আসতেন ও অনেকক্ষণ বসে থেকে পরে বাড়ি যেতেন। আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। তিনি এলে কেউ তামাক সেজে দিত। মহারাজ একটু দেরিতে নামতেন। একদিন দেখেন তখনও কেউ তামাক দেয়নি। তিনিও তামাক দেবার জন্য কাউকে বলেননি। মহারাজ বললেন, "ওরে তামাক সেজে দে। আমি থাকতেই যে সান্যাল কলকে পাচ্ছে না রে।" একবার মহারাজ তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। আমাকে বললেন, "রামময়, তুই তো মায়ের ভাণ্ডারি। কোথায় কি আছে সব জানিস। মায়ের ভাণ্ডারে অনেক মধু আছে না?" আমি বললাম, "হাঁ আছে।" মহারাজ বললেন, "আমি কবিরাজি ওষুধ খাব। একটু মধু লাগবে। তুই মায়ের ভাঁড়ার

থেকে এক বোতল মধু চুরি করে আনবি তো।" আমি বললাম, "হ্যাঁ মহারাজ, নিয়ে আসব।" আমি যখন মধু বের করছিলাম মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করছ?" আমি বললাম, "শরৎ মহারাজ মধু দিয়ে কবিরাজি ওষুধ খাবেন, তাই আমাকে বলেছেন এক বোতল মধু চুরি করে নিয়ে যেতে।" মা শুনে বললেন, "চুরি করতে হবে কেন বাবা? শরৎকে কি আমার কিছু অদেয় আছে? আরও নিয়ে যাও। শরৎ আমার দেবের দুর্লভ ধন! সে মধু খাবে। মধুরও ভাগ্য—যে ভক্ত দিয়েছে তারও ভাগ্য। আমি তো গুড়ের মতো খামছা, খামছা মুড়ির সঙ্গে ছেলেদের খেতে দিই। মহারাজ মধু পেয়ে খুব খুশি হলেন।

বাংলা ১৩৩০ সালের (১৯২৩ খ্রিঃ) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ। বহু ভক্ত নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। বিরাট উৎসব। সারাদিন ধরে ও রাত্রি ১০টা পর্যন্ত 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' প্রসাদ বিতরণের ধুম চলেছিল।

পূজনীয় কপিল মহারাজ পূজা করেছিলেন। মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) শ্রীশ্রীমার বিরাট তৈলচিত্র মন্দিরের বেদিতে বসালেন ও অর্ঘ্য, অঞ্জলি দিলেন। বহু ভক্ত নরনারীকে তিনি দীক্ষাও দিয়েছিলেন। রাত্রে কালীপূজা হলো। পরে বিরজা হোম করে কয়েকজনকে ঐ রাত্রেই তিনি সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যও দিয়েছিলেন। বিভূতির (হংসেশ্বরানন্দের) প্রার্থনায় তাকে প্রথমে দীক্ষা এবং পরে রাত্রে ব্রহ্মচর্য দানে কৃতার্থ করেছিলেন। মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, "একেবারে ডবল প্রমোশন?"

ঠাকুর ও মার ভোগের জন্য ভাল চাল আনা হয়নি। সাধারণ চালের ভাত হবে জেনে স্বামী ভূমানন্দজী কিশোরীদা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী)-কে বকাবকি করছেন জেনে মহারাজ ভূমানন্দজীকে ধমক দিয়ে বললেন, "এক সপ্তাহ আগে তো এসেছ। আগে থেকে এসব দেখলে না কেন? কলকাতা থেকে কত লোক এল। ভাল আতপ চাল আনিয়ে নিতে পারলে না? ঠাকুর, মা এখানে রোজ যে চালের ভাত খান তাই ভোগ হবে।" ব্যস, সকলে চুপ। শ্রীশ্রীমাও সাধারণ সিদ্ধ চালের ভাত সশরীরে থাকাকালে বরাবর খেতেন। তাই বাসমতী আতপ

চাল আনাবার কথা কারও মনে পড়েনি। মহারাজ শুনে খুব হাসলেন। পূজা, হোম প্রভৃতি শেষ হলে মহারাজ প্রায় বিকাল ৩টায় শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়িতে মার ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে বসলেন। সেবক সাতু (স্বামী অসিতানন্দ) নারকেলভাজা, বড়িভাজা, পটোলভাজা প্রভৃতি দিয়ে পাতে চেলো (খেড়ো)-র তরকারি দিতেই মহারাজ খুশি হয়ে খেতে লাগলেন ও বললেন, "তোর শুকনো ভাজাভুজিগুলি খাব না। এই তরকারি বেশ ঠাণ্ডা।" অথচ তখন ঐ সবজি টাকায় পাঁচ মন পাওয়া যেত। অনেকটা লাউয়ের মতো স্বাদ। তবে গরমের দিনে খেতে বেশ লাগে।

কী কষ্টে যে মহারাজ জয়রামবাটীতে কাটাতেন, তা ভাবলে দুঃখ হয়। হেঁটে আমোদরে গিয়ে স্নান সেরে, যেখানে আমোদর উত্তরবাহী সেইখানে তীরে একটি আমলকী গাছের তলায় বসে তিনি জপ-ধ্যান করতেন। মহারাজ সেখানে গীতা পাঠও করতেন। ফিরে এসে তিনি জলযোগ করতেন। যোগীন-মা, গোলাপ-মাকেও ঐভাবে আমোদরে গিয়ে স্নানাদি করতে হতো। মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে যখন ফিরে যাবেন তখন মেজোমামাকে (কালীমামাকে) মহারাজ নমস্কার করলেন। মামা বললেন, "বাবা, আবার আসবে।" মহারাজ দুই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "ঠাকুরের ও মায়ের ইচ্ছা।" যোগীন-মা নমস্কার করতেও মামা আবার আসবার কথা বলায় তিনি বললেন, "না, মামা। আর আসব না। জন্মের মতো মার জন্মভূমি দর্শন করে গেলাম।" মামা বললেন, "ছি ছি! মা! ওকথা বলতে আছে? আবার আসতে হবে।" যোগীন-মা বললেন, "না মামা, আর আসতে পারব না।" দুখানি গোযান তৈরি ছিল। একখানিতে যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও অপরখানিতে মহারাজ উঠলেন। তাঁরা প্রথমে কামারপুকুর গেলেন। পরে কলকাতা যাবেন। গোযানে বিষ্ণুপুর গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া যাবেন। সেদিন সকালে রওনা হওয়ার জন্য মহারাজ মন্দিরের কাছের কুয়ার জলে স্নান করলেন। আমি বালতি বালতি জল তুলে তাঁর মাথায় গায়ে ঢালতে লাগলাম। তিনি খুব আনন্দ করে স্নান করলেন। সেদিন আমোদরে যাবার সময় ছিল না।

মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে মহারাজ সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের এক একখানি বস্ত্র দান করেন। মঠের সাধুরা খুব আনন্দ করেন। সকলকে মিলের ধুতি দিয়েছিলেন। কেবল আমি কংগ্রেসী—মহাত্মা গান্ধীর মতাবলম্বী জেনে আমাকে খদ্দরের কাপড় দিয়েছিলেন। কাপড়ে নিজ হাতে নাম লিখে এনেছিলেন—'রামময়।' একবার উদ্বোধনে আমার পকেট ছুরিটি 'pen knife' একটি ছেলে পেন্সিল কাটবার জন্য নিয়ে আমাকে দিতে ভুলে গিয়েছিল। তখন টাকায় চারটি কাঞ্চননগরের ঐরূপ ছুরি পাওয়া যেতো। ঐ ছুরি মহারাজ নিয়ে একটি খামে ভরে উপরে 'রামময়—গোপালচৈতন্যের ছুরি' লিখে রেখেছিলেন ও এক ভক্তের হাতে মনে করে জয়রামবাটীতে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কত স্নেহ! একদিন জয়রামবাটীতে মহারাজের কাছে বসে আছি। এমন সময়ে আমার প্রধান শিক্ষকমশায় মহারাজকে বললেন, "পাড়াগেঁয়ে স্কুল চালানো বড়ই কঠিন। ছাত্রসংখ্যা কম। সরকারি সাহায্যও নিতান্ত কম। ছাত্রদের বেতন থেকে শিক্ষকদের বেতন দিতে কুলায় না—ইত্যাদি।" তখন মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রবোধ, তোমার ভাল ভাল ছাত্রদের ধর না। তারা লেখাপড়া শিখে এসে কিছুদিন করে তোমার স্কুলে বিনা বেতনে বা সামান্য বেতনে কাজ করে দেবে।" আমি ঐ কথা শুনেই পরদিন মাস্টারমশায়ের কাছে লিখে দিয়েছিলাম, "আমি পড়াশুনা করে পাঁচ বৎসর স্কুলে বিনা বেতনে কাজ করব।"

সামান্য কিছুদিন বাকি ছিল এমন সময়ে স্বামীজীর তিথিপূজায় বেলুড় মঠে মহারাজ ব্রহ্মচর্য ও দীক্ষা দেবেন জেনে (পূজ্য মহাপুরুষ মহারাজ তখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন) আমিও কলকাতায় উদ্বোধনে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে ব্রহ্মচর্যের প্রার্থনা জানাই। তিনি বললেন, "তুই তো তোর স্কুলে মাস্টারি করিস। পাঁচ বছর শেষ হয়েছে?" আমি বললাম, "না, এখনও হয়নি। কিছুদিন বাকি আছে।" তখন তিনি বললেন, "তবে সেটা সেরে এসেই ব্রহ্মচর্য নিবি।" আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আপনি আমাকে ব্রহ্মচর্য দিচ্ছেন—এ কথা জানিয়ে খুব আগ্রহ দেখাতে থাকি। আমাকে দয়া করে দিতেই হবে বলায় মহারাজ শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। আর বলে দিলেন, "মঠে গিয়ে সুধীরকে (পূজ্যপাদ স্বামী

শুদ্ধানন্দজীকে) বলবি যেন সব ঠিক করে রাখে। আমি কাল সকালে মঠে যাব। বিকালে ব্রহ্মচর্য হবে।'' আমি ফিরে পূজনীয় সুধীর মহারাজকে সব বললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমিও ব্রহ্মচর্য নেবে নাকি?'' আমি বললাম, ''আজ্ঞা হাঁ। আমি শরৎ মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি মঞ্জুর করেছেন।'' আমি সকালে শিখা রেখে মাথা কামিয়ে তৈরি হয়েছি দেখে কেউ কেউ বললেন, ''কেবল শরৎ মহারাজ বললেই হবে না। তুমি কি সুধীর মহারাজের অনুমতি নিয়েছ?'' আমি বললাম, ''তাঁকে বলেছি যে শরৎ মহারাজ রাজি হয়েছেন।'' তাঁরা বললেন, ''সুধীর মহারাজও রাজি না হলে মহারাজের কাছে তোমার নাম দেবেন না।'' আমি বড়ই চিন্তায় পড়লাম। কেবল অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন মহারাজ মঠে আসেন। তিনি প্রায় ১০টার সময় একজন ভক্তের গাড়িতে এসে মঠে নামতেই আমি প্রথমে আমার নেড়া মাথা দেখালাম। তিনি ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করে পূজ্য মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বসলেন। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাকে কেউ দেখতে না পান, এমন জায়গায় ঘড়িটির নিচে দাঁড়ালাম। প্রথমেই আমার কথা উঠল। পূজনীয় সুধীর মহারাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি বললেন, ''রামময় ব্রহ্মচর্য চায়। তাকে তো আমরা বহুদিন ধরে জানি। বেশ ভাল ছেলে। শ্রীশ্রীমার অনেক সেবা করেছে। তবে সে নাকি তার স্কুলে মাস্টারি করে। তাই আমাদের ইচ্ছা সে ঐটি শেষ করে এসে ব্রহ্মচর্য নেবে ও মঠে এসে যোগ দেবে।'' মহারাজ বললেন, ''রামময়ের কথা ছাড়। সে কাল আমার কাছে গিয়েছিল। আমি তাকে বলে দিয়েছি তার ব্রহ্মচর্য হবে। সে তো তার স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষকের কাজ করছে। টাকা রোজগার করার জন্য তো কাজ করছে না? আমাদের দেওঘরের বিদ্যাপীঠেও তো সাধু ব্রহ্মচারীরা স্কুলে পড়ায়। কাজেই সেও পড়ালে কোনও দোষ হবে না।'' আর একজনের কথা উঠল। তার সম্বন্ধে পূজনীয় সুধীর মহারাজ বললেন, ''ছেলেটি তো বেশ ভাল। তবে এখনও ছেলেমানুষ। আরও বড় হয়ে নেবে।'' মহারাজ বললেন, ''ছেলেমানুষ ব্রহ্মচর্য নেবে না তো কি তোমার আমার মতো বুড়োরা ব্রহ্মচর্য নেবে?'' পরে

একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "কাল যে রামময়ের হাতে সব ঠিক করে রাখতে বলেছিলাম তার কি করেছ? কেবল কি ঘি, কাঠ, বেলপাতা জোগাড় করে রেখেছ?" আর একজন অন্ধের ব্রহ্মচর্যের কথায় পূজনীয় সুধীর মহারাজ বললেন, "অন্ধ, চোখে দেখে না।" মহারাজ বললেন, "ব্রহ্মচর্যের জন্য চোখের কি দরকার?" যা হোক এই দুইজনের আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য হয়নি। পরে হয়েছিল। পরে অন্যদের কথা উঠতেই আমি নিচে চলে এসে নিশ্চিন্ত হলাম। যথাসময়ে আমার ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয়ে গেল। মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমার গোপাল জেনে ব্রহ্মচারী গোপালচৈতন্য নাম দিলেন।

পূজ্য রাজা মহারাজের দেহত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট কে হবেন স্থির করার জন্য ভোটে পূজ্য মহাপুরুষ মহারাজ অপেক্ষা শরৎ মহারাজই ভোট বেশি পান। সকলে তাঁকেই প্রেসিডেন্ট হবার জন্য অনুরোধ করলেও তিনি কিন্তু হলেন না। তিনি বললেন, "তারকদাই প্রেসিডেন্ট হবেন। স্বামীজী আমাকে সেক্রেটারি করে গেছেন। যতদিন পারব এই কাজই করব।"

উদ্বোধনে মহারাজ আমাদের সঙ্গেই বসে দুপুরে প্রসাদ পেতেন। উপরে ঘণ্টা পড়ে গেছে। মহারাজ তখনও নিচের ঘরে বসে লীলাপ্রসঙ্গ লিখছেন। দেরি দেখে গোলাপ-মা জোরে জোরে বলছেন, "কি শরৎ আবার নিজ মূর্তি ধরছ নাকি?" মহারাজ, "না, গোলাপ-মা, এখনই আসছি" বলেই তাড়াতাড়ি লেখার সরঞ্জাম গুটিয়ে উপরে গিয়ে প্রসাদ পেতে বসলেন। একদিন বাজার থেকে চন্দ্র পচা মাছ কিনে এনেছিল। কেউ খেতে না পারায় মহারাজ চন্দ্রকে এমন ধমক দিলেন যে সারা উদ্বোধন নিস্তব্ধ! বললেন, "ভালো পোনা মাছ বাজারে না পেলে ভেটকি বা অন্য মাছ আনবে। তবু পচা মাছ আনবে না।" আমরা যখন তাঁর সঙ্গে বসে খেয়েছি তখন তিনি বৃদ্ধ। কাজেই খুবই কম খেতেন। একদিন নানারকম তরকারি খাওয়ার কথা চলছে। কেউ বলছেন, "কচি বাঁশের কোঁড়ের ডালনা কেউ খেয়েছেন?" কেউ বলছেন, "কচি অশ্বত্থ পাতার ঘণ্ট কেউ খেয়েছেন? ইত্যাদি।" তখন মহারাজ "কেউ পোস্তের কালিয়া খেয়েছে?" সকলেই বললেন, "না খাইনি।" তখন মহারাজ বললেন, "আমি

খেয়েছি।" জানি না এইটি শ্রীশ্রীমাও খেয়েছিলেন কি না। কারণ তিনি একদিন বলেছিলেন, "কালী যে পোস্ত রেঁধে খাইয়েছিল তা যেন এখনও আমার জিবে লেগে আছে।" এই কালী কি স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ? অথবা কাঁকুড়গাছির স্বামী যোগবিনোদ মহারাজ? কারণ কালীমামা রাঁধতে জানতেন না। হয়তো বিশেষ অসুবিধায় পড়লে বা বাইরে গেলে ডাল-ভাত রেঁধেছিলেন। কিন্তু পাকা রাঁধুনি ছিলেন না। মাকে জিজ্ঞাসাও করিনি—কোন্ কালী?

প্রথম যুদ্ধের সময় সম্ভবত ইংরেজি ১৯১৬-তে একদিন উদ্বোধনে গণেন মহারাজ হুকুম জারি করলেন, "চিনির দাম অনেক হয়েছে। টাকায় এক সের। কাজেই কাল থেকে সকলকে লবণ দিয়ে চা খেতে হবে। চিনি দেওয়া হবে না।" মহারাজ তামাক খাচ্ছিলেন, ভুড়ুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "বাবা, ছোটবেলা থেকে এতখানি বয়স হলো, বুড়ো হয়েছি—বরাবর মিষ্টি চা-ই খেয়ে এসেছি। লবণ দিয়ে চা খেতে পারব না। দেশি গুড় এখনও সস্তা আছে। চারআনা সের। আমাকে একটু গুড় দিয়েই চা করে দিও।" আর লবণ দিয়ে চা খাওয়া কারো হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রণেতা পূজনীয় অক্ষয়কুমার সেনের কাছে আমি খুবই যেতাম। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি যতটুকু পারতাম তাঁর সেবা করতাম। একবার তিনি বলেছিলেন, "একদিন উদ্বোধনে গেছি। শরৎ-ঠাকুর (তিনি বয়সে বড় কিন্তু গৃহী—তাই মহারাজকে শরৎ-ঠাকুর বলতেন) কতকগুলি বই যত্ন করে প্যাক করিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'মাস্টারমশায়, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী—লীলাপ্রসঙ্গ লিখেছি পড়ে দেখবেন।' ভাই, বইগুলি এনে ঘরেই রেখে দিয়েছিলাম। মনে মনে অহঙ্কার হয়েছিল—ঠাকুরের বই লিখেছেন মাস্টারমশায়—শ্রীম এবং আমি লিখেছি। এঁরা আবার কি বই লিখবেন? একদিন হঠাৎ মনে হলো সন্ন্যাসী—গুরুভাই। বিনামূল্যে এতগুলি বই দিলেন! আমার এত অহঙ্কার যে বইগুলি একবার খুলেও দেখলাম না। ভাইরে! বই পড়ে মাথা ঘুরে গেল! দেখলাম আমার যেসব কথা শুনে লেখা—তাতে ভুল আছে। আর ইনি প্রমাণ করে করে সব

ঘটনা লিখেছেন! তখন আবার এই বুড়ো বয়সে কলম ধরে যতদূর পারলাম সংশোধন করলাম '' আমাকে বললেন, ''এই আমার শেষ সংশোধন। আমি আর বেশিদিন বাঁচবনি। আমি এই বইখানি তোমার হাতে সঁপে দিলাম। তোমার উপর ভার—তুমিই এই বই শরৎ-ঠাকুরের হাতে পৌছে দিবে। তিনি ভবিষ্যতে এই বই যেমনভাবে ইচ্ছা ছাপাবেন। আর এই বই ছাপিয়ে বিক্রি করে যা net লাভ হবে তার কিছু অংশ, তা শরৎ-ঠাকুর যেমন বিবেচনা করবেন এখানে আমার ঠাকুর সেবার জন্য পাঠাবেন। এখন আমার বড় বৌমা ঠাকুরের সেবা-পূজা করছে। যদি এরা কেউ না করে তবে তোমরা আমার ঠাকুর কোয়ালপাড়ায় বা জয়রামবাটীতে নিয়ে যাবে এবং ঐ টাকা তোমরা নিয়ে ঠাকুরের সেবা করবে। আর তুমি একখানি বই চেয়ে নিবে।'' আমি তখন ব্রহ্মচারী। প্রথমে ঐ পুঁথি ৬ টাকা দামে বিক্রি হতো। আমি বই নিইনি। কারণ গণেন মহারাজ হয়তো চাইলে দিতেন না। অক্ষয় মাস্টারমশায়ও বলতেন, ''আমরাও তো সেই রামকৃষ্ণের সেবক। গৃহস্থ হতে পারি। কিন্তু গণেন মহারাজ আমাদের যেন ভাল চোখে দেখেন না।'' গণেন মহারাজ উদ্বোধন থেকে চলে যাবার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির বাবদ প্রাপ্য টাকা ৺অক্ষয়কুমার সেনের ছেলেরা না পাওয়ায় তারা খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। একদিন হৃষীকেশে এই কথা গোপেশদার (স্বামী সারদেশানন্দজীর) মুখে শুনে আমি তাদের প্রাপ্য আছে বলায়, তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনে পূজনীয় সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দের) কাছে বিস্তারিত লিখতে বলেন। আমি তাঁকে লেখার পরে তিনি অক্ষয় মাস্টারমশায়ের দুই পুত্রকে ডাকিয়ে এনে তাদের একসঙ্গে কিছু বেশি টাকা তুলে দেন এবং বইয়ের কপিরাইটও অতঃপর তারা উদ্বোধনকে লিখে দেয়।

একদিন জয়রামবাটীতে বসে ভূমানন্দ মহারাজ বলেন, ''মহারাজ, জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ার দুই আশ্রম গ্রাম থেকে উঠিয়ে নিয়ে আমোদরের ধারে কোনও নতুন জায়গায় একটি আশ্রম করলে ঠিক হবে।'' মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ''কেন? তাতে কি সুবিধা হবে?'' ভূমানন্দজী বললেন,

"গ্রামে আশ্রম না থাকাই ভাল। তাতে সাধুরা ভাল থাকবে না।" মহারাজ বললেন, "যারা ভাল থাকবার তারা গ্রামেও ভাল থাকবে। আর যারা ভাল থাকবার নয়, তারা হিমালয়ে থাকলেও খারাপ হবে।" শ্রীশ্রীমার মহাসমাধির পর থেকে মহারাজ যেন ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হতে আরম্ভ করেছিলেন। আমরা দেখেছি, তিনি ভোরে স্নান করে ধ্যান-জপে বসতেন এবং প্রায় ১১টায় উঠতেন। একদিন ভূমানন্দজী পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আপনি তো ধ্যান-জপে ডুবে থাকছেন। আপনার আধ্যাত্মিকতা যত বাড়ছে আমাদের বাঁদরামিও সেই পরিমাণেই বেড়ে চলেছে।" মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, "বেশ কথা!" সেবক সাতু (স্বামী অসিতানন্দ) মহারাজকে এক গেলাস কমলালেবুর রস খেতে দিত। আমাকে সাহায্য করতে বলত। আমি করতাম। রস কম হলে একটু জল ও চিনি মিশিয়ে একগেলাস করে দিত। একদিন গণেন মহারাজ দেখে জল মিশাতে বারণ করলেন ও ৬টা কমলালেবু হলে একগেলাস রস হবে জেনে ২টা বেশি দিবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন মহারাজের নামে একবাক্স কমলালেবু রেলওয়ে পার্শেলে এক ভক্ত পাঠিয়ে রেল রসিদ পাঠিয়েছিলেন। পার্শেলটি শিয়ালদহে এসেছিল। মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, "এই রসিদটা নিয়ে শিয়ালদহ থেকে কমলালেবুর পার্শেলটি ছাড়িয়ে আনতে পারবি?" আমি পারব বলায় আমার হাতে রসিদটি ও খরচের জন্য কিছু টাকা দিলেন। আমি নিয়ে এলে আমাকেই মহারাজ খুলতে বললেন। খোলার পরে দেখে বললেন, "যেগুলি খুব ভাল সেগুলি ঠাকুর ভাঁড়ারে দিয়ে আয়। আর যেগুলি একটু খারাপ সেগুলি সাধুদের ঘরে ঘরে কিছু কিছু করে দিয়ে আয়।" গণেন মহারাজ সবচেয়ে খারাপগুলি গোলাপ-মার কাছে দিতে বলায়, আমি বললাম, "গোলাপ-মার কাছ থেকে কিছু গালাগাল খেতে পাঠাচ্ছেন বুঝি?" তিনি বললেন, "না, গালাগাল দেবেন না! তুই দিয়ে আয় না।" তাই নিয়ে যেতে তিনি ঐখানে রাখ বলায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "গোলাপ-মা, এগুলি তো খারাপ হয়ে গেছে। এগুলি কি কাজে লাগবে?" তিনি বললেন, ঐগুলি থেকে বেছে বেছে যে একটু রস পাবেন তাই দিয়ে কি যেন তৈরি করবেন এবং পাকা খোসাগুলি শুকিয়ে রাখবেন—পানের সঙ্গে

দিলে সুগন্ধ হবে। একদিন ভূমানন্দজী মহারাজকে বললেন, "আমাদের সাধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে খদ্দর বিক্রি করা উচিত।" মহারাজ বললেন, "আমি ও বেচতে পারব না। ছেলেদেরও বিক্রি করতে বলতে পারব না। হয়তো জেলেও যেতে হবে। আমি নিজেও যেতে পারব না—ছেলেদেরও যাবার ব্যবস্থা করতে পারব না। তুমি পার কর।"

একবার মহারাজ, যোগীন-মা ও গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে এসেছেন। তখন কিশোরীদা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী) জয়রামবাটীতে থাকেন। পুণ্যিপুকুরে মাছ ধরানো হচ্ছে। মেজোমামা (কালীমামা) একটি মাছ নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিশোরীদা তাঁর হাত থেকে মাছটি কেড়ে নেন। যোগীন-মা বললেন, "দেখেছ শরৎ? কিশোরী মেজোমামার হাত থেকে মাছটি নিয়ে নিলে। এটা কি ভাল হলো?" মহারাজ কিশোরীদাকে বকলেন। বললেন, "তুই মামার হাত থেকে মাছটা কেড়ে নিলি কেন?" কিশোরীদা বললেন, "মহারাজ, এখন পুণ্যিপুকুর নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। মামা চাইলে আমি মাছ দিব। জোর করে নিতে দিব না। তাতে অসুবিধা আছে।" তখন মহারাজ যোগীন-মাকে বললেন, "দেখেছ। আমরা তো দু-দিনের জন্য এসেছি। ওদের তো ভুগতে হবে।" পরে কিশোরীদা মামাকে একটি মাছ দিয়ে এলেন। সকলেই খুশি হলেন।

তখনকার দিনে এদিকে ফটো তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একদিন ঘাটাল থেকে একজন ক্যামেরা নিয়ে কয়াপাট, বদনগঞ্জ অঞ্চলে টাকা নিয়ে ফটো তুলছিল। লোকেরা ফটো দেখে খুব খুশি। বলে, "একজন লোক ছবি তুলছে। চমৎকার। একেবারে নাক, চোখ, মুখ ঠিক ঠিক উঠে আসছে। আর দু-টাকায় তিনখানা করে ছবি বিক্রি করছে।" আমার মাস্টারমশায় ঐ ভদ্রলোককে জয়রামবাটীতে এনে শ্রীশ্রীমা উপরে বসবেন ও মাস্টারমশায়, জ্ঞান মহারাজ ও আমি মার পায়ের তলায় বসে একটি ফটো তোলার কথা বলতে মা বললেন, "বাবা, শরৎকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।" বাবা, এমনি তো পাড়াগাঁয়ের মেয়ে! কিছুই বুঝেন না। কিন্তু ফটো তুলতে দিলেন না। মাস্টারমশায় বিফলমনোরথ হয়ে ফটোগ্রাফারকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিলেন।

শ্রীশ্রীমার দেহত্যাগের পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ নিচের ঘরে বসে কাঁদছেন, এমন সময়ে উপর থেকে যোগীন-মা ডাকলেন, "শরৎ উপরে এসে দেখে যাও।" মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন, "আর কি দেখব?" যোগীন-মা বললেন, "জীবনে যা দেখনি, তাই দেখে যাও।" মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে উপরে গিয়ে দেখে অবাক হলেন। শ্রীশ্রীমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্তিময়। তিনি মায়ের শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিচে গেলেন।

১৯১৬ কিংবা ১৯১৭-র ১ জানুয়ারি মহারাজ আমাকে উদ্বোধনে জিজ্ঞাসা করলেন, "রামময়, তুই বশীর (বশীশ্বর সেনের) বাড়ি চিনিস?" আমি উত্তর দিলাম, "হাঁ মহারাজ চিনি।" তিনি আমাকে কতকগুলি ভাল গোলাপ ফুল ও একটি চিঠি দিয়ে বললেন, "এই ফুলগুলি ও এই চিঠি বশীর বাড়িতে ঢুকেই ডানদিকের ঘরে এক আমেরিকান মহিলাকে (Sister Christine-কে) দিয়ে আয়।" আমি গিয়ে তাঁকে দিতেই তিনি খুব খুশি হয়ে মহারাজের নাম করে বললেন, "It is very kind of him to send me such nice flowers." (তাঁর খুবই দয়া যে, আমাকে এমন সুন্দর ফুল পাঠিয়েছেন।) পরে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, "Will you kindly wait for two minutes, I will write a few words giving him thanks?" (তুমি দয়া করে দু-মিনিট অপেক্ষা করবে? আমি কয়েকটি কথা লিখে তাঁকে ধন্যবাদ জানাব।) আমি তাঁকে বললাম, "Yes, I will gladly wait, you can write." (হাঁ, আমি আনন্দের সহিত অপেক্ষা করব। আপনি লিখতে পারেন।) তিনি আমার হাতে চিঠি দিলে আমি নিয়ে গিয়ে মহারাজকে দিলাম। তিনি খুশি হলেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ বিদেশ থেকে ফিরে আসার পরে শ্রীযুক্ত গিরিশবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শরৎ ওদেশে (আমেরিকায় ও ইউরোপে) কেমন সব দেখলে?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "দেখুন G.C. (গিরিশচন্দ্র) ওদের দেশে কোনও বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক বিচার হলো। কিন্তু যখন ভোট হলো তখন সকলে নিজ নিজ মত ছেড়ে একমত হয়ে কাজ করল।

আমাদের তিনটি বাঙালির দুটি মত।" শুনেই গিরিশবাবু বললেন, "এ্যাঁ, তিনটে বাঙালির দুটো মত কেন হবে? তিনটে বাঙালির তিনটে মত হবে।"

কামারপুকুরে প্রথম পনেরো কাঠা জমি, "সুখলাল গোস্বামীর ভাঙা ভিটা" লাহাবাবুদের কাছ থেকে মনে হয় তিনশত বিশ টাকায় (৩২০) কেনা হয়েছিল। এখন ঐ জমির উপর নাটমন্দির তৈরি হয়েছে এবং বাকি জমি নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকের খোলা ময়দান। পূজনীয় শরৎ মহারাজ আমার প্রধান শিক্ষকমশায়কে লিখলেন, "প্রবোধ, জমিটা তো কেনা হলো। এখন দখল নিতে হবে তো? আমি টাকা দিব। তুমি জমিটিকে পরিষ্কার করিয়ে চারদিকে বেড়া দিয়ে কোণায় একটু পাকা pillar গাঁথিয়ে দাও।" মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, "তুই তো আই. এ. পরীক্ষা দিয়েছিস? ফল বেরোতে তিন মাস লাগবে। তখন বি. এ. পড়তে যাবি তো? তুই এই কাজ আমার চেয়ে ভাল পারবি এবং এই সময়ের মধ্যে সব হয়েও যাবে।" আমি গেলাম। তখন পূজনীয় শিবুদা, বৌদি ও তাঁদের ছেলে ও মেয়ে কামারপুকুরে থাকতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ কাজের জন্য আমার কাছে টাকা পাঠাতেন। আর আমাকে লিখলেন, "তোর খাওয়া খরচের জন্য পূজনীয় শিবুদাকে মাসে মাসে দশ টাকা (১০) দিবি। কিন্তু এক সঙ্গে দশ টাকা দিবি না। ২।১ টাকা করে মাঝে মাঝে দিবি। নতুবা শিবুদা হয়তো দশ টাকার জিলিপি কিনে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে দিবেন। জায়গাটায় অনেক কাঁটাগাছ প্রভৃতি ছিল। একটা বড় গর্তও ছিল। মজুর দিয়ে সব আগাছা ও কাঁটাগাছ কাটিয়ে ও একটি ছোট ছোট ইটের তৈরি ও কাদা দিয়ে গাঁথা ভাঙা বাড়ি ছিল। ঐটিকেও ভাঙিয়ে সব গর্তে ফেলে বাকি জমিটিকেও সমান করিয়ে নিয়ে বেড়া দেওয়ালাম। পূজনীয় শিবুদা বললেন, "রামময়, কামারপুকুরে ভাল বাঁশ পাবে না, দামও বেশি। তুমি একটু এগিয়ে উমোরপুরে (অমরপুরে) যাও। সেখানে খুব বড় বড় ও পাকা বাঁশ পাবে এবং দামও কম হবে।" আমি গিয়ে যার খুব বেশি ও ভাল বাঁশ তার কাছে বাঁশ কেনার কথা বলতে সে বলল, "সবচেয়ে বড়, মোটা ও লম্বা, পাকা বাঁশ, বেছে বেছে কেটে, ঝুড়ে (কঞ্চি প্রভৃতি কেটে ফেলে পরিষ্কার করে) আমার গরুর গাড়িতে আপনার

জায়গায় পৌঁছে দিব। কিন্তু টাকায় ১৬ খানি বাঁশ দিব। ১৭ খানি চাইলে দিব না। আমি রাজি হলাম। পরে দেখলাম খুব ভাল বাঁশ দিয়েছে। এটি ১৯১৯ সালের কথা। এখন এদেশেই ঐরূপ একখানি বাঁশের দাম দশ টাকা। আমি পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে হিসাব দিতাম ও আরও টাকা পাঠাতে লিখতাম। তিনি টাকা পাঠিয়ে দিতেন। যখন বেড়া দিতে আরম্ভ করব, তখন লাহাবাবুদের কেউ কেউ আপত্তি দিলেন যে, জমি বেশি নেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীমা তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। আমি দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়ায় গিয়ে মাকে সব বললাম। তখন সেখানে আমার হেড মাস্টারমশায় ও তাঁর বন্ধু আরামবাগের উকিল মণীন্দ্রবাবুও ছিলেন। মণীন্দ্রবাবু আমাকে বললেন, "তুই দলিল দেখে ঠিক মাপ করে বেড়ার জন্য গর্ত করিয়েছিস তো?" আমি বললাম, "হাঁ।" তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুই ফিরে যা। গিয়ে ঠিক জমির চেয়ে এক হাত দূরে গর্ত করতে আরম্ভ করে দে। আগের গর্তগুলি মাটি দিয়ে ভরে দিবি। আমরা দুজন একটু পরে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে লাহাবাবুদের ডাকিয়ে মাপ করে জায়গা একটু বেশি নেওয়া হয়েছে বলে সবদিকে একহাত কম করতে হবে বলব। তাতে তাঁরা খুশি হবেন।" আমি দেখালাম আমার আগের গর্তগুলি ঠিকই ছিল। মা মণীন্দ্রবাবুর কথা শুনে হাসলেন ও বললেন, "ছেলের বুদ্ধি দেখ।" অনেক কষ্টে মান্দারণের ভাঙা গড়ের প্রাচীর থেকে ইট আনিয়ে ও চুন সুরকি দিয়ে চারকোণায় চারটি pillar গাঁথিয়ে কাজ শেষ করলাম। তখন মজুরদের রোজ বেতন ছিল দুই আনা। খেতে দিতে হতো না। সব কাজ শেষ হলে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে হিসাব পাঠিয়ে দিলাম। তিনি এত কম খরচে কাজটি শেষ হয়েছে জেনে খুবই আনন্দিত হয়ে আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। আমাকে তিন মাস শ্রীশ্রীঠাকুর যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন। মাঝের বড় ঘরে পূজনীয় শিবুদা, বৌদি ও ছেলেমেয়েরা থাকতেন। বৈঠকখানা ঘরটি ভক্তদের জন্য রাখা হতো।

একটি আমার বয়সি কলেজের ছাত্র দীক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে পূজনীয় শরৎ

মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানাত। মহারাজ বলতেন, "আচ্ছা হবে পরে।" আর একটি কথা বলতেন, "এখন দীক্ষা চাইছিস, পরে আমাকে দীক্ষা দিতে চাইবি।" ছেলেটি ঐ কথার কিছুই অর্থ বুঝতে পারত না। হঠাৎ শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে এসে গেলেন। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে ছেলেটি তাঁর কাছে দীক্ষার প্রার্থনা জানায় ও মা "কাল তোমার দীক্ষা হবে" বলেন। পরের দিন তার দীক্ষা হলো। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "তুই অনেক দিন থেকে দীক্ষার কথা বলছিস। ঐ পঞ্জিকাটা নিয়ে আয় একটা দীক্ষার জন্য ভাল দিন দেখে নিই।" ছেলেটি কিছু বলেও না, পঞ্জিকাও আনে না। পূজনীয় মহারাজ জানতেন যে, শ্রীশ্রীমা তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। তাই তাকে বললেন, "এজন্যই তোকে বলতাম। আজ দীক্ষা চাইছিস, কাল আবার আমাকে দীক্ষা দিতে চাইবি। এখন বুঝলি তো আমার চেয়ে কত বড় আছেন। তাঁর কৃপা পেয়েছিস—খুব আনন্দের কথা।" ছেলেটি মহারাজকে আবার প্রণাম করে চলে গেল।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা* (১)

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী! আজকের এই পবিত্র দিনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন; আমি বারবার তাঁকে জানিয়েছি, আমার অসামর্থ্য এ-বিষয়ে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত বলে আমাকে এই সভায় তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাতে আমার ভেতরের সঙ্কোচ যেন আরো বাড়িয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, স্বামী সারদানন্দের পদপ্রান্তে বসবার সৌভাগ্য কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু তাঁকে কতটা বোঝবার চেষ্টা করেছি তা বলতে পারি না—এসেছি, তাঁর পায়ে প্রণাম করেছি, কাছে বসেছি, হয়তো কিছু কথাও শুনেছি, কিন্তু বুদ্ধিও পরিপক্ক ছিল না এবং সেসব কথা বোঝবার চেষ্টাও বিশেষ করেছি যে, তাও নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে তিনি যা বলছেন, তা শুধু শুনে গেছি। তাঁর পদপ্রান্তে বসে আছি—এই সার্থকতাটুকুই মনে আসছে, আর কিছু তখন ভাবিনি, যদি কোন দূর কল্পনাতেও মনে আসতো যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, তাহলে নিজেকে তখন থেকে তৈরি করতুম। সে কথা মনে ওঠেনি, এখনও পর্যন্ত ওঠে না। তাঁর সম্বন্ধে লেখবার জন্য অনেকে বলেছেন, অনুরোধ করেছেন—কারুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। কারণ তাঁকে নিজে বোঝবার চেষ্টা করিনি—অপরকে বোঝাবো কেমন করে? তাঁর পদপ্রান্তে যখন এসেছি, একেবারে নিজেকে বালকের মতো বোধ হয়েছে, এখনও হয়। যখনই আসি, ঐ উদ্বোধনের বাড়িটিতে যখন প্রবেশ করি, সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোনো বালকটি যেন জেগে উঠে—আর সব ভুলে যাই। কাজেই

তাঁর সম্বন্ধে বলতে আমাকে এত জোর করে অনুরোধ করায়, আমি খুব সঙ্কোচ বোধ করছিলুম, কিন্তু তবু রেহাই পাইনি। তাই কোন কথা গুছিয়ে বলার চেষ্টা না করে, মাত্র দু-চারটি কথা যা মনে আসবে, খুব সংলগ্ন হবে না, অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন স্মৃতি-কণাগুলি আপনাদের কিছু পরিবেশন করবার চেষ্টা করবো।

কখনো সাধারণ সভায় মহারাজ সম্বন্ধে বলিনি—মহারাজ বলেই আমি বলি এখন, আপনারাও সেইভাবেই বুঝে নিন—আমি স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে লক্ষ্য করে বলছি। মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের একান্ত অন্তরঙ্গ, সাধু ব্রহ্মচারীদের কাছে কখনো কখনো দুই-একটি পুরোনো স্মৃতি উল্লেখ করেছি মাত্র, কোন সুসংবদ্ধ বক্তৃতা হিসাবে কিছু বলিনি। তবে এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরাও সেই ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে মনে করে, দু-চার কথা যা মনে আসবে তা বলবো, আপনারা তার প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না লক্ষ্য করবেন না, অপ্রাসঙ্গিক হলে কিছু মনে করবেন না, মাত্র এই কথাগুলি থেকে আপনাদের যদি কিছু গ্রহণ করার থাকে তা নেবেন—বাকি ভুলে যাবেন। আমি বক্তা হিসাবে বলছি না।

তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি, কখনো বিচার করে দেখিনি। এখনো করি না। ব্যক্তিত্ব বুঝি না, আসতুম যখন, দেখতুম—বেশিরভাগ ঐ ছোট বসবার ঘরটিতে বসে থাকতেন—দরজার কাছে; আমরা এসে বসতুম—ছোট তখন। প্রণাম করে বসে আছি, কথা হচ্ছে, সব কথা যে মন দিয়ে শুনছি, বুঝছি, তা নয়। কখনো কখনো সেইখানে নিজেদের খেয়ালে চোখ বুজে ধ্যান করতে লেগে গেলুম। আবার তিনি বলতেন ঃ "যা না, ধ্যান করতে হয় তো, ঠাকুরঘরে যা।" ঠাকুরঘরে ধ্যান করা যেমন, তাঁর কাছে বসে ধ্যান করার আকর্ষণ যে তার চেয়ে কম জিনিস নয়, সে কথা বলার ধৃষ্টতা হয়নি। সেখানে বসে দেখেছি, কলকাতার নানা লোক আসতেন—তাঁদের নিজেদের নানা রকমের অশান্তির বোঝা নিয়ে আসতেন এবং সব বোঝা তাঁর পদপ্রান্তে নিবেদন করতেন। আমরা তখন ছোট—সংসারের এত দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় নেই। মনে হতো যে, এঁরা কেন সাংসারিক কথা এত করে

বলেন, আর মহারাজও সমস্ত নির্বিকার চিত্তে শোনেন। ভাল লাগতো না। কখনো কখনো ভেতরে অভিমান হতো, আমরা কি এসব কথা শোনবার জন্যে এসেছি। তিনি যে কেবল দু-চারটি ছেলেকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে দেবার জন্য মাত্র বসে নেই, তিনি বসে আছেন যারা তাপিত, যারা এই সংসারে দুঃখকষ্টে নানা রকম যন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের সকলের সেই যন্ত্রণার লাঘব করবার জন্যে—এ কথা বোঝার সামর্থ্য ছিল না। তাই ভাল লাগতো না। আমাদের যে ভাল লাগতো না, তিনি যে তা বুঝতেন না তা নয়, তাই আমাদের জন্যে আবার দয়া করে একটু কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে বলতেন—"এই ডাক্তার এসো না এদিকে!" ডাক্তার মানে স্বামী পূর্ণানন্দ—প্রাচীন সাধু, তাঁকে হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেননি। তিনি সদর দরজা দিয়ে ঢুকে অপর প্রান্তে যে ছোট্ট ঘরটি পাওয়া যায়—যেখানে এখন নানা জিনিসের গুদামের মতো, অনেক সময় আমরা যেখানে জুতোটুতো রেখে তারপর উপরে যাই—সেই ঘরটিতে তিনি থাকতেন, বড় একটা ঘরের বাইরে আসতেন না—জপ-ধ্যান নিয়ে থাকতেন বেশির ভাগ সময়। মহারাজ তাঁকে বলতেন, "এসো না এদিকে।" তিনি বুঝতেন, কেন তাঁর ডাক পড়েছে। এসে সৎ-প্রসঙ্গ কিছু তুলতেন। তখন অন্তত সেই সময়ের জন্যে একটু কথার মোড় ফিরতো। আমরা বুঝতে পারি, সেটা আমাদের জন্যে—আমাদের মতো যারা সংসারে অনভিজ্ঞ এবং তাঁর কাছে এসেছে অন্য জিনিস আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের জন্যে ঐভাবে কথার মোড় ফেরাতেন। কিন্তু এখন অনেক দিন পরে, সংসার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ না হলেও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু হওয়াতে, বুঝতে পারছি, কত বড় একটা প্রয়োজন তিনি সকলের মেটাতেন—ঐভাবে ওখানে স্থির হয়ে বসে থেকে। নিজে কথা যে বেশি বলতেন, তা নয়। কিন্তু যাঁরা এসে তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ নিবেদন করতেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বোঝার ভার যে লাঘব হচ্ছে তা বুঝতে পারতেন। ফেরবার সময়—যে মানুষটি এসেছিলেন, সে মানুষটি আর ফিরতেন না—ভেতরে শান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন।

এই কথা ভেবে এখন মনে হয়, এই ছোট্ট পরিবেশের ভেতরে কি যে এক

বিরাট অবদান তিনি দিয়ে গেছেন, কত লোককে যে তিনি শান্তি দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই—ভেবে মুগ্ধ হই। তিনি সংসারবিরাগী, কিন্তু সকলের সংসারের বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে চলেছেন—মায়ের সেবক। মা তাঁর দেহসম্বন্ধে যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ পরিবারবর্গ তাঁদের বোঝা তো নিয়েছেনই, তাছাড়া বিশাল জগতের যাঁদের মায়ের স্নেহের প্রয়োজন—মায়ের কাছ থেকে যাঁদের সাহসের প্রয়োজন—মায়ের কাছ থেকে যাঁদের প্রয়োজন একটি নিরাপদ অঞ্চল, তাঁরা যেমন মার কাছে এসে শান্তি পেয়েছেন, মায়ের সেবক সেই ধারা ঠিক বজায় রেখে চিরকাল এইভাবে সকলকে শান্তি দিয়ে গেছেন। একভাবে বলতে গেলে, তখনই আমাদের মনে হতো—যেন মা-ই রূপান্তর নিয়ে বসে আছেন। ঠিক মা! পুরোপুরি মা! তাই তাঁর বাহিরের গাম্ভীর্যের আবরণ আমাদের এতটুকু ভয়ের উদ্রেক করত না। সত্যি সত্যি আমরা তাঁকে মা বলে দেখতুম। মায়ের কাছে আবদার চলে। মায়ের কাছে সন্তানের চাহিদা অনায়াসে মেটে। তাই আমরা সেই চাহিদা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। বাণীর দ্বারা উচ্চারণ না করেও আমাদের যা দরকার তা পেয়েছি। অনেক সময় আমরা যে উপদেশ চাইতুম, তা নয়। একটা অগাধ স্নেহের সম্বন্ধ যেন আপনা থেকে সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। এইটি হচ্ছে অন্তরের অভিজ্ঞতা। বক্তৃতার ভেতর দিয়ে কি করে বোঝানো যায় জানি না; এইজন্য বোঝাতে চাই না, চেষ্টা করি না। মাতৃত্বের প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখেছি, আমাদের অনুভবগম্য হয়েছে বারবার—স্নেহ পেয়েছি অগাধ। কখনো হয়তো ধমকও খেয়েছি—ছোটখাট; কিন্তু কখনো তাঁর কাছ থেকে যাকে বলে তীব্র ভর্ৎসনা তা পাইনি। কোন দোষ বা কোন বালসুলভ ত্রুটি হলে, তাঁর আদরের ভর্ৎসনা ছিল 'বাঁদর'। বলতেন 'বাঁদর'। সেই 'বাঁদর' বলবার মতো আপনজন কারো বেশি দিন থাকে না। তিনিও বেশি দিন স্থূল শরীরে রইলেন না। কিন্তু সেই মিষ্টি সম্ভাষণ এখনো কানে প্রতিধ্বনিত হয়। আপনাদের মধ্যে সকলের না হোক কারো কারো নিশ্চয় তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে। তাঁরা মনে হয় এই রকম অনুভব নিশ্চয় করেছেন তাঁর কাছে, কাজেই তাঁরা আমার কথা খুব ভাল করে উপলব্ধি করবেন। এমন হয়েছে, কোন একটা প্রশ্ন করেছি যা হয়তো অবান্তর। ভর্ৎসনা করে বললেন—'বাঁদর।'

কিন্তু তারপর মিষ্টি করে বুঝিয়ে মনের যা সঙ্কোচ সংশয় তা দূর করে দিলেন— এ রকম অনেক সময় ঘটতো। তাঁর সান্নিধ্যে এই জিনিসটি আমরা খুব অনুভব করেছি। আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে বেশি দিন থাকবার সুযোগ পাইনি। মনে হয় এখন যে, আমাদের মধ্যে সে আগ্রহ থাকলে সে সুযোগ তিনি দিতেন, বঞ্চিত করতেন না। কিন্তু তখন সে আকাঙ্ক্ষা মনে জাগেনি। তখন মনে হতো, যেন তাঁরা চিরকাল থাকবেন। সুতরাং এ তো হাতের পাঁচ—যখনি বলবো তখনি পাবো। অমূল্য জিনিস হাতের খুব কাছে পেলে মানুষের এই রকম মনে হয়। যেন খুব সুলভ, ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়—যেন চিরকালই পাওয়া যাবে। কে জানতো যে, আমাদের বাল্য চিরকাল থাকবে না! কে জানতো যে, এ সংসারে পরিবর্তন সর্বদা ঘটছে। আজ যে পরিবেশ আছে কাল তা থাকবে না, এ কথা মনে হতো না।

তিনি সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো কত অত্যাচার সহ্য করেছেন। কত পাগলকে নিয়ে তিনি ঘর করেছেন—আক্ষরিক অর্থে। অনেকগুলি পাগল তাঁর পোষা ছিল। আবার সেই পোষা পাগলগুলির কারো পাগলামির মাত্রা যখন বেড়ে যেত, তখন তিনি হয়তো বলতেন, "ওরে সাতু, এ বুড়িটা কয়েকদিন কিছু খাচ্ছে না; একে একটু ওষুধ এনে দে!" পাগলামি বেড়ে গেছে কখনো, সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি থাকত। একটি লাঠি হাতে করে মাথায় পাগড়ি বেঁধে কেউ বলছে, 'মহারাজের দরোয়ান।' যত পাগলের তিনি হচ্ছেন রক্ষক, তিনি তাদের পোষণ করছেন, তাদের সমস্ত অত্যাচার থেকে রক্ষা করছেন। অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা যারা তখন মঠে থাকতুম, ঠাট্টা করে বলতুম, "উদ্বোধন তো পাগলের আড্ডা।" সত্যি পাগলের আড্ডা। কত পাগলের মেলা! তখন জানতুম না যে, এতগুলি পাগলের অভিভাবক হওয়া কত কঠিন; এতগুলি পাগলকে নিয়ে ঘর করা, তাদের জন্য এত চিন্তা করা, তাদের কল্যাণ—ইহকাল পরকালের কল্যাণ— এমন করে দেখা, এ আর কে করবে! কার সামর্থ্য আছে? ইচ্ছা করলেও কে করতে পারে? মাত্র নীলকণ্ঠই সমস্ত জগতের বিষকে হজম করতে পারেন, আর কারো সাধ্য নেই। মহারাজ যেভাবে সকলের বিষকে নিঃশেষে গলাধঃকরণ

করে তাদের শান্তি দিয়েছেন, তাঁর স্থান নীলকণ্ঠের মতো। ধীর স্থির অচঞ্চল, যত কিছু ঝড়-ঝাপটা ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর সেই অটল গাম্ভীর্যের একটুও হানি হচ্ছে না তাতে। কতদূর স্থৈর্য যে, সেই খুঁটির মতো বসে আছেন—একটু স্থূল শরীর—স্থির হয়ে বসে থাকতেন। চঞ্চলতা একটুও নেই—শরীরেও নেই, মনেও নেই। অথচ সেই অচঞ্চল পর্বতের কাছে এসে লোকে যখন তাদের দুঃখ নিবেদন করছে, তখন তারা পাষাণের কাছে নিবেদন করছে না। সকলে তাঁর ভেতর থেকে এমন একটি মৌন সহানুভূতি পাচ্ছে যে, তাদের সমস্ত সন্তাপ জুড়িয়ে যাচ্ছে। কত রকমেরই না লোক, আর কত রকমেরই না তাদের প্রকৃতি নিয়ে তারা আসছে! সকলের সেখানে অবাধ অধিকার। অপরে বিরক্ত হতে পারে, তিনি বিরক্ত হতেন না; আর আমাদের আবদার—তাও কি কম সহ্য করেছেন!

মহারাজের বাত হয়েছে। বাতের জন্যে চলতে কষ্ট হয় বড্ড। আমরা তখন এই বাগবাজারেই একটি আশ্রম তৈরি করেছিলাম—জ্ঞান মহারাজের আশ্রম বলে প্রচলিত ছিল জায়গাটি—তাতে তিন তলার ওপর ঠাকুরঘর। মহারাজকে নিমন্ত্রণ করলাম, "আমরা মহাবীরের পুজো করব, আপনাকে যেতে হবে।" "হ্যাঁ বাবা, যাব।" গেলেন। সরু সিঁড়ি, তিন তলার ওপর উঠতে হবে; বাতের কষ্ট এত যে, হেঁটে উঠতে পারছেন না। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছেন—দেখে যারপরনাই কষ্ট হলো আমাদের, মনে হলো কি অন্যায় করেছি! কিন্তু তাঁর একটুও বিরক্তি নেই। অত কষ্ট করে গেলেন সেখানে; কেন? আমাদের একটু আনন্দ দেবার জন্যে, আমাদের তৃপ্তি হবে এই জন্যে। ছোটখাট ব্যাপার, হয়তো এটা কিছু বইয়ের পাতায় লেখবার মতো জিনিস নয়, কিন্তু মনে করুন, যারা তাঁকে আপনার বলে মনে করছে, তাদের মনের ওপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়। এই হলো তাঁর স্বভাব। নিজের কষ্টের জন্য তিনি অপরের আবদারকে উপেক্ষা করতে জানতেন না কখনো।

প্রত্যেককে তার নিজের প্রকৃতি অনুসারে এগিয়ে নিয়ে যেতেন তিনি। আমরা সাধু হব, এই দৃঢ় ভাবনা রয়েছে, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সেইভাবে

তিনি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের একটি বন্ধু, খুব সৎ প্রকৃতি এবং ত্যাগের ভাব রয়েছে। মহারাজকে বললে, "মহারাজ, আমি সংসার ত্যাগ করে মঠে যোগ দেব।" তিনি বললেন, "বাবা, সন্ন্যাস সকলের জন্য নয়।" আমরা শুনে অবাক হয়ে গেলুম—এমন ত্যাগী ছেলেটি, আর মহারাজ এমন করে তাকে কেন বারণ করলেন? যাকে বারণ করলেন তার মনে এজন্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো না। কারণ, এত স্নেহের সঙ্গে বললেন। পরে তিনি গৃহস্থ হয়েছিলেন—আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেছিলেন, "ভাই এতদিনে বুঝতে পারছি, মহারাজ যে আমার ভবিষ্যৎকে কি রকম স্পষ্টভাবে দেখতেন, তখন আমরা তা বুঝতে পারিনি।" ঠাকুর যেমন মাস্টারমশাইকে বলেছেন ঃ তোমার তো সব আমি জানি; তোমার অতীত, তোমার বর্তমান, তোমার ভবিষ্যৎ—আমি তো সব জানি! এ রকম না জানলে ঠিক এইভাবে সকলকে গড়া সম্ভব নয়। এ কেবল কল্পনার কথা নয়, মাত্র কতকগুলি theory—এ নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, অনুভব থেকে তিনি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেখে বোঝা যায়।

আমাদের আর একটি বন্ধু, অতিশয় সৎ-প্রকৃতি, অসুস্থ হয়ে তিনি মহারাজেরই নির্দেশে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মহারাজ তখন কাশী গেলেন। কাশী থেকে ফিরছেন। হাওড়ায় পৌঁছেই তিনি তাঁর সেবককে বললেন, "তুমি এক্ষুনি হাসপাতালে যাও, খবর নিয়ে এস।" খবর নিতে গিয়ে সেবক দেখেন যে, ভক্তটি 'গুরুদেব, গুরুদেব' বলতে বলতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ শব্দ তাঁর কানে পৌঁছুচ্ছে এবং তাঁকে অস্থির করে তুলছে। তার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর করতে পাঠালেন। সাধারণ গুরু নয়! সাধারণ গুরু কতকগুলি মন্ত্র পড়ে দিয়ে গুরুগিরি করেন—এ তা নয়। সন্তান তাঁর! যাকে বলে বাংলায় নাড়ির সম্বন্ধ; তার চেয়েও বেশি। আত্মার সম্বন্ধ; এইভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করতেন তাঁর সন্তানদের কথা ভাবতেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতেন।

আমার জীবনের আর একটি ঘটনা বলছি—আপনাদের কাছে বলতে আমার খুব সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কারণ, তাঁর কথা বলতে গেলে আমার নিজের

কথা যে অনেক এসে যায়, যেগুলো এইভাবে পরিবেশন করার মতো কথা নয়। উপায় নেই। একবার মনে হলো যে, আরও গোড়ার কথা বলছি—ব্রহ্মচর্য নিতে হবে; যেয়ে বললুম, "মহারাজ, আমি ব্রহ্মচর্য নোব।" হেসে বললেন, "হ্যাঁরে, ব্রহ্মচর্য তো আমি দিই না; তা যা, মঠে যা, গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বল।" আমি বললুম, "আমি মহাপুরুষ মহারাজকে ভয় করি, বলতে পারি না।" "সে কি রে! মহাপুরুষ মহারাজকে ভয় করিস কি! আচ্ছা যা, জ্ঞান মহারাজকে গিয়ে বল।" "জ্ঞান মহারাজকে আমি বলব কি, আমি জানি তিনি পছন্দ করবেন না।" মহারাজ বললেন, "তুই আমার নাম করে বলবি।" জ্ঞান মহারাজকে বললুম। তিনি তখন নিরুপায়। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে বললেন। ঠিক হলো, ব্রহ্মচর্য হবে। হলো। এ যেন একটা ছেলেখেলা জিনিস আমি চাইলুম—তাঁকে দিতে হবে। মহারাজের দিতে কোন বাধা নেই, দিতে কোন আপত্তি নেই, একবারও বললেন না—"তুই কি যোগ্য এর জন্যে?" প্রশ্ন করলেন না। যোগ্যাযোগ্য বিচার করার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

আর একটি ঘটনার কথা বলছি—সাধু তখন, ইচ্ছে হলো কাশীতে গিয়ে শাস্ত্রচর্চা করবো। বললুম, "মহারাজ আমি কাশীতে পড়তে যাবো।" "কাশীতে পড়তে যাবে? তা বাপু, তুমি মঠে রয়েছ, মহাপুরুষ মহারাজ রয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করো।" আচ্ছা। মহাপুরুষ মহারাজ তখন বাইরে—তাঁকে চিঠি লিখলুম। তিনি বললেন, "দ্যাখো, কতকগুলো ব্যাকরণ-চচ্চড়ি হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তুমি যদি বেদান্ত পড়তে চাও তাহলে মঠে আমাদের ভাল পণ্ডিত রয়েছেন, তাঁর কাছে বেদান্ত-চর্চা করো, কাশী যাবার দরকার কি?" সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঐ আকাঙ্ক্ষা চলে গেল। মহারাজ আমাকে একটা দারুণ সঙ্কট থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। তখন ভাল করে বুঝিনি, পরে বুঝেছি—'শাস্ত্র-ব্যসন' বলে একটা কথা আছে—যে জিনিস অন্যান্য আকর্ষণ থেকে কম নয়। মানুষকে শাস্ত্র-অধ্যয়ন যেমন এগিয়ে দেয়, আবার শাস্ত্র-ব্যসন তেমনি তাকে পেছনে টেনে রাখে—আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে

তা দেখছেন, তাই পছন্দ করলেন না। যদি পছন্দ করতেন, বলতেন—"হ্যাঁ যাবে বৈ কি!" কত ভাল কাজে, কত শুভ সঙ্কল্পে তিনি কত উৎসাহ দিয়েছেন। সুতরাং সেভাবে বললেন না।

আর একদিনের কথা বলি ঃ ছেলেমানুষি কথা সব। জয়রামবাটী কামারপুকুর দর্শনে গিয়েছি। তখনকার দিনে চাঁপাডাঙা পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে যেতে হতো কামারপুকুর ২৪ মাইল, জয়রামবাটী ২৭ মাইল। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দর্শনে গেছলুম—ফিরে আসছি—সঙ্গে জপের মালা ছিল, রাস্তায় চাঁপাডাঙাতে রাত্রিবাস করতে হয়েছে, সেখানে জপের মালাটি হারিয়েছি। সকালবেলার ট্রেন ধরেছি; ট্রেন চলছে যখন, তখন মালার খোঁজ পড়লো—দেখি যে মালাটি হারিয়েছি। ট্রেন থেকে নেবে পড়লুম। হেঁটে ফিরে এলুম চাঁপাডাঙায়, খোঁজ করলুম, মালা পাওয়া গেল না। সেখান থেকে অনেক হাঙ্গামা করে খানিকটা হেঁটে, খানিকটা ট্রেনে, এইভাবে ফিরতে সন্ধ্যের কাছাকাছি—মুখটুক শুকনো, এসেছি মহারাজের কাছে। "মহারাজ আমার মালা হারিয়ে গেছে।" "বাঁদর! মালা হারিয়ে গেছে তো কি হয়েছে? করে জপ শ্রেষ্ঠ জপ; মালা হারিয়েছে তো হারিয়েছে, আবার একটা মালা করে নিবিখন।" তার পরের কথা হলো, "ওরে খেতে দে, একে খেতে দে।" সারাদিন খাওয়া হয়নি—উপবাস সারাদিন। মালা হারিয়ে গেছে কি করে খাবো। তিনি ব্যবস্থা করলেন। খাওয়ার মাত্রাটা একটু বেশিই হলো। মনের সমস্ত শঙ্কা তো চলেই গেল, শারীরিক অস্বস্তি সেটাও দূর হলো।

আর একদিনের কথা বলছি—তখন মঠে থাকি। কিন্তু মনে যখন শঙ্কা ওঠে, তাঁর কাছে যাই। গেছি—নিজের কোন ব্যক্তিগত সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি। তিনি বললেন, "বোকা, সব কথা আমাকে জিগ্যেস করতে হয়?" আমি একটু অভিমান বোধ করলুম যে, আপনাকে জিগ্যেস করব না তো কাকে করব? তারপরেই বলছেন, "দেখো বাবা, আমরা কি চিরকাল থাকবো। তোমাদের ভেতরে যা সমস্যা আসবে তার সমাধান তোমাদের ভেতর থেকে চেষ্টা করে করতে হবে। জেনো, আমরা চিরকাল তোমাদের সমস্যার সমাধান

করতে আসবো না। তোমাকেই করতে হবে—ভেতর থেকে সমস্যার সমাধান পেতে হবে।" বুঝলুম, একটা কিছু করতে হবে, কিন্তু যা করবার জন্যে আমাদের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আগেই বলেছি, এমন দিন আসবে, যখন তাঁর সাক্ষাৎ সাহায্য পাওয়া যাবে না—এ কথা তখন ভাবতেই পারিনি। কাজেই তাঁর কথাগুলো শুনলুম বটে, কিন্তু তত মনের ওপর কোন রেখাপাত করলো না। এখন বুঝি, তিনি কিভাবে ধীরে ধীরে আমাদের স্বনির্ভরশীল করবার চেষ্টা করেছেন—অধ্যাত্মজীবনেও। এইটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুরুর কাজ। গুরু শিষ্যকে গুরুর ওপরও নির্ভরশীল রাখবেন না। তিনি তাকে স্বনির্ভর করে তুলবেন—যাতে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান সে ভেতর থেকে পায়। দেখলুম, তিনি সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তা না হলে আমাদের সাধ্য কি যে তাঁর আদেশ ছাড়া, একটি পাও নিজেরা চলি, কোন একটা বিষয়ে নিজে থেকে সিদ্ধান্ত করি—তৈরি হয়নি মন। তৈরি করছেন—গোড়া থেকে তৈরি করছেন—বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কখনো মিষ্ট ভর্ৎসনা করে, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে মনের সব গ্লানি মুছে দিচ্ছেন। কেউ যদি তাঁর বকুনি খেতো, সেটা তার মহাভাগ্য, কারণ তারপরেই পাবে তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ। এটা স্বাভাবিক—চিরকাল এ রকম হতো। কারুর মনেতে দুঃখের স্থায়ী রেখা তিনি রেখে ব্যবহার করতেন না কারুর সঙ্গে। কখনো কারুকে রূঢ় কথা বলেননি, যাতে তার মনে দীর্ঘকাল আঘাত বোধ থাকবে। এই হলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি, তাঁকে দেখলে মায়ের মতো বোধ হতো। অনেক সময়ে অনেকে বলতেন—শুনেছি—"তিনি এত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁর কাছে এগোনো যেতো না।" কথাটা আংশিকভাবে সত্য বলে মনে হতো। বাহিরের আবরণ হিসাবে গাম্ভীর্য ছিল বটে, কিন্তু যারা সাহস করে একটু কাছে এগুতে পেরেছে, তারা সেখানে দেখেছে একটি স্নেহময় মাতৃহৃদয়, মাখনের মতো নরম, তার ভেতরে কোথাও কাঠিন্য নেই, এটি প্রত্যেকের অনুভবের জিনিস। অনুভব তারা করেছে যে, এখানে এলে আর কোন ভয় নেই, এখানে এসে যদি ভর্ৎসনাও পায়, তার পেছনেই আসছে অশেষ স্নেহ,

কাজেই কোন চিন্তার কারণ ছিল না। আমরা যারা সমবয়সী বন্ধু ছিলুম, আমাদের কেউ সাধু হয়েছেন আবার কেউ—একটু আগে যার কথা বললুম—গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু সকলেরই এক কথা—মন চিরকালের জন্যে তাঁর পায়ে বাঁধা। এ বিষয়ে সন্ন্যাসী গৃহস্থের কোন পার্থক্য ছিল না। ভক্তদের মধ্যে এমন একটিও দেখি নাই, যে নিজের জীবনকে তাঁর সম্পর্কে এসে সার্থকতামণ্ডিত বলে বোধ না করেছে। সকলকে তিনি সফল করেছেন, তাঁর জীবনে—সকলকে। এটি আমরা আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখি।

আগেই বলেছি, তাঁর ব্যবহারে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোথাও রূঢ় ভাব ছিল না। তাঁর মুখ দিয়ে কেউ কখনো অশিষ্ট শব্দ শোনেনি। অনেক সময়ে নির্দোষভাবেও অনেকে শব্দ প্রয়োগ করেন, যে শব্দের ভেতরে সব সময়ে শিষ্টতার মর্যাদা থাকে না। তাঁর ভাষায় কখনো আমরা, সে রকম অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখিনি। কোন জায়গায় না। ব্যবহারে মাধুর্য, শব্দের ভেতরে অদ্ভুত শালীনতাই দেখেছি। কোন জায়গাতে এমন কোন বাক্য তিনি ব্যবহার করেননি, যা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোন দিক দিয়ে অশোভন হয়। এই জিনিসটি সকলের চিরকালের একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা এবং সকলকে চিরকাল তা আনন্দ দিচ্ছে, দেবে।

তাঁর ওপরে ছিল বিরাট দায়িত্ব। আপনারা জানেন, মা স্বয়ং বলতেন যে, আমার ভার শরৎ বইতে পারে, আর কে বইবে! এক ছিল যোগীন, আর এক শরৎ, সে বইতে পারে। মায়ের ভার যে কি করে তিনি বইতেন, তা তো আপনারা তাঁর সম্বন্ধে কত বই বেরিয়েছে তা থেকে পাচ্ছেন। অকাতরে মায়ের তিনি সেবা করে যাচ্ছেন এবং মায়ের সেবা করবার জন্যে তাঁর অদেয় কিছু ছিল না। কোন সঙ্কোচ এর ভেতরে ছিল না—এতটা অবধি দেওয়া যায়, এমন কোন সীমা ছিল না। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও, গৃহস্থের মতো মায়ের ভক্ত-পরিবারদের সকলের বোঝা বইছেন এবং এই বোঝা বইবার ভেতরে কোন বিরক্তির চিহ্ন নেই, কোন জায়গায় নেই। এক কথায় বলতে গেলে সমস্ত কামারপুকুর-জয়রামবাটীর বোঝা যেন তাঁর মাথায়। বলতেন, "দ্যাখো,

কামারপুকুর-জয়রামবাটীর কুকুর বেড়াল পর্যন্ত আমাদের কাছে পবিত্র, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।" কুকুর বেড়াল পর্যন্ত। এ কথাটা শুধু অতিশয়োক্তির মতো একটা কাব্যের ভাষা নয়—এই রকম তাঁর ব্যবহার। যেমন মা তাঁর সন্তানদের আবদার সব সহ্য করেছেন—মায়ের সন্তানও যেন তাঁর এইসব গুণগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। আসল কথা—তাঁর ভেতরে মা ছাড়া যেন আর কিছু নেই। মা সেখানে এমনভাবে বিকাশ লাভ করেছেন যে, সমস্ত ব্যবহার মায়ের মতোই হয়েছে—মায়ের মতো সমস্ত ব্যবহার এবং তার দ্বারা সকলকে আকর্ষণ, যার ফলে মায়ের স্থূল শরীরের লীলাসংবরণের পর ভক্তেরা তাঁর কাছে এসে তাদের সেই মায়ের অভাব মেটাতে পেরেছে। এত বড় একটা স্থান তাঁকে নিতে হয়েছে। যেন সেই জন্যেই তিনি গোড়া থেকে তৈরি রয়েছেন একদিক দিয়ে।

আবার আর একদিক দিয়ে এই বিরাট রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরিচালনের গুরুদায়িত্ব তাঁর মাথায়। আমরা দেখেছি, মহারাজের শরীর যখন আছে, তখন এত ভাল করে বুঝতে পারিনি—মহাপুরুষ মহারাজ যখন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ তখন দেখেছি, কোন কিছু সঙ্ঘের সমস্যা এলেই মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, "শরৎ মহারাজকে জিগ্যেস করো, শরৎ মহারাজ যা বলেন সেই রকম করো।" সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা সেখানে। মহাপুরুষ মহারাজ অত এই জন্যে মাথা ঘামাতেন না। তিনি সঙ্ঘনেতা, কিন্তু তিনি জানেন যে, শরৎ মহারাজের কাছে গেলে ঠিক ঠিক নির্দেশ সকলে পাবে—এবং তাঁর কাছে সেজন্যে পাঠিয়ে দিতেন। এই যে একটি জায়গা, যেখানে সমস্ত সঙ্ঘের সমস্ত সমস্যার সমাধান মেলে—এ অদ্বিতীয়। এবং এই অদ্বিতীয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে এই বোঝা বয়ে গেছেন—কখনও বিরক্তি প্রকাশ না করে। কোন্ ক্ষেত্রের কথা বলবো? তাঁর সঙ্ঘনেতৃত্ব, সঙ্ঘের পরিচালনার কাজ—তার পরে আর একটি জিনিস দেখুন—শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে এমন সুষ্ঠু সঙ্গত বুদ্ধিগম্য করে পরিবেশন করার বিরাট দায়িত্ব তিনি এর ভেতর থেকে নিয়েছেন। লীলাপ্রসঙ্গ তাঁর যে অতুলনীয় অবদান তা লেখা হয়েছে এই উদ্বোধনের ভেতরে বসে। এইখানে বসে, যেখানে সাধারণ

লোকের হয়ত একটু স্থির হয়ে চিন্তা করারও অবকাশ মেলে না, তার ভেতর। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এইসব দায়িত্বগুলো মাথায় নিয়ে—রাজ্যের দায়িত্ব—সাধুদের দায়িত্ব—গৃহস্থ ভক্তের দায়িত্ব—তাদের সংসারের সব সমস্যা তাঁর কাছে উপস্থিত করতো তারা। কত বৃদ্ধা তাদের যা সম্বল ছিল তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। কারণ জানত, এইটি একটি নিরাপদ স্থান। তিনি আবার সেইগুলি সব পুঁটলি বেঁধে বেঁধে এইটা অমুকের—এইটা তমুকের—এই রকম করে রাখতেন—প্রত্যেকটি জিনিস সযত্নে রাখতেন। কখনও তাদের বলেননি, "বাপু, আমি এত মাথা ঘামাবো কেন—আমি সন্ন্যাসী, আমার কাছে কেন আসছো?" এ কথাও না। প্রত্যেকের জন্যে তাঁকে ভাবতে হবে—তাঁর দায়িত্ব। মা তাঁকে তাঁর এই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন—কাজেই পালন করতে হবে। যেমন তিনি নিজেকে মায়ের দ্বারী বলে বলতেন। মাকে দর্শন করতে যাওয়া—ডাক্তার বলেছেন যে, নিতান্ত প্রয়োজন হলে মায়ের কাছে যাবে—তখন মায়ের শরীর খুব অসুস্থ শরৎ মহারাজের কাছ দিয়ে না হলে যাওয়া যাবে না। একজন সমস্ত বাধা-নিষেধ না শুনে যাবেন, মাকে দর্শন করবেনই—উনি দরজা আগলে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে ধাক্কা দিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু মাত্র বিরক্তি নেই। ভদ্রলোক ভক্ত, প্রথমে যাবার সময় হুঁশ ছিল না, ওঁকে ধাক্কা দিয়েই চলে গেছেন—ফিরে এসে পায়ে ধরে বলছেন, "মহারাজ ক্ষমা করুন।" "তুমি তো কোন দোষ করোনি, তুমি মায়ের কাছে যাচ্ছিলে—তোমার মনে মাকে দর্শন করবার প্রবল আগ্রহ ছিল। তা একটু ধাক্কাধুক্কি করেও যদি যেয়ে থাকো, দোষ কি?" দোষদৃষ্টি নেই। নিজে খুশিই হয়েছেন মনে হলো, বিরক্ত না হয়ে। এই তো তাঁর কর্তব্য, তিনি করে যাচ্ছেন। কত রকমের দায়িত্ব! কত লোকের সংসারের বোঝা তাঁকে বইতে হচ্ছে! আমরা আগেই বললুম, যখন তাঁর ঐ ঘরটির ভেতর বসে বসে শুনতুম, দেখতুম সব—নানান জন, নানান রকমের প্রকৃতি—তার ভেতরে কাকেও বিরক্ত না করে, কারও ওপরে সহানুভূতি কিছুমাত্র কম না করে, কাকেও বঞ্চিত না করে, তিনি সকলের দুঃখ শুনছেন—সকলকে পরামর্শ দিচ্ছেন। সকলের অশান্তির ভেতর তিনি শান্তিসুধা বর্ষণ

করছেন, যেমন গৃহস্থের পক্ষে তেমনি সাধুর পক্ষে—চিরকাল এই রকম। এতদিন ধরে এইভাবে কাটালেন—শেষ সময় যখন তাঁর stroke হলো—তারপরে, অত অসুস্থতার ভেতরেও ভক্তরা যাচ্ছেন, সাধুরা যাচ্ছেন, খুব বেদনা নিয়ে। তিনি কথা বলতে পারছেন না। কিন্তু কি এক স্নিগ্ধ দৃষ্টি! সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইছেন, যেন তাদের সমস্ত অন্তরের বেদনাকে মুছে দিচ্ছেন। দীর্ঘ প্রায় তেরো দিন, এই রকম রইলেন সেই অবস্থায়—দূর দূরান্তর থেকে ভক্তেরা এসে দেখা করলেন, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সাধুরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এলেন—সকলকে যেন সুযোগ দেবার জন্যে এই কষ্টের ভেতরেও তিনি শরীরকে ধারণ করে রইলেন, যেন এদের দর্শন না দিয়ে, এদের মনে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা না দিয়ে আমি যেতে পারি না—যেন এই ভাব। এই বেদনার ভেতর দিয়েও এইভাবে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রইলেন। একজন ডাক্তার, তিনি মঠের ভক্ত ছিলেন না, পরিচিত ছিলেন না—একেবারে অপরিচিত। তাঁর একজন ডাক্তার বন্ধু, যিনি মঠের ভক্ত, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন মহারাজের অসুস্থতার সময়। মহারাজ নবাগত অপরিচিত ডাক্তারটির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন। তাঁর যেন তার বেশি প্রয়োজন ছিল না। তিনি পরে বলেছেন ঃ ঐ দৃষ্টিই আমাকে অভিভূত করেছে। তাঁর জীবন চিরকালের জন্যে এই সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শেষকালে তিনি বরাবর সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ ভক্তরূপে সেবা করেছেন। মহারাজ তখন কথা বলতে পারছেন না। আর শরীরের কোন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারছেন না—কেবল দৃষ্টি দিয়ে দেখা। ভাবতে পারি কি আমরা—সেই দৃষ্টির মূল্য কী, সেই দৃষ্টির ভেতর দিয়ে তিনি কী সুধা বর্ষণ করলেন, কী আকর্ষণ বিস্তার করলেন, যার ফলে একটি জীবন চিরকালের জন্যে বাঁধা হয়ে রইলো, ঋণী হয়ে রইলো? এ কথা বোঝানো সম্ভব নয়, অনুভবগম্য। যে অনুভব করেছে, মাত্র সেই বুঝতে পারে।

আরও অনেক তাঁর প্রসঙ্গ আছে। আমাদের আর এখানে বসে সব একসঙ্গে বলা তো সম্ভব নয়। আর আগেই বলেছি এগুলি সুসম্বদ্ধ নয়, এলোমেলো যা মনে এসেছে সেই কথাগুলি পরিবেশন করলুম। আপনারা এর ভেতর থেকে

যদি কিছু আকর্ষণ—কোন শব্দের, কোন ঘটনার প্রতি—বোধ করে থাকেন খুব ভাল। আমার ভেতর এগুলো যেন টুকরো টুকরো সম্পদ হিসাবে আছে। আমি জানি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার এই সম্পদ কিছু কমছে না, বরং ভক্ত-সঙ্গে প্রসঙ্গ করার ফলে আমার মন আর একটু হয়তো তাঁর দিকে এগিয়ে যাবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর কৃপায় আমাদের সকলের তাঁর প্রতি এবং তিনি যে আদর্শকে তাঁর দেহ মনের ভেতর দিয়ে প্রসারিত করেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর প্রতি যেন চিরকাল মতি থাকে। তাঁদের কৃপায় যেন আমাদের জীবন সার্থক হয়।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতিকথা* (২)

স্বামী ভূতেশানন্দ

এই হলে এর আগে একবার আমাকে স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে বলবার জন্যে বাধ্য করা হয়েছিল। আমি যে 'বাধ্য করা হয়েছিল' বলছি, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; আমি সহজে রাজি হইনি। কারণ নিজের মনে যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল, বিশেষত এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে। কারণ তাঁর সম্বন্ধে বলবার জন্যে মনে কিছু প্রস্তুতি দেখতে পাই না। এই জন্যে অস্বস্তি বোধ হয়। এর আগে কি বলেছিলাম দেখতে ঔৎসুক্য হলো, পুরানো উদ্বোধন খানা খুলে দেখলুম, উদ্বোধনে একবার আমার কথাগুলি অনুলিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।[১] দেখে অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল। সেবারও অস্বস্তির মধ্যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম—এবারে বেশি করে অস্বস্তি বোধ করছি, কারণ ব্যক্তিগত যেসব স্মৃতি, তার ভাণ্ডার অফুরন্ত হয় না।

যেগুলি বলবার মতো হয়েছিল, খুব সুসংবদ্ধ না হলেও, সেগুলি সেদিন মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। কাজেই আবার কিছু বলতে গেলে আগে যা বলা হয়ে গেছে, অনেকক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি হবে। অস্বস্তির তাও একটা কারণ।

কিন্তু ইচ্ছে করলেও অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায় না। কাজেই যেমন সেবারেও বাধ্য হয়ে এসেছিলুম, এবারেও বাধ্য হয়ে এসেছি। আমার অসামর্থ্য যথাসম্ভব জানিয়েছি, কিন্তু আমার কোন কথাই, কোন ওজরই মঞ্জুর হয়নি। আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমি বিনয় করে বলছি কিন্তু তা নয়—একেবারে অন্তরের কথা। অস্বস্তি একেবারে অন্তর থেকে বোধ হচ্ছে, তবুও বলতে হবে।

* ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৮, শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 'সারদানন্দ হলে' প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।
১ চৈত্র, ১৩৮১ (৭৭ বর্ষ, ৩ সংখ্যা) পৃঃ ১১৭-১২৬।

এর চেয়ে 'ভক্তমালিকা' থেকে তাঁর জীবন-চরিত পড়া হলে অনেক জিনিস তা থেকে পাওয়া যেত।

আর ব্যক্তিগত কথাগুলি শুনতে সাময়িকভাবে হয়তো ভাল লাগে, কিন্তু যিনি বলবেন, তাঁর পক্ষে বলা মুশকিল। খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। নানা ঘটনা ও উক্তির সঙ্গে সব মিশে আছে। সেই পাঁচমিশেলি স্মৃতির মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে হয়, যা সকলের কাছে প্রকাশ করা চলে। আমার কাছে যে জিনিসের বিশেষ মূল্য আছে, অপরের কাছে তার সে মূল্য থাকবে না। আমি নিজে যেভাবে তাঁকে দেখেছি, সেটা আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থেকে দেখা। অপরে যেভাবে তাঁকে দ্যাখে তার সঙ্গে আমার দেখার মিল থাকবে না। তবু বলতে হবে। মহামুশকিল। যাই হোক, কাগজে যখন নাম ছাপা হয়ে গেছে, তখন উপায় নেই। যা মনে আসে, বলতে হবে। আপনারা যথাসম্ভব—ঠাকুরের ভাষায়—'ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে' নেবেন! সত্যি কথা বলতে কি—কোনটা বলবার মতো হবে আর কোনটা বলবার মতো নয়, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

এটা অন্তরের কথা বলছি, কারণ তাঁর সঙ্গে যখন তিনি মেশার সুযোগ দিয়েছিলেন, তখন সেই সুযোগের যে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি, তা মনে হয় না। আসতুম। ভাল লাগতো আসতে। কাছে বসে থাকতুম—ভাল লাগত বলে। প্রশ্ন বিশেষ করিনি—আর যেসব প্রশ্ন আলোচিত হতো, সেসবও যে তখন খুব মন দিয়ে শুনেছি, তাও বলতে পারি না। যা শুনেছি, তাও যে বুঝেছি, তাও নয়। ঐ উপনিষদের ভাষায়—

'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।'

(কঠ উ, ১।২।৭)

—অনেকে শুনতে পর্যন্ত পায় না, আবার অনেকে শুনেও বুঝতে পারে না। আমাদের ঠিক সেই অবস্থা—'বহবঃ', সেই বহুর মধ্যে পড়ে যাই, যারা শুনেও বুঝতে পারে না। দু-চারজন ভাগ্যবান যাঁরা শুনেছেন ও বুঝেছেন তাঁদের দলে

পড়ি না। সঙ্কোচ সেই জন্যে বেশি করে। এসেছি, কাছে বসেছি, শুনেছি কথাবার্তা, তার বেশি চোখ চেয়ে দেখেছি। ভাল লাগতো—একটা আপনার বোধ, মনে জেগে উঠতো, তাই চেয়ে থাকতুম। কি বলেছেন, হয়তো কানে গেছে, কিন্তু তা তলিয়ে বুঝবার অবকাশ সে সময় হয়নি—বুদ্ধিও হয়নি। আজও যদি সেদিন ফিরে আসে—এখন যে তা ভাল করে বুঝতে পারবো, তা নয়; কারণ হচ্ছে, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা একেবারে নগণ্যমাত্র। কাজেই সেখানে আমাদের বুঝবার চেষ্টাও থাকতো না। আর আমার মনে হয় এখনও থাকবে না। তবু আমার কাছ থেকে আপনারা শুনতে চান, তাঁর কথা। কিন্তু কী শোনাবো?

তাঁর ছবিটি আমি যেভাবে দেখি, আপনাদের সামনে কি সেভাবে তুলে ধরতে পারবো? পারবো না। কারণ, তা আমার একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস। সুতরাং আমাকে সভাসীন করায় আমার নিজের দুর্ভোগ ছাড়া আপনাদের বিশেষ কিছু লাভ হবে না। যখন আসতুম, তখন বয়স কম ছিল—মঠ-মিশনের সঙ্গে পরিচয় সবে শুরু হয়েছে। তাঁর কাছে আসি। বসে থাকি। কথাবার্তা দু-চারটা শুনি। কখনো চোখ চেয়ে থাকি, কখনো বা যেমন মন্দিরে বসে ধ্যান করে, সেই রকম চোখ বুজে ধ্যান করি। আর তিনি, কখনো কখনো বলেন—"ধ্যান করতে হয় তো ঠাকুরঘরে গিয়ে কর না!" স্বাভাবিক! তখন ওসব বুঝতুম না। চোখ বুজে আছি, চোখ চেয়ে দেখছি, কথা শুনছি—এই যথেষ্ট! বুঝবার কোন চেষ্টা নেই। তবে দেখেছি যে, তাঁর কথাগুলি যাতে আমাদের বুদ্ধিগম্য হয়, যাতে আমরা আমাদের জীবনের উপযোগী পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি, তার জন্যে তাঁর চেষ্টা ছিল—সে চেষ্টার বিরাম ছিল না কোন দিন।

এর আগের বার বলেছি—দেখলুম সেদিন পড়ে—অনেক সময় তিনি চুপ করে বসে থাকতেন—ঠাকুরের ভাষায়, "অচল অটল সুমেরুবৎ।" 'অচল অটল' পাহাড়ের মতো বসে থাকতেন, আর তাঁর চারপাশে যদিও অল্পপরিসর ঘর (তখন মনে হতো প্রকাণ্ড ঘর, এখন দেখছি কত ছোট উদ্বোধনের ঐ ঘরটি!) তারই ভেতরটা ভর্তি হয়ে থাকত লোকে।

তিনি বসে আছেন—'অচল অটল সুমেরুবৎ' আর চারপাশের লোকেরা যাঁর যা দুঃখের কাহিনী বলে যাচ্ছেন। তিনি শুনছেন। তখন আমরা ছেলেমানুষ। তখন মনে জগতের কালোর দিকটা বেশি করো পড়তো না, আলোর দিকটাই বেশি করে পড়তো। দুঃখের কথা সেই জন্যে ভাল লাগতো না, মনে হতো—এখানে এসেছি আমরা মহারাজের কাছে—(আমরা মহারাজ বলেই তখন বলতুম, যদিও মঠ-মিশনে শুধু মহারাজ বলতে রাজা মহারাজকে—স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকেই বোঝায়) তাঁকে দেখবার জন্যে, তাঁর কথা শোনবার জন্যে—দুঃখের কথা শুনতে নয়। তাই যখন শুনতুম গৃহস্থরা—তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ—তাঁদের সব সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা, সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বলছেন, তখন আমাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হতো। ভাবতুম—এই সব কথা বলায় আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, আমরা তো তাঁর কথা শুনতে এসেছি, যাতে ধর্মজীবনে আমাদের লাভ হয়। কিন্তু তাঁর কাছে দুঃখ নিবেদন করায় লোকেদের যে কষ্টের লাঘব হয় এবং সেই জন্যেই যে তিনি তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা মৌন সহানুভূতির সঙ্গে শোনেন—এ কথা তখন বেশি বুঝতুম না।

আমার কথাগুলি আগের কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় নেই। যেগুলি মনে আসছে, সেগুলিই বলছি।

তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝে আমাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে কাউকে দিয়ে কিছু সৎপ্রসঙ্গ তোলাতেন। তখন সেই সম্বন্ধে কথাবার্তা হতো। নানা কথা উঠতো, কিছু কিছু মনে আছে, অধিকাংশই মনে নেই।

একদিনের ঘটনা বিশেষ করে মনে আছে। কথাবার্তার ভেতরে একজন আগন্তুক এসেছেন। তিনি কথায় কথায় বললেন—"সাধুসঙ্গ করতে এসেছি।" মহারাজ বললেন, "সাধুসঙ্গ! বাপু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর থাকতেন, সেখানের পূজারিরা বা দক্ষিণেশ্বরের প্রতিবেশীরা ঠাকুরের সঙ্গ বহু বছর ধরে করেছে, কালীবাড়ির কর্মচারীরা দিন রাত সঙ্গ করেছে, বছরের পর বছর সঙ্গ করেছে—তাদের জীবনে যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে তা তো দেখা যায় না। তাহলে

সাধুসঙ্গের ফল কি হলো? কাজেই সাধুসঙ্গ মানে সাধুর কাছে আসামাত্র নয়। সাধুর সান্নিধ্যে এলেই সাধুসঙ্গ হয় না।" ভাব হচ্ছে এই, মনের যোগ থাকা দরকার, কেবল কাছে থাকলে হয় না—এই একটি কথা মহারাজ বললেন। আর একটি কথা বললেন ঐ ভদ্রলোককে। প্রসঙ্গক্রমে ভদ্রলোকটি বললেন, তিনি সংসার ত্যাগ করতে চান। মহারাজ বললেন, "তুমি তো বাপু সংসার ত্যাগ করবে, আমি তো এখনও পারিনি!" তারপর বললেন, "দেখো না, কতগুলি জড়িয়েছি!" শীতকাল তখন, ওঁর বাতের শরীর ছিল, কাজেই কাপড়চোপড় ব্যবহার করতে হতো বেশি। বললেন, "দেখ না, কতগুলি জড়িয়েছি!" তারপর বললেন, "এক সময় ছিল যখন এক কাপড়ে ভারত পরিভ্রমণ করেছি"—বলেই সংশোধন করে বললেন—"উত্তর ভারত।" "কিন্তু এখন? আজ এখন, এতগুলি জড়িয়ে রাখতে হয়েছে। সংসার ছাড়তে পারলুম কোথায়?" ভদ্রলোক কতখানি বুঝলেন জানি না, এখন মনে হয় যে, সংসার মানে দেহটার সঙ্গে সম্বন্ধ। যতক্ষণ দেহটার সঙ্গে সম্বন্ধ, দেহের প্রতি 'আমি-আমার'-বোধ, ততক্ষণ সংসার। সুতরাং সংসার ছেড়ে যাওয়া মানে বাড়ি থেকে চলে যাওয়া বা আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকা নয়। সংসার বাড়ি বা আত্মীয়স্বজন মাত্র নয়—সংসার দেহটাও। দেহের প্রতি 'আমি-আমার'-বুদ্ধিটা তাই মানুষকে সংসারে বেঁধে রাখে। এই কথাটি তিনি সংক্ষেপে বললেন। তার আর বিস্তার করে আলোচনা যে হলো, তা নয়। এই রকম টুকরো টুকরো কথা মাঝে মাঝে উঠতো। সেগুলি—তখন যদি বুদ্ধি থাকতো—টুকে রেখে দিতুম—সম্বল করে। তাহলে বলবার জন্যে এখন ভাবতে হতো না, বলবার মতো অনেক জিনিস পাওয়া যেতো। তা তো করিনি! নির্বোধ বালক, মনে হয়েছে, এঁদের কথা লিখে রাখবো কি! যখন ইচ্ছা শোনা যাবে তো! তা যে যায় না, ঐ সব কথা যে দুর্লভ হয়ে যাবে, সে কথা তখন ভাবিনি। ভাবনা মনে ওঠেনি, মনে হয়েছে এই রকম দিন চিরকাল থাকবে। কাজেই দেবার মতো, পরিবেশন করবার মতো কিছু সম্বল করে রাখিনি।

তবে তাঁর ব্যবহার, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তখনকার দিনে আমাদের

কিশোর মনে পড়েছিল এবং আমাদের অন্তরকে অন্তত কতকটা প্রভাবিত করেছে। তবে তা এখন ব্যাখ্যা করে বলবার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। তবু বলি আজ যে সন্ন্যাসজীবন লাভ হয়েছে, সে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপায় এবং সেই কৃপা এসেছে তাঁদের মাধ্যমে—তাঁর পার্ষদদের, বিশেষ করে, স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মাধ্যমে। ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদদের আরো অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু এঁর সঙ্গে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল—যার কারণ আপনাদের আগেই বলে দিয়েছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। কাজেই সেই বিশেষ সম্বন্ধের জন্যে তাঁর প্রভাব হয়তো একটু বেশি। তবে সেই কৃপার অনুভূতি হয়তো জীবনে আরও বেশি করে হতে পারতো।

এর আগে যা বলেছিলুম ব্রহ্মচর্য নেওয়া সম্বন্ধে, তা উদ্বোধনে বেরিয়েছিল। যখন আমার ইচ্ছা হলো ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করবো, এসে তাঁর কাছে নিবেদন করলুম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্মতি জানিয়ে বললেন, "ব্রহ্মচর্য তো আমি দিই না; মহাপুরুষ মহারাজ মঠে আছেন, তিনি দেন, তাঁর কাছে বলতে হয়, মঠে যা, গিয়ে তাঁকে বল।" এই বলে তাঁর কাছে পাঠালেন।

ব্রহ্মচর্যব্রতের সঙ্কল্পের কথা তাঁকেই জানিয়েছি—তিনিই ব্যবস্থা করবেন। করেছেনও তিনি। এইভাবে সন্ন্যাসজীবনের সূত্রপাত। এবং সেই আদর্শ সামনে ছিল বলে, যতই অযোগ্য হই, সেই অযোগ্যতার কথা বিচার না করেই পড়েছে আমাদের ওপর তাঁর কৃপা, তাঁর মাধ্যমে ঠাকুরেরই কৃপা। এই কৃপার কথা কি বাইরে বলবার মতো যে বলবো! বলবার কিছু নেই, নিজের অনুভবের জিনিস, নিজের অন্তরের জিনিস, নিজের অন্তরে রাখবার জিনিস। ইচ্ছা থাকলেও বাইরে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলা যায় না। এই জন্যে কিছু বলতে চাই না। বারবার বলেছি, আমাকে ছেড়ে দিন।

গতবারে যা বলেছি, পড়ে মনে হয়েছে—বাঃ! মোটামুটি বেশ তো গুছিয়ে বলেছি। এবার কিন্তু সব অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। অগোছালো হয়ে যাচ্ছে এই জন্যে যে, যা বলবার তা তো বলেই দিয়েছি, নতুন করে আর কী বলবো! সম্বন্ধ যা, ঘটনা যা—বলবার মতো—অল্পবিস্তর বলা হয়ে গেছে। তবু আজ

বিশেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করবার জন্যে, আপনারা এসেছেন, হয়তো উৎসবেও যোগ দিয়েছেন, আজকের স্মৃতিচারণ শুনতে সভাতেও যোগ দিয়েছেন। আপনারা স্মরণ করুন তাঁকে—যেমন আমি স্মরণ করি উদ্বোধনের ঐ ছোট ঘরটিতে তিনি বসে আছেন।

তিনি ছিলেন ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ফলে অনেক সময়ে আমাদের অনেকে তাঁর কাছে এগুতে সঙ্কোচ, সম্ভ্রম বোধ করতো। কিন্তু যখন তাঁর কতকটা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সাহস বা সুযোগ হয়েছে, তখন দেখেছি সেখানে ভয়ের কিছু নেই। কোন দোষ করলেও সেখানে ভয়ের কোন স্থান নেই—আছে অজস্র ক্ষমা, সে ক্ষমার তুলনা হয় না। একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি মঠে আছি—বেলুড় মঠে। একজন সাধু এমন এক গর্হিত কাজ করেছেন যে, প্রাচীন সাধুরা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তখনই তাঁকে মঠ থেকে বের করে দেওয়া উচিত। তখন মহাপুরুষ মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ। তিনি অনুপস্থিত। সুতরাং একজন সাধু সেই সাধুটিকে নিয়ে উদ্বোধনে এলেন মহারাজের কাছে বলতে—"এই ব্যক্তি এই গর্হিত আচরণ করেছে, সুতরাং একে মঠ থেকে বহিষ্কার করা হোক, এই আমাদের সিদ্ধান্ত। আপনি অনুমতি দিন।" মহারাজ কী বললেন? বললেন—"সত্য বলছ, ঠিক কথা—সাধুর পক্ষে এই গর্হিত আচরণ নিতান্ত অশোভন এবং এই গর্হিত কাজ এর জীবনে এই প্রথম নয়, তাও জানি। তবু আমার অনুরোধ তোমরা একে আরও একবার সুযোগ দাও।" মহারাজ মঠের সম্পাদক। তাঁর কথাই সিদ্ধান্ত—চরম সিদ্ধান্ত। তবু তিনি বলছেন, "আমার অনুরোধ"—"আমার অনুরোধ তোমরা একে আরও একবার সুযোগ দাও।" আশ্চর্য ব্যাপার!

আমাদের তখন অল্প বয়স। প্রকৃতির মধ্যে ঔদ্ধত্য আছে। মানুষের যে দুর্বলতা, তার প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি নেই। আমরা উত্তেজিত হয়ে ভাবছিলুম, সাধুটিকে বিদায় করে দেওয়া হোক, কিন্তু মহারাজের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া! "আমার অনুরোধ তোমরা একে আরও একবার সুযোগ দাও।" 'একবার' বললেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছে 'একবার' 'প্রত্যেকবার' হবে। কোন

দুর্বলতা এমন নয়, কোন আচরণই এমন গর্হিত নয়, যা তাঁর ক্ষমার অযোগ্য। এ আমরা দেখেছি। বারবার দেখেছি, তাই বলি যে, এমন মানুষকে কেউ ভয় করে! যিনি মানুষের সমস্ত অপরাধকে ক্ষমা করেন, তাঁর কাছে ভয় কিসের! কাজেই আর কোন ভয় থাকতো না। সম্ভ্রম একটু যে ছিল না, তা নয়। ছিল। কিন্তু জানতুম, তাঁর কাছে ভয়ের কোন স্থান নেই।

এর আগের বারেও বলেছি, কতকগুলি পাগল তাঁর আশ্রয়ে ছিল। সকলেই তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখতো। কিন্তু তারা মহারাজের স্নেহ থেকে কখনো বঞ্চিত হতো না। আগের বারে বলেছি—একটি বুড়ি এই পাগলদের অন্যতম। মহারাজ দেখছেন যে, সে কদিন ধরে খাচ্ছে না। বলছেন, "ওরে, বুড়ি কদিন ধরে খাচ্ছে না, ওর বুঝি বাই চড়েছে—ওকে একটু ওষুধ এনে দে।"

কত রকমের পাগল সব! পাগলামিতে আবার যাকে বলে, "There is a method in madness"—তাও আছে! একজন মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতো, বলতো, "মহারাজের দারোয়ান।" এক এক জন এক এক রকম। এই তো গেল উন্মাদদের কথা। অর্ধোন্মাদও কম ছিল না। কেউ ছিল দাম্ভিক, কেউ ছিল বিদ্যার অভিমানী, কেউ ছিল অন্য রকমের। কতকগুলি এমন ছিল, যাদের আচরণ অপরের কাছে অসহনীয় ছিল। তারা যখন অনুযোগ করতো, "আপনি এইসব লোককে স্থান দিয়েছেন, এদের এখানে থাকবার যোগ্যতা আছে?" তিনি বলতেন, "হ্যাঁ বাপু জানি, জানি এদের এখানে স্থান না দিলে আর কোথাও স্থান হবে না। তাই তো এদের রেখেছি। আমি যদি না রাখি, এরা কোথায় যাবে!" তাঁর কাছে তাদের স্থান ঠিক আছে। কোন সংশয় নেই, কোন আশঙ্কা নেই যে, তারা তাঁর আশ্রয় হারাবে। এই জন্যে মধ্যে মধ্যে অনুযোগ শুনতে হয়েছে, তবু তাঁর স্নেহ কখনো কুণ্ঠিত হয়নি। সকলের উপর অফুরন্ত ভালবাসা—তাদের দোষ জেনেও। দোষ-গুণ বিচার করে তিনি স্নেহ করতেন না—মায়ের সম্বন্ধে ঐ যেমন বলা হয়েছে, "অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্"—হাজার দোষে দোষী হলেও তুমি বিনা কারণে আমাদের উপর দয়া করো—মায়ের প্রতিনিধি মহারাজের সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়।

মহারাজ সকলের প্রতি অহেতুক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। সে স্নেহ অবারিত—সর্বত্র অবিরত বর্ষিত হতো। কেউ তা থেকে বঞ্চিত হতো না। ভাল-মন্দ সবাই সমভাবে তার ভাগ পেতো। এটি দেখার জিনিস। যারা দেখেছে, যে কেউ দেখেছে, অভিভূত হয়েছে। কখনো কখনো বিরক্তও হয়েছে। আমাদেরও মনে হয়েছে মহারাজ কি করে সকলকে, আমাদের দৃষ্টিতে যাকে বলে প্রশ্রয় দেওয়া, সেই প্রশ্রয় দেন। কিন্তু মহারাজ ভাবতেন, "আমি যদি এদের না রাখি, এরা কোথায় যাবে।" তিনি জানতেন, তাদের আর অন্য কোথাও জায়গা নেই। কাজেই তিনি মায়ের মতো ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল হয়ে চিরকাল তাদের লালন করেছেন! আমরা মঠে ঠাট্টা করে, পরিহাসছলে বলতুম—"উদ্বোধন পাগলের আড্ডা।" কিন্তু সেই পাগলদের যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, লালনপালন করেছেন, তিনি যে কত বড় নীলকণ্ঠ, তা কি আমরা তখন বুঝেছি, না বোঝবার চেষ্টা করেছি!

কত রকমের আক্রোশ, কত রকমের অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, এইসব পোষ্যদেরই কাছ থেকে। একবার একজনের কাছে তিনি হিসেব চেয়েছেন। তিনি বললেন, "আপনি হিসেবের কি বোঝেন?" মহারাজ বেশি কিছু বললেন না। শুধু বললেন, "ওরে, অতোটা ভাল নয়।" খুব শান্তভাবে বললেন, রাগ করে নয়—"ওরে অতোটা ভাল নয়।" তাঁর কাছে সমস্ত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হলেও অপরের কাছে তো হবে না! ফলে তারই হানি হবে, অকল্যাণ হবে, এই ভেবে বললেন, "ওরে অতোটা ভাল নয়।"

গুণ এতটুকুও দেখলে তাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেখা এবং দোষ খুব বড় হলেও তুচ্ছ করে দেখা—এইটি ছিল তাঁর মহান হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য। এই মহান হৃদয় যদি না থাকতো, তাহলে ঠাকুরের এই সঙ্ঘ যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তা কি করতো? এই জন্যে ঠাকুর যোগ্য ব্যক্তির উপর এত গুরুভার দিয়েছিলেন। কথায় আছে, ঠাকুর একবার শরৎ মহারাজের কোলে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—"দেখলুম ও কতটা ভার সইতে পারবে।" ভার তিনি প্রচুর সইতে পারতেন। চিরকাল ভার সয়েছেন—শেষ পর্যন্ত। কখনো বিরক্তি

নেই, ওজর আপত্তি নেই। ঠাকুর ভার দিয়েছেন, সুতরাং সে ভার বহন করতেই হবে। এবং এখন ইতিহাস বলবে কতটা যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সে ভার বহন করেছিলেন। যোগ্য হস্তে সঙ্ঘের পরিচালনার ভার ছিল, তাই না আমরা তাঁর আশ্রয়ে আসতে পেরেছি। যদি দোষ-গুণ বিচার করে আমাদের স্থান দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নের নিষ্পত্তি হতো, তাহলে আমরা কোথায় থাকতুম! আমরা কেউ একেবারে শুদ্ধ নিষ্পাপ নির্দোষ হয়ে আসিনি। এসেছি দোষগুণযুক্তরূপে। এবং তিনি আমাদের মনের সমস্ত আবর্জনা, সমস্ত মলিনতা নিজ হাতে মুছে দিতে সদাই তৎপর ছিলেন। তা না হলে আমাদের কি গতি হতো! তাঁর কৃপায় তাঁর পদাশ্রয়ে থেকে আমরা এবং আমাদের মতো অসংখ্য লোক বেঁচে গেছে, জীবনে একটা অবলম্বন পেয়েছে, এ জিনিস কি আর ভাষা দিয়ে, ঘটনা দিয়ে বুঝিয়ে বলা যায়! অনুভবের বস্তু! অন্তরের অন্তরে আস্বাদন করার জিনিস! জীবনে-জীবনে এর প্রতিষ্ঠা! প্রাণে-প্রাণে এর অনুভূতি! যা খুব গভীর, তা ভাষায় বলা মুশকিল।

একজনের ঘটনা বলছি। মহারাজ তাঁর খুব প্রশংসা করেছেন, তাঁর সাধনের প্রশংসা করেছেন, তাঁর বৈরাগ্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে তাঁর পদস্খলন, তাঁর অধোগতি দেখে কেউ কেউ বলতেন, "এত প্রশংসা পেলে তবু এ রকম হলো!" এখন বুঝি প্রশংসা কেবল সে ব্যক্তির বর্তমান দেখে নয়, তাঁর অতীতকে দেখে, তাঁর ভবিষ্যৎকে দেখে। কারণ আমরাই তো পরে দেখলুম, সেই ব্যক্তির চোখ দিয়ে অনুতাপের অশ্রুধারা ঝরেছে। তাতেই কি তাঁর সব দোষ ধুয়ে যায়নি! সেই দেখেই কি মহারাজ তাঁর প্রশংসা করেননি—তাঁকে স্থান দেননি!

আমরা খুব ভুল করি, মানুষকে তার এক মুহূর্তের জীবন দেখে বিচার করে। আমরা তো বুঝি না দূরদৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখতে হবে, তার বর্তমান, তার অতীত, তার ভবিষ্যৎ—সবটাই—দেখতে হবে। কাজেই আমরা ভুল করি। আমাদের সিদ্ধান্তে ভুল হয়। মহাপুরুষদের দৃষ্টি এই রকম সীমিত নয়, কেবলই বর্তমানে নিবদ্ধ নয়—তাঁরা অতীত দেখেন, বর্তমান দেখেন, ভবিষ্যৎও দেখেন।

যার ভিতরে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পান, তার প্রশংসা করেন। আমরা অনেক সময় ভাবি, অমুক ব্যক্তি মহারাজের আশীর্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু কই তার ফল তো দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ আমরা খুব অল্পতে ধৈর্য হারাই। তাঁর আশীর্বাদ অমোঘ। সে আশীর্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের জীবন নিষ্ফল হবে না, এ আমাদের বিশ্বাস, তবে সে আশীর্বাদ অনুভব করবার মতো সময় কবে আসবে, তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না। কারু কাছে আগে, কারু কাছে পরে, তাতে কি আসে যায়! স্পর্শমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়—তার আকার যাই হোক না কেন। হোক না তার তলোয়ারের আকার, সে সোনা হবেই। তেমনি যাঁরা তাঁর পদপ্রান্তে এসেছেন, যাঁরা তাঁর আশীর্বাদ জীবনে লাভ করেছেন, সে আশীর্বাদ কখনো বৃথা হবে না—সে আশীর্বাদ অমোঘ।

আর যাঁরা তাঁর পদপ্রান্তে এসে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার তেমন সুযোগ পাননি, তাঁরাও যদি এখন তাঁর পূত চরিত্রের কথা স্মরণ করেন, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের অনুধ্যান করেন, তাঁদের সেই চেষ্টাও নিষ্ফল হবে না। কারণ, অবতার আর অবতারের পার্ষদদের জীবন ভিন্ন নয়—একই বস্তু। যেমন ঠাকুর বলতেন, "কলমির দল।" সবটা নিয়ে কলমির দল। অবতার আসেন তাঁর পার্ষদদের নিয়ে, পার্ষদরা থাকেন অবতারের সঙ্গে নিত্যসম্বদ্ধ হয়ে। কাজেই মহারাজের আশীর্বাদ ঠাকুরেরই আশীর্বাদ বলে মনে রাখতে হবে। তাঁর কৃপা ঠাকুরেরই কৃপা। যেমন বাইবেলে আছে, "He who has seen the son, has seen the Father"—যিনি সন্তানকে দেখেছেন, তিনি পিতাকেও দেখেছেন। যারা এইসব শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের দেখেছেন, তাঁদের কৃপা লাভ করেছেন, তারা শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপা লাভ করেছেন—তাঁদের মাধ্যমে সেই এক শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপা সর্বত্র বর্ষিত হচ্ছে।

স্বামী শিবানন্দজীকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মহারাজের (ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে সবাই 'মহারাজ' বলতেন) কাছেই দীক্ষা নেব, না মায়ের কাছে নেব?" সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের স্বভাবসুলভ সরল উত্তর ঃ "একই কথা—দু-নল দিয়ে একই গঙ্গার জল আসছে!" শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা

যেন এক একটি নল, এক একটি মাধ্যম। তার ভেতর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। আমরা বুঝি আর না বুঝি, যাঁরা এই কৃপা পেয়েছেন, তা অবশ্যই সার্থক হবে তাঁদের জীবনে। আমরা এখন না বুঝলেও ভবিষ্যতে বুঝবো। মায়ের একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। একজন জিজ্ঞেস করছেন—"মা, আমরা তো বুঝতে পারছি না, জীবনে এগুচ্ছি কি না।" তিনি মায়ের পদপ্রান্তে এসেছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না, ধর্মজীবনে অগ্রগতি হচ্ছে, কি হচ্ছে না। মা গ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া-জানা মেয়ে নন। বাকচাতুর্য তাঁর নেই। তিনি বললেন, "বাছা, তুমি যদি ঘুমিয়ে থাক, আর খাটসুদ্ধ যদি কেউ এগিয়ে নিয়ে যায়, তুমি কি টের পাও?" কাজেই আমরা বুঝতে পারি আর না পারি—তাঁর কৃপায় জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবেই—হচ্ছেই। চোখ থাকলে আমরা এখনই তা বোধ করতে পারতুম।

তাঁর কৃপা অমোঘ। এই বিশ্বাস সর্বদা ধরে রাখতে হয় যে, তাঁর কৃপায় তাঁর পদপ্রান্তে, যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আমরা পৌঁছতে পারবো। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা যাঁরা সাক্ষাৎ ভাবে পেয়েছেন আর যাঁরা পেয়েছেন তাঁর পার্ষদদের মাধ্যমে তাঁরা সকলেই ধন্য হবেন, তাঁদের সকলেরই জীবন সার্থক হবে। এই ভরসা নিয়ে বসে আছি এবং প্রার্থনা করি, এই জীবনে তা অনুভবের গোচর হোক, তাঁর কৃপায়। এই জীবনে সে অনুভূতি জীবনকে সার্থক করে দিক এবং অন্তে তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই আধ্যাত্মিক পথযাত্রার পরিসমাপ্তি হোক।

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি* (৩)

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের বাল্যজীবনের সঙ্গে আমরা আদৌ পরিচিত নই। যতটুকু তাঁকে দেখেছি, তা হলো তাঁর জীবনের প্রায় শেষের দিক। প্রবল আধ্যাত্মিক জীবনের পিপাসা নিয়ে যৌবনে ঠাকুরের সংস্পর্শে তিনি যখন এসেছেন এবং তাঁর চরণপ্রান্তে থেকে যেসব সাধনা করেছেন, তার অধিকাংশই সকলের অজ্ঞাত। কারণ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আত্মজীবনী কিছু লেখেননি। যাঁরা তাঁর কথা লিখেছেন তাঁরা পাঁচ জনের কাছ থেকে শুনে একটি চিত্র দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁদের ঘটেনি। তবে এইটুকু বুঝতে পারি যে, ধর্মজীবনের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল, তার দ্বারাই আবাল্য তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

শরৎ মহারাজের শরীর ছিল দৃঢ়, বলিষ্ঠ, একটু স্থূল। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে তিনি যে সবচেয়ে বলবান ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কাছ থেকে সাক্ষাৎ এটি শুনেছি। প্রচুর শক্তি ছিল দেহের কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে পাওয়া যেত না, কারণ তাঁর স্বভাব অতিশয় নম্র ছিল। তবে একটি পরিচয় পাওয়া যেত যে, যখন বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়—তখন যেসব কাজে দৈহিক শক্তির দরকার যেমন—হাণ্ডা, কড়া মাজা, তাতে তিনি সব সময় এগিয়ে যেতেন। চাকরবাকর তখন ছিল না, নিজেরাই সব করতেন। যা শক্তি ছিল তা এইভাবেই ব্যবহার করতেন। আর একেবারে নিরহঙ্কার। অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ—যাতে মানুষের বলের পরিচয় পাওয়া যায়, তার দিক দিয়েও যেতেন না। আর একটি জিনিস অখণ্ডানন্দ মহারাজের কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি অত্যন্ত

সেবাপরায়ণ ছিলেন। গুরুভাইদের কারো অসুখ হলে তাঁর পাশে থেকে সব সময় তাঁর সেবা-শুশ্রূষা নিখুঁতভাবে করতেন। একাজে তাঁর মতো নিপুণতা আর কারো ছিল না এবং এই সেবার কাজে নিজের সব রকম অস্বাচ্ছন্দ্য অসুবিধা সহ্য করতেন। পরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসে যখন সাধনজীবন আরম্ভ করেছেন, তখনও সেই সেবাপরায়ণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুর যেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন, সেই বিশেষ দিনে ঠাকুরের ভিতর এক দিব্যভাবের প্রকাশ হয়েছিল। তাই দেখে ভক্তেরা যখন অভিভূত হয়ে সকলে পরস্পরকে ডাকছেন ঠাকুরের কাছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করবার জন্য, সকলেই যখন ঐ নিয়ে মত্ত, তখন ঠাকুরের সেবক শরৎ এবং লাটু অর্থাৎ পরে যাঁরা স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দ—দুজনে ঠাকুরের বিছানাপত্র পরিষ্কার করা, রোদে দেওয়া, ঘর ঝাড়া এইসব নিয়ে ব্যস্ত। কারণ ঠাকুর তখন শয্যাশায়ী। সেদিন সামান্য ভাল বোধ করায় একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন, এই অবকাশে সেবক দুজন তাঁর ঘরটিকে গুছিয়ে রাখছেন। ওদিকে ভক্তেরা ডাকাডাকি করছেন, কিন্তু তাঁরা সেদিকে কর্ণপাত করলেন না। ভাবলেন, যাঁরা ঠাকুরের আশীর্বাদ চান তাঁরা যান, আমরা বরং এই সুযোগে তাঁর সেবার কাজ খানিকটা এগিয়ে নিই। এর থেকে বোঝা যায় যে, সেবার ভাব তাঁদের কত প্রবল। যার জন্য সামনে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির একটা দুর্লভ লগ্ন এসেছে, হয়তো বা ক্ষণস্থায়ী—তবুও সেই সেবার কাজেই তাঁরা ব্যাপৃত থাকলেন—সেবা ফেলে ঠাকুরের কাছে গেলেন না। এটি সেবাপরায়ণতা ও ঐকান্তিকতার একটি বড় পরীক্ষা। নিঃস্বার্থ ভক্ত ভগবানের সেবা ছাড়া মুক্তি পর্যন্ত চান না। ভাগবতের সেই শ্লোকটি মনে পড়ে—'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥' ভক্তিশাস্ত্রের মতে যে বিভিন্ন প্রকারের মুক্তির কথা আছে—ভগবানের সঙ্গে এক লোকে বাস, তাঁর মতো ঐশ্বর্যশালী হওয়া, তাঁর মতো রূপধারী হওয়া, ভগবানের অঙ্গরূপে পরিণত হওয়া—এগুলি দিলেও ভক্তরা গ্রহণ করেন না—যদি না ভগবানের সেবাকার্যে কিছু সুবিধা হয়। সেবার জন্য তাঁরা সব করতে পারেন, কিন্তু নিছক মুক্তির

প্রত্যাশী তাঁরা নন। চরম আধ্যাত্মিক আনন্দও তাঁদের কাম্য নয়। সেবকদের এই নিস্পৃহ সেবার দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

বরাহনগর মঠে যখন সকলে ছিলেন সহায়সম্পদহীন হয়ে, কোনদিন খাবার জুটত, কোনদিন বা জুটত না, সেই সময় যখন সকলে ধ্যান-ভজনে মগ্ন হয়ে থাকতেন তখন কেউ অসুস্থ হলে, শরৎ মহারাজ সর্বদাই থাকতেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে। পরেও যখন ঠাকুরের সন্তানেরা তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় তীর্থাদিতে এবং প্রসিদ্ধ সব সাধন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখনও তাঁর এই সেবার ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই সময় হৃষীকেশ বা অন্যত্র ঠাকুরের কোন সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে শরৎ মহারাজ নিজের সাধন-ভজনকে উপেক্ষা করে তাঁর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। পরিব্রাজক-জীবনের কথা কখনো কখনো তিনি নিজের মুখে আমাদের বলেছেন। একবার বলেছিলেন, "এক কাপড়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরেছি।" কোথাও কোথাও খুব শীতের জায়গাতেও এ রকম একবস্ত্রে ঘোরা, কঠোর তপশ্চর্যা—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই—সেই অবস্থায়ও তাঁর সেবার ভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি।

যখন ঠাকুরের পদপ্রান্তে রয়েছেন—তখন ঠাকুর একদিন শরৎ মহারাজের কোলে গিয়ে বসে বললেন, "দেখলুম ও আমার ভার সইতে পারবে কি না।" বিশ্বম্ভরের ভার! যাকে তিনি সইবার শক্তি দেন সেই সইতে পারে, অপরে নয়। যখন তিনি স্থূলদেহ বিলয়ের পর সঙ্ঘদেহে বিরাজ করছেন সেই সঙ্ঘমূর্তি ঠাকুরেব ভারও যথাসময়ে শরৎ মহারাজকে বইতে হয়েছিল। যখন সঙ্ঘের কাজে স্বামীজী তাঁকে পাশ্চাত্য দেশে—ইংলন্ডে ও পরে আমেরিকায় পাঠালেন, স্বামীজীর আজ্ঞাবহরূপে তিনি গেলেন। আবার স্বামীজী তাঁকে ডেকে নিলেন ভারতের কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে এলেন এদেশে কাজ করবার জন্য। স্বামীজী তাঁর স্কন্ধে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব তুলে দিলেন। ঠাকুরের কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো। যিশুখ্রিস্ট সেন্ট পিটারকে বলেছিলেন, "I shall build my church on this rock." দৃঢ়ভিত্তি এই পাহাড়ের উপরে আমার

church বা ধর্ম-সঙ্ঘ গঠন করব। ঠাকুরের নির্দিষ্ট ভার ন্যস্ত হলো শরৎচন্দ্রের উপর।

আমরা যখন তাঁকে সেই সঙ্ঘ-সম্পাদক রূপে দেখেছি—তখন দেখেছি সঙ্ঘের নেতারূপে তিনি কি রকম নির্লিপ্তভাবে কাজ করতেন। তার দৃষ্টান্ত বহু জায়গায় বহু সাধুর মুখেও আমরা শুনেছি। কোন জায়গায় কোন গোলমাল হচ্ছে, দুই দলে পরস্পর বিরোধ হচ্ছে, একজন আর একজনের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি স্থিরভাবে সমস্ত কথা শুনে গেলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। অভিযোগকারীর হয়তো মনে হলো, তার কথা কি তবে সব বৃথাই হলো? বললেন, "মহারাজ আপনাকে সব বললাম আপনি তো কিছু বলছেন না?" শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন, "তোমার কথা তো শুনলাম বাপু, এখন অপর পক্ষের কথাও তো শুনতে হবে। কাজেই তার আগে তোমাকে কি বলব?" আমরা যখন দেখেছি তাঁকে—শুধু সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়েই তিনি ছিলেন—তা নয়। ভক্তমণ্ডলী—বিশেষ করে যারা নিতান্ত অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যাদের দেখবার কেউ নেই, যারা সংসারে অবহেলিত, তাদের ভারও তাঁকে বইতে হতো।

স্বামী যোগানন্দ মায়ের ভার বইতে পারতেন—প্রথমে তিনিই মায়ের সেবক ছিলেন। স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর সেই ভার শরৎ মহারাজের উপর পড়ে। এক জায়গায় মা বলছেন, "আমার ভার বওয়া সহজ নয়। এক যোগীন পারত আর শরৎ পারে।" একজন বলছেন, "মা, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পারেন না?" মা বললেন, "না, ও পারে না। ওর ভাব আলাদা।" তা মায়ের ভার মানে সাধারণ ভার নয়, তাঁর বিরাট সংসার, এই সবার সব ভার। শরৎ মহারাজ নিপুণভাবে মায়ের সেবা করেছেন, যখন তিনি জয়রামবাটীতে আছেন তখনও, যখন তিনি কলকাতায় আছেন তখনও—সব সময় অবিচলিত চিত্তে তিনি মায়ের ভার বহন করেছেন। কি নিষ্ঠা, দূরদৃষ্টির সঙ্গে তিনি সেই সেবা করেছেন এটা দেখবার জিনিস ছিল। মায়ের কাছে যারা আসত তারা সকলেই ভক্ত ছিল না। হয়তো মায়ের সঙ্গে কারো সাংসারিক সম্পর্ক ছিল, কেউ বা

অসহায় অবস্থায় এসে মায়ের আশ্রয়ে রয়েছে—এই রকম। তাদেরও প্রত্যেকের ভার শরৎ মহারাজ নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর নিজের মুখের কথা ঃ "কামারপুকুর, জয়রামবাটীর কুকুর শেয়ালও আমাদের নমস্য।" আর মায়ের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—তাদের তো কথাই নেই। এর জন্য তাঁকে কি না করতে হয়েছে? সেবা করা মানে শুধু বিধিব্যবস্থা বা অর্থসংগ্রহ করে চালানো নয়, সব রকম দায় দায়িত্ব পালন। কোথায় মায়ের কোন ভাই কি উপদ্রব করছে, কোথায় জমি জায়গার কিছু গোলমাল হচ্ছে, সব তাঁকে সামলাতে হচ্ছে, সবদিকে দৃষ্টি রেখে চালাতে হচ্ছে। মায়ের এই সেবার কাজে নিজের যত অসুবিধাই হোক, তিনি তাতে কখনও বিব্রত বোধ করেননি। মা তাঁর স্থূলদেহ সংবরণ করবার পরও মায়ের সেই বিশাল সংসারের ভার বহনের দায়িত্ব শরৎ মহারাজের স্কন্ধে রয়ে গেল। পরেও সেই একই অবস্থা ছিল। যারা সংসারে আবর্জনাস্বরূপ, তারা সর্বদাই শরৎ মহারাজের কাছে কৃপার পাত্র। শুধু কৃপা নয়, তাদের জন্য কত দরদ!

দেনা করে তিনি মায়ের বাড়ি করেছেন। তখন অর্থাভাব, এমন কোন ধনী ভক্ত ছিল না যে মায়ের জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে সক্ষম। অথচ মায়ের জন্য একটি বাড়ি করা একান্ত দরকার এবং বাড়িটি হবে গঙ্গার অদূরবর্তী স্থানে। কারণ মা গঙ্গা থেকে দূরে থাকতে পারতেন না। প্রথমে বাড়ি ভাড়া করে মাকে আনা হতো। কিন্তু বেশি ভাড়া দেবার বা বরাবরের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করে রাখবার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া মা সর্বদা থাকতেন না, যখন আসতেন তখন বাড়ি পাওয়া যাবে কোথায়? বাগবাজার, ঘুসুরি, বেলুড় নানা জায়গায় মাকে এনে রাখতে হয়েছে। শরৎ মহারাজ ভাবলেন, এ রকম করে চলবে না, মায়ের জন্য একখানি বাড়ি করতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? অতি কষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করে এবং বেশির ভাগ ধার করে মায়ের বাড়ি আরম্ভ হলো। তখনকার দিনে ধার পাওয়াও সহজ ছিল না, ভক্তদের কাছ থেকেই পেতে হতো এবং সে দায়িত্ব তখনকার দিনে সাধুদের পক্ষে দুর্বহ ছিল। যাঁদের নিজেদেরই চালচুলোর ঠিক নেই—তাঁরা দেনা করবেন কোন সাহসে—

কে শোধ দেবে? আর ধারই বা দেবে কে তাঁদের? শরৎ মহারাজের ব্যক্তিত্ব ছিল, আন্তরিকতা ছিল, ভক্তদের উপরে তাঁর প্রভাব ছিল। কাজেই দেনা করে তিনি মায়ের বাড়ি করলেন এবং সেই দেনা শোধ করবার জন্য তাঁকে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখনকার মতো অবস্থা তখন ছিল না। ভক্ত ছিল কিন্তু তাদের বেশিরভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির, উচ্চ মধ্যবিত্ত খুব কম। কাজেই তাদের সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। তখনকার দিনে হয়তো দশ বারো হাজার টাকায় একটা বাড়ি হয়ে যেত কিন্তু তা-ও তখন কল্পনাতীত ছিল। যাঁরা উদ্বোধনে গিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন বাড়িতে ঢুকে বাঁ হাতে একটি ছোট্ট ঘর আছে। সেটিই তাঁর বসবার ঘর ছিল। ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং উদ্বোধনের জন্য লেখাও ওখানেই হতো। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁকে বর্ণনা করেছেন, গণেশ ঠাকুরের মতো স্থূলদেহ, স্থির, ধীর, অল্পভাষী।

তাঁর অমূল্য অবদান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ। তিনি বলছেন যে, এটি লেখার উদ্দেশ্য বই-এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে মায়ের বাড়ির দেনা মিটবে। ঐ ছোট্ট ঘরখানিতে হাটের মাঝে বসেই তাঁর এত গভীর সুচিন্তিত গ্রন্থরচনা! ছোট একটি ডেস্ক থাকত। সেখানে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লেখা সব কাজ চলত। একটা নির্জন জায়গাও ছিল না যেখানে স্থিরভাবে বসে লেখাপড়ার কাজ করা যায়। কত বুড়োবুড়ি, কত পাগল সেখানে সব জড় হয়েছে, সকলের দিকে তাঁর দৃষ্টি। সাধু অথবা গৃহী আর্ত, দুঃখী, বেদনাতুর হয়ে যে-ই তাঁর কাছে এসেছে সে কখনও তাঁর কৃপাদৃষ্টি না পেয়ে ফিরে যায়নি। সকলেরই অন্তর ভরে যেত তাঁর কাছে সান্ত্বনা পেয়ে। এমন ধীর-স্থির, নীরব সহানুভূতির সঙ্গে তিনি তাদের সব দুঃখ বেদনার কথা শুনতেন যে, তাতেই তাদের দুঃখের ভার হালকা হয়ে যেত। প্রত্যেকের প্রতি তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি। দিনের পর দিন এই দৃশ্য সেখানে দেখা যেত। আমাদের মতো অল্পবয়সীদের ওসব কথা ভাল লাগত না। আমরা গিয়েছি ঠাকুরের কথা শুনতে, কিন্তু সেসব কথা না হয়ে হয়তো কেবল সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথাই চলছে।

আবার অল্পবয়সী যারা যেত তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তিনি উদাসীন

থাকতেন না। তাই মাঝে মাঝে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে একজন প্রাচীন সাধুকে তিনি কাছে ডাকতেন। তিনি পূর্ব জীবনে ডাক্তার ছিলেন, তাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকতেন—"ডাক্তার আসবে নাকি?" তাঁর মন ভাল থাকলে বলতেন, "হ্যাঁ মহারাজ যাচ্ছি।" আর তা না হলে বলতেন, "মহারাজ, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।" তিনি এলে কথার মোড় ফিরিয়ে দিতেন। সাংসারিক দুঃখ-বেদনার কথা হচ্ছিল, তিনি এসে সৎপ্রসঙ্গ তুলতেন। পরে বোঝা গিয়েছে যে তাঁর সহানুভূতি কেবল যারা ধর্মপিপাসু তাদেরই প্রতি নয়, যারা দুঃখকষ্ট বেদনায় জ্বলে-পুড়ে মরছে তাদের জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদত। সুতরাং তাদের জন্য যথেষ্ট সময় দিতেন। এই জিনিসটি আমরা অনেক পরে বুঝেছি। তখন কিন্তু বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া যে পাগলের দলকে তিনি পুষে রেখেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর কত সহানুভূতি, কত বেদনা! একদিন বলছেন, "ওরে ঐ বুড়িটার বোধ হয় বাই বেড়েছে, ও কিছু খাচ্ছে না, ওর জন্য একটু ওষুধ এনে দে।" এমনি করে কতকগুলি অনাহূত ব্যক্তি আসত, তারা উদ্বোধনে খেত আর পাগলামি করত। তাদের ভিতরেও কোথায় কোন্ বুড়ি খাচ্ছে না সেদিকেও দৃষ্টি আছে। একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, পরে তাঁর মাথার বিকৃতি হয়েছিল, একটা বিরাট পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভাবতেন তিনি সেখানকার দারোয়ান। এই রকম এক এক জন এক এক রকম।

এই ঘটনাটি সকলেই জানেন। একজন ভক্ত মাকে দর্শন করতে যাবেন, কিন্তু মায়ের শরীর অসুস্থ। দোতলায় যাবার পাথর বাঁধানো সিঁড়ির সামনে শরৎ মহারাজ তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছেন। স্থূল শরীর, প্রায় সমস্ত সিঁড়িটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মায়ের কাছে এখন যাওয়া চলবে না, কিন্তু ভক্তটি মাকে দেখবার জন্য এত আগ্রহী যে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠে মাকে দর্শন করতে গেলেন। তারপর মনে হয়েছে, তাই তো মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে চলে এসে কি অন্যায় করেছি! ফিরে এসে ক্ষমা চাওয়াতে তিনি বললেন, "বাপু তোমার যেমন মাকে দর্শন করবার আগ্রহ, আমারও যেন এ রকম হয়।" তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। এই রকম মায়ের সেবাতে তাঁর নিজের অভিমান কোথাও প্রকাশ পায়নি।

সেবার ব্যাপারে সকলের জন্য তাঁর সমান আগ্রহ। বুড়িদের যা কিছু সম্পত্তি হয়তো দু-চারখানা গয়না, কিছু টাকা, কোথায় রাখবে? বাড়িতে কারো উপর ভরসা নেই তাই তারা এসে শরৎ মহারাজের কাছে গচ্ছিত রাখত। তিনি সেগুলি পুঁটলি বেঁধে নাম লিখে লিখে একটি আয়রন সেফের ভিতরে রেখে দিতেন। আর যখন তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল তার আগের দিন একজন সাধুকে ডেকে বললেন, "এই আলমারিতে যা রয়েছে দেখে নাও, এগুলি যার যার জিনিস তারা যেন ঠিক ঠিক পায় তা দেখো।" তার পরের দিনই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল, স্ট্রোক হলো। তবে শেষ দিন পর্যন্ত এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। পাত্রাপাত্র নির্বিচারে সকলকে এইভাবে আশ্রয় দেওয়া, এই নিয়ে বেলুড় মঠে কোন কোন সাধু অভিযোগ করেছেন, "মহারাজ, আপনি এসব কতকগুলো দুষ্টু লোককে আশ্রয় দিয়েছেন।" শরৎ মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ বাবা, আমিও জানি যে ওরা সহানুভূতির অযোগ্য, কিন্তু আমি যদি ওদের স্থান না দিই তাহলে ওরা যাবে কোথায়? ওদের তো আর কোন জায়গা নেই।" সুতরাং সেখানে তাদের আশ্রয় অক্ষয় রইল। এইভাবে যাদের কোথাও স্থান নেই, তাঁর কাছে তাদের স্থান আছে। তারা তাঁকেও যে খুব সম্মান করে চলত সব সময় তা নয়। অপরিমেয় স্নেহ পেয়েছে, কিন্তু তবুও তারা তাঁর স্নেহের উপযুক্ত হতে পারেনি। তিনি কেবল দেবার জন্য এসেছেন, কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা রাখতেন না।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে ঃ একজন নবাগত ভক্ত এসে বলছেন, "আমি এখানে সাধুসঙ্গ করতে এসেছি।" মহারাজ বলছেন, "দেখ ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঠাকুর, চাকর, বামুন, কর্মচারী অনেকেই থাকত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁর সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু তাদের জীবনের তো বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সুতরাং সাধুর কাছে গেলেই যে সাধুসঙ্গ হয় তা নয়।" আগন্তুক সংসার ত্যাগ করতে চায় বলায়, শরৎ মহারাজ বললেন, "বাপু তুমি তো সংসার ত্যাগ করবে, আমি কিন্তু এখনও পারিনি।" বলে বলছেন, "দেখ না কত জড়িয়ে আছি।" ভাব

হচ্ছে এই, সংসার মানে কেবল স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবৃত থাকা নয়, দেহটাই সংসার। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এর চাহিদা মানুষকে মেটাতে হবেই। কাজেই বলছেন, "আমি সংসার ত্যাগ করতে পারিনি।" শরীরের পোষণের জন্য তাকে শীত-তাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য সবই করতে হয়। তা যদি হয় তাহলে সংসার ত্যাগটা হলো কোনখানে? অর্থাৎ ভাব এই যে, সংসার বাইরে নয়, মনে। মনে যদি সংসার থাকে বাইরে সংসার ত্যাগ করে কোন লাভ নেই। আর মনে যদি সংসার না থাকে তাহলে বাইরের সংসার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা তাঁর নিস্পৃহতার পরিচয় দেয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর নতুন মঠাধ্যক্ষ নির্বাচন হবে। কেউ কেউ বললেন যে, শরৎ মহারাজ তো ভার নিলে পারেন, কার্যত তাঁর উপরই তো এই ভার এতদিন ন্যস্ত রয়েছে। তিনি বললেন, "বাপু, স্বামীজী আমাকে সেক্রেটারি করে গিয়েছেন, আমি সেক্রেটারিই থাকব। আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই না।"

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ। শিবানন্দ মহারাজের শরৎ মহারাজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই এই সঙ্ঘকে উপযুক্তভাবে চালাতে পারবেন। তার পরিচয় আমরা অনেকক্ষেত্রেই পেয়েছি। সাধারণ একটি ঘটনা—সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে একদিন প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরী-মা মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন, "মহারাজ. আমরা সারদেশ্বরী আশ্রমের সাহায্যের জন্য একটা আবেদন করব। তাতে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা সকলে সই করবে, আপনারও নাম তাতে থাকুক আমরা চাই।" তিনি বললেন, "দেখ, আমার নাম দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যদি বলেন তো দিও।" অর্থাৎ এসব ব্যাপারে তাঁর নামটা দেওয়া হবে কিনা, সে সিদ্ধান্তের ভারও শরৎ মহারাজের উপরে দেওযা। সঙ্ঘ ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কথা উঠল যে, যাঁরা বৃদ্ধ তাঁদের উপরে আর ভরসা রাখা যায় না, এখন তাঁদের সকলেরই শরীর অসমর্থ হয়ে পড়ছে। কাজেই নতুন কয়েকজনকে এখন এই সঙ্ঘের দায়িত্ব নিতে হবে। সে

সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মঠ ও মিশনের প্রথম কনভেনশন হলো ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। অনেকেরই সে সময় দারুণ আপত্তি যে, আমরা নতুন পরিচালক চাই না। আমরা যাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এতদিন কাজ করে এলাম তাঁদেরই অধীনে থাকতে চাই। যখন এরূপ আলোচনা চলছে, সে সময় শরৎ মহারাজ সাধুদের একটি সভা আহ্বান করে জানালেন, "এই যে পরিবর্তন আমরা করতে চাইছি তার কারণ আমাদের অবর্তমানেও সঙ্ঘের কাজ যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। তাই একটি নতুন পরিচালকবর্গ তৈরি করে রেখে যেতে চাই যারা ভবিষ্যতে সঙ্ঘের পরিচালনভার নেবার জন্য তৈরি হতে পারে।" তাঁর অভিপ্রায় বুঝে সঙ্ঘ এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি মেনে নিল। একটি কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি করে তাদের উপর কাজ চালাবার ভার দেওয়া হলো।

যেদিন থেকে তিনি কার্যভার ঐ ওয়ার্কিং কমিটির হাতে দিলেন সেদিন থেকে একেবারে নির্লিপ্ত। তারপর থেকে সেই অক্লান্ত কর্মী স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, কোন দিন তাঁর মাথায় যেন কোন দায়িত্ব ছিল না, এইরকমভাবে নিজেকে একেবারে জপ-ধ্যানে ডুবিয়ে দিলেন। তারপর থেকে সেই ভাব, সেই mood তাঁর শেষ পর্যন্ত রইল। কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি সংক্ষেপে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সঙ্ঘের কাজে সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করতেন না। তখন যেন তাঁর দক্ষিণেশ্বরের সাধন-ভজনের জীবন ফিরে এল। এমন ধ্যান-জপে ডুবে থাকতেন যে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। সেই সময় তাঁর দিনচর্যা এই রকম ছিল; সকালে গঙ্গাস্নান করে এসে জপ-ধ্যান করতেন, দুটো আড়াইটে অবধি ঐভাবে কেটে যেত। তারপর খাওয়া, বিশ্রাম, সমাগত ভক্তদের সঙ্গে কথা বলা, কাজের বিষয়ে আর কোন চিন্তা নেই।

একদিনের ঘটনা এইরূপ ঃ একদিন শরৎ মহারাজ বাগবাজার থেকে নৌকা করে মঠে যাচ্ছিলেন (তখন কলকাতা থেকে নৌকা করে বেলুড়, দক্ষিণেশ্বরে যেতে হতো) এমন সময় ঝড় উঠল। নৌকা ডোবে ডোবে এমনি অবস্থা। তিনি কিন্তু স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন নৌকার ভিতরে। সহযাত্রী ছিলেন

ডাঃ কাঞ্জিলাল। তিনি সক্রোধে কলকেটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বললেন, "নৌকা ডুবছে আর আপনি বসে বসে তামাক খাচ্ছেন!" তারপর ঝড় কেটে গেল, নৌকা এসে পাড়ে ভিড়ল। তখন বললেন, "আমি তো বসে তামাক খাচ্ছিলাম, তোমরা তো কেবল হৈ চৈ করছিলে, তাতে কি নৌকা বাঁচত?" ঐ ঝড় যেমন তাঁকে চঞ্চল করতে পারেনি, তেমনি সঙ্ঘের উপর দিয়েও যেসব ঝড় তখন বয়ে গিয়েছে তিনি তাতেও কখনও বিচলিত হননি।

স্থির অচঞ্চল সঙ্ঘনেতা। চিরকাল সঙ্ঘের বোঝা বয়েছেন, কিন্তু তিনি যে কষ্ট করে বোঝা বইছেন, এ কথা তাঁকে দেখে বোঝা যেত না। সম্মানে-অসম্মানে, সম্পদে-বিপদে কোন অবস্থাতেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। এইটি ছিল তাঁর চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই পরবর্তী কালে স্বামী প্রেমেশানন্দ গানেতে বলেছেন ঃ "শরৎ সুধীর শান্ত যেন গণনাথ"—গণেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছেন, চঞ্চলতা নেই, কোন তরঙ্গ তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না। অথচ এই স্থির অচঞ্চল ব্যক্তিটি এতবড় সঙ্ঘের নিয়ন্তা! কে দেখলে বুঝবে যে এতবড় বিরাট কাজ ইনি করছেন! আসল কথা হচ্ছে এই যে, যাঁরা এ রকম বিরাট পুরুষ তাঁরা নিজেদের বিরাটত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না। যারা দূর থেকে দেখে তারা ভাবে, "কি বিরাট ব্যক্তিত্ব!" একদিনের একটি ঘটনা বলে শেষ করি।

শরৎ মহারাজের জন্মতিথি। আমাদের সকলের খুব ইচ্ছা আজকের দিনে তাঁকে সবাই ফুল দিয়ে পূজা করব। কিন্তু এমন গম্ভীর হয়ে বসে আছেন কার সাধ্য যে প্রথমে গিয়ে তাঁর সেই গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে। আমাদের সবার ইচ্ছা, কিন্তু দূরে অপেক্ষা করছি কে আরম্ভ করবে, প্রথম ঝাপটাটা কে সইবে? এমন সময় ভক্তদের বাড়ি থেকে আগত একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখা গেল। সাধুরা তাকে শিখিয়ে দিলেন, "যা, এই ফুলটা মহারাজের পায়ে দিয়ে প্রণাম করে আয়।" মেয়েটি গিয়ে দিব্যি ফুল দিয়ে প্রণাম করল। দেখা গেল তাঁর সেই গাম্ভীর্যটা কমে গিয়েছে। তখন আমরা সব সাহস করে এগোলাম। উনি বুঝতে পারলেন যে, এটা কৌশল করে করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ

গাম্ভীর্যের আবরণের ভিতরে কি অদ্ভুত কোমলতা, কি স্নেহপরায়ণতা, সকলের প্রতি কি সহানুভূতি ছিল। ঐ আবরণ ভেদ করে যারা তাঁর কাছে পৌঁছেছে তারাই এটি বুঝতে পেরেছে। এই স্নেহের ভাব একমাত্র মায়ের ভিতরে কতকটা পাওয়া যায় অন্যের কাছে নয়, তাও 'কতকটা' বলছি। একবার আমার নিজের জীবনেই হয়েছে। তাঁর কাছে গিয়েছি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে, গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বলছেন, "সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমরা কি চিরকাল থাকব?" একটু পরেই আবার বুঝিয়ে বলছেন, "বাবা, সব প্রশ্নের উত্তর নিজের ভিতর থেকে পাওয়ার চেষ্টা করবে। জেনো, সর্বদা অপরের উপর নির্ভর করলে নিজের ভিতর থেকে উত্তর পাবে না। আর আমরা তো চিরকাল থাকব না।" যেন আমাদের প্রস্তুত করবার জন্য বলছেন, আমাদের সব সময় তাঁর দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের আশ্রয়রূপে তাঁর দিকে চেয়ে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মনির্ভর করতে চাইছেন। বুঝলাম এইজন্য বিশেষ করে চাইছেন যে, তাঁদের লীলা সম্বরণ করার আর বেশিদিন বাকি নেই।

তাইতো বলি, বাইরের গুরু যিনি তিনি ভিতরের গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্বের পরিপূর্ণতা। আজকের শুভ দিনে এই পুণ্য স্মৃতিচারণ-প্রসঙ্গে আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাই যে, তাঁদের জীবন যেন আমাদের চলার পথে সব সময় আলোকবর্তিকার কাজ করে। আমরা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁদের আশ্বাসবাণীর উপর ভরসা করে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের উপর সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে।

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥'

—গীতা, ৪।১৮

গীতায় কোনটি কর্ম ও কোনটি অকর্ম অর্জুনকে বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। উহার সাধারণ অর্থ—কর্মে যিনি অকর্ম ও অকর্মে যিনি কর্ম দেখেন তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি বিভিন্ন প্রকার কর্ম করিলেও কখনও কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন না। এই কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম কি তাহা লইয়া বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নরূপ ভাষ্য বা টীকা করিয়াছেন।

খুব সম্ভব ঐ শ্লোকটির উপরেই কর্মযোগ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন, যান-বাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে; ইহাই কর্মযোগের আদর্শ।

স্বামীজীর এই কর্মযোগীর আদর্শ আমরা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে মূর্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম। শত কাজ ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও দেখিতাম তিনি ধীর, স্থির ও শান্ত, কর্মকোলাহলপূর্ণ কলকাতার পল্লিতে অবস্থান করিলেও মনে হইত সত্যই তিনি মরুভূমির নিস্তব্ধতা উপভোগ করিতেছেন এবং যখন কর্মবিরত অবস্থায় শান্তভাবে বসিয়া থাকিতেন তখনও মনে হইত শুধু মঠ-মিশন কেন, বহুজনের কল্যাণ চিন্তায় তিনি নিমগ্ন, তাঁহার বিশাল হৃদয়ে কত দীনদুঃখী যে স্থান পাইত তাহার ইয়ত্তা নাই।

মঠে যোগদানের পর আমরা যখন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলাম তখন 'উদ্বোধন' অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'কে মনে হইত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি বিচিত্র কর্মশালা। শ্রীশ্রীমায়ের সবেমাত্র শরীর গিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের সহচারিণী বা সেবিকা গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতেই রহিয়াছেন। যোগীন-মার আশ্রয়শূন্য দৌহিত্রগণও তখন উদ্বোধনে আশ্রয় পাইয়াছেন, আবার জয়রামবাটীর এবং শ্রীশ্রীমায়ের আত্মীয়া রাধু প্রভৃতির সকল খবর এখান হইতে রাখিতে হইতেছে। ইঁহাদের সকলের ভার পূজনীয় শরৎ মহারাজের উপর।

মঠ-মিশনের কার্যও তখন উদ্বোধন হইতেই হইত। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ [স্বামী শিবানন্দজী] তখন মঠ-মিশনের সহাধ্যক্ষ [Vice President] এবং বেলুড় মঠের কার্যাধ্যক্ষ থাকিলেও বহুদিন কঠোর তপস্যায় জীবনযাপন করায় তাঁহার পক্ষে মঠ-মিশনের বিবিধ কর্মের মধ্যে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হইত না। মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দজী] উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে সর্বদা অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার পক্ষেও কর্মক্ষেত্রে নামিয়া সমস্ত কিছু দেখাশুনা করা বা পরিচালনা করা সম্ভব হইত না। কাজেই মঠ-মিশনের সকল কাজই পূজনীয় শরৎ মহারাজকেই দেখিতে হইত। অনলস ও অতন্দ্র কর্মিরূপে তিনি সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেন। পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ এই কালে বেশির ভাগ সময়ই ভুবনেশ্বরে থাকিতেন। কেবল মঠ-মিশনের কোন বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইলে বা কোন বিশেষ কার্যের জন্য প্রয়োজন হইলে স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন ও বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে মঠে বা প্রয়োজনীয় অন্য স্থানে লইয়া গিয়া ঐ সমস্যার সমাধান করিতেন এবং সমস্যাটির সমাধান হইলেই তাঁহাকে আবার তাঁহার অধ্যাত্মরাজ্যে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতে দিতেন।

উদ্বোধনে তখন যে সকল সাধু থাকিতেন তাঁহারা কর্মী হইলেও সকলেই ধীর মস্তিষ্কের ছিলেন না, কিন্তু এই নানাপ্রকার বিপরীত অবস্থাতেও পূজনীয়

স্বামী সারদানন্দজীকে আমরা কখনও বিচলিত হইতে দেখি নাই। ধীর, স্থির, সুদক্ষ কর্মবীরের মতো তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘকে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করাইয়া উহার সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেন।

দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত, দুঃস্থ ও আর্তদিগের সেবাও তখন মিশনের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ছিল। যেখান হইতেই ঐরূপ সেবার আহ্বান আসিত মঠ-মিশনের কর্মীর সংখ্যা তখন অতি অল্প থাকিলেও পূজনীয় শরৎ মহারাজ অচঞ্চল চিত্তে তৎক্ষণাৎ সেখানে আর্তত্রাণ কার্যের জন্য কর্মী পাঠাইয়া দিতেন। সেবক পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না; আর্তত্রাণের ও কর্মীদিগের সকল খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়মিতভাবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে হইত, তিনিও নিয়মিতভাবে উহা চালাইবার উপদেশ দিতেন। ঐ কার্যের কোনরূপ শিথিলতা বা ব্যয়বাহুল্য দেখিতে পাইলে তিনি কর্মীদিগকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিতেন ও পুনরায় কখনও উহা না হয় তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিতেন। কিন্তু বাহিরের কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন সঙ্ঘ সেবকদিগের ঐ সকল কার্যের কিছুমাত্র অন্যায় সমালোচনা করিলে তিনি সিংহবিক্রমে উহার অসারতা প্রমাণ করিয়া দিতেন এবং সেবকদিগকে ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতে নিষেধ করিয়া তাহাদের নিজেদের কার্যে অবহিত হইতে বলিতেন। রাজশাহী জেলায় নওগাঁয় বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করিবার সময় আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দীর্ঘ দুই মাস সেবাকার্যের পর ওখানে উহার আর কোন প্রয়োজন না থাকায় পূজনীয় শরৎ মহারাজের নির্দেশক্রমে ঐ কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানকার কার্যনিরত কোন কোন নূতন সঙ্ঘ হইতে উহাতে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল; সংবাদপত্রেও ঐ বিষয়ে নানারূপ সমালোচনা বাহির হইল; কিন্তু পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাহাদের সকলের কথা তুচ্ছ করিয়া সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে, দীর্ঘকাল সেবাকার্যের অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন্ সেবাকার্য কখন আরম্ভ করিতে হইবে এবং কখন উহার পরিসমাপ্তির প্রয়োজন হইবে তাহা মিশন বিশেষরূপে অবগত আছে, যাঁহারা নব উৎসাহ লইয়া আরও অধিককাল ঐ কার্য-পরিচালনা করিতে চান তাঁহাদিগের এই বিষয়ে আরও

অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক। পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঐ কথা লইয়া তখন পত্রিকাদিতে নানারূপ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পূজনীয় শরৎ মহারাজ অচঞ্চল রহিলেন ও পরে সর্বসাধারণ তাঁহার কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিলেন।

মিশনের কার্য সম্বন্ধে সেই সময়ে ইংরেজ সরকার বাহিরে কিছু না বলিলেও উহা খুব সুনজরে দেখিতেন না। ঢাকার দরবারে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ভাষণদানকালে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল মিশনের উপর বিরূপ কটাক্ষ করিয়া যেরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে সর্বজনবিদিত। তাহার ফলে মঠ-মিশনের অনেক ভক্ত ও সভ্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট এই বিষয়ে কি করণীয় তাহার নির্দেশ চাহিয়া পত্রাদি দেন; তাহার উত্তরে তিনি তাঁহাদিগকে অবিচলিত থাকিয়া ও কোনরূপ ভীত না হইয়া সত্যকে ধরিয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন এবং মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে তিনি স্বয়ং লর্ড কারমাইকেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা এবং মিশনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে লর্ড কারমাইকেল আর একটি বক্তৃতায় তাঁহার পূর্ব-মন্তব্য প্রত্যাহার করেন।

আর একটি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যাহাতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। বরিশাল জেলায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে ভারুকাঠি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্য শুরু করা হয়। ঐ অঞ্চলে কয়েকটি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় সংবাদপত্রে ঐ সংবাদ প্রকাশ করেন; ফলে তিনি রাজরোষে পতিত হন এবং উক্ত আশ্রমে পুলিশ পুনঃ পুনঃ আসিয়া তাঁহাকে ঐ উক্তিটি প্রত্যাহার করিতে বলে। এই বিষয়ে কি কর্তব্য, পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট জানিতে চাহিলে মহারাজ লিখিলেন, "কখনও তুমি সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। যদি ঐ ঘটনা সত্য হয় তবে কাহারও ভয়ে তুমি উহা প্রত্যাহার করিও না। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সহায় হইবেন।" অতঃপর যখন ঐ ঘটনা সত্য বলিয়া

প্রমাণিত হইল, তখন রাজরোষও ধীরে ধীরে ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষের উপর হইতে অন্তর্হিত হইল।

কার্যক্ষেত্রে এইরূপ কঠোর, নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত হইলেও তাঁহার হৃদয় ছিল কুসুম অপেক্ষাও কোমল। কত রাজরোষ-পীড়িত, কত অসুস্থ, অর্ধোন্মাদ ও বিকৃতমস্তিষ্ক সাধুকে যে তিনি তাঁহার নিকটে 'উদ্বোধনে' স্থান দিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজরোষ-নিপীড়িত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ [দেবব্রত বসু] এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দ [শচীন] উভয়েই ছিলেন মানিকতলার বোমার ষড়যন্ত্র মামালার আসামি, আত্মপ্রকাশানন্দ [প্রিয়নাথ] ও স্বামী সত্যানন্দ [সতীশ] প্রভৃতিও ছিলেন বিপ্লবী দলের। তাঁহাদের মুক্তির পর তিনি ইঁহাদিগকে স্থান না দিলে ইঁহাদের মঠ-মিশনে স্থান হইত কিনা সন্দেহ।

অদ্বৈত-চৈতন্য প্রভৃতি অর্ধ-উন্মাদদেরও তিনিই ছিলেন পরম আশ্রয়। অদ্বৈত-চৈতন্য আমাদেরই সময়ে সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিল, যথাসময়ে তাহার ব্রহ্মাচর্য-দীক্ষাও হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার পর তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। তখন সে কখনো মঠে, কখনো কলকাতা বা অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাহাকে উদ্বোধনে আশ্রয় দেন ও তাহার সর্ববিধ সেবাশুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে সে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহার সেবককে যথাসময়ে ঔষধ খাওয়াইতে বলিয়াছিলেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক অদ্বৈত কিন্তু ঔষধ খাইতে অস্বীকার করিল। সেবক পূজনীয় শরৎ মহারাজকে ইহা নিবেদন করিলে তিনি স্বয়ং তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাহাকে ঔষধ খাইতে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন, ''বাবা অদ্বৈত, ঔষধটি খাও, তোমার অসুখ সেরে যাবে,'' উত্তরে কিন্তু উন্মাদ জানাইল, ''এই সময়েই তো শুধু 'বাবা' বলছ, কই, রসগোল্লা খাওয়ার সময় তো 'বাবা' বল না।'' তখন কল্যাণকামী ধীর গম্ভীর শরৎ মহারাজ বলিলেন, ''বাবা, এবার তুমি ঔষধ খাও, পরে তোমাকে রসগোল্লা খাওয়ানো হবে।'' এইরূপ করুণাময় মহাপুরুষ আর কোথায় দেখা যাইবে?

আমরা আর একটি ঘটনাও অতি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, তাহাতে তাঁহার চিত্ত যে কত কোমল ও ক্ষমাশীল তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হই। অতি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের একটি সাধু এক সময়ে অত্যন্ত অন্যায় কর্মে লিপ্ত হন। মঠ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উহা হইতে পুনঃ পুনঃ সতর্ক হইতে বলিলেও তিনি প্রারব্ধবশত উহাতে সমর্থ হন নাই। উহা যখন সংশোধনের মাত্রা ছাড়াইয়া গেল তখন মঠ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার পূর্বাশ্রমে ফেরত পাঠানোই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন এবং তজ্জন্য দুই জন ব্রহ্মচারী-সহ তাঁহাকে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; উদ্দেশ্য—মঠ-মিশনের সেক্রেটারিকে জানাইয়া তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া। ব্রহ্মচারিদ্বয় উঁহাকে লইয়া উদ্বোধনে পৌঁছিলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ উপরে তাঁহার ঘরে বসিয়াই এ সংবাদ পাইলেন ও তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারী দুই জনকে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন ও নিচে অপরাধী সাধুটির নিকট যাইয়া সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুই কোথায় যাবি, এখানেই থাক, তোর সকল ব্যবস্থা আমিই করবো।" সাধুটিও তাঁহার করুণায় বিগলিত হইয়া উদ্বোধনে থাকাই স্থির করিলেন ও কিছুকাল তাঁহার নিকটেই সুস্থচিত্তে অবস্থান করিলেন। কিন্তু প্রারব্ধ বলবান, এত করুণা পাইয়াও শেষ পর্যন্ত তিনি থাকিতে পারিলেন না।

তখন বেলুড় মঠের সাধুগণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে চিকিৎসার ও পথ্যাদির ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হইত, কারণ তখন মঠের আয় স্বল্প ছিল। আমরা শুনিয়াছি, পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ এইজন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ' পুস্তকখানি মুদ্রিত করাইয়া স্বল্পমূল্যে ভক্তদের নিকট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য—বিক্রয়লব্ধ অর্থে অসুস্থ সাধুদিগের সেবা হইবে। ইহাতে নানা কথা উঠে, পূজনীয় শরৎ মহারাজ উহা শুনিয়া একদিন মঠে জ্ঞান মহারাজকে বলেন, "দেখ জ্ঞান, তুমি এই বইখানি আমাকে দাও। এখন হতে মঠের অসুস্থ সাধুদের চিকিৎসা ও সেবার ভার আমিই গ্রহণ করব।" তদবধি বহুদিন পর্যন্ত উদ্বোধনে জায়গা সঙ্কীর্ণ হইলেও মঠের অসুস্থ সাধুগণ আসিয়া সেখানেই অবস্থান করিতেন এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজের

স্নেহচ্ছায়ায় থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাদি করাইবার সুযোগ লাভ করিতেন।

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ বা স্বামী তত্ত্বানন্দের কথা মনে পড়ে। তত্ত্বানন্দ আমাদের সময়েই মঠে যোগদান করিয়াছিল এবং উদ্বোধনে কর্মিরূপে কিছুকাল ছিল। এই সময়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজ কিছু দিনের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। তখন গোবিন্দ হঠাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। উদ্বোধনে ছোট বাড়িতে তাহাকে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া উদ্বোধনের তদানীন্তন পরিচালকগণ তাহাকে কারমাইকেল [বর্তমানে আর. জি. কর] মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েক দিন পরেই গোবিন্দ সেখানেই দেহত্যাগ করে। কিছু দিন পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসেন ও গোবিন্দের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং দুঃখ করিয়া বলেন, "এখন হতে আমার অসুখ হলেও তোমরা আমাকে হাসপাতালেই ভর্তি করো।" এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ খেদোক্তি তাঁহার মতো মহাপুরুষের মুখেই সম্ভব।

দীনদুঃখীর তিনি চিরদিনই পিতা-মাতা। তাঁহার শরীর যাইবার অনেক পরে তাঁহার হস্তলিখিত একটি হিসাবের বই আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বহস্তে বহু দীনদুঃখীর হিসাব রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। কোন্ বিধবা তাঁহার নিকট কবে কয়টি টাকা রাখিয়াছেন, কোন্ অসহায় ভিক্ষু তাহার ভিক্ষালব্ধ অর্থের কতটুকু তাঁহার নিকট জমা রাখিয়াছে, সবই তাহাতে সুস্পষ্টরূপে লেখা ছিল। আবার সেই অর্থ হইতে কে কবে কত টাকা লইল তাহাও উহাতে উল্লেখ ছিল।

মাতৃজাতির উপর তাঁহার অপার্থিব শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত; 'ভারতে শক্তিপূজা'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তি-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অর্পিত হইল।" সত্যই তিনি মাতৃজাতিকে ঐরূপ সম্মান চিরদিন দিয়া আসিতেন। তাঁহার শরীর যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে তিনি মঠ-মিশনের

কর্মভার নূতন সাধুগণের উপর দিয়া জপ-ধ্যানে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন; তখনও দেখিয়াছি দ্বিপ্রহরে তাঁহার আহার সমাপ্ত হইবার পূর্বে ও পরে কত গৃহস্থ ঘরের মহিলাগণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রাণ খুলিয়া অভাব-অভিযোগ নিবেদন করিতেছেন এবং তিনিও সস্নেহে উহা দূর করিবার উপায়সকল তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতেছেন। তাঁহার শরীর গেলে আমাদের মনে হইয়াছিল যে তাঁহারা এবার সত্যই আশ্রয়শূন্য হইলেন, প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের দুঃখ নিবেদন করিবার বোধ হয় আর কোন স্থান রহিল না।

মঠে যোগ দেওয়ার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সৌভাগ্য আমাদের খুব কমই হইয়াছিল। বেলুড় মঠে থাকিতাম, কোন বিশেষ কাজে কলকাতায় আসিতাম। তখন অল্প সময়ের জন্য পূজনীয় মহারাজের দর্শন পাইতাম, আবার কার্যোপলক্ষে তিনি মঠে গেলে কখনও তাঁহার অল্প-স্বল্প সেবা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে উদ্বোধনে প্রথম দেখার কথা আমার বেশ মনে আছে। কোন এক কাজে কলকাতায় আসিয়াছিলাম, আমি মঠে নূতন যোগ দিয়াছি শুনিয়া উদ্বোধনের তদানীন্তন পূজারি আমাকে দয়া করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে লইয়া গেলেন। তখন সবে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার বিশেষ আড়ম্বর নাই। পূজারি নিজেই চন্দন ঘষিয়া, ফুল সাজাইয়া পূজায় বসিতেন। আমি শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের উত্তরের ছোট বারান্দায় বসিয়া একটু জপ-ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম। কতক্ষণ এভাবে বসিয়াছিলাম মনে নাই। পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরের সামনে দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে আসিয়াছিলাম, তখন খুব সম্ভব পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘর বন্ধ ছিল। ফিরিবার সময় দেখিলাম তাঁহার ঘর খোলা, বোধ হয় জপ-ধ্যানের পর তিনি চা খাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সভয়ে তাঁহার ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিলাম তিনি সস্নেহে ডাকিলেন, আমিও সঙ্কোচের সহিত তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। পূর্বে দুই-একবার তাঁহাকে বোধ হয় মঠে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সাহস করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে পারি নাই। এবার তাঁহার সস্নেহ আহ্বানে মনটি গলিয়া গেল। একেবারে

তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনিও নানা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল তিনি যেন আমার একান্ত আপন লোক। মায়ের ঘরে গিয়া এতক্ষণ কি করিলাম, বসিয়া পূজাটুজা দেখিয়াছি না অন্য কিছু করিয়াছি, ইহাই তাঁহার প্রথম প্রশ্ন। উত্তরে একটু জপ-ধ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলায় তিনি যেন খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং দীক্ষা লইয়াছি কিনা, কাহাকে ইষ্ট বলিয়া ধরিয়াছি, সাকার বা নিরাকার কোন্‌টি আমার ভাল লাগে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিলেন। দীক্ষা তখনও হয় নাই বলায় বলিলেন, "অবশ্য, ওতে দোষ নেই; তবে একটা ইষ্ট ঠিক না করিলে 'frittering away of energy' [বৃথা শক্তি ক্ষয়] হয়, দীক্ষা নিলে তা হয় না।" সাকার নিরাকারের প্রশ্নে শেষেরটিতে আমার বিশেষ আস্থা আছে বলায় বলিলেন, "তা ভাল, তবে সাকারও সত্য বলে জেনো। জানই তো, স্বামীজী যেমন বলতেন, একই সূর্যের বিভিন্ন স্তর হতে ফটো নিলে বিভিন্ন রকম ফটো উঠে, তার কোনটিই কিন্তু মিথ্যা নয়। প্রত্যেকটিই সূর্যেরই ফটো।"

কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, শুনেছি যে একটি ছেলে সম্প্রতি মঠে এসেছে, সে নাকি ইতঃপূর্বে interned হয়েছিল।" মাথা নিচু করিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ মহারাজ, সে আমিই।" মঠে প্রবেশ করিবার সময় উহা আমি কাহাকেও বলি নাই। শুনিয়াছিলাম উহা জানিতে পারিলে মঠ-কর্তৃপক্ষ আমাকে মঠে যোগ দিতে দিবেন না। কিন্তু আমার এক সহপাঠী আসিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। কি করিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের কানে উহা পৌঁছাইল, বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম; কিছু ভয়ও যে না হইয়াছিল, তাহা নয়। কিন্তু দেখিলাম মহারাজ উহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিচলিত না হইয়া কেন আমার ঐরূপ হইয়াছিল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমিও অকপটে সবই বলিলাম।

তিনি সেই দিন সাধন-ভজন সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত বলিয়া এখানে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া নিচে নামিলে কোন কোন সাধু উহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,

"তোমার তো দীক্ষা হয়েই গেল।" আমি কিন্তু উহা বুঝি নাই। তবুও এখন যখন সে কথা মনে পড়ে, মনে হয় হয়তো বা তিনিই আমার প্রথম দীক্ষাগুরু।

আর একদিনের কথা—কয়েক বৎসর পরে ঢাকা হইতে মঠে আসিয়াছি। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে দর্শন করিতে এক সন্ধ্যায় স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দের সহিত উদ্বোধনে আসিয়াছি। মহারাজ তাঁহার সেই ছোট ঘরটিতে [বৈঠকখানায়] বসিয়া আছেন; আশেপাশে সান্যাল মহাশয়, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ও কয়েকটি ভক্ত—সকলেই চুপ করিয়া আছেন। হঠাৎ পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, "তোমাদের কার কি প্রশ্ন আছে কর।" আমাদের কোনই প্রশ্ন ছিল না, শুধু তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, তাই চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "তোদের কি কোন প্রশ্নই নেই, চুপ করে বসে আছিস কেন?" প্রশ্ন করিতে হইবে বলিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "মহারাজ, আপনারা তো এত সাধন-ভজন করে, তাঁকে উপলব্ধি করে, তবে কাজে নেমেছিলেন; তবে আমাদের মঠে যোগ দেবার সাথে সাথে কাজে নামাচ্ছেন কেন?" পূজনীয় শরৎ মহারাজ কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া কহিলেন, "তুই কি ভেবেছিস যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হবি [অর্থাৎ আগে সিদ্ধ হয়ে পরে কাজে নামবি], না স্বামী বিবেকানন্দ হবি? দেখ, তোর বা আমার কারও ঐরূপ হওয়া হবে না, আমাদের জপ-ধ্যান ও কাজ একসঙ্গে চালাতে হবে। এর কোনটি ছাড়লে চলবে না।"

তাঁহার সহিত আর ঐরূপভাবে কোনও কথা হয় নাই, তবে ঐ দুদিনের স্মৃতি মনে জাগরূক রহিয়াছে।

স্বামী সারদানন্দের পুণ্য স্মৃতি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

স্বামী সারদানন্দকে ১৯২৪ সালে আমি যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ষোলর কিছু উপরে। মফস্বলের একটি ছোট শহর হইতে কলকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়াছি। ঐ শহরেই ঠাকুর-স্বামীজীর বইয়ের সঙ্গে কতক পরিচয় হইয়াছিল এবং একবার একটি ছোট কবিতা লিখিয়া উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য স্বামী সারদানন্দের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে কোনও উত্তর পাই নাই। কবিতাও কাগজে ছাপা হয় নাই। অবচেতন মনে বোধ করি তাঁহার উপর এই কারণে একটু অভিমান ছিল। পরে অবশ্য নিজের ঐ বালসুলভ চপলতার কথা ভাবিয়া অনেক হাসিয়াছি। যাহা হউক কলকাতায় আসিয়া বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। ইডেন হাসপাতাল রোডে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতিতে স্বামী অভেদানন্দের পুণ্যদর্শন লাভ হইল এবং তাঁহার ক্লাসে যাইতে শুরু করিলাম; আমহার্স্ট স্ট্রিটে কথামৃতকার শ্রীম-র সহিত পরিচয় হইল, বলরাম মন্দিরে একদিন স্বামী অখণ্ডানন্দেরও দর্শন ঘটিল—কিন্তু উদ্বোধনে গিয়া স্বামী সারদানন্দকে দর্শন করা যেন খেয়ালের মধ্যেই আসিতেছিল না।

স্বামী অভেদানন্দের একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যের সহিত খুব ভাব হইয়াছিল। তিনিই একদিন উদ্বোধন অফিসে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে দর্শনের জন্য লইয়া গেলেন। সন্ধ্যা হয় হয়। উপরে ঠাকুর দর্শন করিয়া নিচে সদর দরজার পাশে ছোট বৈঠকখানা ঘরটিতে গিয়া আমরা বসিলাম। আরও দু-তিন জন বসিয়া আছেন দেখিলাম। ব্রহ্মচারী আমার কানে কানে বলিলেন, মহারাজ এখনই নিচে নামবেন। একটু পরে জনৈক সেবক সন্ন্যাসী একটি গড়গড়া ও জ্বলন্ত কলিকা লইয়া ঢুকিলেন এবং শরৎ মহারাজ যেখানে বসিবেন তাহার কাছে

রাখিলেন। বুঝিলাম মহারাজের আসিবার আর দেরি নাই। ধীরে ধীরে প্রশান্তমূর্তি মহাপুরুষ নিঃশব্দে ঐ বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে বসিলেন। সকলের সহিত আমিও তাঁহার পদধূলি লইলাম। কিছু কিছু কথাবার্তা চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে গড়গড়ার নলও টানিতেছেন। স্বামী অভেদানন্দজীর কুশল প্রশ্ন আমার সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উপরে ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা যেই বাজিতে শোনা গেল অমনি কপালে জোড় হাত স্পর্শ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। আরতি শেষ হইলে সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, ও হরিপ্রেম, এদের প্রসাদ দে। শ্রীশ্রীমায়ের পরম স্নেহভাজন সন্তান এবং পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের একনিষ্ঠ সেবক স্বামী হরিপ্রেমানন্দ প্রসাদ পাইয়া আসিলেন এবং সকলকে দিলেন। প্রথম দর্শনে পূজ্যপাদ মহারাজের শান্ত গম্ভীর চেহারা বড় ভাল লাগিল। অবশ্য কিছু ভয়ও হইয়াছিল। পরে জনৈক যুবক ভক্তের একটি মন্তব্য শুনিয়াছিলাম, শরৎ মহারাজকে দেখলে সমুদ্রের কথা মনে পড়ে। ঠিক কথা।

মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী প্রায় একবৎসর দক্ষিণ দেশ ও বোম্বাইতে কাটাইয়া ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মঠে ফিরিলেন। শিবরাত্রির দিন বেলুড় মঠে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিলাম। কয়েক মাস পরে তিনি কৃপা করিয়া দীক্ষা দিলেন। তাঁহার নিকট একদিন শুনিয়াছিলাম আমাদের সঙ্ঘে ঠাকুরই প্রকৃত গুরু, তিনি বা শরৎ মহারাজ বা ঠাকুরের অপর সন্তানগণ যাঁহারা দীক্ষা দিয়াছেন—তাঁহারা যন্ত্র মাত্র, তাঁহাদের কাজ শুধু ভক্তকে ঠাকুরের পায়ে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। সেইজন্য মন্ত্রগুরু লইয়া ভেদ বা দল সৃষ্টি করা বেলুড় মঠের আদর্শ নয়।

একবার মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিনে স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজী একসঙ্গে দুপুরবেলায় মঠে আসিলেন। অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে। মঠবাড়ির নিচের তলায় ভিতর দিককার বারান্দায় তিন গুরুভ্রাতার মিলনদৃশ্য বড় মধুর। সেই দৃশ্য কখনও ভুলিব না। স্বামী অভেদানন্দজী তাঁহার একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে মহাপুরুষজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন,

এর নাম—চৈতন্য। মহাপুরুষজীর সেই দিন বড় মাতোয়ারা ভাব। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, এখন আর পৃথক চৈতন্য দেখি না, এক চৈতন্য সর্বত্র দেখি। তিন মহাপুরুষ বেঞ্চে বসিলেন। একজন ফটো লইলেন। এই ফটোটি কোনও কোনও বইতে ছাপা হইয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজের গায়ে একটি তুলার জামা ছিল, শরৎ মহারাজের হাতে লাঠি। একটি জমজমাট আধ্যাত্মিক ভাব সেদিন সব ভক্তেরা অনুভব করিয়াছিলেন।

একটি ধর্মবন্ধুর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যায় উদ্বোধনে শরৎ মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছি। বন্ধুটি মহারাজজীর মন্ত্রশিষ্য, দর্শনের ছাত্র এবং ধর্মালোচনায় পরম উৎসাহী। বৈঠকখানা ঘরে মহারাজজী বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত এবং শরৎ মহারাজজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বৈকুণ্ঠ সান্যাল মহাশয়ও আছেন। আমরা উভয়কে প্রণাম করিয়া একপাশে বসিলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিবার পর বন্ধুটি মুখ খুলিয়া মহারাজজীকে যেই প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, মহারাজজী অমনি ধমক দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, খবরদার, কোনও প্রশ্ন করতে পারবিনি। কেবল প্রশ্ন, কেবল প্রশ্ন। বন্ধুটি ঘাবড়াইয়া গেলেন। সান্যাল মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, তুমি তো মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকো, সেখানে যেসব সাধু আছেন তাঁদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ কর না কেন? পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বলিলেন, তাতে ওদের প্রাণ ভরে না। এখানে এসে আমাকে প্রশ্ন করা চাই। যা, ওই ঘরে ডাক্তার আছে (স্বামী পূর্ণানন্দজী), তার কাছে গিয়ে বস গে এবং যত পারিস তাকে প্রশ্ন কর। মহারাজজী একটু বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বৈঠকখানার সামনের ঘরে স্বামী পূর্ণানন্দজীর নিকট গেলাম। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের আদেশ মান্য করিয়া বন্ধু তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। উদ্বোধন হইতে ফিরিবার পথে দেখিলাম বন্ধুটির প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। তিনি কয়েক দিন পরে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে একটি চিঠিতে নিজের মনোবেদনার কথা জানাইলেন। উত্তরে মহারাজ খুব স্নেহপূর্ণ ভাষায় তাঁহাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন, মনে পড়ে।

বেলুড় মঠে এক বৎসর দুর্গাপূজার সময় কয়েক দিন ছিলাম। তখন উঠানের

উত্তর পাশে চালা নির্মিত হইয়া তাহার ভিতর পূজা হইত। সন্ধ্যারতির পর দেবীর প্রতিমার সামনে সাধুরা কালীকীর্তন করিতেন। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ মঠে উপস্থিত ছিলেন। আসরে গানের আয়োজন হইতেছে, মহারাজ বারান্দায় বেঞ্চিতে উপবিষ্ট। কয়েকজন সাধুর খুব ইচ্ছা তিনি মায়ের সামনে বসিয়া তানপুরা লইয়া একটি গান করেন, কেননা তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের এবং স্বামীজীর নিকট গান শিখিবার, তথা পূর্বে পূর্বে মঠে গান করিবার কথা অনেকেরই জানা ছিল। দু-একজন সাধু আগাইয়া মহারাজজীকে তাঁহাদের আগ্রহের বিষয় জানাইলেন। কিন্তু মহারাজ রাজি হইলেন না। হাসিয়া বলিলেন, এখন বুড়ো বয়সে আর গাইতে পারি না।

এক বৎসর ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে অন্নপূর্ণা পূজায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। স্বামী কমলেশ্বরানন্দজী তখন ওখানকার অধ্যক্ষ। তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনায় মঠ হইতে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ এবং উদ্বোধন হইতে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ পূজা উপলক্ষে গদাধর আশ্রমে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সমবেত ভক্ত ও সাধুরা আগ্রহের সহিত তাঁহাদের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। দুপুরের দিকে প্রথমে মহাপুরুষজী পৌঁছিলেন। পূজাস্থানে প্রতিমা দর্শন করিয়া তিনি আশ্রমের একটি ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা প্রণাম করিতেছেন। কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় একজন খবর দিলেন পূজনীয় শরৎ মহারাজ পৌঁছিয়াছেন এবং ঠাকুর দর্শন করিতে গিয়াছেন। শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ একটু ব্যস্ত হইলেন এবং প্রীতি-বিহ্বল চোখে বারবার দরজার দিকে চাহিতে লাগিলেন। একটু পরে শরৎ মহারাজ ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে মহাপুরুষজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এস শরৎ মহারাজ বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহার পদধূলি লইলেন। তাহার পর দুই মহাপুরুষের পরস্পর প্রেমালিঙ্গনের দিব্য-দৃশ্য কখনো ভুলিব না। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে যে গভীর ভালবাসা ও ভ্রাতৃভাব ছিল তাহা সত্যই অতুলনীয়।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু ও কর্মীদের একটি কনভেনশন (সম্মেলন) আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষে

ভারতের নানা আশ্রম হইতে প্রায় চারিশত সাধু ও ভক্ত মঠে সমবেত হইয়াছিল। আট দিন ব্যাপী ঐ সম্মিলনের সময় কতিপয় ছাত্রবন্ধু-সহ স্বেচ্ছাসেবকরূপে মঠে থাকিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দজী যখন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন তখন তাঁহার মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী এবং আরও অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসী মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সমস্ত সভামণ্ডপ একটি গম্ভীর প্রশান্ত আনন্দময়ভাবে যেন গমগম করিতেছিল। প্রায় প্রত্যহ্ সন্ধ্যাবেলায় আরতির পর মঠের প্রাঙ্গণে আমতলায় 'সাধুসঙ্গ' বসিত। এক সন্ধ্যার ঘটনা বেশ মনে আছে। স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এবং আরও দু-একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী উঠানে বেঞ্চের উপর বসিয়া। বহু সাধু ও ভক্ত নিচে মাদুরের উপর উপবিষ্ট। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন আর শরৎ মহারাজ ধীরে ধীরে অতি মিষ্ট স্বরে উত্তর দিতেছেন। একজন যুবক সন্ন্যাসী কর্মযোগ-সংক্রান্ত একটি সংশয় তুলিলেন। শরৎ মহারাজ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তুমি বুঝি গীতাখানা আদৌ পড়নি? তাহার পর তিনি এবং পরে বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর প্রবর্তিত সেবাধর্মের বিষয়ে কিছুক্ষণ অতি মর্মস্পর্শিভাবে আলোচনা করিলেন।

একবার বড়দিনের সময় পূজনীয় ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজজী মঠবাড়ির পূর্বদিকে গঙ্গাতীরস্থ মাঠে বিকালবেলায় একটি শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শনীর উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন। কলকাতার কোনও প্রতিষ্ঠানের যুবকগণ বিশেষ শারীরিক শক্তির পরিচায়ক নানা ব্যায়াম দেখাইতে লাগিলেন। সাধুরা এবং অনেক ভক্তও দর্শক। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বারান্দায় সিঁড়ির নিচে চেয়ারে বসিয়া ছেলেদের ঐসব খেলা দেখিয়া খুব আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। উপরের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া মহাপুরুষ মহারাজজীও যুবকদের ঐ প্রদর্শনী দেখিয়াছিলেন। একটি বিশেষ খেলা বেশ বিপজ্জনক ছিল। শরৎ মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, ছেলেটি যখন ঐ খেলায় ব্যাপৃত তখন তিনি তাহার নিরাপত্তার জন্য ঠাকুরের নাম জপ ও প্রার্থনা করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় দেওঘর বিদ্যাপীঠের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক স্বামী সদ্ভাবানন্দজীর সঙ্গে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে দর্শন করিতে উদ্বোধনে গিয়াছিলাম। স্বামী সদ্ভাবানন্দজীর উদ্দেশ্য জনৈক ভদ্রলোকের জন্য শরৎ মহারাজের নিকট দীক্ষার সুপারিশ করিবেন। সে সময়ে মহারাজের শরীর তত ভাল ছিল না। তবুও সদ্ভাবানন্দজীর কথায় ভদ্রলোকটিকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। অনুরূপ আর একদিন সন্ধ্যাবেলার ঘটনার কথাও মনে পড়ে। একটি ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট একটি আশীর্বাদী ফুল লাভ করিয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন মন্ত্রদীক্ষা লইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে শরৎ মহারাজের নিকট আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজ ধীরভাবে সব শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, তুমি খুব সৌভাগ্যবান, মায়ের এমন কৃপা পেয়েছ। জানিয়াছিলাম ঐ ভদ্রলোককে কিছু দিন পরে শরৎ মহারাজ মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন যদিও ঐ সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল ছিল না।

আমার গর্ভধারিণী জননী একবার চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসিয়া বাগবাজারে কিছুকাল ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া মাঝে মাঝে উদ্বোধনে ঠাকুর দর্শন ও পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজজীকে প্রণাম করিবার জন্য যাইতাম। মা তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। শরৎ মহারাজও তাঁহাকে খুব আশীর্বাদ করেন এবং সেই সময়ে সদ্যপ্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা প্রথম ভাগ পড়িতে বলেন। মা পরে মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তখন শরৎ মহারাজের দেহত্যাগ হইয়াছে।

দুই বৎসর পর পর পূজ্যপাদ সারদানন্দজীর শুভ জন্মদিনে তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিবার ঘটনা চিত্তে অবিস্মরণীয় মধুময় স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছে। প্রথম বৎসর উদ্বোধনে ঐ উৎসব আয়োজিত হইয়াছিল। দ্বিতলে তাঁহার ঘরটি খুব ফুল দিয়া সেবকগণ সাজাইয়াছিলেন। তিনি অতি প্রসন্ন মূর্তিতে মেজেতে আসনে বসিয়া আছেন। ঠাকুর প্রণাম করিয়া ভক্তেরা একে একে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিতেছেন এবং তাঁহাকে পুষ্প অর্পণ

করিতেছেন। মহারাজ প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। আহা, সে কী প্রাণ-জুড়ানো স্পর্শ!

পরের বৎসর ঐ উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল বেলুড় মঠে। মহাপুরুষ মহারাজ ঐ সময়ে মঠে ছিলেন না। শরৎ মহারাজ সকাল ১০টা নাগাদ মঠে পৌঁছিলেন এবং ঠাকুর দর্শন করিয়া ভিতরের বারান্দায় বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিলেন। সাধুদের আনন্দের সীমা নাই। কলকাতা হইতে অনেক ভক্তও আসিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন সাধু উপুদাকে (স্বামী যোগীশ্বরানন্দজী) লইয়া একটি তামাশা ফাঁদিয়াছেন এবং শরৎ মহারাজকে পূর্বে জানাইয়া রাখিয়া তাঁহার সামনে উহার রূপ দিতেছেন। উপুদা শরৎ মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন। শরৎ মহারাজ এবং সমবেত সকলে খুব উপভোগ করিতেছেন। হাসির লহর ছুটিয়াছে। কিন্তু উপুদা নিজে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না। তাহাতে আমোদ আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। ধীর গম্ভীর স্বামী সারদানন্দজীর এইরূপ বালকভাব বড় মধুর। কিছু পরে তাঁহাকে উপরে স্বামীজীর ঘরের পাশের বড় ঘরটিতে লইয়া যাওয়া হইল। গালিচার উপর আসনে তিনি বসিয়াছেন। গলায় মালা দেওয়া হইল। তিনি বারবার বলিতেছেন, দেখ আমি মায়ের দরোয়ান মাত্র, আমাকে নিয়ে এসব কি করছে। জয় মা! জয় মা! ভক্তেরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। প্রসাদের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল।

১৯২৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ জন্মোৎসবের দিন স্বামী সারদানন্দজী মঠে আসিয়াছিলেন এবং দ্বিপ্রহরে অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাধু ও ভক্তও চলিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমারও মহারাজজীর কাছে কাছে থাকিয়া ঘুরিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তাঁহার হাতে লাঠিটি ছিল। দোকানপাট, নানা কীর্তনের আসর—সর্বত্র ধীরে ধীরে খুব উৎসাহ লইয়া দেখিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কথাবার্তাও চলিতেছিল। পরে শুনিয়াছিলাম অতটা পরিশ্রমে তাঁহার শরীর কলকাতায় ফিরিবার পর খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জানিয়া

শুনিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলেন, কেননা বেলুড়ের পুণ্য মহাক্ষেত্রে জীবন-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব স্থূলদেহে ইহাই যে শেষবার দেখা তাহা তাঁহার ন্যায় সমাধিবান যোগীপুরুষের অবিদিত ছিল না।

স্বামী সারদানন্দ প্রসঙ্গে

স্বামী অসিতানন্দ

স্বামী সারদানন্দ পূজনীয়া যোগীন-মা প্রভৃতিকে নিয়ে কাশীধামে গিয়েছেন। লাকসায় 'লক্ষ্মীনিবাসে' থাকেন, কারণ তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শ্রীমায়ের সেবিকা গিয়েছেন, অদ্বৈত আশ্রমে মেয়েদের থাকবার নিয়ম নাই। ভাগ্যক্রমে আমরা মায়ের মানস পুত্রের সেবার অধিকার পেয়েছিলাম। ওপরের সিঁড়ির পাশের ঘরে শ্রীযোগেন মা তাঁর দলবল নিয়ে থাকতেন। মাঝের ঘরে স্বামী সারদানন্দ, তার পাশের ঘরে আমি ও স্বামী সম্বিদানন্দ থাকতাম। দিব্যসঙ্গে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হতো। খুব ভোরে মহারাজ শয্যা ত্যাগ করতেন। তারপর প্রাতঃকৃত্য করে যোগাসনে বসতেন। আমরা ঘরদোর পরিষ্কার করে তাঁর চা তৈয়ার করে দিতাম। সামান্য প্রসাদসহ চা সেবা করে তিনি অদ্বৈত আশ্রমে যেতেন। সেখানে সাধুভক্তগণ তাঁর কথামৃত পান করতেন। মঠ মিশন সংক্রান্ত আলোচনাও হতো। চব্বিশ ঘণ্টা ধ্যানী যোগীন-মা তাঁর ধ্যান সেরে অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুর প্রণাম করতে যেতেন, তাঁর সঙ্গে থাকতেন বীরভক্ত কালীদানার ভগ্নি 'বরেনবাবুর পিসি'। অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুর প্রণাম সেরে লক্ষ্মীনিবাসের সন্নিকটে লক্ষেশ্বর শিবের পূজা করে যোগীন-মা ফিরে আসতেন, তখন চা ও জলযোগ করতেন। আমি তাঁকে চা পান করিয়ে মধ্যাহ্নের রান্না করতাম, পরিশ্রম বলে মনে হতো না, একটি দিব্য হাওয়ায় যেন উড়ে বেড়াতাম। কোন কোন দিন যোগেন মহারাজের (স্বামী সম্বিদানন্দ) হাতে রান্নার ভার দিয়ে, ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী সারদানন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে যেতাম। সান্যাল মহাশয় ঠাকুরের ও তাঁহাদের কত পুরানো কাহিনী বলতেন, হায়রে, সেসব কথা তখন যদি লিখে রাখতাম, তবে জগতের কত উপকার হতো। তিনি বলতেন—"স্বামীজী বলতেন যদি শরৎ, শশীকে দুপাশে পাই আর এই সাণ্ডেল (স্বামীজী দত্ত নাম) যদি পেছনে

থাকে তবে জগৎ জয় করে আসতে পারি। স্বামীজী বলতেন—রাখাল, শরৎ, শশী আমার চির আজ্ঞাচারী। আমি যা বলেছি, বিচারশূন্য হয়ে এদের মতো কেউ পালন করতে পারে নাই, আমার শিষ্যরাও নয়।

"স্বামীজী বলতেন—'আমি যখন মিশনের কাজ আরম্ভ করি তখন, এই তিনজন ছাড়া কেউ বুঝতে পারে নাই। তারা সবাই সাধন, ভজন, সমাধিতে মগ্ন। আত্মসমাহিত হওয়ার চেয়েও যে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা বড় সে কথা ঠাকুর আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি তাই এদের মধ্যে প্রচার করতাম, ও কাজ করে দেখাতাম, কিন্তু এদের এই নূতন সাধন সংস্কার নিতে দেরি হয়েছে।' স্বামীজী বলতেন—'আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি কিন্তু আমার গুরুভাইদের মতো যথার্থ সাধু কোথাও দেখি নাই। সাধু মানে নিঃস্বার্থ। এমন কি নিজের মুক্তিও চায় না; এই শরৎ, এর ভিতর সেই গুণ পূর্ণভাবে বর্তমান। শরৎ মা, ঠাকুর ও আমাকে ভিন্ন কিছুই জানে না।' স্বামীজী বলতেন—'আমি যদি শরৎকে নরকে যেতে বলি, আমার কথায় বিচার না করে সে সেখানেই যাবে।'"

শরৎ মহারাজের সাধনার কথা সান্যাল মহাশয় বলতেন—"আমরা একসঙ্গে ঠাকুরের দেহত্যাগের পর হৃষীকেশে তপস্যা করতে যাই। হৃষীকেশেই শরৎ নির্বিকল্প সমাধিলাভ করে। সেসব অনেক কাহিনী। তারপর হরি ভাই, শরৎ ও আমি তিনজনে কেদার-বদরী দর্শন মানসে উত্তরাখণ্ডের পথে পথে ভ্রমণ করি। সে বৎসর খুব অজন্মা হয়েছিল। পাহাড়ে দুর্ভিক্ষ। সেই জন্য পাক দণ্ডি পথে (সরু পায়ে চলা পথে) লুকিয়ে লুকিয়ে চলছিলাম। রাজপথে সরকার কাহাকেও যেতে দিচ্ছিল না। গাড়োয়ালের ভিতর দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমরা ঠাকুরকে চিন্তা করতে করতে অগ্রগামী হচ্ছিলাম। তারপর আর গ্রাম নাই। একদিন পথে একটি পাহাড়ি নদী পড়ল। চড়াই উতরাই-এর পথে লোহা বাঁধানো লাঠি একমাত্র সহায়। একটি বুড়ি এক নদীর ধারে বসে কাঁদছে। শরৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলে—কেন কাঁদছ? সে বললে আমার চলার সহায় লাঠি হারিয়ে গেছে, কেমন করে খরস্রোতা নদী পার হয়ে যাব, লাঠির অভাবে ভেসে যাব। শরৎ তাকে তার লাঠি দিয়ে দিলে, বুড়ি চলে গেল। আমরা শরৎকে কত

বকলাম, তুমি একি করলে, লাঠি বিনা এক পা চলা অসম্ভব। অসম্ভব বিশ্বাসী গুরু ভক্ত শরৎ বললে—ঠাকুর ঠিক আমাকে পার করে নিয়ে যাবেন। হরি ও আমি পেরিয়ে গেলাম, শরৎ হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে পার হলো। শরতের জন্য আস্তে আস্তে চলতে হচ্ছিল, গভীর অরণ্যে রাত হয়ে গেল। হিমালয়ের ছুরি চালানো শীত, জনমানবহীন অরণ্য। কোথাও কোন লোকালয় নাই। একটা মানুষ কেন? একটা জীবজন্তুরও সাড়া নাই। সরু পথের ধারে একটা পাথরের ছাউনির মতো স্বাভাবিক আশ্রয় পেলাম। তিনজনে স্থির করলাম, এখানে ধ্যানে রজনী অতিবাহিত করব। আহার নাই, পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর, হিমহাওয়া চাপড় মারছে—আমরা তিনজনে ঠাকুরের চিন্তাসনে বসে আছি। কোন্‌দিক দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। আমি চোখ চেয়ে দেখি হরি ও শরৎ তখনও সমাধিস্থ। ক্রমে হরি ব্যুত্থিত হলো, অনেক পরে শরৎ সহজ অবস্থা পেল। কোথা যাই, খুব খিদে পেয়েছে, এমন সময়ে দেখি একদল মেষপালক আসছে, তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে বুড়ো কেদার* পৌঁছিলাম।

"ময়দাকে লুচি করিয়া খাওয়া বাঙলার নিজস্ব চাল। এ চাল ভারতের আর কোথাও দেখা যাইবে না। যেখানে লোকে ভাত খায় না, সেখানে আটার রুটি, বাজরার রুটি খাইবে, আটার পুরি খাইবে কিন্তু ময়দার লুচি খাইবে না। সুতরাং শরৎ মহারাজ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা বুড়ো কেদারে পূর্ণ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।"

তারপরে যাহা ঘটিয়াছিল শরৎ মহারাজের শ্রীমুখের কথাতেই উল্লেখ করিতেছি—"বুড়ো কেদার গ্রামখানি পাহাড়ি গ্রামের তুলনায় বেশ বড়ই। দেখতে দেখতে যাচ্ছি—দেখি না গাঁয়ে বাজারও রয়েছে; সেই বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দোকান থেকে—'এ মহাত্মা, এ মহাত্মা!' শব্দ শুনে ফিরে চাইতে দেখি দোকানি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যেতেই

* এই কঠিন রাস্তা অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহা মনে করিয়া শরৎ মহারাজ ভাবিলেন—ঠাকুর তাহাদের সঙ্গে নাই। থাকিলে কি অনাহারে এত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এই কথা ভাবিয়া শরৎ মহারাজের মনে অনেক কথা উঠিল। শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—এই বুড়ো কেদারে যদি গরম লুচি খাইতে পাই তাহা হইলে মানিব ঠাকুর সঙ্গেই আছেন।

বল্লে—'পা লেও।' অর্থাৎ খেয়ে নাও। আমি বললাম, 'আমার সঙ্গে দুজন সাধু আছেন, যা দেবে দাও—তিনজনে ভাগ করে খাব।' দোকানি বললে, 'দুজন সঙ্গে আছেন, কি আর হয়েছে। তুমি বসে খাও, তারপর দুজনার জন্যে যা দেবার তা দেবখন।' দোকানির আগ্রহে খেতে বসলুম। বেশ করে দোকানি গরম গরম লুচি খাওয়ালে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর দোকানিকে বললুম, 'কই তাদের জন্যে যা দেবে দাও?' দোকানি বললে—'তুমি তো খেয়েছো আবার কী? যাও আর কিছু হচ্ছে না।' আমি দোকানির ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত রাত্রের কথা। তখন সান্যাল ও হরিকে বলবার জন্যে সটান ফিরে এলাম তারপর একে একে সকল কথা বললুম। তখন হরি ও সান্যালের যা হাসি।"

"আমরা যখন হিমালয়ে থাকি তখন কিছুই খাবার পাওয়া যেত না। কুইনিনের মতো তেতো এক প্রকাব আটা পাওয়া যেত তারই রুটি বানান হতো। আমি ও হরি কিছুতেই খেতে পারতাম না, বমি হয়ে যেত কিন্তু; শরৎ অম্লান বদনে যেন উপাদেয় আহার—এরূপ ভাবে খেয়ে ফেলতো।

"তোরা শরতের কাছে আছিস তোরা মহা ভাগ্যবান। শরতের তুলনা নাই। এমন সহ্যশক্তি আমি কারুর দেখি নাই। সেই জন্যই তো শ্রীমা শরৎকে এত ভালবাসতেন। বিশ্বের ঝাপটা সহ্য করবার জন্য শরৎ যেন হিমাচলের মতো বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা স্বল্প বিস্তর সবাই তার ওপর কত অত্যাচার অবিচার করেছি কিন্তু শরৎ সবার কাছেই মুখ বুজে সবার দাসের মতো সেবা করেছে। শরৎকে বুঝতেন ঠাকুর ও মা। স্বামীজী, রাজা মহারাজ, আমাদের সাধ্য কি এই গম্ভীর গুহায় প্রবেশ করি।

"শরৎ চরিত্র সত্যই অতল স্পর্শ। বাংলার অন্যতম আদি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলতেন—মুখুজ্যে পাড়ায় আমাদের বাড়ির খুব কাছেই উদ্বোধন মঠ (মায়ের বাড়ি) হলো, ভাবলাম ভাল হলো, নিকটেই একটা সৎসঙ্গ পাওয়া যাবে। মায়ের শ্রেষ্ঠতম সেবক সন্তান, শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ মন্ত্রপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সারদানন্দ, সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ

দিকের ছোট ঘরে অধিকাংশ সময় থাকতেন। মঠ মিশনের কাজ করতেন, বেদের মতো বই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ রচনা করতেন। তিনি উদ্বোধন পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। আমি আমার দুবেলার চা খাওয়াটা ওখানেই সারতাম। মনে মনে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে নিজের তুলনা করতাম—উনিও লেখক, আমিও লেখক, উনি জীবন দর্শন থেকে সমন্বয় দর্শনের রচয়িতা, আমিও নাট্যকার, বহু নাটক লিখেছি। আমার আলিবাবা, প্রতাপাদিত্য, কিন্নরী সারা বাংলায় সাড়া তুলে লোককে উন্মাদ করেছে, আমার গানও হাটে, মাঠে, ঘাটে গীত হয়, উনি ব্রাহ্মণ আমিও খড়দার নিকষ কুলীন ব্রাহ্মণ। আমি হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুপুত্র, আমিও M.A.পাস, জেনারেল এসেমব্লী কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক, আমাকে বাংলাদেশে চেনে না এমন শিক্ষিত লোক নেই, সুতরাং আমি ছোট কিসে? তুলাদণ্ডে তাঁকে ও আমাকে রাখতাম। তারপর দিনের পর দিন পরীক্ষকের চোখ দিয়ে দেখি, তাঁর পাল্লা ভারি হচ্ছে, আমারটা হালকা হচ্ছে, এখন দেখি তিনি এক মণ আর আমি এক ছটাক, তা না হলে তাঁর চেয়েও ২।৪ বছরের বড় হয়েও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। আমি স্বামীজীর চেয়েও বোধ হয় কিছু আগে জন্মেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার চরমতম সুধী সমাজের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্বন্ধ হবার সুযোগ হয়েছে। স্যার গুরুদাস তো আমাকে গুরুপুত্র হিসাবে গুরুর মতো মান্য দিতেন, স্যার আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস, অরবিন্দ ঘোষ সকলের সঙ্গেই আমার অল্প বিস্তর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। কিন্তু একি দেখলাম, এ যে সকল গুণের গুণনিধি, সাক্ষাৎ জাহ্নবীধারা যেন জমাট বেঁধে সারদানন্দ আকার ধারণ করেছে। চরিত্রের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হলো—অভিমানশূন্যতা। সকলেই বড় বটে কিন্তু প্রত্যেকেই অভিমানে ভরা, এমন যে গুরুদাস, তাঁরও ব্রাহ্মণ অভিমান দারুণ ছিল। স্বামীজীর সংবর্ধনা সভায় তাঁকে সভাপতি করবার জন্য যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি মত করেন নাই। বলেছিলেন, যদি নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে সভা হয় তবে যেতে পারি, কারণ তিনি বিদেশে দেশকে বরণীয় করেছেন; কিন্তু কায়স্থ কখনও সন্ন্যাস নিতে পারে না, একমাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাস নেবার অধিকার আছে। আমি তাঁকে সন্ন্যাসী হিসাবে বরণ করলে, শাস্ত্র মর্যাদা লঙ্ঘন হবে।

"আর আমাদের এই পরম ব্রাহ্মণ মুচি মেথর সমজ্ঞান করে সম্মান দিচ্ছেন। খুব বড় বড় লোক দেখেছি, কারুর মন, মুখ এক নয়। সামনে এক কথা বলে পেছনে অন্য কথা। আজ এত বৎসর এঁর সঙ্গে ছায়ার মতো রয়েছি একদিনও মন মুখের গরমিল দেখলাম না। পরনিন্দা করে না এমন লোক এঁকে ছাড়া আর কোথাও দেখি নাই। শুধু তাই নয়, প্রতিটি গুরুভাইকেই ইনি গুরুতুল্য সম্মান দেন। তাঁরা কেউ তাঁর নিন্দা করেছে এই কথা এঁর কাছে লাগাতে এলে, বক্তার প্রতি বিরক্ত হন। ইনি বলেন—'আমার গুরুভাই, আমাকে কি বলেছেন, তাতে তোমার কি?' একবার তাঁর কতকগুলি শিষ্য, তাঁর এক গুরুভ্রাতার নামে নালিশ করতে এল। তাঁর গুরুভ্রাতা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর নামে আজ এরা নালিশ করতে শরৎ মহারাজের কাছে যাবে, তাই আগে থেকে সমস্তটা জানিয়ে দিতে উক্ত গুরুভ্রাতাটি তাঁর ঘরে বসেছিলেন, সে সময়ে মহারাজ বাথরুমে ছিলেন, এদিকে নালিশ-ওয়ালারাও এসে গেল। কোন পক্ষই অসাক্ষাতে তাঁকে কিছু বলতে পারলে না। শিষ্যরা শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে গেলে, তিনি বললেন—আগে আমার গুরুভাইকে প্রণাম কর, তারপর আমাকে করবে। ঠাকুর ও তাঁর মন্ত্রপুত্রদের সমজ্ঞান করবে। ওঁর প্রতি যদি তোমাদের সম্মান দান করবার প্রবৃত্তি না হয়, তবে আমাকে যে সম্মান দিচ্ছ তার কোন অর্থ থাকে না, আমাকেও অসম্মান করা হয়।

"এই যে উদ্বোধন বাড়ি দেখছ, এটি তাঁরই সৃষ্টি। ঐ বাঁধানো সিঁড়ির নিচে একদিন তিনি তেল মাখছিলেন, এমন সময়ে একটি ঝাঁকড়া চুলো ভক্ত মা ঠাকুরানীকে প্রণাম করতে এল। সেদিন শ্রীমাকে প্রণাম করবার বার নয়, তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ও নয়, তাই তিনি ভক্তকে মায়ের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ভক্তটি বাধা না মেনে, তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওপরে চলে গেল। ভাগ্যক্রমে মা তাঁর ঘরে একা বসেছিলেন, মা ভক্তকে যত্ন করে বসালেন, প্রসাদ খেতে দিলেন, তার আবোল তাবোল প্রশ্নের মনের মতো জবাব দিলেন, শেষে বললেন—'নিচে একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি সাক্ষাৎ শিবতুল্য, তুমি কি তাঁকে দেখেছ, তাঁকে প্রণাম করেছ?' ভক্তটি বললে—'আমি তাঁকে ঠেলে

ফেলে দিয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমাকে তোমার কাছে আসতে দিচ্ছিল না।' মা তো শুনে অবাক—'ওমা খ্যাপা ছেলে গো—যাও, যাও তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, নইলে মহা অমঙ্গল হবে।' ভক্তটি নিচে এসে, এই ছোট ঘরে তাঁকে প্রণাম করলে। মহারাজ আশীর্বাদ দিলেন। ভক্ত—'আমাকে ক্ষমা করুন।'

মহারাজ—'তুমি কি অপরাধ করলে যে ক্ষমা চাইছ?'

ভক্ত—'আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ওপরে চলে গেলাম, হয়তো আপনার কত লেগেছে।' মহারাজ—'না লাগেনি, তুমি ঠিক করেছ। মায়ের কাছে যাবার পথে যা কিছু বাধা আসুক তা সবল হাতে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। আমি তখন তোমার বাধা হয়েছিলাম, তুমি বাধা ভেদ করে মায়ের কাছে গেছ, এটা তুমি ঠিক করেছ। আবার আমিও ঠিক কাজ করেছি, আমি মায়ের বাড়ির দারোয়ান, আমাকে পাহারা দিতেই হবে, কিন্তু তোমার শক্তি ও ভক্তি আমার চেয়ে বেশি, তাই তুমি জয়ী হলে।'

"বোঝ ব্যাপার, তাঁর বাড়িতে তাঁকে ফেলে দিয়েছে, আর তিনি কি চোখে দেখছেন। এত লোক দেখলাম, এমন দৃষ্টিভঙ্গি, এত অভিমানহীনতা, কোথাও দেখি নাই। তাই তিনি আমার নিত্যানন্দ। কত বলব—অনন্ত জীবন বললেও, গুণময়ের গুণের শেষ করতে পারব না। পূজনীয় কানাই মহারাজের (স্বামীজীর সেবক) মুখে শুনেছি—স্বামীজী বলতেন—ঠাকুর রাখালকে এনেছেন, নিজের আনন্দের জন্য—রাখাল তাঁর আনন্দ গোপাল—আর শরৎকে এনেছেন জগতের আনন্দের জন্য। শরৎই আমার নরনারায়ণের সেবার সার্থক রূপ দেবে। জীবের ভিতরে শিবের পূজাই বর্তমান যুগধর্ম। শরৎই তার প্রথম পূজারি। ঠাকুর বলতেন—নরেন হাঁড়ি আর শরৎ সরা। হাঁড়িতে সরা ঢাকা না দিলে সহজে চাল সিদ্ধ হয় না। আর মা—মা তো শরৎ-অন্ত প্রাণ। ছেলে আর মা, মা আর ছেলে অভেদ। সত্য বলছি ভাই—আমি দেখি—সাক্ষাৎ আমার মা আমার গুরুরূপ ধরে আমার সামনে বসে আছেন।"

(উৎস ঃ স্বামী সারদানন্দের শতবার্ষিকী সংখ্যা;

বরিশালে স্বামী সারদানন্দ*

নরেন্দ্রনাথ সেন

সে আজ অনেক দিনের কথা। ১৮৯৯ সন। পৌষ মাসের শেষাশেষি। নাগ মহাশয়ের দেহত্যাগের কয়েক দিন পরে স্বামী সারদানন্দজী ঢাকা হইতে বরিশালে আগমন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের দু-একটি বালক-শিষ্য তখন বি. এম. কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল এবং নিত্যানন্দ মহারাজের ইতঃপূর্বে এখানে আগমন হেতু শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ভক্তদল গঠিত হইয়াছিল। শরৎ মহারাজের আগমন বার্তায় ইহারা মাতিয়া উঠিল; এবং তাঁহার থাকিবার সকলপ্রকার ব্যবস্থাদি করিল।

অশ্বিনীবাবুর বাড়ির সন্নিকটে একখানি নূতন গৃহে স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যবিজয় জনসাধারণ বিশেষত ছাত্রসমাজের মধ্যে বিপুল পুলক সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে আত্মবিস্মৃত জাতির অন্তরে আত্মশক্তির একটা দিব্য গৌরব জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, পরমহংসদেবের শিষ্য, বিলাত-ফেরত স্বামী সারদানন্দ বরিশালে আসিয়াছেন। এ যে অভাবনীয়! সংবাদটি হু হু করিয়া শহরময় ছড়াইয়া পড়িল। স্বামী সারদানন্দের দ্বারা স্বামীজীকে দেখিবার শখ মিটাইবার জন্য শত সহস্র লোক চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণটি কানায় কানায় ভরিয়া গেল। আর স্থান সঙ্কুলান হইল না।

অশ্বিনীকুমার তখন বরিশালে, সংবাদটি তাঁহার কানে পৌঁছিল। এদিকে স্বামী সারদানন্দ অশ্বিনীকুমার শহরে উপস্থিত আছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন অশ্বিনীকুমার নিজেই

* এই প্রবন্ধের উপকরণ পূজনীয় স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেনের নিকট হইতে সংগৃহীত। সুরেনবাবুর উপরই পূজনীয় শরৎ মহারাজের সেবার ভার অর্পিত ছিল।

তাঁহাকে নিজের বাটিতে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সারদানন্দ মহারাজ অশ্বিনীকুমারের বাড়ি গেলেন। সেখানে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। কত কথা, কত আলাপন, কত রহস্য, কত আনন্দ! মাঝে মাঝে দুই বন্ধুর কলহাস্যে গৃহখানি যেন ভরিয়া উঠিতেছিল।

সমবেত উপস্থিত দর্শকগণ সন্ন্যাসীর মুখে দু-একটি কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই জনৈক বালক-ভক্ত তাঁহাকে আনিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার তখন তাঁহার গৃহে কয়েক দিন থাকিবার জন্য শরৎ মহারাজকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন। এদিকে দর্শকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বালক-ভক্তটি উৎসাহ আধিক্যে সারদানন্দজীর একখানি হাত নিজের হাতে জড়াইয়া—'চলুন চলুন' বলিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। তাহার বড় ভয় হইয়াছিল—পাছে মহারাজ অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে থাকিতে সম্মত হন, তাহা হইলে যে তাহাদের বড় সাধে বাজ পড়িবে। একান্তে মহারাজের সেবা ও সঙ্গলাভ করিবার জন্যই না তাহারা গোপনে অশ্বিনীবাবুকে না জানাইয়াই নিজেরা কষ্টেসৃষ্টে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের সকল আশা বুঝি ধসিয়া যায়। অশ্বিনীকুমার বালকটির ঔদ্ধত্য দেখিয়া চটিয়া গেলেন। "কে হে ছোকরা তুই?"—বলিয়া তিনিও মহারাজের অপর হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "জানিস, এই চেয়ারে স্বামী ত্রিগুণাতীত এসে তিন মাস কাটিয়েছেন, নিত্যানন্দ স্বামীও কয়মাস এই ঘরে থেকে গেছেন, এ আমার কে হয় জানিস, আমার ভাই হয়, আমার বাড়িতে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? এখানেই থাকতে হবে।" এই টাগ-অব-ওয়ারের মাঝে পড়িয়া শরৎ মহারাজ তো একবারে অবাক! একদিকে ভক্ত, অপরদিকে বন্ধু ও ভ্রাতা। সে এক আশ্চর্য দেখিবার দৃশ্য, বালকের টানটিই বুঝি ছিল কিছু জোরাল। এই টানাটানির মাঝখানে অশ্বিনীকুমার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ভক্তের টান জবর টান। ভক্তের টানে ভগবান বাঁধা, শরৎ মহারাজ তোদের ওখানেই থাকবেন। তুই ছাত্র, শিষ্য, তোর কাছে পরাজিত হওয়ায় আজ আমার

গৌরব।" অধিকাংশ সময় অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে অবস্থান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া শরৎ মহারাজ বালকটির সহিত ফিরিয়া আসিলেন এবং যে আট দিন বরিশালে ছিলেন উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন।

শরৎ মহারাজের অবস্থান সময়ে প্রভাতে আটটা নয়টার পর হইতে এগার বারটা পর্যন্ত, কখনো আহারের পরও (যে কয়দিন অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে আহার করিয়াছেন) এবং বৈকালে রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত অশ্বিনীবাবুর গৃহে শত শত উৎসুক ধর্মপিপাসু নরনারীর সহিত শরৎ মহারাজ ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। তখনকার দিনে বরিশালে খুব কীর্তন চলিত। অশ্বিনীবাবু ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে নৈতিক আন্দোলন অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে ধর্ম অর্থে শুধু নৈতিক জীবনই বুঝিত এবং লোকের ধারণা ছিল সাধুদের ধর্ম-উপদেশগুলি বিনাইয়া বিনাইয়া বৈষ্ণব বিনয়ে সিক্ত হইয়া কোমল মৃদু ও মধুস্রাবী হইবে। কিন্তু নূতন সন্ন্যাসীর উপদেশ শুনিয়া তাহাদের ধারণা একেবারে উল্টাইয়া গেল। তাহারা বুঝিলেন, নৈতিক জীবনের অতি ঊর্ধ্বে ধর্মজীবন। নীতিমান হইলেও ধার্মিক নাও হইতে পারেন এবং দেখিলেন, যুবক-সন্ন্যাসী যেন এক সিংহগর্জী পুরুষ, সিংহ-শাবকের বাক্যাবলি তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া কোন এক সুপ্ত স্বপ্নবিহ্বল আত্মাকে, মূর্ছিত চেতনাকে যেন স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দিল। মহারাজ বলিতেন, "Self-confidence, Self-confidence--what I want. আত্মপ্রত্যয়-বলে ব্রহ্মশক্তি হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিবে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাবেই এই শ্লথ বিলম্বিত জাতি দেব-ঋষির বংশধর হইয়াও আজ মৃত্যুমুখে। এই আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করাই ভারতের বর্তমান ধর্ম। আপনারা আবার দেবতা হইবেন, আবার ঋষি হইবেন, ভারতবর্ষ আবার জাগিয়া উঠিবে, আবার দেবভূমি বলিয়া ঋষিকণ্ঠে বন্দিত হইবে। জগৎ ভারতকে পূজা ও অর্ঘ্য দান করিবে। ভারতে ধর্মের আদর্শ—বল। সে আদর্শ বলিতেছে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আপনারা এই আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরুন। আদর্শই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। আদর্শই আপনাদিগকে বল দান করিবে। তাই চাই অন্তরের ভিতর সূক্ষ্ম অনুসন্ধানী (introspection) দৃষ্টি। আমাদের শুদ্ধ হৃদয় অন্ধকার

পথ সমুজ্জ্বল করিবে। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করুন। বাহির হইতে কেহ কাহাকেও দাঁড় করাইতে পারে না ও শক্তি দান করিতে পারে না। পরমুখাপেক্ষীর চেষ্টা বৃথা। আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করুন, আর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আপনিই আসিবে। আজ যাঁহারা আপনাদিগকে হীন ও দুর্বল ভাবিতেছেন আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ হইলে কাল তাঁহারাই ভগবানের লীলার সহচর হইবেন। তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া অভাবনীয় বিপুল বীর্য প্রকাশ হইবে।"

মহারাজের প্রত্যেকটি বাক্য হইতে যেন আগুনের ফিনকি ছুটিত, শ্রোতারা নির্বাক মন্ত্রমুগ্ধ। কি যেন একটা নূতন বাণী তাহাদের মধ্যে দিব্য প্রেরণা সঞ্চার করিয়া দিল। তাহাদের ভিতরটা গমগম করিয়া উঠিল। এমনি ছিল মহারাজের দৈনন্দিন উপদেশ। খালি বল, খালি বীর্য, খালি তেজ, খালি শক্তি! যে শুনিত সে ভাবিত, সে বড়—আর ছোট নহে; প্রভুর কার্য করিবার জন্য তাহার জন্ম, মরা মানুষও যেন বাঁচিয়া উঠিত। শহরটা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

ছাত্রদের উপদেশ প্রসঙ্গে মহারাজ যেমন আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য জোর দিতেন তেমন বিজ্ঞান পড়িবার জন্য বিশেষ করিয়া কহিতেন। মহারাজের অগ্নিগর্ভ উপদেশ শুনিয়া নরনারী ঝাঁকে ঝাঁকে দীক্ষা লইবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বলিতেন, "মানুষ-গুরু দীক্ষা দেয় কানে, জগৎ-গুরু দীক্ষা দেয় প্রাণে। আপনারা খুব করিয়া জ্ঞান অর্জন করুন, বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন আলোচনা করুন, মূর্খ থাকিয়া কি লাভ? লোকের কথায় কেবল চালিতই হইবেন, কোন কিছু একটায় নিষ্ঠা-সহকারে লাগিয়া থাকিতে পারিবেন না। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির নিকট ভড়কাইয়া যাইবেন। একটু জ্ঞান লাভ হইলেই বুঝিতে পারিবেন দেশকাল ভেদে আপনাদের প্রাণ কি চাহিতেছে। আপনাদের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি কি? আপনাদের আদর্শই বা কি? শুধু হুজুক করিয়া দীক্ষা দীক্ষা করিয়া মাতিলে কি হইবে? জমি প্রস্তুত হইলে ভগবান আপনিই দীক্ষা দিবেন। সেই দীক্ষা লাভের জন্য হৃদয়ের কপাট খুলিয়া সতত উন্মুখ হইয়া থাকুন। সময় হইলে কাহার মুখ দিয়া কাহার হৃদয় হইতে প্রেরণা লাভ করিবেন তাহা কে বলিতে পারে? কোন পথ দিয়া প্রভু কাহাকে তাঁহার আঙিনায় লইয়া

যাইবেন তাহা কে জানে? কিন্তু প্রাণে প্রাণে সত্যিকার দীক্ষা পাইলে তাহা অমনি বুঝিতে পারিবেন। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক দীক্ষার একটা contagious spirit আছে। একজন দীক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করিলে উহা বহুর মধ্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে atmosphere পরিষ্কার হইলে spiritটিও কাটিয়া যায়। তখন লোক যেই সেই। তাহাতে বরং অনিষ্ট হয়। Personalityর মোহে হঠাৎ কিছু করা উচিত নহে। হুজুক কাটিয়া গেলে জ্ঞান-মার্জিত বিচার-বুদ্ধি লইয়া গুরুকে পরীক্ষা করিয়া স্থির শান্ত চিত্তে বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।" বস্তুত মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দান করিলেন না। কত নরনারী যে ভগ্ন মনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বামী সারদানন্দজী প্রকাশ্য সভায় তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে প্রথম বক্তৃতাটি হইবার কথা ছিল। স্থান ছিল—সনাতন হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা। কিন্তু তাহা হইতে পারে নাই। ধর্ম-রক্ষিণী সভার তৎকালীন সম্পাদক জনৈক ব্যবহারজীবী বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে সভা হইবার অনুমতি প্রত্যাহার করিলেন; কারণ, স্বামী সারদানন্দ বিলাতফেরত। বিলাতফেরত সন্ন্যাসীর আগমনে সনাতন-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা যে কলুষিত হইয়া যাইবে! যিনি শাস্ত্র-বিধান লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে পারিয়াছেন হিন্দুধর্ম প্রচারে তাঁহার অধিকার নাই! এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অশ্বিনীকুমার, কালীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি উত্তেজনা! কি চাঞ্চল্য! উহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জনতা হইতে ধর্ম-রক্ষিণী সভায় লোষ্ট্র-নিক্ষেপ আরম্ভ হইল, গৃহখানির উপর নানারূপ উপদ্রবের উপক্রম হইল। অশ্বিনীকুমার অতি কষ্টে ক্ষুব্ধ জনতাকে সংযত করিয়া পরদিবস হইতে তাঁহার কলেজে সভা হইবে ঘোষণা করিলেন।

উত্তেজনার ফলে তিন দিনই সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। শহর যেন ভাঙিয়া পড়িল। প্রসিদ্ধ ব্রজমোহন হলে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। বারান্দা ভর্তি হইয়া গেল। প্রাঙ্গণে ও রাস্তার উপরে লোকের ভিড় ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। অনেক মহিলা স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

অশ্বিনীকুমার তিন দিনই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং তিন দিনই ইংরেজি বক্তৃতার বাংলায় তরজমা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজি-অনভিজ্ঞ শ্রোতারা বলিতেন, স্বামীজীর বাক্যাবলি ইংরেজিতে হইলেও উহা এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে প্রাণে আসিয়া সজোরে আঘাত করিত। ইংরেজি না জানিলেও তাঁহারা বিনা কষ্টে বাংলার ন্যায়ই সহজে মর্ম-গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। বক্তৃতার ভাষা ছিল এরূপ প্রাণবন্ত! বক্তৃতার পরে নিত্য কিছু সময় ধরিয়া নানারূপ প্রশ্নোত্তর চলিত, প্রশ্ন করিতে দেরি হইলেও উত্তর দিতে দেরি হইত না। বিষয়গুলি যেন মহারাজের জলবৎ সহজ হইয়াছিল, উত্তরগুলি যেন তাঁহার নখদর্পণে। শরৎ মহারাজের উত্তর দিবার ভঙ্গিটি বড় চমৎকার ছিল, যেন ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) সিদ্ধান্ত করিতেছেন। সে সময় ৺গোরাচাঁদ (দাস) বাবু বার-লাইব্রেরির বয়োবৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ উকিল এবং নিজেও ভক্তজন, পণ্ডিত লোক বলিয়া বিখ্যাত। প্রশ্ন অধিকাংশ তাঁহারই ছিল। সভার মুখপাত্র হিসাবেও তিনি অধিকাংশ প্রশ্ন করিতেন। প্রথম দিনে বেদান্তের সার্বভৌমিকত্ব আলোচনাকালে মায়াবাদ প্রসঙ্গে মহারাজ কহিয়াছিলেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" গোরাচাঁদবাবু ভূমিকা করিয়া কহিলেন, "স্বামীজী, একটি জটিল প্রশ্ন করিতেছি দয়া করিয়া বিশদভাবে বুঝাইবেন। আপনি যে বলিয়াছেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহা হইলে যদি একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন তবে আমরা এই সৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য (diversity) দেখিতেছি কেন?" শরৎ মহারাজ কহিলেন, "প্রশ্নটি ঠিক করিয়া বলুন, this question is self-contradictory and illogical. If you can put it in logical form, I can answer"—শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক একেবারে 'থ' হইয়া গেল। গোরাচাঁদবাবু প্রশ্নটিকে পুনঃ পুনঃ ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সাজাইতে চেষ্টা করিতে যাইয়া প্রতিবারই দেখিলেন প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তখন শরৎ মহারাজ একটু হাসিয়া কহিলেন, "This question was asked a thousand times from the very beginning of civilization but subsequently fell through as it could not logically stand." তারপর তিনি বুঝাইয়া দিলেন। তাহা সংক্ষেপে এইরূপ ছিল; সৃষ্টির কোন অখণ্ড ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মনের সম্বন্ধে ইহার আপেক্ষিক সত্তা মাত্র

আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় সহায়ে জিনিসটা একপ্রকার জানিতে পারিতেছি কিন্তু যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত তাহা হইলে আবার কিছু অন্যরূপ প্রতিভাত হইত। সুতরাং ইহার কোন সত্যিকার নিজ সত্তা নাই। ইহা অপরিবর্তনীয়, অনন্ত ও সর্বগ নহে। ইহা আমাদের মনের সৃষ্টি মাত্র, মনের ভিতরে দেশ কাল ও নিমিত্তের যে ধারণা আছে তাহারই সাহায্যে এই স্থূল জগতের প্রকাশ দেখিতে পাই, সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে অখণ্ডের ভিতরে দেশ নাই, কাল নাই, নিমিত্ত নাই, কারণ মনই যে সেখানে নাই, যেখানে মন নাই সেখানে কালের (time) কল্পনা অসম্ভব। তদ্রূপ যেখানে সর্বব্যাপকত্ব সেখানে বিকাশ বা সৃষ্টির জন্য আলাদা দেশ (space) অসম্ভব; তিনি মাত্র এক, অদ্বিতীয়, সেখানে কোনরূপ কার্যকারণ (causation) থাকিতে পারে না। এই ভুল দেখাটা মনের সৃষ্টি, মন সহায়ে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি বা ভাবিতেছি তাহাই মায়া। যতই ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিব ততই আমরা চক্রাকারে এই মায়ার মধ্যে ঘুরিতে থাকিব। সুতরাং মায়ার বাহিরে না যাওয়া পর্যন্ত জগৎটা যে মিথ্যা উপলব্ধি করিতে পারিব না। সান্ত মন লইয়া অনন্তের ধারণা অসম্ভব, ব্রহ্ম উপলব্ধি দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্তি ঘটে, স্ব স্বরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইলে মায়া বিদায় গ্রহণ করে (bids good-bye)। তখন আর রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় না—জগতের অস্তিত্ব থাকে না। একমাত্র স্বতঃপ্রকাশমান ব্রহ্মই বর্তমান থাকেন, কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন মায়ারাজ্যে মায়াতীতের প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত নহে।"

শরৎ মহারাজের উক্ত আলোচনাটি এত সহজ, এত মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, শুনিয়া হর্ষে মুহুর্মুহু করতালিধ্বনি সভাগৃহখানি মুখর করিয়া তুলিল। অবশেষে গোরাচাঁদবাবু ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "এরূপ পাণ্ডিত্য, এরূপ সহজ জ্ঞান, এরূপ তত্ত্ব-উপলব্ধি ও সরল প্রকাশভঙ্গি আমি আর জীবনে দেখি নাই। স্বামীজীর প্রাণদায়ী ধর্মালোচনা আমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনেক আজগুবি ধারণা ও কুসংস্কার আমূল পরিবর্তন করিয়া দিলেন। স্বামীজীর আগমনে, অভিনব ধর্মব্যাখ্যায় বরিশালে এক নবযুগের সূচনা হইল। এখন স্পষ্ট বুঝিতেছি, ধর্ম

শুধু শাস্ত্রে নহে, তীর্থে নহে, মন্দিরে নহে, উহা আমাদের অন্তরে; দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে সহজ-প্রতিষ্ঠার ও আচরণের বস্তু।"

প্রথম দিন বক্তৃতার বিষয় ছিল বেদান্ত (সার্বভৌম বেদান্ত ধর্ম) Vedanta, the Universal Religion. অশ্বিনীকুমার স্বামীজীকে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর অঙ্গে আজানুলম্বিত গৈরিক আলখাল্লা, মস্তকে গৈরিক পাগড়ি, চোখে মুখে এক উজ্জ্বল দীপ্তি, উন্নত গ্রীবা, পুষ্ট দেহখানি, গেরুয়ায়-গেরুয়ায় এক অপূর্ব কান্তি ধারণ করিয়াছিল। দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল—ইতঃপূর্বে বরিশালবাসীর ধারণা ছিল—সন্ন্যাসী জটাজূটধারী, ভস্মমাখা, নগ্নদেহ, কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত, কল্পনার অতীত, এ যে জুতামোজা পরা বাবু সন্ন্যাসী! গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ অতিক্রম না করিয়াই যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে? কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। অশ্বিনীবাবুর কানে বোধ হয় সে কথা গিয়াছিল। তাই সভার প্রারম্ভে স্বামী সারদানন্দজীর পরিচয় উপলক্ষে কহিলেন, "স্বামী সারদানন্দজী ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন চিহ্নিত সন্ন্যাসী শিষ্য। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, পরমহংসদেবের কৃপায় শুধু বিশ্ব-আলোড়নকারী একজন বিবেকানন্দই যে সৃষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার কৃপায় ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন বিবেকানন্দ। এক একজনে যেন এক একটি আগ্নেয়গিরি। ইঁহাদের বাক্য, হাবভাব, প্রতি ভঙ্গিতে, ইঁহাদের জীবনযাত্রার আঁকেবাঁকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। ইঁহাদের সত্তাটিই যেন জ্বলিতেছে, ইঁহারা যেখানে অবস্থান করেন ও যে পথ দিয়া চলিয়া যান সেখানেরই অমঙ্গল ভস্মীভূত হয়। যেই ইঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িবে সেই জীবনে ইঁহাদের একটা উত্তাপ অনুভব করিবে। ইঁহাদের প্রভাবে বাঘে ও মহিষে এক ঘাটে জল খায়। আমি আলমোড়ায় দেখিয়াছি, ভারতবাসীর সহিত একসঙ্গে ইংরেজ, বিবেকানন্দের পদসেবা করিতেছে, জুতা খুলিতেছে। ইঁহারা ঠাকুরের বিশেষ কার্যের জন্য ভারতের মুক্তি হেতু শরীর ধারণ করিয়াছেন। যদি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিতেন, তবেই আপনারা বুঝিতে পারিতেন স্বামী সারদানন্দ তাঁহারই একটি অবিকল প্রতিচ্ছবি। ইঁহারা আজন্ম

সন্ন্যাসী, ঠাকুরের উপদেশ-বর্ণিত হোমাপাখি। ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই ঊর্ধ্বমুখ গতি। তাই সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও ইঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রবিগর্হিত নহে। ইঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য অভিনব সন্ন্যাস ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন। ইনি ভগবান পরমহংসদেবের নির্দিষ্ট কার্য করিতে বিবেকানন্দের মতো অল্প বয়সেই ইংলন্ড আমেরিকা গমন করিয়া অদ্ভুত তপঃশক্তি ও পাণ্ডিত্য-প্রভাবে তত্রত্য বুধমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। আজ আপনারা ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ধন্য হউন।"

বক্তৃতাকালে স্বামীজী স্থানুর মতো নিশ্চল দণ্ডায়মান, হস্ত বক্ষোপরি পরস্পর সম্বদ্ধ। মাঝে মাঝে গ্রীবা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। গৈরিক-মণ্ডিত শান্ত সমাহিত চিত্র আলোক-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া এক বিচিত্র মহিমা সৃষ্টি করিতেছিল। স্বামীজীর নাতিউচ্চ সুকোমল কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে শ্রুত হইয়া শ্রোতৃহৃদয়ে কথার আঁকেবাঁকে রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চের লহর তুলিতেছিল। বিস্ময়-বিমূঢ়ের মতো সভা নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ। সভা ভঙ্গ হইলে সকলেই যেন কি এক নূতন আলোক লাভে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অশ্বিনীবাবু বরিশালের প্রসিদ্ধ বাগ্মী। বক্তৃতাকালে, হাতের নানা ভঙ্গিতে তাঁহার বক্তব্য সহজভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজ একেবারে নিশ্চল থাকিয়া বক্তৃতা করাতে বক্তৃতা একটি অশরীরী বাণীর মতোই শ্রুত হইত। জনৈক ভক্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে মহারাজের নিকট এ বিষয় প্রশ্ন করিলেন। মহারাজ উত্তরে কহিলেন, "বক্তৃতার সময় ঠিকঠাক হাত নাড়া ভঙ্গিকরা একটা মস্ত বড় আর্ট, বাগ্মীরা উহা করিয়া থাকেন। Art of Oratoryতে এসব আছে। উহাতে বক্তৃতা খুব impressive করা যায়। কিন্তু স্বামীজী ঐসব পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, বক্তৃতার সময় অহঙ্কারকে তাড়াইয়া দিয়া শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মৌনভাবে সমাহিত চিত্তে ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াতে হয়। যাহা বলিবার তিনিই বলাইবেন ও তিনি নিজেই শুনিবেন। এইরূপে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বক্তৃতা করিলে তবে সে বক্তৃতায় ভগবানের বাণী প্রচারিত হয়। অহঙ্কার জাগিলেই 'ব্যস', তোমার কথাই বলিবে.

ভগবান পলাইয়া যাইবেন। তাঁহার বাণী আর প্রকাশ করা হইবে না। পূর্বে কথা বলিতে গেলেই আমার হাত পা ছোড়ার বড় মুদ্রাদোষ ছিল। বিলাতে স্বামীজী হাতে একটা ছড়ি লইয়া বসিতেন এবং আমাকে আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বক্তৃতা করিতে আদেশ করিতেন। হাত পা নড়িলেই স্বামীজীর বেত্র আসিয়া হাতের উপর আঘাত করিয়া আমাকে সজাগ করিয়া দিত। এমনি কত যত্ন করিয়া তিনি আমার সেই দোষটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আহা! তাঁহার হাতের বেত খাইয়াই তো শিখিয়াছি! তিনি এমনি করিয়াই হাতে কলমে আমাদের শিখাইয়াছেন।'' এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, ''বিলাতে স্বামীজী অনেক দিন আমাকে সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য কহিয়াছেন, কিন্তু বক্তৃতার নাম শুনিলেই আমি নার্ভাস হইয়া পড়িতাম এবং 'আজ না' 'আজ না' বলিয়া দিন কাটাইতাম। ভাবিতাম কি বলিব? কিছুই তো জানি না, মাথামুণ্ড কিছু ভাবিয়াও পাইতাম না। স্বামীজীর কাছে ঐ কথা বলিলে তিনি একদিন ধমক দিয়া কহিয়াছিলেন, 'তোর এত মাথাব্যথা কেন? ঠাকুরের কাজ করিতে আসিয়াছিস। তুই উপলক্ষ মাত্র, সভায় গিয়া দাঁড়াইবি, তাঁহার যাহা খুশি বলাইয়া লইবেন। ভাল মন্দ তাঁহার। বিবেচনা করিতে তুই কে? দেহাভিমান লইয়া ঠাকুরের কাজ? ওটাকে ছুড়িয়া ফেলিতে না পারিলে আসিয়াছিলি কেন? যা ফিরে যা, দেহাভিমান থাকিতে ঠাকুরের কাজ হয় না।' স্বামীজীর গালাগালিতে অভ্যস্ত থাকিলেও আমার প্রাণে বড় লাগিল। বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই স্বামীজী আবার কহিলেন, ''ক্ষেপেছিস না কি? 'পারিব পারিব' বলিলেই সকল পারিবি, তোকে দিয়ে ঠাকুরের অনেক কাজ হইবে। সে কথা আমি জানিতে পারিয়াছি, তুই সভায় শুধু গিয়া দাঁড়াইবি। দেখবি, ঠাকুরের কাজ তিনিই করিবেন।'' কি জানি ওসব, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ঘটনাক্রমে স্বামীজীর ঐ দিনই একটি বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। সভাস্থলে যাইয়া হঠাৎ প্রকাশ করিলেন, সেদিন তিনি বক্তৃতা করিবেন না—করিবেন তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ। আমি তো কাঁপিয়াই অস্থির। মনে মনে স্বামীজীর উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও উঠিতেছিলাম না দেখিয়া স্বামীজী একটা ঠেলা দিয়া কহিলেন, 'যা—বলগে যা—ভয় নেই।' সে স্পর্শে সে স্বরে

আমি যেন মন্ত্রচালিত হইয়া বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলাম। তারপর আর কিছু মনে নাই। বক্তৃতা শেষে স্বামীজী বলিয়াছিলেন বক্তৃতাটি তাঁহার আশানুরূপ হইয়াছিল। গুডউইন হাসিতে হাসিতে আমাকে জানাইল যে, বক্তৃতাটি খুব ভালই হইয়াছে। যাক বাঁচিলাম, বুক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল, বড় ভয় হইতেছিল স্বামীজীর না আবার কতই গাল খাইব।" দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল Origin and Development of Religion। এই বক্তৃতায় মহারাজ প্রথম ভয়, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি হইতে কিরূপে ধর্মের উদ্ভব হইল, কিরূপে ধর্মের বৈজ্ঞানিক মূল সূত্রগুলি (laws) আবিষ্কৃত হইল ও তৎপরে ক্ষণস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়ের ধারণা আসিল—মায়াবাদের উদ্ভব প্রভৃতি পরপর দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি বিবৃত করিলেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মরূপ সাধারণ-সংজ্ঞায় ধর্ম পরিণত হইল এবং এই একত্ববোধ হইতে সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্য এবং বিনাদ্বন্দ্বে একলক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য নীতিধর্মের আবির্ভাব হইল। ইহাই ধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। কিন্তু হিন্দুধর্ম আরও পরিণতি লাভ করিয়াছে। হিন্দুঋষি বলিতেছেন, ভগবান সত্য শিক্ষা দিবার জন্য মানুষ হইয়াছেন এবং মানুষও পুনরায় ভগবান হইতে পারিবেন। ধর্ম-আদর্শের চরম পরিণতির বীজ মাঝে মাঝে লক্ষিত হইলেও বর্তমানে এই কয়েক বৎসর হইল উহা পূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতির দুইটি ধারা—সর্বভাব ও ধর্মসমন্বয় এবং সর্বভূতে ব্রহ্মের সেবা। পূর্বে ভূমানন্দে মগ্ন হইয়া সমাধিতে জড়বৎ থাকা যে চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত, বর্তমানে ঐ ভূমানন্দ ত্যাগ করিয়া উচ্চতম ভূমি হইতে মনকে জোর করিয়া নামাইয়া আনিয়া, আপনাকে বিপুল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়, ভগবানের বিরাট ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ-পূর্বক যন্ত্রবৎ চালিত হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত ভূমির সীমারেখার উপরে অবস্থিত থাকিয়া সেবা-জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই আদর্শটি কিরূপে কার্যে পরিণত হয় তাহাই বুঝাইতে যাইয়া শরৎ মহারাজ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছিলেন—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে কিরূপ শক্তির বিকাশ পথে শারীরিক ক্রিয়া উৎপাদন করে। এই অন্তর ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমান্বয়ে

শুদ্ধ হইলে প্রকৃতির ইচ্ছা ঠিক ঠিক উপলব্ধি ও ধারণ করিতে পারে। এবং উহা মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রবৎ চালিত করে। মানুষের কাঁচা আমিটি তখন চিরকালের জন্য মরিয়া যায়, সেও ভগবানের হাতের যন্ত্র হয়। তখন আর বেতালে পা পড়ে না। কিন্তু কামগন্ধ কিছুমাত্র থাকা পর্যন্ত অথবা স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকিলে সর্বতোভাবে ভগবানের দিব্য প্রেরণায় চালিত হওয়া অসম্ভব। এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ চিত্ত হইতে মরিয়া মুছিয়া ধুইয়া না গেলে ধর্মজীবন যাপনের আরম্ভই হইতে পারে না, ইহা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। মহাপুরুষ বা অবতারদের জীবন শাস্ত্র বাক্যের যথার্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা এইরূপ একজন মহাপুরুষের পদতলে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যাঁহার মধ্যে দেহবুদ্ধি বা কামগন্ধের লেশমাত্রও ছিল না, তিনি নারীমাত্রকেই জগজ্জননী বলিয়া দেখিতেন। তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাম এরূপ বিশুদ্ধ ও একসুরে বাঁধা ছিল যে, জগন্মাতার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও তাহাতে ধরা পড়িয়া তাঁহাকে কলের মতো চালিত করিত। জগন্মাতার আদেশে তাঁহার জীবনের প্রতি কার্যটি নির্বাহ হইত। তাঁহার সাধনা এরূপ অদ্ভুত তীব্র ছিল এবং লোক-শিক্ষার নিমিত্ত জগন্মাতার আদেশ যে অন্তরে উপলব্ধি করিতেন তাহা নহে, পরন্তু উহা শব্দ-স্পর্শে শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত। তিনি মনুষ্য কণ্ঠের মতই তাহা স্পষ্ট ও নিবিড়ভাবে শুনিতে পাইতেন। তাই তিনি অনেক সময় কহিতেন, "হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙিও।"

এই প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, "ধর্ম, শাস্ত্র, তীর্থ বা মন্দিরের ভিতর নহে; ধর্ম অনুভূতির বস্তু; সুতরাং বেশ-ভূষা বা সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহারের মধ্যে নিহিত নহে। ধর্ম—আচরণের, জীবনের প্রতি স্তরে প্রতি কার্যে প্রতিষ্ঠার বস্তু, ধর্ম অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ মাত্র সুতরাং উহা সহজ হইবার (matter of being) জিনিস।"

তৃতীয় দিনের বিষয় ছিল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়। এই বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষের পূর্ণ জীবন লাভ করিতে হইলে এই ভাব ও সমন্বয়ের প্রয়োজন। পূর্বপূর্বগ আচার্যগণের জীবনে ইহাই প্রমাণিত

হইয়াছে। যদিও সময় বিশেষে লোককল্যাণের নিমিত্ত কাহারও ভিতরে জ্ঞানের প্রাখর্য, কাহারও ভিতর ভক্তির আতিশয্য, কাহারও ভিতর কর্মের অদ্ভুত প্রেরণা লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের জীবনী সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মনীষার মূলে—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সমন্বয়ের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির লক্ষ্য এক এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই আদর্শে পৌঁছাইবার সমান শক্তি। পরস্পরের কমবেশি সাহায্য ব্যতীত ইহার একটিও স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইতে পারে না। জ্ঞান ও ভক্তির প্রতিষ্ঠা আবার কর্মের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে।"

ষষ্ঠ দিনে অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সাধারণের আলাপ-আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলেন। অভিপ্রায়—এতদিন দিনরাত বিপুল জনসমাগম হেতু তাঁহারা একান্ত করিয়া মহারাজের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, আজ তাঁহারা প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া লইবেন। ব্রজেন নন্দী, সুরেন সেন ও যোগেন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণ মহারাজকে কহিলেন, "সভা-সমিতি ও আলোচনায় একমাত্র অশ্বিনীবাবুর সহিত কথোপকথন ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় উল্লেখ মাত্র করিলেন না। এইবার কিছু ঠাকুরের কথা বলুন, আমরা শুনি।" অনেক অনুনয়ের পর মহারাজ সহাস্যে কহিলেন, "আমিত্বের 'আ' থাকা পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা। যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি, ঠাকুরকে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ঠাকুরকে কিছু বুঝিয়াছেন স্বামীজী ও নাগমহাশয়। আমরা ঠাকুরের সেবকমাত্র, তাঁহার আদেশ শুধু পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি। তিনি কৃপা করিয়া যেদিন আমাকে বুঝাইবেন সেদিন মাত্র বুঝিব। ঠাকুর-সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে বড় ভয় হয়। স্বামীজীই বলেন—'অগোচরে পাছে বাড়াইতে যাইয়া ঠাকুরকে খাটো করিয়া ফেলি!' স্বামীজীরই এই, অন্যে পরে কা কথা! ঠাকুরের খুব ধ্যান চিন্তা করিও, তিনিই তোমাদিগকে আলবাত বুঝাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট প্রকাশ হইবেন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশ্বাস কর। আমরা ভাবময় ঠাকুরের কতটুকু বুঝিয়াছি! কিছুই বুঝি নাই।" বলিতে বলিতে সহসা মহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল, দেহ নিষ্পন্দ, চক্ষু ঈষৎ

নিমীলিত, ঊর্ধ্বগতি। দুই এক বিন্দু অশ্রু চোখের কোণে গড়াইয়া পড়িল, শ্বাস রুদ্ধ। একটা দিব্যশ্রী বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এইরূপ মিনিটের পর মিনিট চলিতে লাগিল। কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই, নিস্তব্ধ। গৃহের বায়ুমণ্ডল যেন নিবিড়, চেতন হইয়া উঠিল। অবশেষে সুরেন্দ্রকুমারের বড় ভয় হইল। সে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল—শ্বাস নাই। তারপর নাড়ি টিপিয়া দেখিল, নাড়িও নাই। কি করিবে, ঠিক পাইল না; তারপর ডাক্তার ডাকিতে যাইবে এমন সময় যোগেন্দ্র বলিল, "শুনিয়াছি, সামান্য উদ্দীপনা হইলে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাবসমাধি হইত। হয়তো ঠাকুরের নাম উল্লেখে ইনি গভীর ভাবসমাধিমগ্ন হইয়াছেন।" এই অবস্থায় সাধারণ ভূমিতে মন নামাইয়া আনিতে হইলে কি প্রক্রিয়া করিতে হয় তাহা তখনও ইহারা জানিত না। কাজেই ভীষণ আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর ধীরে ধীরে একটু বাহ্য চৈতন্যের আভাস পাওয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে অর্ধস্ফুট স্বরে 'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করিতে করিতে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। সে রাত্রে তাঁহাকে যেন গভীর, নিবিড় ভাব সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। বেশি কোন কথা হইতে পারিল না। ভক্তেরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে ঠাকুরের নামমাত্র গ্রহণে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, গভীর ভাবসমাধিতে মন প্রবেশ করে, সে ঠাকুর কত বড়, কত মহান! অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে ভাবটা একটু ফিকা হইলে, সুরেন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার জীবনে কি কোন বিশেষ বাসনা আছে?"

শরৎ মহারাজ বলিলেন, "কই, একমাত্র ঠাকুরের আদেশ পালন করা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজিয়া পাই না।"

সুরেন্দ্রকুমার পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ঠাকুরের নিকট আপনি কোন দিন কোন বাসনা পূর্ণ করাইবার জন্য আবদার করিয়াছিলেন কি না? শুনিয়াছি, স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধির জন্য ও বাবুরাম মহারাজ ভাব হইবার জন্য ঠাকুরকে অনেক মিনতি করিয়াছিলেন।"

তদুত্তরে মহারাজ কহিলেন, "একদিন ঠাকুর আমাদের সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ

করিবার জন্য কল্পতরু হইয়াছিলেন। আমাদের তখন ঠাকুরের শক্তির উপর এমনি অখণ্ড বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুর যে বর দান করিবেন তাহা অব্যর্থ হইবে। কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান, কেহ মুক্তি প্রভৃতি চাহিলেন। ঠাকুর আমাকে নীরব দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিরে চুপ করে কেন, তোর কি বাসনা, বল না? কহিলাম—'সর্বভূতে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতে পারি।' ঠাকুর মৃদু হাস্যে কহিলেন, 'সময়ে হবে।' '' সত্যই কি শরৎ মহারাজের মধ্যে ঠাকুরের এই আশীর্বাদ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল না? এই অনুভূতি কি এই সুদীর্ঘকাল তাঁহার আর্ত পীড়িত জীবসেবার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করে নাই?

আর একদিন উপদেশ প্রসঙ্গে মহারাজ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলিতেন, 'সকাল-সন্ধ্যায় নিত্য বসবি, উহাতে তাড়াতাড়ি হয়।' বরিশালে এত কর্ম কোলাহলের মধ্যেও মহারাজের কিন্তু সকাল-সন্ধ্যায় বসার নিয়মটি বাদ যায় নাই। তিনি মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় একলা গান গাহিতেন।

একদিন মহারাজ, অশ্বিনীবাবু প্রমুখাৎ কালীবাড়ির সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺সনা ঠাকুরের (সনাতন) নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তখন প্রাতঃকাল, রৌদ্র উঠিয়াছে। কয়েকজন ভক্তসহ মহারাজ থানার কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলেন। সে সময় সনা ঠাকুর কদাচিৎ মন্দির হইতে বাহির হইতেন। শরৎ মহারাজ মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবা মাত্র সহসা ঝড়ের মতো সনা ঠাকুর বাহির হইয়া শরৎ মহারাজকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের চক্ষু পরস্পরের মুখে নিবদ্ধ। উভয়েই নির্বাক। চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল, তাহা তাঁহারাই জানেন। দুইটি মহাপুরুষের প্রেমালিঙ্গন দর্শনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। কালীবাড়ি যেন গমগম করিতে লাগিল। ভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সুরেন্দ্রকুমার শরৎ মহারাজের পরিচয় প্রদান করিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য শুনিয়া তিনি হঠাৎ কহিলেন, "পরমহংসদেব যে সাক্ষাৎ—।" তখন শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া মহাপুরুষের সহিত মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। সনা ঠাকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য বালকের ন্যায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন এবং শরৎ মহারাজ

দুই চারিটি কথায় ঠাকুরের জীবনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তৎপর শরৎ মহারাজ সনা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''আপনার যে অবস্থা এবং যে বৃদ্ধ বয়স তাহাতে এত কঠোরতা করিতেছেন কেন?''

সনা ঠাকুর কহিলেন,

''মা যেমনি রাখছেন তেমনি থাকছি। ওসব কথা সে বেটি জানে।''

ববিশালে আট দিন অবস্থানের মধ্যে কয়েকটি আগ্রহবান যুবকের নিকট শরৎ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া যান। তখনকার অনেক উপদেশ এখনও ভক্তদের মুখে শুনা যায়।

অষ্টম দিন প্রভাতে তিনি বরিশাল পরিত্যাগ করেন। বহু ছাত্র ও গণ্যমান্য ভদ্রলোক তাঁহাকে বিদায় দিতে স্টিমার-স্টেশনে উপস্থিত হন। 'পরমহংসদেবকী জয়' এই তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে স্টিমার ছাড়িয়া গেল। স্টিমার দৃষ্টি ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে সমবেত জনসঙ্ঘ বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। এই আট দিন বরিশালে যে প্রাণের খেলা চলিয়াছিল, ভক্তগণ সেই সম্পদটুকু ভক্তিনম্র চিত্তে স্মরণ করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি

ডাক্তার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

১৯০৬ খ্রিঃ ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানকার মনোনয়নের কার্ড পাওয়ার পর ইচ্ছা হইল বি. এ. পরীক্ষা দিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িব। রাজনীতিক কারণে এই সময় মোটেই পড়াশুনা করি নাই। ১৯০৮ খ্রিঃ মেডিকেল কলেজে ভরতি হইলাম।

আমাদের সাবেক বাড়ির পাশেই স্বর্গীয় ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের অনেকেই সে বাড়িতে আসিতেন। আমরা বিদ্রূপ করিতাম; তখন এদিক সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম।

আমাদের বাড়িটি তিনমহল ছিল; বাহিরের মহলে একটি বড় উঠানে আমরা খেলাধূলা করিতাম। একদিন বৈকালে অনেকক্ষণ ধরিয়া লাফালাফি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং ঐ উঠানের দক্ষিণে বৈঠকখানা ঘরের উত্তর বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। উঠানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বাটির দ্বিতলে ডাক্তার বিপিনবাবুর শয়নকক্ষ। হঠাৎ দেখি আমার বামদিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' নামক একটি পুস্তকের খানকতক ছেঁড়া পাতা পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্বে এই পুস্তকের নামও শুনি নাই। পাতা কয়খানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। এত ভাল লাগিল যে চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সমগ্র বইখানি পড়িবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইল।

পুঁটিয়ার মহারানীর জামাতা বিশ্বেশ্বরবাবুর ভাগিনেয় বিভূতিবাবু সিটি কলেজে বি. এ. পড়িতেন এবং আমাদের সমিতিতে আমার নিকট লাঠিখেলা শিখিতেন। সেই কারণে তাঁহার সহিত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা

করিলাম, তিনি বইটির বিষয় কিছু জানেন কিনা। তখন ঐ পুস্তকের তিন ভাগ বাহির হইয়াছিল, তিনি আমায় তিন ভাগই পড়িতে দেন।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হইল। ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্বে আমাদের সাবেক বাড়ির কাছে 'উদ্বোধন কার্যালয়' ছিল এবং নিকটেই ছেলেরা একটি লাঠিখেলার সমিতি করিয়াছিল। আমাকে উহাদের খেলা দেখিবার জন্য দুইবার লইয়া যায়। বেলুড় মঠের জ্ঞান মহারাজ (ব্রহ্মচারী জ্ঞান) তখন ঐ স্থানে থাকিতেন। পরে শুনিয়াছিলাম উদ্বোধন কার্যালয় ওখান হইতে বাগবাজারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে।

'কথামৃত' পাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবার পর একদিন বৈকালে চিৎপুর রোড ধরিয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়িতে ঢুকিয়াই বামদিকে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ)-কে দেখিতে পাইলাম এবং অতিশয় শ্রদ্ধান্বিতভাবে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আমার সকল পরিচয় পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ঠাকুরঘরে গিয়াছিলাম কিনা। আমি বলিলাম, এখানে এই প্রথম আসিতেছি, ঠাকুরঘর কোথায় জানি না। তখন তিনি একজন সাধুকে আদেশ করিলেন—আমাকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইতে। আমি ঠাকুরঘরে যাইয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়া নিচে মহারাজের নিকটে আসিয়া পুনরায় বসিলাম।

সেই সময় ডাক্তার কাঞ্জিলালবাবু প্রত্যহ 'মায়ের বাড়ি'তে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বে শরৎ মহারাজের নিকট গান শিক্ষা করিতেন। মহারাজ তানপুরা বাঁধিয়া তাঁহাকে দিলেন—তিনি প্রথমেই 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' এই গানটি গাহিতে লাগিলেন। ছেলেরা মিছিল করিয়া ঐ গানটি গাহিয়া যাইতেছিল, শুনিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ গান ইহার পূর্বে সভাসমিতিতে আমি বহুবার গাহিয়াছি, সেইজন্য গানটির সুর ঠিক হইতেছে না বলিয়া আমার অস্বস্তি হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ঐ গানের সুর আপনার হইতেছে না।" তখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গান জান নাকি?" আমি

বলিলাম, ''মহারাজ, এই গান বহুবার গাহিয়াছি।'' তখন মহারাজ আমাকে গানটি গাহিয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন।

গান শুনিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ''শ্যামাসঙ্গীত কিছু জান কিনা।'' উত্তরে বলিলাম, ''কিছু কিছু জানি।'' বলিয়া পাঁচ-ছয়খানি শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া শুনাইলাম। মহারাজ গান শুনিয়া বলিলেন, ''তোমার বেশ গলা। তুমি গান শেখ, তান মান লয় শিখিলে তুমি উঁচুদরের গায়ক হইতে পারিবে।'' আমি বলিলাম, ''মহারাজ, আমার গান শিখিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু হইয়া উঠিবে কিনা বলিতে পারি না।''

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া আমি বলিলাম, ''মহারাজ, আমি এইবারে আসি।'' আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম এবং বাটি ফিরিবার জন্য উদ্যত হইলাম। মহারাজ বাটি ফিরিবার আদেশ দিয়া বলিলেন, ''আবার এস।'' সেই কথা শুনিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বাড়ি ফিরিলাম। মনে হইতে লাগিল যে এত মিষ্ট করিয়া 'আবার এস' এই কথা বলিতে কাহাকেও কখনও শুনি নাই এবং সেই দিন হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহাবাজদের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাইল এবং নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি যাইতে লাগিলাম।

সেই সময়ে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজি কাগজ সম্পাদনা করিতেন এবং বাংলা 'যুগান্তর' কাগজ দেবব্রত বসু মহাশয় সম্পাদনা করিতেন। দুই জনেই বোমার মামলায় ধৃত হইলেন। অরবিন্দবাবু পণ্ডিচেরী চলিয়া গিয়া সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন এবং সেইখানেই শ্রীঅরবিন্দ রূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেবব্রতবাবুর বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণাভাবে প্রত্যাহৃত হইলে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; তাঁহার নাম হইল 'স্বামী প্রজ্ঞানন্দ'। তিনি 'মায়ের বাটি'তেই বসবাস করিতে লাগিলেন। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং সকলের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং সকলকেই সমানভাবে ভালবাসিতেন। তাঁহার সঙ্গলাভে আমরা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম।

সাধু-সজ্জন পরিবেষ্টিত 'মায়ের বাটি'টির পরিবেশ অতি উচ্চ ধরনের ছিল। তাহার উপর যখন শ্রীশ্রীমা আসিয়া ওখানে থাকিতেন, তখন ঐ বাটির শোভা এবং আকর্ষণ এত বাড়িয়া যাইত যে সকলেই আমরা আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতাম। শ্রীশ্রীমা আহারান্তে দুধ-ভাত মাখিয়া একটি বাটিতে করিয়া আমাদিগের জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিতেন। আমি এবং আমার মতো যাহারা প্রত্যহ বৈকালে মায়ের বাটিতে যাইত তাহারা সকলেই সেই প্রসাদ পরম আনন্দে একটু একটু করিয়া ধারণ করিত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রবোধবাবু খুব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং বেশ মৃদঙ্গ বাজাইতে পারিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে সন্ধ্যার পর প্রায়ই গানবাজনা হইত এবং প্রবোধবাবু মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেন। শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজও সেই সময় আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতেন।

১৯০৯-১০ খ্রিঃ কথা। উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ তখন প্রায়ই সন্ধ্যারতির পর তানপুরা লইয়া ভজন গান করিতেন। আমিও তানপুরা লইয়া দু-একটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতাম। একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়া পাঠাইলেন, "বলো, উহার গান আমার ভাল লাগিতেছে, আরও কয়েকখানি গাহিয়া শুনাক।" যে কয়দিন শ্রীশ্রীমা ওখানে থাকিতেন, বাটিটি এক অপূর্ব এবং দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। সে বিমল আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেয়ে-পুরুষ নিত্য আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন এবং প্রণাম করিয়া যাইত, সে এক অপূর্ব দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি, যাহা বর্ণনাতীত।

মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইবার পর তিনমাসকাল কলেজের ছুটি থাকিত, সেই সময়ে আমি নিজ বাটিতে দ্বিপ্রহরের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রায় সমস্ত দিন মায়ের বাটিতেই থাকিতাম। জনৈক সাধু এবং আমি এক বয়সের ছিলাম, তিনিও পূর্বাশ্রমে শান্তিপুর-নিবাসী ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 'উদ্বোধনে'র অনেক কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতাম। সন্ধ্যার সময় দুজনে গঙ্গার ধারে যাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নানা ধর্মপ্রসঙ্গে কাল কাটাইতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কাম-ক্রোধ যদি বা যায় শেষ পর্যন্ত, 'আমি সাধু' এই অভিমানটা মন থেকে যেতে চায় না।"

এত সহজভাবে এ কথাটি বলিয়াছিলেন যে, এখনও সে কথাগুলি আমার মনে রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের চরণাশ্রিত সাধুরা গৃহী অপেক্ষা যে কত বড়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সেই সময়ে শ্রীযুত কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) একদিন আমায় বলিলেন, "শ্যামাপদ, আগামী কাল অক্ষয়তৃতীয়া, খিদিরপুর থেকে একটি ছেলে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা নিতে আসবে, তুমিও অতি অবশ্য দীক্ষাটি নিয়ে নাও, আমি সকল কথা শ্রীশ্রীমাকে জানিয়ে রাখব। এখানকার দীক্ষায় কোন হাঙ্গামা নেই। গঙ্গাস্নান করে চলে এস।"

তদনুযায়ী আমি পরদিন গঙ্গাস্নান করিয়া মায়ের বাটিতে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমা পূজা সারিয়া, সেই ছেলেটিকে দীক্ষা দিয়া আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সিংহাসনের সম্মুখে শ্রীশ্রীমা বসিয়াছিলেন এবং আসনের কাছেই একখানি আসনে আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা শাক্ত, না বৈষ্ণব?" জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে দীক্ষামন্ত্র দিলেন। তখন আমি যেন নিজের সম্বিত হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটি' হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম অভিমুখে সরু গলিটি ধরিয়া রেলের লাইনগুলি পার হইয়া ঠিক সম্মুখেই গঙ্গার পূর্ব পাড়ে একটি জলনিকাশের পাইপের উপর সিমেন্টে বাঁধানো চতুষ্কোণ একটি চাতালের উপরে গিয়া বসিলাম। একটি বকুল গাছ সেই চাতালটিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল, তাই ঐ জায়গাটিতে মোটে রৌদ্র আসিতেছিল না। সেইখানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া গায়ত্রী মন্ত্রটি উচ্চারণ করিবা মাত্র অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি তখন আনন্দে ও প্রীতিতে এতটা ভরপুর হইয়াছিলাম যে, আমি শ্রীশ্রীমায়ের বাটি হইতে কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, এ কথা মোটেই স্মরণ হইতেছিল না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকিবার পর আমার সম্বিত ফিরিয়া আসিল এবং আমাকে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে সকলে

খুঁজিতেছেন—এরূপ মনে হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে ফিরিয়া আসিবা মাত্র শ্রীযুত শরৎ মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?" শ্রীশ্রীমা আমায় প্রসাদ দিবেন বলিয়া আমার খোঁজ লইতেছেন। আমি শরৎ মহারাজকে সকল কথা জানাইলাম এবং তিনি তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

একবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসবে বেলুড় মঠে যাইয়া খুব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম এবং গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীযুত শরৎ মহারাজকে আমার ঐ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীযুত মহারাজ বলিলেন, "শ্যামাপদ, তোমার যে ভাব, তাহাতে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ গা ঢালিয়া দিয়া থাকো, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলিতেন, ঝড়ের আগে উচ্ছিষ্ট পাতার মতো সংসারে থাকিবে, ঝড় যেদিকে লইয়া যায় সেই দিকে পাতা উড়িয়া যায়।" তাঁহার ঐ কথাগুলি শুনিয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম এবং সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা প্রশমিত হইয়া গেল।

১৯১০ হইতে ১৯১১ খ্রিঃ মধ্যে শ্রীযুত শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মাদ্রাজ হইতে বিশেষ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসিলেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে দ্বিতলে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডানদিকের ঘরটিতে তাঁহাকে রাখা হইল। বিশ্বরঞ্জন মহারাজ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। Anatomy-র dissection প্রথম বৎসর আমার তখন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য পিঠের উপরকার মাংসপেশীগুলির কথা আমার জানা ছিল। সেইগুলি মনে করিয়া সেই মাংসপেশীগুলির উপরে vibratory massage করিয়া (টিপিয়া) দিতাম। উহাতে তিনি বিশেষ আরাম পাইতেন এবং বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে বলিতেন যে, শ্যামাপদ ডিসেকশন করেছে, সেইজন্য ও মাংসপেশীগুলি টিপে দিলে বড় আরাম পাই। অতএব ওকেই করতে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এই মহাপুরুষের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া ও সেবার সুখ্যাতি শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতাম।

তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু যখন হাসিতেন তখন

মনে হইত ঠিক যেন সাত-আট বৎসরের বালক। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কৃপা ব্যতীত ঐ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ আমার ঘটিত না। বাঙ্গালোর হইতে একটি ভক্ত তাঁহার জন্য একটি পেঁপে পাঠাইয়াছিলেন, সেই পেঁপে কাটিয়া লম্বালম্বি চারভাগের একভাগ আমাকে খাইতে দিয়াছিলেন। আমি উহার পূর্বে ও-রকম সুস্বাদু পেঁপে কখনও খাই নাই, সেই কথা বলিলে তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটির বৈঠকখানাতে একদিন দেখি, শ্রীযুত বড় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বসিয়া আছেন এবং তাঁহার গুরুভ্রাতা—ঠাকুরের অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গেরা সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন; শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), শরৎ মহারাজ, এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ মহাপুরুষ মহারাজও (স্বামী শিবানন্দ) ঐরূপভাবে প্রণাম করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা ভক্তির আতিশয্য। তখনকার দিনে ঐরূপ অনেক ভুল ধারণা আমার মনে ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত শরৎ মহারাজের সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, শ্রীযুত গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে প্রবেশদ্বারের ডাহিনে অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরের সংশ্লিষ্ট রোয়াকটির উপর উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন এবং তাঁহার মন যেন অন্য এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। শ্রীযুত শরৎ মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। শ্রীযুত শরৎ মহারাজ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে একজন; কায়স্থ সন্তান এবং গৃহী গিরিশবাবুকে তিনি ঐরূপভাবে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম, ইহাও যে ভক্তির আতিশয্য ছাড়া আর কিছু, তাহা ধারণা করিতে পারি নাই।

যখন মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে পড়ি, তখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ রক্তআমাশয়ে বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছিলেন, সে সময় তিনি বলরাম মন্দিরে থাকিতেন। আমি বৈকালে কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিয়া নিত্য তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। প্রত্যহ দেখিতাম, তিনি সকলের সহিত বেশ হাসিমুখে আলাপ

করিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যহই আমার মনে হইত, আজ বোধ হয় মহারাজ ভাল আছেন। সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতাম, "মহারাজ, আজ কেমন আছেন?" তিনি বলিতেন, "ভাল নাই, তুমি তো ডাক্তারি পড়িতেছ; রক্তআমাশয় রোগে কত যন্ত্রণা হয়, তাহা তো তুমি জান।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতাম, "মহারাজ, আজ কতবার পায়খানা যাইতে হইয়াছে?" তিনি সেই হাসিমুখে এবং অবিকৃত মুখমণ্ডলে উত্তর দিতেন, "সকাল হইতে তিরিশ চল্লিশ বার।" সে কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম; এই কঠিন রক্তআমাশয় পীড়ায় এতদিন ধরিয়া কষ্ট পাইলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে, তিনি এত কষ্ট পাইতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় পূর্ববঙ্গে যাইয়া অবিশ্রান্তভাবে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিশ্রাম না লইয়া প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, সেখান হইতে দারুণ অসুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ঐ বলরাম মন্দিরে ছিলেন। তাঁহাকে কালাজ্বর আক্রমণ করিয়াছিল।

একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজ তন্ময় হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তথায় দাঁড়াইয়া আছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর বাবুরাম মহারাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "গৌরাঙ্গের ভাব, গৌরাঙ্গের ভাব।"

অসুখের সময় বাবুরাম মহারাজের সেই অপূর্ব গৌরবর্ণ ম্লান হইয়া গিয়া একেবারে কালো হইয়া গিয়াছিল। একদিন তাঁহার নিকট যাইয়া দেখি যে, খলে মাড়িয়া একটি কবিরাজি ঔষধ সেবন করিতেছেন এবং কিছুমাত্র মুখ বিকৃত না করিয়া হাসিমুখে আমায় বলিতেছেন, "ঔষধটি ঠিক যেন বিষ্ঠার গন্ধ; কি করিব, কবিরাজ বলিয়াছেন, অতএব সেবন করিতেই হইবে।" দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ ঐরূপ অবিকৃত হাসিমুখে সেবন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের মতো এইরূপ ভাব আর কোথাও দেখি নাই। এই অবিশ্বাসের যুগে যেসব কীর্তি ও লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন সেসবই অপূর্ব; যত দিন যাইবে ততই আমরা অবাক এবং আশ্চর্যান্বিত হইব।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে দ্বিতলের ঠাকুরঘরের পূর্বে অবস্থিত পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে পূজনীয় হরি মহারাজকে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) খুব অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন যাবৎ রাখা হইয়াছিল। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া শরীরের যেখানে সেখানে বিশেষ করিয়া সংযোগস্থলগুলি পাকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম এরূপ ঘটে যখন তিনি পুরীধামে। সেখানে তখন কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক (Dr. S. B. Mitra) পুরীতে গিয়াছিলেন। তিনি লন্ডনের পাস করা ডাক্তার ছিলেন এবং এখন যেখানে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটি, সেইখানে তাঁহার দ্বিতল বাটি ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া M. B. পরীক্ষায় Zoology-র পরীক্ষক হইয়াছিলেন। এবং সে সময় তাঁহার হাতে ছয়-সাতটি ছাত্রের বেশি কখনও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তি হরি মহারাজের প্রথম অস্ত্রোপচার (operation) করিয়াছিলেন। পূজনীয় মহারাজ ক্লোরোফর্ম (chloroform) না লইয়া, বিন্দুমাত্র অস্থির না হইয়া, অবিকৃত মুখে অপারেশান করাইয়াছিলেন দেখিয়া ডাক্তার মিত্র অবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতে তাঁহার ভাবের আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে হরি মহারাজের নিকট হইতে ফী বাবদ আর কিছু লন নাই। হরি মহারাজ কলকাতায় আসিলে তিনি ধর্মতলা স্ট্রিট হইতে ট্যাক্সি করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে মহারাজকে দেখিতে আসিলেন, ভাড়া দিতে গেলে বলিয়াছিলেন, "আমাকে ট্যাক্সিভাড়া দিলে আমার এখানে আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ আমার এত বয়স হইয়াছে, এ রকম মানুষ এই প্রথম দেখিলাম, কাজেই তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করি।"

একখানি উঁচু খাটের উপর তিনি সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া শুইয়া থাকিতেন। সমস্ত জয়েন্টগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুখের উপর একটি মাছি বসিলে হাত নাড়িয়া সেটিকে তাড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সেই অবস্থায় আমি তাঁহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে. তিনি ভাল আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন, "অসহ্য যন্ত্রণা বহিয়াছে।"

বলরাম মন্দিরে নিচের ঘরে (বাটিতে প্রবেশ করিয়াই রাস্তার ধারের

ডানদিকের ঘরটিতে) থাকাকালে তাঁহার পায়ের একটি জয়েন্ট পাকিয়া পুঁজ হইলে পর ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য (তখনকার দিনের প্রখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক) মহাশয় আমার উপস্থিতিতে তাঁহার অপারেশন করিয়াছিলেন। একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া ক্লোরোফর্ম না করিয়া অস্ত্রোপচার করাইলেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য ছুরি দিয়া ফালা করিয়া আঙুল দিয়া ভিতরটা ঘাঁটিয়া পুঁজরক্ত বাহির করিয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। হরি মহারাজ বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই, কিংবা কোন কষ্টসূচক শব্দ করেন নাই। ডাক্তার সুরেশবাবু তাঁহার এই বিস্ময়কর অপার সহ্যগুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এমনকি কাশী সেবাশ্রমের নিকট একখানি বাটি ক্রয় করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি প্রায়ই হরি মহারাজকে দেখিতে যাইতে পারেন এবং যথাসম্ভব তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পান। সেই কাশীতেই একটি পিঠজোড়া প্রকাণ্ড দুষ্টব্রণ (Carbuncle) সজ্ঞানে তিনি বসিয়া কাটাইয়াছিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম।

প্রথম প্রথম মঠে (বেলুড়) খুব ঘন ঘন যাইতাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজের প্রতি আমার বেশি আকর্ষণ থাকায় সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে যাইতাম (অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করিবার পর)। প্রত্যেকেই আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন যে, রাজা-মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম কি না। আমি 'না' বলিলে প্রত্যেকেই আমাকে আগে পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতি আমার আকর্ষণ কম ছিল, তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিতেন। এখন মনে হয়—সেইজন্যই আমার এই অপূর্ণতা দূর করিয়া আমার কল্যাণার্থে তাঁহারা ঐরূপ আদেশ করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের একটি পিতলের গড়গড়া ছিল। সেবকরা সেটিকে নিত্য ধুইয়া মাজিয়া রাখিতেন এবং দেখিলে মনে হইত যে, সোনার গড়গড়া। তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিতাম, সেই গড়গড়াতে তিনি তামাক সেবন করিতেছেন কিংবা কাহারও সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। কেহবা তাঁহার গা-হাত-পা টিপিয়া দিতেছেন। এইসব দেখিয়া প্রথম প্রথম ভয়ভক্তি-বশত কোন প্রকারে তাঁহাকে একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতাম।

একবার পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ অসুস্থ হইয়া সারগাছি হইতে আসিয়া চিকিৎসার জন্য বলরাম মন্দিরে রহিয়াছেন। অসুস্থ শরীরে দিনে পাছে না ঘুমাইয়া পড়েন, তাই তাঁহাকে লইয়া তাস খেলা হইত। পূজ্যপাদ মহারাজেরই বেশি উৎসাহ। খেলায় গোলমাল হইত। মহারাজ তাস বলিয়া দিতেন, হারিয়া গেলে ঠাট্টা করিতেন। আমার এসব ভাল লাগিত না।

একে তো পূর্ব হইতে আকর্ষণ ছিল না, তাহার উপর প্রত্যহ ওরূপ ছেলেমানুষের মতো খেলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষণ আরও কমিয়া গিয়াছিল।

একদিন যখন মনে এরূপ ভাব উঠিয়াছে যে, আর এরূপ খেলিতে আসিব না, তখন মহামহিমান্বিত অপার দয়ার সিন্ধু অন্তর্যামী মহারাজ আমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ফিরিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ শ্যামাপদ, এক ব্রহ্ম সত্য এবং এ জগৎ মিথ্যা।" এ সকল কথা সদ্‌গ্রন্থে অনেকবার পাঠ করিয়াছি এবং বহুবার লোকমুখেও শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঐ সকল বাণী যেন মনে অমৃত ঢালিয়া দিতে লাগিল। সাপুড়ে যেমন মন্ত্রের দ্বারা সাপকে অভিভূত করিয়া নিশ্চল করিয়া দেয়, মহারাজ আমার মনোভাব সেইরূপ একেবারে বদলাইয়া দিয়া আমাকে একেবারে বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান করিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ জন্মিল। সেই দিন হইতে মহারাজকে দিনান্তে একবারও না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না এবং অপর সকল (ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ) সাধুবৃন্দের প্রতি যতটা আকর্ষণ ছিল, সবগুলি একত্র করিয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষণটি অনেক প্রবল বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম এবং সেই দিন হইতে মনে হইত, মহারাজ যেন তাঁহার বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্ঘ ও সাঙ্গোপাঙ্গদের তাঁহার সেই পক্ষদ্বয়ের নিচে আশ্রয় দিয়া সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন! তাহার পর হইতে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মহারাজকে ক্রমশ আরও বড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজের স্মৃতিকথা

অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৯২৫ খ্রিঃ একদিন শরৎ মহারাজকে উদ্বোধন মঠ—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে দর্শন করিতে যাই। রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের আরতি সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। শরৎ মহারাজ নিচের ঘরে উপবিষ্ট আছেন। দুই-তিনটি যুবক ভক্ত উপস্থিত, ইহারা সকলেই বিজ্ঞানের গবেষক। ইহাদের একজন প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ঈশ্বর আছেন কি?"

শরৎ মহারাজ—হাঁ।

অপর যুবক—প্রমাণ কি?

শরৎ মহারাজ—ঋষিবাক্য। তাঁহারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করে বলেছেন—ঈশ্বর আছেন।

ভক্ত যুবকটি—তাঁদের ভুলও তো হতে পারে।

শরৎ মহারাজ—সকল ঋষিরই ভুল হলো?

ভক্ত—আমি নিজে প্রত্যক্ষ না করে বিশ্বাস করি না।

শরৎ মহারাজ—তা উত্তম কথা। তবে তুমি সবই যে প্রত্যক্ষ করে বুঝে নেবে, তা সম্ভব কি? ধর তুমি বিলাত যাও নাই, বিলাত প্রত্যক্ষ কর নাই। যাঁরা গেছেন, তাঁদের কথাই তোমাকে জানতে হবে, কারণ বিলাত যে আছে, তোমার অস্বীকার করবার উপায় নাই। তেমনি ভগবান যে আছেন, তা যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁদের আপ্ত বাক্য বিশ্বাস করে নিতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশ্বর দর্শন করেই তো সকলকে বললেন—"আমি দেখেছি, তোদেরও সাধন-ভজন এবং ব্যাকুলতা থাকলে দর্শন হবে।"

ভক্ত—হাঁ, মহারাজ, এবার আপনার কথা মেনে নিলুম।

শরৎ মহারাজ—দেখ, তোমাদের এইরূপ অবিশ্বাস আসবে বলেই তো এই

বিজ্ঞানের যুগে ঠাকুর এলেন এবং হাতেনাতে তপস্যা করে মাকে প্রত্যক্ষ করে তবে বললেন, "ঈশ্বর আছেন, তোরা সাধন ও ব্যাকুলতা দ্বারা তাঁকে লাভ কর।" এমনকি, তিনি ভবতারিণীর নাকের কাছে তুলো নিয়ে দেখলেন যে, মায়ের নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। যখন দেখলেন তুলো শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল, তখন বিশ্বাস করলেন—হাঁ, মা সত্যই জাগ্রতা, চিদানন্দময়ী। লোক-কল্যাণের জন্যই তাঁর এই আবির্ভাব। এবার মা ঠাকুরকে নিয়ে এলেন এই প্রত্যক্ষ সত্য জগৎকে দেখাতে। বাবা, তোমাদের আর কি বলবো? এটা কৃপার যুগ, তোমাদের একটু ভক্তি বিশ্বাস থাকলেই উদ্ধার হয়ে যাবে। তোমাদের কি মনে নাই, তিনি নিজেই বলেছেন—"আমি তোদের জন্য সাধন-ভজন করে গেলুম, তোরা এবার বাড়া ভাত বসে খা।"

ভক্ত—আশীর্বাদ করুন, মহারাজ, যেন আমাদের ভক্তি বিশ্বাস ঠিক ঠিক হয়।

শরৎ মহারাজ—হাঁ, ঠাকুরের কৃপায়, তোমাদের জ্ঞান-ভক্তি হউক। এবার তোমরা এস, রাত্রি হলো। প্রসাদ নিয়ে যেও।

"ভগবান আছেন কিনা?"—আমাদের জীবনের এই কঠিন সমস্যার সমাধান হইল আজ মহারাজের বাণীতে। ইহাতে মনে হইল, তিনি 'দ্রষ্টা'—ভগবানকে দেখিয়াছেন বলিয়াই এত সরল সহজ কথায় সামান্য উপমা দ্বারা এই গভীর রহস্য আমাদের বুঝাইয়া দিলেন। নিজে দর্শন না করিলে এইরূপ কথা বলা সম্ভব নয়। হৃদয়ে গভীর আনন্দ লইয়া প্রণামান্তে সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরবর্তী দর্শন বেলুড় মঠে। শরৎ মহারাজের শুভ জন্মতিথি—১৯২৭ খ্রিঃ জানুয়ারি। মহারাজ মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। ভক্তগণ একটু সমারোহের সহিত এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। মহারাজ পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া আছেন। একে একে ভক্তেরা শ্রীচরণে ফুলদল দিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। একটি ভক্ত মহারাজের গলায় বড় সাদা ফুলের গোড়ে মালা পরিয়ে দিলেন। মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি হলুম মায়ের বাড়ির দারোয়ান।

তোমরা আমাকে মালা পরাচ্ছ? দারোয়ানের অমন সাজ কেন?" উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

প্রসাদের আয়োজন হইতে লাগিল। বহু ভক্ত মঠের প্রশস্ত আঙিনায় বসিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। মহারাজ দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "এমন না হলে কি ভাল লাগে? মায়ের বাড়িতে জায়গা একটুখানি, ভক্তদের প্রসাদ পেতে কত কষ্ট হয়! এবার এখানে বেশ হলো।" এই জন্মতিথি-উৎসবই তাঁহার জীবদ্দশায় শেষ উৎসব। কারণ ১৯২৭ খ্রিঃ ১৯ আগস্ট, ১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ২-৩০ মিঃ সময় তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন।

শরৎ মহারাজের সঙ্গলাভের বহু সুযোগ পাইয়াছি। তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন, মাঝে মাঝে দু-একটি কথা বলিতেন। বাচনিক উপদেশ তিনি কমই দিতেন, কিন্তু তাঁহার নিকট মৌন অবস্থানও সহস্র উপদেশের কাজ করিত, অব্যক্ত আনন্দে ভরপুর হইত, প্রাণে অগাধ শান্তি আসিত। বহু ভক্তের জীবনেই ইহা পরীক্ষিত সত্য।

মাতৃস্বরূপ স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশচন্দ্র ঘটক

একদিন বেলুড় মঠে গিয়াছি। শুনিলাম শরৎ মহারাজ মঠে আসিতেছেন। খুব আনন্দ হইল—তাঁহার দর্শন পাইব।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজ মঠে রহিয়াছেন, শরৎ মহারাজ মঠে পৌঁছিলেন। দুই গুরুভ্রাতা বহুক্ষণ উপরের তলায় পরস্পর আলাপে নিবিষ্ট রহিলেন। পরে শরৎ মহারাজ নিচে নামিয়া মঠের পশ্চিমের বারান্দায় পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়াছেন—সম্মুখে লম্বা টেবিল। সাধু, ভক্ত ও ব্রহ্মচারিগণ শরৎ মহারাজের সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে মণ্ডলী করিয়া দণ্ডায়মান। "জুড়াইতে চাই, কোথা জুড়াই—শ্রীশ্রীমা যদি আজ দেহে থাকিতেন, ব্যস একবার দেখা হইলেই মনের সব অশান্তি, হাহাকার দূরীভূত হইত"—শরৎ মহারাজের সম্মুখে এবং দণ্ডায়মান সাধুভক্তগণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছি। তখন একজন সাধু আমায় ধাক্কা দিয়া বলিলেন, ও মশাই, শরৎ মহারাজ ডাকছেন। আমিও চাহিয়া দেখি, হাতছানি দিয়া মহারাজ আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে ইশারা করিতেছেন। নিকটস্থ হওয়া মাত্র আমাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া স্বীয় অঙ্কে উপবেশন করাইলেন। আমার দেহের ভার মহারাজের পীড়াদায়ক হইবে মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছিলাম, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবশ হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। হৃদয়াবেগে এবং চক্ষুর জলে আপ্লুত। শত চেষ্টা করিয়াও ভাব বা হৃদয়াবেগ চাপিতে না পারিয়া বিহ্বল। তদুপরি টেবিলের উপরস্থিত পূজনীয় অভেদানন্দ মহারাজের আনীত নানা ভাব প্রকাশক ছবির একখানা বই টানিয়া আমাকে এবং সমুপস্থিত

ব্রহ্মচারী ও বালক এবং ভক্তদিগকে কোন্ ছবির কি অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিজ অবস্থা যথাসাধ্য চাপিবার এবং লোকচক্ষু এড়াইবার জন্য যাহা মনে আসিতেছিল ছবির অর্থ তাহাই বলিতেছিলাম—আর সমবেত জনমণ্ডলী হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনি হইতেছিল। এইভাবে প্রায় ২০।২৫ মিনিট আমাকে উপবিষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। আজ অন্তর্যামী হইয়া যেন শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের অভাব পূর্ণ করিয়া দিলেন!

একদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন।" তিনি বলিলেন, "মায়ের এত আশীর্বাদ পেয়েছ, আবার কি আশীর্বাদ? তোমরা তাঁর প্রেমে ভেসে যাবে।" এই 'ভেসে যাবে' 'ভেসে যাবে' বলিতে বলিতে তিনি মহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। এই গম্ভীর পুরুষকে পূর্বে কখনো এইরূপ ভাবোদ্বেল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সেদিন দেখিলাম যেন 'ভেসে যাবে' বলিতে বলিতে গঙ্গার শতধারার ন্যায় তিনি নিজেই নানারূপ আঙ্গিক বিকার-সহ ভাসিয়া চলিলেন! কতক্ষণ পর আবার স্থির-গম্ভীর!

কথিত আছে, ভবনাথকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন—শনি-মঙ্গলবারে কিছু খাবার নিয়ে আসিস, তোর অবিদ্যা খেয়ে ফেলব। কিন্তু ভবনাথ যখন খাবার নিয়া ঠাকুরের নিকট গেলেন তখন ঠাকুর তাহা খাইতে পারেন নাই। খাওয়ার চেষ্টা করিয়াও খাইতে না পারায় সজল নয়নে বলিয়াছিলেন—মা খেতে দিলে না। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সত্যসন্ধ ঠাকুরের পক্ষে এই সত্য রক্ষা করতে না পারাটা বিসদৃশ নয় কি? শরৎ মহারাজ উত্তরে বলিয়াছিলেন, করুণাবিগলিত হৃদয় ঠাকুর ভবনাথের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে যা করবো বলেছিলেন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত তিনি তা করলেন না। নিজের আইন নিজেই ভাঙলেন না। নরদেবলীলা—এমনিই!

সবেমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। আমার নিকট নিতান্ত আহ্লাদ-সহকারে শরৎ মহারাজ বলিলেন, "লীলাপ্রসঙ্গ বের হয়েছে—এইবার কিনে নাও, পড়।" ইহা পাঠে জীবের অশেষ কল্যাণ, তাই লোকে পড়ুক এই আগ্রহ। লেখক-অভিমান বিন্দুমাত্র তথায়

নাই। খাঁটি যন্ত্র। বিন্দুমাত্র লেখক-অভিমান থাকিলে লোকে স্বরচিত বিষয় লইয়া এত আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না।

উদ্বোধনে একদিন শরৎ মহারাজের ঘরে বসিয়া আছি। খ্যাতনামা ২।১ জন লোকও উপস্থিত। তখন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা না হইলেও কোন ব্যাপার নিয়া মতান্তর এবং মনান্তর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছিল। একজন প্রশ্ন করিল—"মহাশয়, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা মিটিবে না কি? এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুরের দিকে চাহিলেই সমস্যার সমাধান দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বিবাদভঞ্জন; ধর্মবিবাদ এবং গোঁড়ামি অদূর ভবিষ্যতে লোপ হইবে। প্রত্যেক ধর্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যের উপর পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম বেদান্তরূপ সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষরূপে পরিগণিত হইবে।" একজন বলিলেন, "মুসলমান ধর্মও?" তিনি বেশ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, মুসলমান ধর্মও।"

স্বামী সারদানন্দ স্মৃতি

সুশীলাবালা ঘোষ

দেখিতে দেখিতে কত বৎসর অতীত হইয়া গেল—সে মহাপুরুষ আর ইহ জগতে নাই। ইতোমধ্যে কতজন কতভাবে তাঁহার পুণ্য জীবনের কত কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। 'উদ্বোধন' ও অন্যান্য মাসিক পত্র এবং বহু পুস্তকের মধ্য দিয়া আজ তাঁহার জীবন-কথা জনসমাজের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

জীবনের সন্ধ্যায় আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অতীতের দিকে যখন চাহিয়া দেখি শত দুঃখ ও সঙ্ঘাতের সমষ্টি আমার এই জীবনের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই না তখন মনে ভাসিয়া আসে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া আসে স্বামী সারদানন্দের পূত সাহচর্যে যেসব মধুময় মুহূর্তগুলি অতিবাহিত করিবার সুদুর্লভ সুযোগ আমার ব্যথিত জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদেরই আনন্দময় পুণ্যস্মৃতি। এই স্মৃতি একান্তই আমার নিজের অন্তরের সংগোপন ইতিহাস—বাহিরের উত্তপ্ত দিবালোক ইহা সহ্য করিতে পারিবে না।

'উদ্বোধনে' তাঁহার সেই দোতলার ঘরে আসনবদ্ধ হইয়া নিজের খাটটির উপর তিনি বসিয়া আছেন, প্রসন্ন হাস্যে সমস্ত মুখখানা ভরিয়া আছে, আর আমরা কখনো ৭।৮ জন কখনো ১০।১২ জন নিচে বসিয়া কত সুখদুঃখের কাহিনী অনর্গল তাঁহার কাছে কহিয়া যাইতেছি; তিনি কখনো বা দুটি একটি কথা বলিয়া সে সবের সহিত সায় দিতেছেন, কখনো বা কেবল মাত্র সামান্য ইঙ্গিতে অন্তরের গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কতদিন তো হইয়া গেল—কিন্তু তবু সে দৃশ্য যেন এখনো বাস্তব হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে—চোখ বুজিলেই যেন দেখিতে পাই। কোন্ সাল বা কোন্ মাস—তাহার কোনটাই আজ আর সঠিক স্মরণ হয় না, তবে এটা ঠিক মনে আছে যে সেটা শীতের প্রথমাবস্থা। সেই সময় পূজনীয় শরৎ মহারাজকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার

প্রথম হইয়াছিল। কী যে উপলক্ষ সেদিন ছিল তাহাও আজ মনে পড়ে না, কিন্তু যা হোক একটা উপলক্ষেই সেদিন শরৎ মহারাজ আমার পিতৃগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্বদিনই শুনিয়াছিলাম বটে যে তিনি আসিবেন কিন্তু অতবড় সাধু, শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিত ভক্ত, লীলাপ্রসঙ্গ রচয়িতা—তাঁহার সম্মুখে একান্ত অপরিচিতা আমি কীভাবে যাইব? এইসব ভাবিয়া নিতান্ত সঙ্কোচবশে তাঁহার সম্মুখীন হইতে ভয় হইতে লাগিল। তিনি আসিলেন, বিশ্রামাদি করিয়া আহার করিলেন এবং তারপর একখানা চেয়ারে বসিয়া আরাম করিতে লাগিলেন। আমি দূর হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার বিরাট বপুটি দু-একবার দেখিয়াও গেলাম, কিন্তু বহু বিরুদ্ধ-সংস্কারগ্রস্ত ভীত মন সে নরদেবতার নিকটস্থ হইবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। অবশেষে তাঁহার চলিয়া যাইবার সময় হইয়া আসিল দেখিয়া মা বারংবার তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং আমিও তখন কোন প্রকারে যাইয়া তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া জীবনে প্রথমবার সে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মা আমার পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন—"ও বড় দুঃখী, তাই শ্রীশ্রীমা কৃপা করে ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।" যতদূর মনে আছে—এ কথায় শরৎ মহারাজ যেন প্রীত হইয়াছিলেন কিন্তু আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমিও লজ্জাবশে সেদিন কিছু বলিতে পারি নাই কিন্তু তাঁহার নিকটে বসিয়া প্রাণে যেন একটা নির্ভয়ের ভাব বেশ বোধ করিয়াছিলাম। তারপর তিনি 'উদ্বোধনে' চলিয়া গেলেন, মা-ও তৎপর তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা সেদিন বলিলেন। শুনিয়া মনের সঙ্কোচ যেন অনেক পরিমাণে হাল্কা হইয়া গেল। ইহার পর 'উদ্বোধন' অফিসে শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শনার্থ যখন যাইতাম, তখন দূর হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতাম। ক্বচিৎ কখনো সম্মুখে পড়িলে প্রণাম করিতাম—অথবা নিকটে যাইয়াও কোন কোন সময় প্রণাম করিয়া আসিতাম। কথা বড় বিশেষ কিছু হইত না। সর্বদা সেই একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"কেমন আছ? শরীর ভাল তো?"

ইহার পর আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল—আর একদিন বিশেষভাবে

তাঁহার দর্শন পাইলাম। আমার শ্বশুর গৃহে সেদিন বড় দুর্দিন। সে দুর্দিনে তাঁহাকে খুব নিকট হইতে সমস্ত অন্তরটি দিয়া দেখিলাম, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় লজ্জা সঙ্কোচও চিরদিনের মতো যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঘটনাটি এই, আমার এক উপযুক্ত দেবর হঠাৎ কয়েক দিনের অসুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শাশুড়ির সেই দ্বিতীয় পুত্রশোক। শোকে তিনি এককালে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, আহার জল ত্যাগ করিয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এমনি সময়ে আমাদের এক দূর আত্মীয় শরৎ মহারাজকে আমার শ্বশুরগৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতলে শাশুড়ির গৃহে যাইয়া বসিলেন।

আমি সে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একখানা ছোট তক্তপোষের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া শরৎ মহারাজ গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া সদ্য পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন। গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি একটা গম্ভীর ও প্রশান্তভাবের আবেশে এককালে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। শরৎ মহারাজের সমস্ত মুখে একটা অব্যক্ত ব্যথা ও করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধার ক্ষীণ দেহটির দিকে অপলক নেত্রে তিনি চাহিয়া আছেন, আর মনে হইতেছে যেন তাঁহার প্রত্যেকটি অঙ্গ হইতে শোকের ছাপগুলি অতি যত্নে মুছিয়া লইতেছেন। দুই-চারিটি কথাই সেই দিনও কহিলেন, বেশি কথা কোনদিনই কহিতেন না, সেদিনও কহিতে শুনিলাম না। আমার শাশুড়ির কী একটা প্রশ্নের উত্তরে একবার সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন—"মৃত্যুর পর মানুষ যে কোথায় যায় তা তো জানিনে মা। তবে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, যে যায় সে চিরদিনের মতই যায়—আর আসে না। কোন অবস্থায়ই কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে না।" আর একবার কহিলেন, "মৃত্যুর শোক মনুষ্যজীবনে অবশ্যম্ভাবী, এর হাত থেকে সংসারে কাহারও কি নিস্তার আছে?" ইহার পর আরও সামান্য দুই চারিটি কথা কহিয়া মহারাজ বিদায় লইলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম যে বৃদ্ধা জননী এবং বাটিস্থ সকলের অর্ধেক শোকজ্বালা যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অপসৃত হইয়াছে। সেদিন দুঃখশোকের ঘনান্ধকার মধ্যে শরৎ মহারাজের যে রূপটি দেখিয়াছিলাম

তাহা হইতে তদীয় অন্তঃকরণের অনুপম মাতৃভাবের কতকটা যেন আভাস পাইয়াছিলাম। তাঁহার গাম্ভীর্যের ও স্বল্পভাষণের অন্তরালে কী একটা বিরাট সহানুভূতিপূর্ণ দরদি প্রাণ যে লুকাইয়া ছিল তাহাও যেন অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

তারপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দেহ গেল। আমাদের সকল আশাভরসা এককালে নিবিয়া গেল। বহুদিন আর 'উদ্বোধনে' যাই নাই। যাইবার কথা মনে হইলেই কল্পনার চক্ষুতে মায়ের শূন্য ঘরটার ছবিখানি ভাসিয়া আসিত। মনটা হা-হা করিয়া উঠিত। তবু শেষে একদিন 'উদ্বোধনে' গেলাম—শরৎ মহারাজকে দর্শন করিতে। যাইয়া দেখিলাম, মহারাজ তাঁহার নিচেকার ঘরটি ছাড়িয়া দ্বিতলে মায়ের ঘরের পার্শ্বের ঘরটিতে একখানা খাটে বসিয়া আছেন, আর অনেকগুলি সধবা-বিধবা মেয়ে নিচে মেঝেতে বসিয়া নিজেদের সব কথা তাঁহার কাছে নিবেদন করিতেছে। আমিও যাইয়া প্রণাম করিয়া সেইখানেই বসিলাম। অনেকক্ষণ থাকিলাম, অনেক কথা শুনিলাম—মায়ের অভাব যেন আর বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত প্রাণটা শরৎ মহারাজ আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার নিকট যাওয়া আসা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। ঘনিষ্ঠতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হইতে লাগিল। সময়ে অসময়ে সকালে বিকালে—কত সময়ই না তাঁহার নিকট যাইতাম। আজ মনে পড়ে, প্রত্যেক একাদশীর দিনে তাঁহার অভাগিনী বিধবা মেয়েগুলির জন্য ঠাকুর ও মাকে লুচি সন্দেশ নিবেদন করিয়া দিয়া কেমন করিয়া তিনি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন; কেমন করিয়া অম্বুবাচীর তিন চার দিন প্রচুর ফল, মিষ্টি প্রভৃতি দিয়া আমাদের প্রত্যেককে তিনি পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। কত দরিদ্র, অনাথা মেয়েই তো তাঁহার ছিল! এইসব ব্রত নিয়মের দিনে কে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিত? ধনী গৃহের অনেক মেয়েও এইসব দিনে নির্জল উপবাস পালন করিতে চেষ্টা করিত। শরৎ মহারাজ সেসব উপবাসক্লিষ্ট করুণ মুখগুলি যেন দেখিতে পারিতেন না। তাই এইসব আহারের ব্যবস্থাদি না করিয়া তাঁহার স্থির থাকিবার উপায় ছিল না।

হৃদয়ে বড় দুঃখের আঘাত লইয়া যদি কখনো তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম—মহারাজ স্থির হইয়া বসিয়া সব শুনিতেন। তারপর হয়ত শুধু একটি 'আহা' মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু কি অমোঘ শক্তি লইয়া সে শব্দটি যে বাহির হইত এবং কী অমৃত প্রলেপেই যে তাহা হৃদয়ের ক্ষতটি ভরিয়া দিত তাহা বলিয়া বুঝান সুকঠিন। শ্রীশ্রীমা ছাড়া অমন অমৃত প্রলেপ আর কেহ দিতে পারিত না।

পূজনীয়া যোগীন-মার অসুখের কালে তাঁহার সামান্য সামান্য সেবার কাজ করিবার সৌভাগ্য আমারও দুই একবার হইয়াছিল। সেই সময়ে মহারাজের সেবাকুশলতা এবং প্রসন্নধৈর্যের কত নিদর্শনই না দেখিয়াছি। যোগীন-মা নিতান্ত অসহায় ছোট মেয়েটির মতো তাঁহার নিকট কত আবদার, কত অনুরোধ করিতেন, আর শরৎ মহারাজ কী গম্ভীর স্নেহে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধায়ই না সেসব আবদার অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন!

তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর 'উদ্বোধনের' অতি নিকটবর্তী এক আত্মীয়-গৃহে আমি থাকিতাম। তাই ঐ কালে সময়ে-অসময়ে, নানাভাবে, নানা অবস্থার মধ্যে শরৎ মহারাজকে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্বেই তো বলিয়াছি যে সাধন-ভজন হীন মন আমার তদীয় মহৎ চরিত্রের এতটুকু গভীরতাও তখন উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সংসারের বাহ্য চাকচিক্যে ঝলসিত চক্ষু তাঁহার বিরাট বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের মণিকোঠার গুপ্তদ্বারটি কোনদিনই উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। আজ যখন তিনি রক্তমাংসের দৃষ্টির চির অগোচরে, এখন কালের অন্তরাল ছিন্ন করিয়া অসম্বদ্ধভাবে তাঁহার কত কথাই না মনে ভাসিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন জনের মুখে তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিয়া, বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার কাহিনী পড়িয়া সহসা এক এক সময় যেন চমকিয়া উঠি। এই তো সেদিন তাঁহারই শ্রীচরণাশ্রিত জনৈকের মুখে শুনিলাম—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ যে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনেরই ইতিহাস তাহা নহে—উহার প্রত্যেকটি পত্রে স্বামী সারদানন্দের জীবনের একটা সুস্পষ্ট ছবিও অলক্ষ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাসমুদ্রের গভীরতম গুপ্তপ্রদেশ হইতে অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিবার আশায় সিদ্ধসাধক স্বামী সারদানন্দ অকুতোভয়ে ডুব দিয়াছেন—ডুব দিয়া যত দূর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছেন তাহারই আংশিক ইতিবৃত্ত পুস্তিকাকারে গ্রথিত হইয়া লীলাপ্রসঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং একদিকে ইহা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারার সহিত জগৎকে পরিচিত করাইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আবার আধ্যাত্মিক রাজ্যের 'ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম' পথে গ্রন্থকার স্বয়ং কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছে।" তাঁহারই মুখে আরও শুনিলাম—"ঠাকুরের জ্ঞান, মায়ের প্রাণ ও স্বামীজীর কর্মশক্তি—এই ত্রিধারার সঙ্গমস্থলে স্বামী সারদানন্দ দণ্ডায়মান। অমৃতবাহী সে ত্রিস্রোত স্বামী সারদানন্দের জীবন খাতে কী লীলায়িত ছন্দেই না বহিয়া যাইতেছে! যেমনি গভীর তেমনি বিপুল সে প্রবাহ। অমন উদার অন্তর সুদুর্লভ।" শুনিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলাম, তাইতো এ সুদুর্লভ রত্ন তো একান্তভাবে আমাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। কিন্তু চিনিতে পারিলাম না কেন? হায়! কেমন করিয়া তাঁহাকে চিনিব? সে সংস্কার, সে মন লইয়া তো জন্মি নাই।

কে যেন দৃঢ়স্বরে অভয় দিয়া অন্তরের মাঝখানটিতে মুখ রাখিয়া বলে "মাভৈঃ, সংসারে বিড়ম্বিত হইয়াছ বলিয়া এ জগতেও যে বিড়ম্বিত হইবে এমন কথা কে তোমাকে বলিয়া দিল? স্থির জানিও যে তাঁহার দৈব-স্নেহ সর্বাংশে অমোঘ, বিশ্বাস করিও যে তাঁহার আশীর্বচন সর্বাবস্থায় অব্যর্থ। কোন অবস্থাতেই তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। নিঃসংশয়ে জানিয়া রাখিও যে তোমার জীবন ব্যর্থ হইবে না, জীবনেই হউক আর মরণেই হউক মহামায়ার অভয় আশ্রয় তুমি লাভ করিবে। তাঁহার শীতল ক্রোড় হইতে তোমাকে বিচ্যুত করিতে পারে এমন শক্তি ত্রিসংসারে নাই।"

ব্রহ্মলীন স্বামী সারদানন্দ

তামসরঞ্জন রায়

সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই জীবজগতের জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকা এক অদৃশ্য মহাশক্তির হস্তে নিয়ন্ত্রিত। আজিকার মানুষ—দুই দিন পরে কোথায় চলিয়া যায়—কেহই তাহার সন্ধান রাখে না। কালের কঠোর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুক হইতে তাহার স্মৃতিচিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। সমাজের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস, দেশের ইতিহাস তাহাদের কোনই হিসাব রাখে না; নূতনের মহাপ্লাবনে অতীতের শতবিস্মৃত কাহিনীর মধ্যে সে চিরতরে ডুবিয়া যায়। পরিদৃশ্যমান বস্তু জগতের ইহাই সনাতন ইতিহাস। যুগে যুগে আবার দুই-চারিজন মানুষ এমনও দেখা যায় যাঁহাদের প্রত্যেক কাজ কালের কুলিশবুকে কঠিন রেখাপাত করিয়া যায়, যাঁহাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অনুষ্ঠান ভবিষ্যযুগের নরনারীর সম্মুখে আশার আলোকবর্তিকা প্রদীপ্ত করিয়া রাখে, যাঁহাদের আদর্শ চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া যুগে যুগে মানুষ নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা নিয়মিত করে এবং যাঁহাদের পুণ্যকাহিনী পঠন-পাঠনে মানুষ পবিত্র ও ধন্য হইয়া থাকে। ইতিহাস ইঁহাদেরই অমর কাহিনী বুকে করিয়া জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ রাখে, সন্দেহ ও সংশয়ের যুগে মানুষের দ্বারে দ্বারে আশা ও উৎসাহের দিব্য বাণী বহিয়া আনে। যে মহাশক্তির প্রভাবে মানুষ এইরূপে অমর ও লোকপূজ্য হইয়া যায় তাহা শ্রীভগবানেরই বিশেষ দান এবং স্থান ও প্রয়োজন বিশেষেই তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। পুণ্যশ্লোক শরৎ মহারাজ ইহারই জ্বলন্ত উদাহরণ। শাস্ত্র যাঁহাদিগকে আধিকারিক-পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্যই লোকশরীরে আবির্ভূত হন—'শক্তিমন্ত্রের সিদ্ধসাধক' শরৎ মহারাজ তাঁহাদেরই অন্যতম। যুগে যুগে যাঁহারা বিশ্বের স্বার্থ পূতিগন্ধময় ভোগৈক সর্বস্ব জীবনধারাকে

নিয়মিত করিয়া মহিমোজ্জ্বল ত্যাগের পথে টানিয়া আনিয়াছেন—বৈদিক ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধশ্রমণ ভিক্ষু, শঙ্করানুবর্তী সন্ন্যাসিকুল, জৈন তীর্থঙ্কর ও বৈষ্ণব প্রভুপাদগণ পর্যন্ত যাঁহারা নিজেদের জীবনে যথার্থ ত্যাগ, নিষ্ঠা, পবিত্রতা, সংযম, প্রেম ও ভক্তির অমৃত আদর্শ ফুটাইয়া রাখিয়া ভারতের সমাজ, ভারতের জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং বর্তমান যুগে শ্রীভগবানের লীলাসহায়করূপে যে কয়জন মহাপুরুষ ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনপ্রবাহকে ত্যাগের আদর্শ পথে চালিত করিতে প্রথম উদ্যম করিয়াছেন, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ আপ্তকাম ঋষি 'শরৎ মহারাজ' তাঁহাদেরই অন্যতম। আজ দীর্ঘ চারি বৎসরকাল হইল এই লোকোত্তর মহাপুরুষ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন এবং এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সংবাদ পত্রিকায় বিভিন্নভাবে তাঁহার পুণ্য জীবনবেদ আলোচিত হইয়াছে। ভক্ত, সাধক, কর্মী, গৃহী, সন্ন্যাসী—যে যে হিসাবে তাঁহাকে যতটুকু জানিত—সেইটুকুই আজ তাঁহাদের নিকট অতি পবিত্র প্রসঙ্গরূপে পরিণত করিয়াছে। আমি জানি তাঁহার পুণ্যচরিতের নিতান্ত আংশিক বর্ণনাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে—তথাপি ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইবার জন্য যেমন সকলেই ব্যাকুল হয়—তেমনি তাঁহার দেবচরিত্র আলোচনা করিয়া নিজে একটু কৃতার্থ ও পবিত্র হইতে আশা করিয়াছি। তাঁহার আশীর্বাদই একমাত্র পাথেয়—অন্য পাথেয়ের প্রয়োজন বোধ করি না।

পৃথিবীর বুকে ফুল যেমন নিভৃত নীরবে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে এবং তাহার পর আপন সৌরভে চারিদিক উৎফুল্ল করে—ধরিত্রীর বুক আলো করিয়া শরৎ মহারাজও তেমনি এক পুণ্যসন্ধ্যায় শিশু শরৎচন্দ্র রূপে আনন্দময়ের শ্রীপদপ্রান্তে শুভ মুহূর্তে জন্মিয়াছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাল্যের দিন ছাড়িয়া কিরূপে তিনি সচ্চিদানন্দ সাগরের শুদ্ধ মুক্তবায়ুতে পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া কিশোর শরৎচন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠেন—কিরূপে তিনি কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রথম সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের অজ্ঞাত। যৌবনের প্রারম্ভে St. Xaviers' College-এর অধ্যয়নশীল ছাত্ররূপেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তখনো ভিতরের জন্মজন্মান্তরের রুদ্ধপ্রবাহ

দুকূল ছাপিয়া তাঁহার দেহমন পাগল করিয়া তুলে নাই—তখনো ভিতরে ভিতরে কেবল নীরব ভাবনাই চলিতেছিল। তারপর একদিন কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে যুগযুগান্তরের প্রবল সংস্কার ও প্রেরণায় সত্য, ধর্ম ও জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার সমগ্র অন্তর আকুল হইয়া ছুটিয়া বাহির হইল। দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারির শ্রীপদপ্রান্তে নিপতিত যুবকভক্ত শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া আমরা ধন্য হইলাম। অলক্ষ্য মহাশক্তির নির্দেশে লোকোত্তর গুরুর সহিত শিষ্যের মিলন পূর্ণ হইল। বস্তুত শরৎ মহারাজের পুণ্যজীবনের অমিয়প্রবাহ এই কালের পর হইতেই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধীরে এবং লীলায়িত গতিতে প্রবাহিত হইয়া কালে পরিপূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বটের বীজ একদিন বৃক্ষের কোটরে পড়িয়া ধীরে ধীরে যেমন বাড়িয়া উঠিতে থাকে এবং কালে মহামহীরুহরূপে পরিণত হইয়া সমগ্র বৃক্ষটিকে এককালে ঢাকিয়া ফেলিয়া শত সহস্র ক্লান্ত নরনারীকে সুশীতল ছায়া দানে তৃপ্ত করে—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহছায়ায় পুণ্যশ্লোক শরৎ মহারাজও তেমনি যুবক শরৎচন্দ্র হইতে ধীরে ধীরে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী সারদানন্দে পরিণত হইয়া কালে শতসহস্র নরনারীর আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর অতি অল্প দিনই শরৎ মহারাজ সংসারে থাকিতে পারিয়াছিলেন। সহসা এক ধূসর সন্ধ্যায় নগ্নপদে একবস্ত্রে শৈশব ও কৈশোরের লীলানিকেতন পৈতৃক বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শরৎ মহারাজ তদানীন্তন বরাহনগর মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। 'জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়' বলিয়া আশ্রমবাসিগণ নবাগতকে সেদিন অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের লীলাসহায়ক, মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত জীবন—শরৎ মহারাজ এইরূপে ইহলৌকিক সমুদয় ভোগবাসনা কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগব্রত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর সন ১৮৮৬ খ্রিঃ হইতে ১৮৯৬ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বৎসর কাল আমরা তাঁহাকে আর লোকালয়ে দেখিতে পাই নাই বলিলেই হয়। বীর সাধক শরৎ মহারাজ তখন বৃন্দাবন, কাশী, হরিদ্বার, কনখল, কেদার-বদরী প্রভৃতি তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজকভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজ জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন! হিমশীর্ষ হিমগিরির ক্রোড়ে কত শীত, কত বর্ষা—দীর্ঘদিন, দীর্ঘবরষ, আশ্রয়হীন,

কপর্দকহীনভাবে শুধু তপস্যা ও ধ্যানজপে কাটিয়া গেল। 'দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' শরৎ মহারাজ এই দীর্ঘ দশ বৎসর পাহাড়ে, পর্বতে—বনে বনে—লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া শ্রীগুরুর আশীর্বাদে ধীরে ধীরে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী সারদানন্দে গড়িয়া উঠিলেন। প্রাচীন ভারতে ঋষি মহাপুরুষগণের পন্থানুসরণ করিয়া অতীতের গৌরব মহিমান্বিত শত শত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের পুণ্যরজঃ তিনি গায়ে মাখিলেন; ভারতের অতীত সভ্যতা ধর্ম, দর্শন, স্থাপত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির অদ্ভুত গভীরতা ও উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া একদিকে যেমন উৎফুল্ল হইলেন, অন্যদিকে আবার বর্তমানে দেশের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞানতা কুসংস্কার প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমময় হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহার এই কালের তীব্র কঠোরতা শত দুঃখের স্মৃতিতে ভরা অদ্ভুত জীবনের বিস্মৃত ইতিহাস জানা অসম্ভব, কারণ ধ্যানগম্ভীর শরৎ মহারাজের নিজের মুখ হইতে কোনদিনই নিজের কথা বাহির হইত না।

এইরূপে দিন কাটিতে কাটিতেও সন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কিন্তু এমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল যেদিন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শরৎ মহারাজকে আমরা ভোগ ও অনাচারের লীলাভূমি পাশ্চাত্য প্রদেশে বীর-বেশে যাত্রা করিতে দেখিতে পাইয়া থাকি। বর্তমান ভারতে 'অভিনব জাতীয় ভাবধারার প্রথম ভগীরথ'—স্বামী বিবেকানন্দের গম্ভীর আহ্বানে স্বামী সারদানন্দ—যথার্থ ধর্ম, পরম জ্ঞান ও মহদুদার আনন্দের বাণী বহন করিয়া এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যাত্রাকালে চির নিরভিমান, 'অহং'লেশ শূন্য শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন—"আর কিছু না পারি স্বামীজীকে তামাক সাজিয়াও তো খাওয়াইতে পারিব।" শুধু দুইটি কথা—কিন্তু এই দুইটি কথার মধ্য দিয়াই যে গুরুভ্রাতার প্রতি কি অনুপম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা কে বুঝিবে? তারপর মাত্র ২ বৎসর কাল সেখানে থাকিয়া নিজ দেবোপম চরিত্র মাধুর্যে জনসাধারণের মধ্যে তিনি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তদ্দেশীয় বহু মনীষী কর্তৃকই বহুবার উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তারপর যখন আবার সন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বেলুড় মঠের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য স্বামীজী তাঁহাকে আমেরিকা হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই কাল হইতে—তাঁহার দেহত্যাগ পর্যন্ত ত্রিশ বৎসর কাল সমভাবে—প্রথমে ১২।১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে এবং পরে মুখার্জি লেনস্থ তখনকার 'উদ্বোধনের' সেই ছোট বাড়িতে নীরবে, নিঃশব্দে, অপূর্ব সহনশীলতার সহিত তিনি একাকী সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন রূপে গড়িয়া উঠিল। ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ইহার কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, শুধু ভারতে কেন, ভারতের বাহিরে সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত ইহার একাধিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল—শরৎ মহারাজের কাজও অসম্ভব রূপেই বাড়িয়া গেল। শুধু ইহাই নহে—দিকে দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতি ব্যাপারে সাময়িক সেবাকার্য, 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকতা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' 'ভারতে শক্তিপূজা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন—স্থানে স্থানে জটিল ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান, প্রতিদিন বহু নর-নারীর জীবনের শত জটিল সমস্যার সমাধান প্রভৃতি সমুদয় কাজই একা নিষ্কাম কর্মী শরৎ মহারাজ অতি সঙ্গোপনে অথচ অদ্ভুত কুশলতার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্মকুশলতা ও অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতা যে কত গভীর ও অলৌকিক ছিল তাহার কথঞ্চিৎ ধারণা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। "সহস্র ফণা বিস্তার করে শরৎ সঙ্ঘকে ধরে রেখেছে", "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষের আশীর্বাদ শরতের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে, আমি আর তাহার কথা কি বলিব!"—শরৎ মহারাজ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও স্বামীজীর পূর্বোক্ত উক্তিসমূহই তাঁহার কথঞ্চিত আভাস মাত্র দিয়া থাকে।

শরৎ মহারাজের অমর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' সাহিত্যের রাজদরবারে মহাকাব্য বলিয়া আদৃত হইবে। জীবনেতিহাসের মধ্যে উহা প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সাধক-মণ্ডলীর নিকট বিশেষ সম্বলরূপেই পরিগৃহীত

হইবে। তৎরচিত 'গীতাতত্ত্ব', 'ভারতে শক্তিপূজা', 'বিবিধপ্রসঙ্গ', 'Stray thoughts on Hinduism'—প্রভৃতি গ্রন্থ একদিকে তাঁহার অতলস্পর্শী আধ্যাত্মিকতা এবং অন্যদিকে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রজ্ঞানেরই পরিচয় প্রদান করে।

পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগের পর হইতেই শরৎ মহারাজ ধীরে ধীরে সমুদয় কর্মবন্ধন হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। অনেক সময় মুখে প্রকাশ করিয়াই বলিতেন—"মা গেলেন, মহারাজ গেলেন, আমি যে আর বিশেষ কিছু করতে পারব তাতো মনে হয় না।" কর্ম সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীনভাব অবলম্বন করায় কেহ যদি প্রশ্ন করিত, তবে বলিতেন—"ঐ বিষয়ে—মন যায় না—তা কি করিব? যদি ঠাকুরের ইচ্ছায় আবার কর্মপ্রবৃত্তি আসে তবে দেখা যাইবে।" জীবনের সন্ধ্যায় আবার অন্তরে বাহিরে যেন পরম প্রেমাস্পদেরই সেই আকুল আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন—"ওরে আয়, চলে আয়।" তাই মায়ের দেহত্যাগের পরই বলিয়াছিলেন—"আমার দারোয়ানি শেষ হলো।"

জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া করুণা ও আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ হইয়াই যেন বিরাজ করিতেন। সর্বদা সমস্তখানি মন প্রাণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যেন উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, কে কোথায় যথার্থ প্রার্থী আছে তাহারই জন্য। জীবনে কেহই তাঁহার নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। বাহিরের গাম্ভীর্য দেখিয়া অনেকেই সরিয়া পড়িত বটে কিন্তু বীরের মতো সেই ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকু কাটাইয়া যে একবার কাছে যাইয়া পড়িতে পারিত সেই একেবারে অমৃতের স্বাদ পাইয়া ধন্য হইত। সে মধুর স্বাদ যে না পাইয়াছে, তাহাকে কথায় বুঝান যাইবে না। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র প্রভৃতির ভালবাসা হইতে শতগুণ নিঃস্বার্থ সে প্রেম শুধু অনুভবেরই জিনিস, প্রকাশের নহে। তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ যাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সেই ধন্য হইয়াছে, যে তাঁহাকে দর্শন মাত্র করিযাছে সেও কৃতার্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কালের কঠিন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মধুচক্র আজ মধুহীন হইয়া পড়িয়াছে। শরৎ মহারাজের স্থূলদেহ আজ আমাদের চক্ষুর বহির্ভূত। তৃষিত তাপিত নরনারী আর সেই আনন্দময় পুরুষের ধ্যানগম্ভীর পবিত্রমূর্তি দেখিতে পাইবে না। আর তাহার শ্রীমুখের অমৃতময় বাণী শুনিয়া ধন্য হইতে পারিবে না। তবে তিনি তাঁহার দেব চরিত্রে যে ভাস্বর আদর্শ ফুটাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন—সর্বতোভাবে আমরা যেন সেই আদর্শেরই অনুগামী হইয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ হই, সংসারের বহু কর্ম কোলাহলে—অন্তর বাহিরের বহুমুখী কামনা-বাসনা যেন পথভ্রষ্ট করিয়া আমাদিগকে বিপথে লইয়া না যায়, আজ তাঁহার শ্রীচরণে সকলের সম্মিলিত হৃদয়ের সেই প্রার্থনাই অকপটে নিবেদন করিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের আর অন্য পথ কি আছে?

স্বামী সারদানন্দ স্মৃতি

গুরুদাস গুপ্ত

(১)

জন্ম—১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী।

পিতা—গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

মাতা—নীলমণি দেবী।

জন্মস্থান—বর্তমান কলকাতায়, হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থল।

বিদ্যালয়—এলবার্ট স্কুল, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ ও মেডিকেল কলেজ।

১৮৮৬ খ্রিঃ কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক।

১৮৮৬—১৮৯৬ পর্যন্ত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ও কঠোর তপস্বী।

১৮৯৬—আমেরিকায় প্রচারক।

দেহত্যাগ—১৮ আগস্ট ১৯২৭

১ ভাদ্র ১৩৩৪ রাত্রি ২½ টা।

১৯২৩ সালের পূজার সময় কাশী যাইব মনে করিয়া কলকাতায় পৌঁছিলাম। জ্যো—আমার সঙ্গে যাইবে ঠিক ছিল কিন্তু তাহার অসুখ হওয়ায় কাশী যাওয়া বন্ধ হইল। কলকাতায় রহিয়া গেলাম।

পূজনীয় হরি মহারাজের সহিত, স্বামী সুবোধানন্দের অনুগ্রহে, পত্রদ্বারা পরিচিত হইয়াছিলাম। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে হরি মহারাজের মহাসমাধি হয়। তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ১৯১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি হয়। বিবেকানন্দ সমিতির একটি অধিবেশন, ঐ তারিখে বেলুড় মঠে হইতেছিল। উক্ত সভায় অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত

হইল। সকলগুলিই বড় নীরস লাগিল। দিনটা বৃথা যাইবে মনে করিতেছি, এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী উঠিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। অবাক কাণ্ড— বিদ্যার আড়ম্বর নাই, ভাষার তেমন লালিত্য নাই অথচ যাহা বলিলেন তাহা মর্মস্পর্শী। ঐ ব্যক্তির চেহারায় তেমন কোন বিশেষত্ব তখন লক্ষ্য করিতে পারি নাই। বিশেষত কয়েকদিন পূর্বে মঠে একটি বাল সন্ন্যাসীর অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী এবং তাঁহার উপনিষদ্-পাঠ মনকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক সন্ন্যাসী প্রবর ২।৪টি কথায় 'বাদত্রয়ের' দার্শনিক বিচার শেষ করিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিয়াছিলাম যে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যস্থানে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও জীব ভিন্নও নহেন, ভিন্নও বটেন। যেমন বৃক্ষ ও শাখা। শাখা বৃক্ষ হইতে ভিন্ন নহে, অথচ শাখাকে বৃক্ষও বলা চলে না। তিনি সংক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, এ সকলের কোন বিশেষত্ব নাই। সকল মতাবলম্বীরাই উপাসনার পক্ষপাতী। বিবাদ ভুলিয়া যাও। ঈশ্বরের সমীপস্থ হও। মা বলিয়া তাঁহাকে ডাক। পিতা বলিলে কাঠিন্য আসিতে পারে। মা বলিলে, একেবারে কোমল হইয়া সঙ্কোচ দ্বিধা সব কাটিয়া যায়। মহা সমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই শিক্ষা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনেক পরে জানিয়াছিলাম উক্ত সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মিশনের হরি মহারাজ বা তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালের কুম্ভমেলা দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ হরিদ্বারে ছিলেন। মনে করিয়াছিলাম তাঁহার দর্শন পাইব। পত্র লিখিয়া জানিলাম তিনি তখন ওখানে থাকিবেন না। তবে আমাকে কুম্ভ দর্শনে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে, দুর্গাপূজার সময় বলরাম মন্দিরে তাঁহার দর্শন পাইলাম। তখন তিনি অসুস্থ। তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় বলিলেন, "যখন মঠে বা কাশীতে যাইব তখন হইবে।"

অতঃপর এক গ্রীষ্মের বন্ধে কাশী যাইবার সুযোগ হইল। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়া তুরীয়ানন্দজীর দর্শন পাইলাম। তিনি নিভৃতে ডাকিয়া কি সাধন করি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন অনেক সময়

প্রাণায়ামাদি করিয়া লোকে পাগল হইয়া যায়। তুমি ব্রহ্মচারী এজন্য সুস্থ থাকিতে পারিয়াছ। মাছ খাইবার উপদেশ দিলেন। তাঁহার সপ্রেম আচরণ অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন বিশিষ্ট সাধন তাঁহার নিকট হইতে চাহিতে ভুলিয়া গেলাম। মনে হয়, তাঁহাকে ধরিলে উপদেশ করিতেন। অল্পদিন থাকিয়া চলিয়া আসিলাম কিন্তু ৫।৬ মাসের ছুটি লইয়া, ৪।৫ মাস পরেই, পুনরায় কাশী গেলাম। এবার অনেক উপদেশ শুনিলাম ও তাঁহার নিকট সমগ্র গীতা অধ্যয়নের সুবিধা হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে দু-মাস পরেই রোগাক্রান্ত হইলাম এবং আমার কাশীস্থ আশ্রয়দাতার মৃত্যু হইল। পূজনীয় হরি মহারাজের দুর্লভ সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত অনেক পত্র ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্তির ইচ্ছা পত্রযোগে জানাইলাম। তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই এবং দিবেনও না জানাইলেন। এবং এমন কিছু লিখিলেন যাহাতে আমি বুঝিলাম, আমার পক্ষে দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইবার আবশ্যকতা নাই। "যেমন চলিতেছ তেমনি চলিতে থাক—কালে ভগবানই সব করিবেন।" আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

পুনরায় এক বৎসর পরে —বাবুর সহিত একত্রে কাশী গিয়া প্রায় দেড় মাস সেবাশ্রমে, হরি মহারাজের ঘরের নিকটেই একটি কোঠায় আশ্রয় লইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজের শরীর বড় কাতর হইয়া পড়িল। গরমও সেবারে অত্যধিক হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে কথাবার্তা শুনিতাম কিন্তু বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না।

পর বৎসর গ্রীষ্মের বন্ধে কাশী যাইব মনে করিয়া বাহির হইলাম। কিন্তু যাওয়া হইল না। সেইবারেই হরি মহারাজ দেহত্যাগ করিলেন। আমি সংবাদ পাইয়া নিজেকে বড়ই হতভাগ্য ও বিপন্ন মনে করিলাম।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মহাসমাধি হইয়া গিয়াছে। মাতাঠাকুরানী চলিয়া গিয়াছেন—হরি মহারাজও চলিয়া গেলেন। পূজা আগত। —বাবু আমাকে বলিল, এখন তো আর হরি মহারাজ নাই, স্বামী সারদানন্দ কলকাতায় আছেন, তিনি মহাপুরুষ। তাঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া ভাল। সে একদিন

মহারাজের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিল। ২।১ দিন পরেই নিভৃতে যাহা করি, তাঁহাকে জানাইলাম। কিছু উপদেশ দিয়া অপর একদিন দেখা করিতে বলিলেন। পুনরায় দিন ফিরাইয়া দিলেন। ইতোমধ্যে একজন সাধু বলিলেন, "আপনি মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা লউন। উপদেশে সাধনের সুবিধা হয় না।" দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা তখন আমার একরূপ ছিল না। আমি হরি মহারাজের কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছিলাম। যাহা হউক, মহারাজকে বলিলাম, "যদি আপনি মনে করেন দীক্ষা গ্রহণ করিলে আমার ভাল হয়, তাহা হইলে আমাকে দীক্ষা দিন।" মহারাজ বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। তোমাকে দীক্ষা দিব।" প্রথম দিন আলাপের পর, অপর একদিন নির্দিষ্ট সময়ে উদ্বোধনের অফিসঘরে বসিয়া আছি, মহারাজ সংবাদ পাইয়া অল্পক্ষণ পরেই (বোধ হয় বেলা ১১টা হইবে) নামিয়া আসিলেন। একখানি বেঞ্চে বসিয়া, আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে আদেশ করায়, ইতস্তত করিয়া বসিয়া, যাহা যাহা করি নিবেদন করিলাম। স্বামীজীর ধ্যান করি বললাম এবং ধ্যান জমিবার প্রাক্কালে শ্বাসকষ্ট হয়, দম বন্ধ হইবার মতো হইয়া যায়—হরি মহারাজকেও বলিয়াছিলাম। মহারাজ বলিলেন, তোমার শরীর তেমন সবল নয়, সেইজন্যই ঐরূপ হয়, উহা থাকিবে না। তারপর ঠাকুরকে ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, ঠাকুরের মধ্যে সর্বভাব বিদ্যমান—স্বামীজীরও তিনি গুরু। আর বলিলেন, সহস্রারে ঠাকুরকে কেন্দ্রে বসাইয়া তাঁহার শিষ্যবর্গকে চারিধারে রাখিয়া ধ্যান করিবে। এর পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। সময়াভাব নিবন্ধন উদ্বোধনে, সিঁড়ির নিচে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "দুর্গাপূজার সময়, তুমি এই কয়েক দিন দুর্গানাম নিষ্ঠা সহকারে জপ করিবে এবং যেমন বুঝ আমাকে বলিবে।" তারপর অন্য একদিন দীক্ষাপ্রার্থী হইলাম। অতঃপর ১৯২৬ সালের ৫ অক্টোবর, ১৮ আশ্বিন তারিখে লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন আমার দীক্ষা হইল। কি করিলাম তখন বুঝিতে পারি নাই। দীক্ষার প্রক্রিয়া ও মন্ত্রগুলি বেশ উদার এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। তাছাড়া ঠাকুরকে অনেক দিন ভাবিয়াছি এবং তাঁহার সন্তানদের মধ্যে একজন আমার গুরু হইলেন এবং প্রার্থিতভাবেই উপদেশ করিলেন দেখিয়া আপসোসের কোন কারণ রহিল না।

(২)

১৯২৩ সনের শেষ ভাগ হইতে ১৯২৭ সনের মাঝামাঝি আমি সকল বন্ধই কলকাতায় কাটাইয়াছি। মধ্যে একবার শরৎ মহারাজের সঙ্গ পাইবার জন্য পুরী গিয়াছিলাম। এই কয়েক বৎসর উহার সঙ্গই বিশেষ শিক্ষার ও আনন্দের কারণ হইয়াছিল। যে বৎসর দীক্ষা পাইলাম, সেইবারকার বড় দিনের বন্ধে একটি উপদেশে বড়ই উপকার হইয়াছে। ইষ্ট ও জীবাত্মা একই জ্যোতির দুই মূর্তি। যে জ্যোতিঃরাশি হইতে ইষ্টের প্রতিমূর্তি কল্পিত হইয়াছে তাহা হইতেই জীবাত্মার মূর্তিও গঠন হয়—অর্থাৎ আমি আমার ইষ্টের উপাদান হইতেই গঠিত। জীবাত্মা ও কুণ্ডলিনী কিভাবে অবস্থিত থাকেন; কি প্রকারে মূলাধারে অবস্থিত শক্তি উত্থিত হইয়া হৃদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মাকে সঙ্গে করিয়া সহস্রারে যান এবং তথায় গেলেই সমাধি হয়—এ সকল কথা পূর্বেও বলিয়াছিলেন, এবারও বলিলেন।

শরৎ মহারাজ বড়ই গম্ভীর প্রকৃতির। বাহির হইতে দেখিলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিবার উপায় নাই। কিন্তু উঁহার হৃদয় স্নেহময়। উঁহার মতো শান্ত প্রকৃতির লোক এ পর্যন্ত দেখি নাই। এইটি ভাল, এইটি মন্দ, এই ভাবের পরিচয় উঁহার মধ্যে কদাচ দেখিয়াছি। ছোট ছোট সাধুদের মেজাজ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন। শরৎ মহারাজের মেজাজ বোধ হয় সর্বদাই এক রকম থাকিত।

১৯২৩ সালের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মার মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। ১ বৈশাখ এখান হইতে বাহির হইয়া রাত্রিতে কলকাতা পৌঁছিলাম, পরদিন সকালে বিষ্ণুপুর রওনা হওয়া গেল। শরৎ মহারাজের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠিয়াছি। গাড়ির মধ্যে মহারাজ আমাদিগকে দেখিয়া কিছু খাইয়া আসিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সঙ্গে খাবার আনা হইয়াছে তাহাও বলিলেন। দীর্ঘ ৮।৯ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল। কত সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি কিন্তু শরৎ মহারাজের নিকট বসিয়া যেমন উপকার পাইয়াছি, অন্যত্র তাহা পাই নাই। যতক্ষণ তাঁহার নিকট থাকা যায় ততক্ষণ জপ চলিতে থাকে। প্রকৃত সাধুর সান্নিধ্য মাত্রই বাঞ্ছনীয়। কথাবার্তার বিশেষ আবশ্যক নাই। জয়রামবাটিতে বহু

লোকের দীক্ষা হইল। শরৎ মহারাজ অকাতরে দীক্ষা দিলেন এবং বলিলেন মায়ের স্থানে কাহাকেও ফিরাইব না। আয়োজনের বহুগুণ বেশি লোক আসিয়াছে দেখিয়া যোগীন-মা একটু চিন্তার ভাব দেখাইলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন—"মায়ের ইচ্ছায় সব হইতেছে।"

যখন বিদায় লইয়া আমি প্রণাম করিতে যাইতেছি, তখন শরৎ মহারাজ বলিলেন, "এস বাবা, এস।" অমন মধুরভাবে উচ্চারিত কথা আর কানে শুনি নাই। হরি মহারাজের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি একবার পাইয়াছিলাম। দুই-ই যেন এক জাতীয় জিনিস। ১৯২৪ সালে বড়দিনের বন্ধে কলকাতায় গিয়াছি। উদ্বোধনের ছোট ঘরটিতে আমরা বসিয়া আছি। স—র মালা জপ করিয়া যখন মহারাজ নিচে আসিলেন তখন তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং স্বর গম্ভীর। বুঝিলাম উঁহাদের জপ ধ্যান কত গভীর। সকলকেই উনি সমান শ্রদ্ধা ও স্নেহ করেন। কোথায় তিনি পুরুষ সিংহ এবং কোথায় একটি ক্ষুদ্র বালক। অথচ কত আগ্রহে তাহাকে উপদেশ করিতেছেন। প্রেম বলিতে কি বুঝায়, শরৎ মহারাজকে দেখিয়া একটু বুঝা যাইত। কয়েক মাস পূর্বে একদিন আমরা ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছি, একটি ভক্ত ডাক্তার মহারাজের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ নির্বাক, নিস্পন্দ, চক্ষুনিমীলিত করিয়া ধ্যানমগ্ন। একই স্থানে নৃত্যময়ী চঞ্চলা প্রকৃতির অভিনয় এবং শান্ত সমাহিত সাধুর পরমাত্মযোগ! বেশ চমৎকার দৃশ্য হইয়াছিল। এই দৃশ্যটির স্মৃতি আমার মনে এক অভূতপূর্ব ভাব জাগাইয়া দেয়।

"Islamic body and Vedantic heart"—এই বাক্যদ্বারা স্বামীজী কি বুঝাইতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করিলাম—উনি বলিলেন body অর্থে শরীর বুঝিতে হইবে। সুদৃঢ় শরীর আমাদের নাই, যেমন বুদ্ধি এবং হৃদয়ের আবশ্যক, তেমনি শরীরও সুস্থ সবল থাকা চাই।

১৯২৪ সনের শ্রাবণ মাসের শেষে কলকাতায় গিয়াছি শরৎ মহারাজ বড়ই যত্ন করিলেন—অপ্রত্যাশিত স্নেহ। সম্প্রতি উহার বেরিবেরি হইয়াছিল। নিচে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার পরই শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায়, বাম

পাখানি লম্বা করিয়া দিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া বলিলেন দেখ না ফুলোটা এখনও কমে নাই। আঙুল বসিয়া যাইতেছে। আমি আঙুল লাগাইয়া দেখিয়া হাত বুলাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য বড়ই কৃতার্থ বোধ করিলাম। তারপর অসুখের কারণ এবং কি করিলে আরাম হইতে পারে এসব কথা কিছু হইল। এমন সস্নেহ কথোপকথন আমার নিকট একটু অস্বাভাবিক। যাহা হউক এইকালে এক ভদ্রলোক মিশনের সম্পর্কিত একটা ব্যাপার শরৎ মহারাজের গোচর করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করিলেন। মহারাজ উহা আমাকে পড়িতে বলিলেন। অতঃপর অপর আর একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলে সস্নেহে আমাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি একটু পাশের ঘরে গিয়া বস।" কথা ও ব্যবহার সব স্নেহমাখা। জয়রামবাটিতে শরৎ মহারাজের স্নেহের পরিচয় পাইয়াছিলাম। 'এস বাবা, এস' এই তিনটি কথা এমনভাবে বলিয়াছিলেন যে আজও তাহা কানে মধু বর্ষণ করিতেছে। এবারকার ব্যবহারও বড়ই মধুর। যেদিন বিদায় লইয়া আসি, সেদিন নিচে নামিতে পারেন নাই। শরীর অসুস্থ ছিল। প্রণাম করিতে যাইব কিনা ইতস্তত করিতেছি। ডাক্তার মহারাজের কথায় সাহস পাইয়া উপরে গেলাম। পূর্বেও দুই একবার ডাক্তার মহারাজ উৎসাহ দিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছেন, তাঁহার উৎসাহ না পাইলে মহারাজের নিকট অনেকবার কথাবার্তার জন্য যাওয়াই হইত না। পূর্বেই বলিয়াছি, মহারাজের মতো গম্ভীর লোক কদাচিৎ দেখা যায়, উপরে গিয়া প্রণাম করিলাম। আহা কি মধুর সম্ভাষণ! "বাবা শরীরটা আজ খারাপ, তাই নিচে যাইতে পারি নাই।" প্রণামান্তর রওয়ানা হইতেছি—মহারাজ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা" যেন আমাকে মা দুর্গার হাতে সঁপিয়া দিয়া সর্ববাধা বিপত্তির মূল নাশ করিয়া দিতেছেন। আহা আর কে এমন করিয়া আমাদের জন্য ভাবিবে। বস্তুত অকৃত্রিম ও নিষ্কাম স্নেহ জীবনে বড়ই কম পাইয়াছি। ভালবাসা ও স্নেহ, গুণ থাকিলে পাওয়া যায়। কিন্তু মহারাজের চক্ষে তো সবই স্পষ্ট। আমার গুণের দৌড় কতটা তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, জানিয়া শুনিয়া অতটা অকৃত্রিম স্নেহ করা পূর্বে কম দেখিয়াছি। মনে আছে হরি মহারাজের প্রেমপূর্ণ চক্ষু। সেও এক অপূর্ব ও উপাদেয় সামগ্রী, মৈথিলী স্বামীর কথা ভুলিতে পারিব না।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলাম, "আমি, স্বামীজী ও হরি মহারাজকে আমার আদর্শ করিয়াছি। স্বামীজী আমার ইষ্ট। মহারাজ, স্বামীজীর স্থলে ঠাকুরকে বসাইলেন। বলিলেন—ঠাকুরের মধ্যে সকলভাব পাইবে। স্বামীজীও ঠাকুরকে আদর্শ করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের পরের দিনেই বলিয়াছিলেন সহস্রারে ঠাকুরকে কেন্দ্রস্থলে বসাইয়া তাঁহার চতুষ্পার্শে অন্যান্য মহারাজদের বসাইয়া ধ্যান চিন্তাদি করিবে। ঠাকুর বালক ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমাকে তোর কি মনে হয়।" যখন বুঝিতেন, বালক ঠাকুরকেই উপাস্য মনে করে তখন সুস্থির হইতেন।

(৩)

বহু প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক লইয়া সংসার করা অসাধারণ শক্তির আবশ্যক। উদ্বোধন এক অদ্ভুত সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল। এক এক জন এক এক রকমের। কাহারও সহিত প্রায় কাহারও মিল নাই, কিন্তু মহারাজকে অবলম্বন করিয়া সংসার সুন্দরভাবে চলিয়া যাইতেছিল। শ্রীশ্রীমা একদা বলিয়াছিলেন, "দেখ না, শরৎ কত ঝঞ্ঝাট পোয়ায়—মুখটি বুজে থাকে। ও সাধু মানুষ, ইচ্ছা করিলেই ভগবানে মন লাগাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে। কেবল লোকের কল্যাণের জন্য এসব লইয়া থাকে।" শান্ত প্রকৃতি ও সর্বদা সমভাব সম্পন্ন থাকা মহারাজের বিশেষত্ব। স্ত্রীলোকের ভিড় মহারাজের ঘরে লাগিয়া যাইত। প্রতিদিন এইরূপ। আমি প্রথম প্রথম খুব সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম। কি প্রকারে ঐরূপভাবে স্ত্রীলোকদের সহিত মেলামেশা করা সম্ভবপর, তাহা আমি তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অথচ উহা মহারাজের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছিল। ডাক্তার মহারাজের নিকট শুনিয়াছি, মহারাজের নিকট মেয়েদের কোনই সঙ্কোচ থাকিত না। উঁহারা সংসারের অশান্তি, কলহ ও অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়ও মহারাজের গোচর করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

ডাক্তার মহারাজ বলিয়াছিলেন, একবার কাশী যাইবার সময় মহারাজ

তাঁহাকে হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিবার জন্য ডাকিলে, তিনি দেখিলেন বহু লোকের গহনা, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি তাঁহার আলমারিতে জমা রহিয়াছে। কোন জিনিস নষ্ট করা তাঁহার ধাতে সহিত না। দীনেশ মহারাজ বলিয়াছিলেন, একবার অসুখের সময় একটা লেবু ঠিকভাবে না কাটায় অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে মহারাজ অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকের সংস্রব না রাখা ভাল। কিন্তু যখন তাহাদের সংস্রবে আসিয়া পড়িতে হইল, তখন অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সেবা, শুশ্রূষাদি ও দেখাশুনা করা চাই। ১৯২৫ সনের মে মাসের শেষভাগে পুরী যাইবার পথে দীনেশ মহারাজ, মহারাজের সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে বড় স্টেশনে গাড়ি থামিলেই তিনি মহারাজের তত্ত্ব-তালাশ করিয়া আসিতেন। কিন্তু সঙ্গের মেয়েদের কোন খোঁজ করিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এবংবিধ ব্যবহারে অর্থাৎ মেয়েদের সহিত না মেলামেশায় মহারাজ খুশি হইবেন। কিন্তু ঘটনা উল্টা হইয়া গেল। মহারাজ খুব বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যখন আমার অতটা যত্ন করিয়া খোঁজ-খবর লইলে, তখন মেয়েদেরও খোঁজ-খবর লওয়া উচিত ছিল। আমার সহিত যখন আসিয়াছ, তখন মেয়েদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখানোটা ভাল হয় নাই।"

২৫।৬।২৫; স্থান—শশী নিকেতন

পুরীধামে থাকিবার কালে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসৎ চিন্তা যায় কি করিলে।" তদুত্তরে মহারাজ ঠাকুরের উক্তি উল্লেখ পূর্বক বলিলেন, "আমারই কি সব গিয়াছে! সব আছে, তবে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। মানুষ তো কাঠ পাথর হইবে না—সব sentimentsই (বৃত্তি) থাকিবে, তবে overpower (অভিভূত) করিতে পারিবে না। ওসব চিন্তা এল গেল—মন দিও না। তাঁর চিন্তাই কর।"

মহারাজের বাহিরটা খুব গম্ভীর, কিন্তু হৃদয় বড়ই কোমল। একটি মেমসাহেব নাকি বলিয়াছিলেন, "Swami, you are our mother."—স্বামীজী আপনাকে আমাদের মা বলে মনে হয়।

পুরী গিয়াছি, মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে কলেজ খুলিবে?" বলিলাম, "সোমবার—আমি শনিবার নাগাদ এখান হইতে রওনা হইব।" "রথ পর্যন্ত থাকিতে পারিবে না?" ইচ্ছা যেন রথ পর্যন্ত থাকি। তারপরই বলিলেন, "যা হোক, দর্শন, স্পর্শন সব হইয়াছে—আসিয়া বেশ ভালই করিয়াছ—একসঙ্গে কিছুদিন থাকা গেল।" কথাগুলি খুব স্নেহপূর্ণ।

গুণ্ডিচা বাড়িতে একবার প্রসাদ পাওয়ার কথা হইতেছিল। আমরা রওনা হইবার পূর্বে একদিন সেখানে সকলের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত হইতে পারে কিনা, দেখিবার জন্য অমূল্য মহারাজকে বলিলেন। শনিবার দিন স্থির হইল। না বলিতেই আমার আন্তরিক ইচ্ছার পূরণ হইল। বস্তুত প্রবল ইচ্ছা হইলেই তাহা পূর্ণ হয়। বিশেষত মহারাজের কাছে। তবে ইচ্ছাটা খুব প্রবল হওয়া চাই। প্রশ্ন জানাইবার আবশ্যকতাও হয় না। কখনো মনেই উত্তর উঠে কিংবা মহারাজ অযাচিত হইয়া উত্তর দেন। পুরী আসিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, আশ্চর্যভাবে উহা পূর্ণ হইল। কোথা হইতে অক্ষয়দাদা জুটিলেন, একেবারে মহারাজের দলভুক্ত হইয়া গেলাম! মহারাজকে বলিলে সম্ভবত ইহাই হইত।

(৪)

এই প্রসঙ্গে সেদিন —বাবু একটি কথা বলিলেন। সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিতেছি না—খুব ইচ্ছা হইতেছে মহারাজ যদি একটু কিছু করিয়া দেন, তবেই বাঁচি, অন্য উপায় দেখি না—কথাগুলি মনেই রহিয়াছে। উদ্বোধনের নিচের ছোট ঘরটিতে লোক পূর্ণ। মহারাজ আপন মনে গল্প বলিতেছেন—"এক ব্যক্তির অতুল ঐশ্বর্য লাভেচ্ছা প্রবল হইয়াছে। এক সাধু বলিয়া দিলেন 'সব ছোড়ে সব পাওয়ে'—ঐ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া যাহা কিছু সম্বন্ধ ছিল নিঃশেষে পরিত্যাগ করিল। আহার নিদ্রার খেয়াল ছাড়িয়া দিল। ফলে অত্যন্ত আমাশা হইল। শৌচে বসিয়া অত্যন্ত ভাবিতে লাগিল, 'শেষে ভগবান দুরারোগ্য আমাশা রোগে কাতর করিলেন;' এমন সময়ে খানিকটা মাটির চাপ ভাঙিয়া গেল এবং লোকটি কয়েক

ঘড়া স্বর্ণ-মুদ্রা দেখিতে পাইল। ধন পাওয়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু আমাশা না হইলে হয় না,'' —বাবু গল্প শুনিয়া অবাক।

পুরীতে প্রথম দর্শনের দিন জগন্নাথজীকে স্পর্শন আলিঙ্গন করিতে পারি নাই—অপরে করিয়াছেন। মহারাজ শুনিয়া অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া বলিলেন, ''আচ্ছা তুমি বৈকালে গিয়া স্পর্শ করিয়া আসিও।'' কথাগুলি স্নেহমাখা। তার পরদিন মহারাজের সহিতই গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল—স্পর্শ আলিঙ্গন সব অপ্রত্যাশিতভাবে হইল। সেদিনটা খুব আনন্দ হইয়াছিল।

পরদিন রথ টানা হইবে। আমরা অনেক পূর্বেই পুঁটিয়ার মন্দিরে গিয়া বসিয়া আছি। মহারাজের বালকের ন্যায় আগ্রহ। ঐ রথ এল এবার চল—অথচ তখনও রথ অনেক দূরে; পা পোড়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া দর্শন করিলেন এবং রথ একটু টানিয়া তবে মন্দিরে ফিরিলেন। ঐরূপে তিনখানা রথই টানিলেন। এইদিন শান্তভাব কাহাকে বলে বেশ বুঝিলাম, সকলেই বলে উহা ঋষিদের ভাব। কিন্তু ঋষিদের ভাব যে কি তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। মহারাজ বলিলেন, ''ভগবানের সহিত সখ্য দাস্যাদি কোনরূপ সম্পর্ক না পাতাইয়া মনঃসংযম পূর্বক তাঁহার স্মরণ মনন—যাহা যাহা মনকে বিষয়াভিমুখী করে—যাহাতে যাহাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়—সেই সকল ব্যাপার হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাতেই মনকে স্থাপনের চেষ্টাকে 'শান্তভাব' কহে। বিষয় কামনাই ভগবান লাভের অন্তরায়, অতএব উহা পরিবর্তনের নিরন্তর চেষ্টাকেই শান্তভাবের সাধনা কহে। শান্ত দাস্যাদির মধ্যে ছোট বড় নির্দেশ করা নিরর্থক। বিভিন্ন প্রকৃতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা। মহারাজের ভাবগুলি যেমন স্পষ্টভাবে বুঝা ছিল, তেমনি উহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিতেন। তাঁহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ—বাণীদোষ ছিল না। ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ অধিকার ছিল, ইদানীং কিন্তু বাংলাই বেশি লিখিতেন। তাঁহার রচিত লীলাপ্রসঙ্গের ভাষা একাধারে গাম্ভীর্য ও সরলতা পূর্ণ। আমরা জগন্নাথ ক্ষেত্রে শশী নিকেতনে অবস্থান করিতেছি। —স্বামী কার্যস্থলে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন অথচ শরীর অসুস্থ—না গেলে কাজের

ক্ষতি হইবে। মহারাজ তাঁহাকে বলিতেছেন, "দেখ এতটা খেটে-খুটে এই জ্ঞানটুকু হইয়াছে যে আমাদের দ্বারা কিছুই হয় না। সকলই ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়, পূর্বে আমারও মনে হইত—আমি না হইলে বুঝি কাজটা পণ্ড হইবে—আমি না থাকিলে এ কাজ আর কে করিবে? এখন দেখিতেছি কাহারও অভাবে কাজ বন্ধ হয় না।"

(৫)

"যখন লীলাপ্রসঙ্গ লেখা হয় তখন কত দিকে গণ্ডগোল ছিল। মা উপরে রহিয়াছেন, ভক্তের ভিড়, হিসাবপত্র রাখা; রাধু রহিয়াছে, বাড়ি তৈয়ারি করায় অনেক টাকা ধার হইয়াছে। নিচে ছোট ঘরটিতে বসিয়া লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেছি। তখন কেহ আমার সহিত কথা কহিতে সাহস পাইত না, সকলেই ভয় করিত। আমার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলিবার সময়ই ছিল না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে 'চটপট সেরে নাও' বলিয়া সংক্ষেপে শেষ করিতাম। লোকে মনে করিত ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী। এই বাড়িতে (শশী নিকেতন, পুরী) বসিয়া লীলাপ্রসঙ্গ লিখিয়াছি, কয়েক খণ্ড। ভক্তদের সম্বন্ধে কোন কথা লেখা হয় নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখিবার অন্ত নাই। মনটা লিখিবার মতো হইলে, হয়ত লেখা যাইত। —স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, (তপস্যা করা চাই নতুবা মনে হইবে, এসব কাজ যা হইতেছে, তার কর্তা আমি।)" মহারাজের লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার ইতিহাস বিচিত্র। মায়াবতী হইতে ঠাকুরের যে জীবনী বাহির হইয়াছে তাহা দ্বারা সাহেবদের বিশেষ সুবিধা হইবে না, যাঁহারা পূর্ব হইতেই ঠাকুরকে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপকৃত হইবেন, এই প্রসঙ্গে উদ্বোধনের ছোট ঘরটিতে বসিয়া কিছু কথাবার্তা হইয়াছিল। মহারাজ বলিতেছেন, "আমার তো ইচ্ছা ছিল একখানা জীবনী ইংরেজিতে লিখি। লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার সময় ২।৩ অধ্যায় লেখাও হইয়াছিল। ঘটনাগুলি ঠিক রাখিয়া এমনভাবে লেখা যায়—যাহাতে সাহেবরা আকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহা পারিলাম কই?"

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিলেন, "যাঁহারা আমেরিকায় আছেন, তাঁহাদের কেহ চেষ্টা করিলে হয়ত হইতে পারে।" মহারাজ—"হাঁ হইতে পারে বটে।"

ধনগোপালবাবুর লিখিত বই-এর কথাপ্রসঙ্গে এইসব কথা হইতেছিল। এই সময়ে ম্যাক্সমূলার লিখিত ঠাকুরের জীবনীর কথা উঠিল। মহারাজ বলিলেন—"ম্যাক্সমূলারের খুব বিস্ময় ছিল যে কেশববাবুর চিন্তার ধারা হঠাৎ আশ্চর্যভাবে বদলাইয়া গেল কি কারণে? তিনি বাইবেলের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচারাদি করিতেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আসিবার হেতুও অনেকটা তাহাই। স্বামীজীই ম্যাক্সমূলারকে বুঝাইলেন ঠাকুরের প্রভাবই সেন মহাশয়ের পরিবর্তনের কারণ। স্বামীজী খুব বলিতেন, 'ম্যাক্সমূলার, সায়ন, স্বয়ং।' নিজের ভাষ্যের পুনঃ প্রচারের জন্য নূতন দেহে তাঁহার আবির্ভাব। সায়নাচার্য, ভাষ্যের মায়া ছাড়াইতে পারেন নাই। ৪৫ বৎসর একটানা পরিশ্রম। ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, উহা আমি লিখিয়া দিয়াছিলাম। ম্যাক্সমূলারের ইচ্ছা হইয়াছিল, ঠাকুরকে জনসমাজে প্রচার করা। স্বামীজী নিজে না লিখিয়া, আমাকে লিখিতে বলিলে, আমি আপত্তি করিলে, বলিয়াছিলেন, 'আমি লিখিলে বুড়ার মাথায় আমার ভাব ঢুকাইয়া দিতে হইবে।' আমি যাহা জানি সব লিখিয়া দিলাম। ভাবিয়াছিলাম, স্বামীজী কাট-ছাট করিয়া দিবেন। কিন্তু তিনি ২।১টি কথার বদল ও ২।১টি জায়গায় ভাষার অত্যুক্তি তুলিয়া দিয়া গোটা লেখাটা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং আমার স্মরণ হয় Max Mullerও কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়াই উহা ছাপাইয়াছিলেন। Max Muller তো ভয়ে ভয়ে ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন।" মহারাজ বলিতেছেন—"উদ্বোধনে ছাপাইবার জন্য ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন নানারূপ প্রবন্ধ আসিত। সবই এত অধিক ভ্রমপূর্ণ যে উহা কাটিয়া-ছাঁটিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিতে হইত। আমার কেবলই মনে হইত, আমরা থাকিতেই এতটা ভুল ধারণা ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রচার হইবে? এছাড়া—মহাশয় তখন খুব বলিয়া বেড়াইতেন যে উহারা ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভুলিয়া অন্য পথে চলিতেছে। মহাশয়ের কথায় খুব রাগ হইয়াছিল।

"ঐ দুই ব্যাপার ঠাকুরের জীবনী লিখিবার প্রধান হেতু। যখন উদ্বোধনের বাড়ি হয় তখন ১১,০০০ টাকা দেনা। ঐ দেনা ঘাড়ে লইয়া বাড়ি করা হইল। বই বিক্রি প্রভৃতির দ্বারা উহা শোধ হইয়াছিল। মাকে রাখিবার জন্যই এই বাড়ি করা। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই—তাঁহার জন্যই সব। এইভাবে ভরপুর হইয়া তখন সকল কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাইত। তিনি যাইবার পর সকল উৎসাহ একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। শরীরটা তো খুব ভালই ছিল, কিন্তু মার দেহ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরও পড়িয়া গেল।" লোককে ভাল করিতে হইলে আমরা সাধারণত ধমক গালি-মন্দ করিয়া থাকি, ২।১টি দৃষ্টান্তে মহারাজের ধৈর্য ও শোধরাইবার বিভিন্ন পন্থা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল।

উদ্বোধনে এক সাধু বামুনকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, অন্য বামুন পাওয়া যাইতেছে না। মহারাজ বলিলেন, "দেখ, এ ব্যবহার কাহারও, বিশেষত সাধুর অকর্তব্য। আর তোমার গোস্তাকির জন্য এতগুলি লোক কষ্ট পাইবে—তাই বা কেন? নিজের একবেলা আগুনের জ্বাল লাগাইবার সামর্থ্য নাই তোমার এত গোঁয়ার্তুমি কেন? আমরা মঠে ১০।১৫ দিন এমনকি ১ মাস পর্যন্ত কাজ চালাইয়া দিয়াছি, তোমাদের সে সামর্থ্য কই? পুনরায় এমন ব্যবহার হইলে আমার নিকট বকুনি খাইতে হইবে। উহার...থাকিবে না, একটু ভুগিয়া শিখুক। এজন্য আমি এ পর্যন্ত কিছু বলি নাই।" কত শান্তভাবে সমালোচনা। আমরা মহারাজের সহ্যগুণের একটি উদাহরণে শুনিয়াছি—স্বামীজী একদিন মহারাজকে খুব বকিলেন—অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপে। মহারাজ গম্ভীর—অবশেষে বলিলেন, "এই গুপ্ত[1] তামাক সাজ।" স্বামীজী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"তোর মাছের রক্ত। এত বকাবকি কার উপর করিলাম। তোকে স্পর্শও করিতে পারিল না।"

[1] গুপ্ত—স্বামী সদানন্দ, ইনি পূর্বাশ্রমে গুপ্ত উপাধিধারী ছিলেন।

(৬)

মহারাজের নিকট অনেক সময় ঠাকুরের প্রসঙ্গ শোনা যাইত। ১৯২৬ সনের জুন মাসে মহারাজের খুব অসুখ হইয়াছিল। অনেক দিন পরে নিচে (উদ্বোধন অফিস) নামিয়াছেন। জনৈক ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত ...মহাশয়ের এক শিষ্যের কথা উঠাইলেন। ...মহাশয়ের আদেশ বিশেষভাবে শুচিসম্পন্ন না হইয়া জপাদি কর্তব্য নহে। মহারাজ বলিতেছেন—"ঠাকুর ধর্মলাভ সহজ করিয়া দিতেই আসিয়াছিলেন। আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠায় মানুষ পিষ্ট হইতেছিল। ভগবানের নাম করিবার—তাঁহাকে ভজন করিবার জন্য কাল ও স্থানের অপেক্ষা অনাবশ্যক। যে কোন অবস্থায় তাঁহাকে ডাকা চলে। শুচি অশুচির কোন তোয়াক্কাই তিনি রাখেন নাই। আর উপায়? যাহা তোমার ভাল লাগে। সাকার ভাল লাগে তাঁহাতেই হইবে—নিরাকার ভাল লাগে, লাগিয়া থাক, উহাতেই তোমার উন্নতি হইবে। কিভাবে উপাসনা করিবে, ভগবান আছেন কিনা, সন্দেহ হইয়াছে—আচ্ছা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর। 'তুমি আছ কিনা জানি না—তোমার সাকার না নিরাকার রূপ? যে রূপ হয় আমাকে বুঝাইয়া দাও।' কাপড় ছাড়া, স্নান করা, তিলক কাটা, বিছানা ছাড়া—পার তো কর, অসুবিধা হয়, ওদিকে খেয়াল না দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া যাও।" আমাকে তিনি করতালি দিতে দিতে ব্রাহ্মসমাজের 'নাথ তুমি সর্বস্ব আমার' গানটি গাহিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহার মধ্যকার যে কোন একটি ভাব আয়ত্ত করিলেই সব হইবে।" এই বলিয়া মহারাজ গানটি গাহিলেন, যথা—

নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার।
প্রাণাধার সারাৎসার; নাহি তোমা বিনে
কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার ॥
তুমি সুখ, শান্তি, সহায়, সম্বল;
সম্পদ ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল।
তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল;
আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার ॥

তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ;
তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম।
তুমি শাস্ত্রবিধি, গুরু কল্পতরু;
অনন্ত সুখের আধার ॥
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য;
তুমি স্রষ্টা, পাতা, তুমি হে উপাস্য।
(তুমি) দণ্ডদাতা পিতা,
স্নেহময়ী মাতা, অনন্ত সুখের আধার ॥

একদিন 'বারবেলা' লইয়া কথা উঠিয়াছিল। মহারাজ বলিতেছেন—"ঠাকুর মঘা, অশ্লেষা, যোগিনী ত্র্যহস্পর্শ, দিকশূল, বৃহস্পতিবারের বারবেলা খুব মানিয়া চলিতেন। কেন মানিতেন, তাহা বলিতে পারি না ॥ বস্তুত তিনি অনেক জিনিসই বিশ্বাস করিতেন। তিনি মানিতেন বলিয়াই আমরা মানি। যখন আমেরিকায় ছিলাম, এসব দিকক্ষণ মনেই আসিত না। বস্তুত এইসব জ্যোতিষিক গণনা বর্তমানে নির্ভুলও নহে। নূতন করিয়া গণনা আর এখন হইতেছে না। অথচ পরিবর্তন নিয়তই চলিতেছে, এজন্য আজকাল আর এসব ততটা মানি না। কেবল, ঠাকুর যে কয়েকটি মানিতেন তাহাই লক্ষ্য করি।"

উক্ত কথায় আমার ধারণা হইল—তোমার মনে লাগেত মানো, নতুবা আবশ্যক নাই। মনে খুঁত খুঁত থাকিলে মানাই ভাল।

প্রঃ "শ্রাদ্ধে অন্ন-গ্রহণে ভক্তির হানি হয়"—ঠাকুর ইহা কেন বলিতেন?

উঃ " 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আছে, মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন। এক ধীবর তাঁহাকে জালে পায়। ভাব-প্রভাবে শরীরে নানা বিকৃতি ঘটিয়াছিল; সে তাঁহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেই, তাহার প্রেমের উদয় হয়। ঐ ব্যক্তি পূর্বে হরিনামের ধার ধারিত না। এখন সে হরিনাম কীর্তনে বিভোর হইল। সে মুহুর্মুহুঃ হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকে। এদিকে মহাপ্রভুর সন্ধানে তৎপর তাঁহার অনুচরেরা, ঐ ধীবরের বৃত্তান্ত শুনিয়া, উহা মহাপ্রভুর কার্য নিশ্চিত করিয়া তাঁহার সন্ধান

পাইলেন। ঐ ব্যক্তির স্বস্থাবস্থা-প্রাপ্তির উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলে, উঁহারা ধীবরকে কোন বাড়ির আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়াইতে উপদেশ করিলেন। বস্তুত উক্ত অন্ন ভোজনেই ধীবর প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। উত্তম শরীর ও উত্তম মেধা প্রাপ্তিই আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শরীর ও বুদ্ধি নির্মল না হইলে ভগবৎ সাধন সম্ভবপর নহে। এজন্য ভগবানের তৃপ্তি সাধনের জন্য নিবেদিত অন্নগ্রহণে মন ও শরীর বিশুদ্ধ হয়। শ্রাদ্ধের অন্ন, বিশেষত আদ্যশ্রাদ্ধের ভোজ প্রেতের তৃপ্তির জন্য দেওয়া হয়। উহা ভগবদ্ উদ্দেশ্যে নিষ্পন্ন নহে। ফলে আহারের পূর্বোক্ত ফল না ফলিয়া—উল্টা ফল ঘটে। আহার্য পদার্থে শরীর ও মন তৈয়ারি হয়। যেমন ভাব লইয়া আহার করিবে, শরীর ও মন তেমনি ভাব-সম্পন্ন হইবে।"

প্রঃ "তা হইলে স্ফূর্তি করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত অন্নভোজেও যোগদান অকর্তব্য?" মহারাজ—"হাঁ তাই বটে।"

অপর একদিন, গ্রহণের সময়, ধ্যান-জপাদির বিধান কেন রহিয়াছে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। মহারাজ—"একটা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনায় মানুষ চিন্তান্বিত হয়। গ্রহণাদি ব্যাপার প্রকৃতির এক অদ্ভুত পরিবর্তন আনয়ন করে। উহাকে সন্ধিক্ষণও বলা যায়। প্রকৃতির এক অবস্থা পরিবর্তন পূর্বক অপর অবস্থা প্রাপ্তির ব্যবধানে মন অনেকটা শান্ত থাকে। এজন্য ঐ কাল জপ-ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত ও অনুকূল।"

(৭)

মহারাজ মায়ের কথা বলিতে খুব উৎসাহ বোধ করিতেন। তিনি বলিতেছেন—'ঠাকুরের দেহরক্ষার পর যোগেন স্বামী, মা, যোগীন-মা ও গোলাপ-মা প্রভৃতিকে লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন; গাড়ির মধ্যে যোগীন স্বামীর ভীষণ জ্বর। যতক্ষণ হুঁশ ছিল ততক্ষণ কেবলই ভাবিতেছিলেন—কি করিয়া উঁহাদিগকে বৃন্দাবন নামাইব। এই সময়ে তাঁহার একটি vision (দর্শন) হয়;

দেখিলেন—ঠাকুর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, নিকটে একটি বিকটাকৃতি জ্বরাসুর; কেবলই বলিতেছে—'তোকে দেখিয়া লইতাম, তা পারিলাম না—তোর গুরু পরমহংসের জন্য। তোকে এখুনিই ছাড়িয়া দিতে হইতেছে, নতুবা দেখিয়া লইতাম। যাক এই বেটিকে (পার্শ্বস্থ লাল কাপড়-পরা একটি মেয়ের মূর্তিকে দেখাইয়া) রসগোল্লা দিস।' ভোরে যোগেন স্বামীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। মাও গাড়ির মধ্যে ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। উহারা জয়পুরে পৌঁছিলে মন্দিরে লাল কাপড়-পরা পূর্বদৃষ্ট দেবীমূর্তি দেখিয়া যোগেন স্বামী যোগীন-মাকে বৃত্তান্ত বলিলেন। আশ্চর্য, নিকটেই একটি রসগোল্লার দোকান ছিল। এক টাকা কি এক টাকা দু-আনার রসগোল্লা কিনিয়া দেওয়া হইল। ঐ বেটি সম্ভবত শীতলা। ঠাকুরের কৃপা না হইলে হয় তো যোগীনের বসন্ত হইত।"

মহারাজ আর একদিন বলিয়াছিলেন—"স্বামীজীর বিলাত যাইবার পূর্বে মায়ের এক vision (দর্শন) হইয়াছিল—"ঠাকুর ও স্বামীজী হাত ধরাধরি করিয়া গঙ্গায় নামিলেন। নামিয়াই ঠাকুর গঙ্গার জলে মিশিয়া গেলেন; স্বামীজী খুব উত্তেজিত হইয়া আবেগভরে গঙ্গার জল ছিটাইতে লাগিলেন"—এই vision (দর্শন) এত vivid (স্পষ্ট) হইয়াছিল যে মা দুই দিন গঙ্গায় পা দিতে পারেন নাই। ঠাকুর গঙ্গায় মিশিয়া রহিয়াছেন—এই বোধ এত স্পষ্ট হইয়াছিল!

"স্বামীজী বলিতেন, তাঁহার নিকট vision অনেক সময় inverted (বিপরীত) হইয়া আসিত। ইচ্ছামাত্রই যে, কোন vision আসিত এমন নহে। আমার সম্বন্ধে একদিন কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা পারিলেন না, বলিলেন—'আজ হবে না, পেট গরম হইয়া রহিয়াছে।' স্বামীজীর শক্তি দেখিয়া একজন সাহেব কিছু মতলব করিয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। একদিন স্বামীজী হঠাৎ তাহার হাতখানি দেখিয়া, সে এ পর্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছে, সব বলিয়াছিলেন। গুডউইন বলিত—স্বামীজীর উক্তবিধ আচরণ-দৃষ্টে সেই লোকটির মুখ কাগজের মতো সাদা হইয়া গিয়াছিল; ঐ অবধি সে লোকটি আর স্বামীজীর নিকট আসে নাই।

"ওদেশ হইতে ফিরিলে, স্বামীজীর শরীর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল।

স্বামীজী বলিতেন—'যাহা কিছু—ওদেশে রাখিয়া আসিয়াছি! বক্তৃতার সময় এই শরীর হইতে শক্তি বাহির হইয়া শ্রোতাদিগকে অনুপ্রাণিত করিত।'

"একটা দেশের thought current (চিন্তাধারা) পরিবর্তিত হইয়া গেল—চারটিখানি কথা নয়ত! দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীনই স্বামীজী মধ্যে মধ্যে খুব শক্তির প্রভাব অনুভব করিতেন। আমাদেরই একজন ঐ শক্তির প্রভাব বোধ করিয়াছিলেন। তাহার হাতখানি battery সংলগ্নের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। চেষ্টা করিয়াও ঐ কম্পন থামাইতে পারে নাই। স্বামীজী এদেশে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'বক্তৃতা করিতে করিতে ঐ শক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। এখন আর পারিব না।'

"বুড়ো বাবার মুখে আমি শুনিয়াছিলাম—তিনি স্বামীজীকে নির্বিকল্প-সমাধির জন্য ধরিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিয়াছিলেন—'পুনরায় কৌপীন পরিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় সাধন-পরায়ণ হইলে, হয়ত নির্বিকল্প সমাধি করাইবার শক্তি আসিতে পারে। আমেরিকায় বক্তৃতাদি দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।' "

মহারাজ বলিতেছেন—"ঠাকুর একদিন কোন ব্যক্তির—'সংসারে কিরূপভাবে থাকিব'—এই প্রশ্নে ঢেঁকির vision (ভাব-দৃশ্য) দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াই বলিয়াছিলেন—'ধান ভানিবার সময় দশটা কাজ চলে বটে, কিন্তু মনটা যেমন হাতের উপর থাকে, সেইরূপ মন ভগবানে রাখিয়া সকল কার্য করিতে হইবে।'

"এখানে আমার আর একটি vision-এর কথা মনে উঠিতেছে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে হয়—ইহা বুঝাইতে গিয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন—'হালদার পুকুর পানায় ঢাকা। এক ব্যক্তি পানা সরাইয়া স্ফটিকজল পান করিতেছে।' " (পানা অর্থে—কামিনীকাঞ্চন)

(৮)

মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে কহিতেছেন—"একদিন ভাগবত পাঠ প্রসঙ্গে দক্ষরাজার মেয়েদের কথা হইতেছিল। হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—'জানি গো তাদের জানি, উহারা আমার বোন।' গৌরী-মা সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিলেন—'এইবার সকলকে বলে দেবো। আমাদের কথা তুমি গায়ে তোলো না। আজ তো নিজ মুখে স্বীকার করিলে।' তখন মা বিপন্ন জ্ঞানে কাতরে বলিলেন, 'কাকেও কিন্তু বোলো না, আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি।' মা যোগীন মহারাজের হাত হইতে বৃন্দাবনে একদিন মিষ্টান্ন খাইলেন, তারপর পান চাহিয়া লইয়া খাইয়া খানিকটা ফেলিয়া দিলেন—যেমন ঠাকুর করিতেন। মা ভাবে বিভোর হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটেই যোগেন স্বামী। সেদিন মা ঠাকুরের ভাবে আবিষ্ট। সেইরূপ কথা কওয়া, পান খাওয়া ইত্যাদি। সে সময় মার লজ্জা একেবারেই ছিল না। যোগীন মহারাজকে মন্ত্র বলিয়া দিবার জন্য ২।৩ দিন ঠাকুরের আদেশ পাইলেন। পরে যোগীন-মার মারফৎ তাঁহাকে মন্ত্র বলিয়া দিলেন। যোগীন মহারাজ বলিয়াছিলেন—'ঠাকুর তাঁহাকে একটা কিছু বলিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়া যান নাই। এখন সেই কার্য মাকে দিয়া করাইলেন।'"

এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা উঠিল। মহারাজ বলিতেছেন—"তিনি সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধন সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতেন। মহাপ্রভুর তিরোধান হইয়াছে। এক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে নীলাচল (?) পর্যন্ত গমন করিয়া যখন জানিলেন মহাপ্রভুর দেখা পাওয়া যাইবে না, তখন স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আগমন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেই প্রথম ঐ ব্যক্তির সম্মুখীন হইয়া তাহাকে আদর-যত্ন পূর্বক উপদেশাদি প্রদান করিলেন।"

"শেষ জীবনে রাধুর ব্যাপার লইয়া জয়রামবাটির লোকে বলিত মায়ের মায়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে ঐ উপায়ে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতেন তাহা লোকে বুঝিতে পারিত না। ঠাকুর আপনার প্রকট অবস্থায়, মা ঠাকুরানীকে নিত্যরানীর কথা বলিয়াছিলেন। ঐ রানী স্বামীর জীবিতকালে কাচের চুড়ি ইত্যাদি

পরিতেন। স্বামীর দেহরক্ষার পর কাচের গহনা ভাঙিয়া ফেলিয়া স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন—'এখন আমার স্বামী অমর হইয়াছেন, তাই ঠুনকো কাচ ফেলিয়া দিয়া স্বর্ণাভরণ পরিয়াছি।' ঠাকুরের দেহরক্ষার পর মা-বালা ও পেড়ে ধুতি ফেলিয়া দিতে গেলে ঠাকুর দর্শন দিয়া বাধা দেন। মা একবার বৃন্দাবনে এবং আর একবার জয়রামবাটিতে (মতান্তরে কামারপুকুরে) অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক থান পরিতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু সেবারও ঠাকুর বাধা দেন।

"ষোড়শী পূজার সময় মা এতই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, কি যে হইতেছে, হুঁশ ছিল না। ঠাকুর তাঁহাকে কাপড় ছাড়াইয়া নূতন কাপড় পরাইয়াছিলেন, প্রণাম পূর্বক তাঁহার পায়ে মালা রাখিলেন ইত্যাদি। কিন্তু মা কিছুই জানিতে পারেন নাই। এই দিন মা প্রসাদী মাংস পর্যন্ত খাইয়াছিলেন, অথচ কখনও তিনি মাংস খাইতেন না।"

এই প্রসঙ্গে মহারাজ কথিত ও সান্ন্যাল মহাশয় সমর্থিত গিরিশবাবুর বাড়িতে পূজার নিমন্ত্রণের কথা উঠিল। "মা অষ্টমী পূজার দিন ভাবাবেশে গিরিশবাবুর বাড়িতে মিষ্টান্নাদি খাইয়াছিলেন। ঐ আবেশ চলিয়া গেলে অনেক চেষ্টা করিয়াও মাকে আর কিছুই খাওয়ানো যায় নাই। পূর্বদিন খাইয়াছেন—তদুত্তরে বলিয়াছিলেন 'সেদিন' 'আমি'—'আমি ছিলাম না। আজ অসৎ স্পৃষ্ট অন্ন কি করে খাব?' "

(৯)

উদ্বোধনের ছোট ঘরটা লোকপূর্ণ। —বাবু মঠ হইতে ফিরিয়াছেন; তিনি মহাপুরুষ মহারাজ কথিত স্বামীজী-দৃষ্ট গায়ত্রীর কথা বলিলেন। মহারাজ বলিলেন—"স্বামীজীর স্বপ্নে ঐ দর্শন হইয়াছিল। গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া—ঊষার আবির্ভাব চারিদিকে—'আয়াহি বরদে দেবি।' ইত্যাদি আবাহন সুর করিয়া গীত হইতেছে শুনিলেন। স্বামীজী ঐ সময় বেদের পঠন-পাঠন করিতেছিলেন। ঐ

দর্শন স্বামীজীর উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তখন ঠাকুর দেহরক্ষা করিয়াছেন। একদিন মহারাজের বাটিতে স্বামীজী বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত তন্ময় হইয়া যন্ত্র সাহায্যে গায়ত্রীর আবাহন—

'আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে ॥'

পর্যন্ত আলাপ করিয়াছিলেন। ৪টার পর স্নানাহার হইল। মঠেও স্বামীজী অনেকবার গায়ত্রীর বন্দনা আলাপন করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন। তবে —মহারাজের বাটিতে খুব বেশি তন্ময়তা হইয়াছিল। স্বামীজী যখন ভজন গাহিতেন তখন হুঁশ থাকিত না, কোথা দিয়া সময় কাটিয়া যাইত। স্বামীজীর বাণী-দোষ আদৌ ছিল না। যেমন বিশুদ্ধ সুর, তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ। বিশেষ বিশেষ স্থানে উপযুক্ত জোর দেওয়ার ফলে গানের ভাবার্থ ফুটিয়া উঠিত।"

শ্যা—বাবু বলিতেছেন, রাখাল মহারাজ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "আহা তোমরা আমাকে দেখিয়াই এত আনন্দ পাও, যদি স্বামীজীকে দেখিতে, তাহা হইলে কতই না আনন্দ পাইতে।"

শরৎ মহারাজ—"তা বই কি! স্বামীজীর সহিত আমাদের কাহারও তুলনা হয় না। আমাদের কথা তো ধরিবারই নয়। মহারাজও (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) ঐ কথাই বলিতেছেন। বস্তুত স্বামীজীর নিকট আমরা সকলেই pigmies (বামন)। আমাদের দেখিয়া স্বামীজীকে বুঝিতে চাইলে ভুল হইবে। আবার ঠাকুরের তুলনায় স্বামীজীও pigmy। কাশীপুরের বাগানে স্বামীজী রামচন্দ্রের উপাসনায় প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিকতার ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা ভূয়োভূয় করিয়া, ঠাকুর শেষের দিকে বলিতেন, 'এখানে যে তোড়টি আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় এর ব্যাপার সিকিও নয়।' এবার ঠাকুর কোথাকার লোক ছিলেন বুঝিয়া লও। অবশ্য যাহারা স্বামীজীকে দেখিয়াছে, তাহারা ঠাকুরের মহত্ত্ব কিছু অনুভব করিতে পারিবে। ঠাকুর বলিতেন, 'নরেনের মধ্যে ১৮টি শক্তি আছে। কেশব সেন ১টি শক্তির বলে জগৎ মোহিত করিয়াছে।'

"ঠাকুরের বড় ভয় ছিল, পাছে নরেন্দ্র তাঁহার ভাব সমগ্র আয়ত্ত না করিয়া

২।১টি দিক মাত্র দেখিয়াই, একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বসে। কেশববাবু 'যত মত তত পথ' এই সত্য সম্বন্ধে বুঝিয়াছিলেন যে সকল ধর্মে অল্পাধিক সত্য আছে তাই তিনি বিভিন্ন ধর্মের সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পৃথক 'নব-বিধান' সৃষ্টি করিলেন। ঠাকুরের experience (অনুভূতি) ভিন্ন রকমের। তিনি প্রত্যেক ধর্মের প্রচলিত সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কিছু কাট-ছাট না করিয়া উক্ত ধর্মের চরম উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

"দেখ কোন কোন উপনিষদে অদ্বৈতভাব, কোন কোনটিতে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতভাব সমন্বিত বহু শ্লোক রহিয়াছে। ঐগুলির টানিয়া বুনিয়া একভাবের অর্থ করিবার চেষ্টা তিনি আদৌ করেন নাই। সকল ভাবই সত্য—মনের বিভিন্ন অবস্থায়। চরম সত্য হইতেছে—অদ্বৈতোপলব্ধি। বস্তুত ঠাকুরকে স্বামীজীই বুঝিয়াছিলেন।

"স্বামীজীর interpretation (ব্যাখ্যা) ব্যতিরেকে ঠাকুরকে যিনি বুঝিতে যাইবেন, ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক তিনি ধরিতে পারিবেন না। দেখ কি (সঙ্কীর্ণ) ভাব। এখন অনেকে ঠাকুরের উক্তিগুলিই বেদ-বেদান্ত বলিয়া চালাইতে চাহে। বস্তুত বেদ-বেদান্ত ঠাকুরের জীবনী ও উক্তি সকলের সাহায্যে interpret (ব্যাখ্যা) করিতে হইবে। বেদ-বেদান্তই অবলম্বনীয়, তবে ঠাকুরের জীবনী ও বাণীর সাহায্যে উহা বুঝিতে হইবে।

"স্বামীজী না বুঝাইলে, আমরা ঠাকুরের কিছুই বুঝিতাম না —ধর না, ঠাকুর বৈষ্ণব ধর্মের 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। 'জীবে দয়া' এই কথা উচ্চারণ করিয়াই তিনি বলিতেছেন 'থু থু; জীবে দয়া! জীবে দয়া করিবাব তুমি কে? জীবে, নারায়ণ জ্ঞানে সেবা, ইহাই সার কথা।' এক ঘর লোকে এই কথা শুনিয়াছিল—কে কি বুঝিত? স্বামীজীই ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। বলিলেন—'আজ এক অপূর্ব কথা শুনিলাম—অদ্বৈত জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ। যদি বাঁচিয়া থাকি জগতের নিকট ইহা প্রচার করিব।'

" 'হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ' নামক পুস্তকখানি দেখিয়াছ? বৈদিক যুগ হইতে

আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত ধর্মের যে রূপ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার সার সঙ্কলন পূর্বক ঠাকুর যে অবতার বরিষ্ঠ—এই কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি ঐরূপ না বুঝাইলে আমরা কেহ কেহ হয়ত অবতার পর্যন্ত বলিয়া চুকাইতাম। যেমন রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরকে চৈতন্য প্রভুর অবতার বোধে তৎকালীন কোন্ কোন্ ভক্ত অধুনা কাহার কাহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহার মীমাংসায় নিযুক্ত ছিলেন। বস্তুত স্বামীজী না বুঝাইলে আমরা ঠাকুরকে কিছুই বুঝিতাম না।

"স্বামীজী বলিতেন—'আমি ঠাকুরকে এক কণামাত্র বুঝিয়াছি।' ঠাকুর বলিতেন 'দারিদ্র্য নরেনকে দাবাইয়া রাখিয়াছে। দেখ না অত গুণী লোক একটি কর্মের জন্য ছুটাছুটি করিয়াও তাহা পাইল না। উপযুক্ত সুবিধা পাইলে ও একটা কাণ্ড তখন তখনই করিয়া বসিত।'

"ঠাকুরের ভয় ছিল স্বামীজী একটা সম্প্রদায় করিয়া না বসে! বস্তুত সেই কিশোর বয়সেই কেশব সেন প্রভৃতি তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে নাম না লিখিলেও তিনি ব্রাহ্মভাবে ভাবিত হইয়া ভজন-সাধন করিতেছিলেন। এজন্য তাঁহার পক্ষে ঐ সমাজে একটা leader (সম্প্রদায় প্রবর্তক) হওয়া একটুও অসম্ভব ছিল না।"

(১০)

মহারাজ আপনার সম্বন্ধীয় কোন কথা বলিতে খুব সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কদাচিৎ ২।৪টি কথা শুনা যাইত। এই জন্য উহা খুব মূল্যবান। একদিন 'ভয় হয় কেন' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"অনেক সময়ে ভয়ের কারণ হচ্ছে diffidence (আপনার শক্তির পরিমাণ না বুঝা)। স্বামীজী আমাকে বিলাত যাইতে বলিতেছেন, আমি কখনো বক্তৃতা দিই নাই, বক্তৃতা দিতে পারি না। এজন্য আপত্তি করায় বলিলেন, 'বক্তৃতা যা, তাহা আমি দিয়া আসিয়াছি, তুই গীতা, উপনিষদের ক্লাস করবি এই মাত্র। তোর বক্তৃতা দিতে হইবে না।' আমি ভাবিলাম এ পর্যন্ত পারিব। স্বামীজী বলছেন—গেলে তাঁর কাজ হয়—স্বীকার

হইলাম! বিলাত পৌঁছিয়াছি মাত্র দুই দিন। দেখি, বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—Swami Saradananda will speak on...date, আমি তো অবাক। স্বামীজীকে একশ গালাগাল করিলাম। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। যা হোক করিয়া বক্তৃতা দিতে হইল। তিন কোয়ার্টার বক্তৃতার পর দুই ঘণ্টা Question—Answer! (প্রশ্নের উত্তর।) বক্তৃতা কেমন হইয়াছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় মন্দ হইয়াছিল না। কিন্তু Question—Answer-এ (প্রশ্নোত্তর) সকলেই খুশি হইয়া সুখ্যাতি করিয়াছিল এবং বেশ প্রশংসা বাহির হইল। এই দেখ, স্বামীজী জানিতেন শক্তি আছে—তিনি আমার diffidence (সঙ্কোচভাব) ভাঙিয়া দিলেন।

"—এখন বক্তৃতা দেয়, কিন্তু স্বামীজী কি করিয়া তাহাকে বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন, তাহার কাছে শুনো। সে কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—'আমি কি বলিব! কিছুতেই বক্তৃতা দিতে পারিব না।' তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন—'তাহলে এখান থেকে চলে যা—জানিস তো আমেরিকায় ভিক্ষা দেয় না।' —কাঁদিতে লাগিল। তখন স্বামীজী বক্তৃতা লেখাইয়া, মুখস্থ করাইয়া, তাহার দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইলেন। পারিবে না মনে করিয়া, বক্তৃতান্তে Question—Answer নিজেই করিলেন। স্বামীজী বুঝিতেন উহার মধ্যে শক্তি আছে। তবে জাগাইতে হইবে। অনেকের diffidence (সঙ্কোচভাব) কাটিয়া গেলে গর্ব হয়। উহাতে কাজ খারাপ হয়। তবে নিজের শক্তি বুঝিয়া কাজের programme ও routine করা (কি উপায়ে কাজ করিব) এবং confidence (আত্মবিশ্বাস) থাকাকে গর্ব বলে না। দেখা যায়, সামর্থ্য না বুঝিয়া মানুষ অনেক কিছু আশা ভরসা করে। আমরা যৌবনের রক্তের তেজে নিজের শক্তি সামর্থ্যের over-estimate (অধিক মনে) করি। পরে অভিজ্ঞতার ফলে, নিজেদের ওজন বুঝিয়া, তদনুসারে নিজদিগকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) করিয়া থাকি। ইহাতে মনে হইতে পারে progress (অগ্রগতি) কম হইল বা অধোগতি হইতেছে—তা নয়। যখন বুঝিলাম, আমাব এতটা সময়, এতটা শক্তি, তখন যা সয়, রয় তদনুসারে চলিতে থাকি। আমরা যখন দুর্গম স্থানে গিয়াছি—নিঃসম্বল অবস্থায়

তখন উহা সম্ভবপর হইয়াছিল দুই কারণে। কতকটা রক্তের তেজে ও কতকটা ভগবানের উপর বিশ্বাসের জন্য।" এই প্রসঙ্গে, মৃত্যুভয় কিরূপে যায় এই প্রশ্নের যে উত্তর মহারাজ দিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হইল।

"মৃতুভয়, ঈশ্বর বিশ্বাসে যায়। একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালীন অবস্থা বলিতেছি। মেয়েটি বড়ই লজ্জাশীলা। ঠাকুরের খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, 'অমন স্ত্রী, দশটা থাকিলেও পতনের ভয় নাই।' মেয়েটি মৃত্যুর পূর্বে আমাকে ডাকাইয়া গীতাপাঠের অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। উহার লজ্জাশীলতার বিষয় জানা ছিল। পিছন ফিরিয়া গীতা পড়িলাম। সেই দিন শেষ রাত্রিতে পুনরায় ডাকাইয়াছে। গিয়া দেখি মেয়েটি আদৌ লজ্জা করিতেছে না। সকালেও তাহার অত্যধিক লজ্জাশীলতা দেখিয়া গিয়াছি। সে বলিতেছে, 'আমার যাওয়ার সময় হলো না? মুখ ধুইয়ে দাও, বাসি কাপড়ে যাব না, কাপড় বদলাইয়া দাও ইত্যাদি।' যেন এ বাড়ি হইতে অন্যত্র যাইতেছে। তাহার ইচ্ছানুরূপ সব বন্দোবস্ত হইল। তখন সে বলে, 'খাট আন, গঙ্গায় যাইব।' খাট আনিতে লোক পাঠান হইল। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া মেয়েটি বড়ই ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল। 'কি এখনও এল না—এখনও এল না।' ঠিক একস্থান হইতে অন্যত্র যাইবার ব্যগ্রতা। খাট আসিল। ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া দিলে, একেবারে মৃতের মতো বোধ হইল। আমরা মনে করিলাম বোধ হয় দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু বাবুরাম মহারাজের মা বলিলেন, 'লইয়া যাও, ও যখন বলিয়াছে, তখন গঙ্গায় না যাওয়া পর্যন্ত প্রাণ বাহির হইবে না।' তখন গঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইল। গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া শোয়াইয়া দিলে একবার তাকাইয়া সে দেহত্যাগ করিল।"

এই প্রসঙ্গে মহারাজ পূর্বে একদিন তাঁহার ভাইয়ের মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছিলেন। "মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সে বলিতে লাগিল, 'এই চলে গেল, তোমরা ধর না কেন? এই এতদূর পর্যন্ত আসিয়াছে (শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখাইয়া) তোমরা ধর ইত্যাদি।' আমি তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিয়াছিলাম, 'যাক না, তুমি ভগবানের নাম কর।' তখন সে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণশূন্য হইয়া গেল।"

মহারাজ এই প্রসঙ্গে অন্য এক সময়ে বলিলেন, "গিরিশবাবুর আত্মীয় (তাঁহার পিতা বা পিতামহ বা অন্য কেহ) রাধারমণের ভোগ প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু খাইতেন না। একদিন সুস্থ শরীরে অফিস হইতে ফিরিবার পর উক্ত প্রসাদী অন্ন দুইটি বমনের সহিত বাহির হয়। তদ্দৃষ্টে তিনি নিশ্চয় করিলেন, যখন প্রসাদ পেটে থাকিল না, তখন মৃত্যু সন্নিকট। তখনই গঙ্গায় যাত্রা করিলেন। হাঁটিয়াই চলিয়াছেন। পথে খুব একদম প্রস্রাব হইল। অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ করায় খাটে উঠিলেন—খাট পশ্চাতে পশ্চাতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। গঙ্গাতীরস্থ হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

"কখনও কখনও ভগবচ্চিন্তা মনে না আসিয়াও নিশ্চিত মৃত্যুর পূর্বে মানুষ খুব ঠাণ্ডা হইয়া অবস্থিতি করে এরূপ ঘটনাও দেখা যায়। আমার জীবনে এরূপ ঘটনা কয়েকটি আছে। আমেরিকায় বাইসাইকেলে ঢালু পথে নামিতে হইতেছে—তখনও ভাল অভ্যাস হয় নাই। সমতল ভূমির উপরই চলিয়াছিলাম, অনবধানতাবশত হঠাৎ ঢালুতে আসিয়া পড়িয়াছি। গাড়ি খুব বেগে নিচে নামিতেছে। সমতল রাস্তায় (সদর রাস্তা) পৌঁছিবা মাত্র, গাড়ি উল্টাইয়া যাইবে কিংবা চলন্ত গাড়ি ঘোড়ার তলে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আমার কিছুমাত্র ভয় বা উদ্বেগ হইল না। হ্যান্ডেল খুব সহজে ধরিয়া রাখিয়াছি, অর্থাৎ মোটেই চাপিয়া ধরি নাই—ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলাম। মনে তখন তখন উঠিল—তারপর পা (প্যাডেল হইতে উঠিয়া গিয়াছে) বিস্তার করিয়া চাকার উপরকার রডের সহিত রক্ষিত পেরেকের উপর উঠাইয়া দিলাম—এসব তখন তখন মনে উঠিয়াছিল—অতঃপর সমতল জায়গায় পৌঁছানো গেল—কোন বিপদ হয় নাই।"

(১১)

"আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামীজীর সহিত দেখা করিবার জন্য কাশ্মীর যাইতেছি। গাড়ি খুব জোরে ছুটিয়াছে। গাড়োয়ান উন্মত্ত। সে আপনা আপনি

বলিতেছে, 'আজ যদি আল্লা বাঁচায় তবে দেখিব' ইত্যাদি। এখন গাড়ি মোড় ফিরিবার-কালীন অন্য গাড়ি আসিয়া পড়ায়, গাড়ির চাকা রাস্তা হইতে নিচে পড়িয়া গেল এবং একটা বিশাল প্রস্তরখণ্ডে ধাক্কা খাইল। তখন গাড়ি নিচে নামিতে আরম্ভ করিল। প্রায় ১৫০ শত ফুট নিচে নামিতে হইবে। ধ্রুব মৃত্যু! এই সময় দেখিতেছি অনেকটা দূরে একটা গাছ—মনে করিলাম গাড়ি যখন ঐ গাছের নিকট দিয়া যাইবে, তখন ঐ গাছ ধরিয়া লাফ দিব। মনে কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই। অল্পকালের মধ্যেই গাড়ি আড়াআড়ি ভাবে গাছে লাগিয়া থামিয়া গেল। আমি পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো লাফাইয়া পড়িলাম। কাঁটা গাছের সামান্য আঘাত পায়ে লাগিয়াছিল। ঘোড়াটা পড়িয়া শীঘ্রই মারা গেল। জিনিসপত্রগুলি কোনটি আধ মাইল, কোনটি এক মাইল দূরে ছড়াইয়া পড়িল। আমি লাফ না দিলেই ভাল হইত। নিজের বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া পায়ে কিছু আঘাত পাইলাম মাত্র।

"কাঞ্জিলালের সহিত নৌকায় মঠে যাইতেছি। মহারাজের (রাখাল মহারাজ) একটা ফোঁড়া অস্ত্র করিতে হইবে। আমি তামাক খাইতেছি। ইতোমধ্যে মহা ঝড় উঠিল। নৌকা ডুবু ডুবু। আমার কোনই উদ্বেগ হইতেছে না। বেশ নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাইতেছিলাম। কাঞ্জিলাল আমার ঐরূপ নিরুদ্বিগ্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া মহা ক্রোধে হুঁকাটা কাড়িয়া লইয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিল। যাহা হউক তখন পালটা নামাইয়া দিবার কথা বলিলাম। পাল নামাইতেই অনেকটা নিরাপদ বোধ হইল। ঝড়ও ক্রমশ নামিয়া গেল।"

স্বামীজীর কথা হইতেছে। মহারাজ বলিতেছেন—"ঠাকুরের তিথিপূজার দিন আমরা সকল দেব-দেবী ও বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষদের পূজা করিয়া থাকি। বরাহনগর মঠে কালী মহারাজ নানা তন্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া পূজা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা 'মহম্মদায় নমঃ' বলিয়া অপরাপর মহাপুরুষদের সহিত তাঁহারও পূজা করিয়া থাকি। কেনই বা করিব না? ঠাকুর দেখাইয়াছিলেন, 'যত মত তত পথ।' অনেককাল পরে তিথি পূজার সময় মঠে আসিয়া দেখিলাম এখনও ঐরূপ ভাবেই পূজা চলিতেছে। গিরিশবাবু একদিন দেখিয়া বড় খুশি হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ও বাবা, এ যে দেবতার গাঁদী—

যে যাঁহার পূজা লইয়া চলিয়া যাইতেছেন।' বরানগর মঠে সকালে ৮টায় পূজায় বসিত—সকল পূজা শেষ করিতে রাত্রি ৪টা বাজিয়া যাইত।"

"স্বামীজীর observation-এর (পর্যবেক্ষণ) শক্তি কত অধিক ছিল। ভিক্ষা করিয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছেন—আমরাও সেইসব স্থানে গিয়াছি কিন্তু তিনি ঐসব জায়গায় এত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়া মনে রাখিয়াছিলেন যে যখন উহা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন তখন আশ্চর্য হইতে হইয়াছে। আমাদের চাইতে তিনি কত অধিক দেখিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

"তিনি জাপানের পথে, আমেরিকা যাইবার কালে জাপানের মধ্য দিয়া এবং ঐ দেশের ২।৪টি শহরে নামিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু উহারই মধ্যে জাপানের ভিতরকার অবস্থা বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, 'জাপান ইউরোপের যে কোন দুই দেশের সম্মিলিত শক্তির সহিত লড়িবার সামর্থ্য অর্জন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, কেবল international status-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।'

"The New Orient নামক একটি পত্রিকায় এক সাহেবও দেখিতেছি, স্বামীজীর ঐ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম-দর্শন শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। হয়ত উহাকে স্বামীজী ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ২।৪ দিনের দেখা-শুনায় একটি জাতির pulse (ধাত) নির্ণয় করা সোজা কথা নয়।

"প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের অদ্ভুত মত পরিবর্তন। একটা ঘটনায় ইহা স্পষ্ট হইবে। তাঁহাকে মহিম চক্রবর্তীর নিকট বলিতে শুনিয়াছি—'আমরা ধর্মের কি জানিতাম? উনিই (ঠাকুর) তো ধর্ম কি জিনিস বুঝাইয়া দিলেন।' তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি খুব প্রশংসা সূচক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য, তিনিই পরে নিজের দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ উল্টা কথা সব বলিয়াছেন অর্থাৎ 'নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা পরমহংসদেব আমাদের নিকট হইতে লইয়াছেন, আমরা ভগবানের মাতৃভাব তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি' ইত্যাদি। এইসব বাদানুবাদ যখন হইতেছিল তখন তাঁহার লিখিত পূর্বকথিত প্রবন্ধটি আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি ছাপাইয়া দিল। চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজীর অনন্যসাধারণ কৃতকার্যতায় সকলেই ম্লানপ্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। অনেকেই

Barrows (ব্যারোজ) সাহেবের সহায়তায় স্বামীজীর নিন্দাবাদ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। মিশনারিদের তো কথাই নাই। তাহারা স্বামীজীর বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। স্বামীজীর বক্তৃতার পর অনেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করায়, মিশনারিদের অনেকগুলি কেন্দ্র উঠিয়া গিয়াছিল। স্বামীজী যে ভারতবর্ষের ধর্মমতের representative (প্রতিনিধি) নহেন, ইহা প্রতিপাদনার্থ 'শিশুদিগকে কুমীরের পেটে দেওয়ার প্রথা, রথের চাকার তলে পড়িয়া মেয়ে-পুরুষের আত্মবলিদান' ইত্যাদি ছবিতে আঁকিয়া ভারত কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভারতের ধর্মমত কত তুচ্ছ ও অসার, ইহা প্রতিপাদনের কত চেষ্টাই না হইয়াছিল। স্বামীজীর বক্তৃতার পর আমেরিকার অনেক লোক বুঝিয়াছিল ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা অনাবশ্যক। ঐ দেশ ধর্মবিষয়ে যথেষ্ট উন্নত। এইজন্য যাহারা ধর্মপ্রচারার্থ অর্থ দান করিত, অনেকে উহা বন্ধ করিয়া দেয়।

"চিকাগো বক্তৃতান্তে এক ধূর্ত ব্যবসাদার স্বামীজীর বক্তৃতা কিনিয়া লইল। সে নানা স্থানে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবে। লাভের অংশ উভয়ে ভাগ করিয়া লইবেন—স্বামীজীর উদ্দেশ্য ঠাকুরের ভাব প্রচার করা। ঐ ব্যক্তির কথায় বুঝিয়াছিলেন, আমেরিকায় বোধ হয় পূর্বোক্ত উপায়েই ভাবপ্রচার করিতে হয়। কিন্তু আজ এখানে কাল অন্যত্র অনেক দূরে এক স্থানে, বক্তৃতা করিতে করিতে শীঘ্রই হয়রান হইয়া পড়িলেন। পরে ২।১ জন বন্ধুর পরামর্শে যথাসম্ভব সত্বর ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিলেন।"

(১২)

"তারপর স্বামীজী নিজেই এক ঘর ভাড়া করিয়া নিউইয়র্কে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এখানে বক্তৃতা বিনা পয়সায় দেওয়া হইত। আমাদের দেশে বিদ্যা ও ধর্মদান অর্থ সাপেক্ষ নহে। তিনি সেই ঘরে চেয়ার টেবিল রাখিলেন না, ফরাস পাতা। সেখানেই যত লোক জমা হইতে লাগিল। নিজে রান্না করিয়া খাইতেন। যাঁহারা pioneers (অগ্রগামী) তাঁদের কত কষ্ট করিতে হয়। একটা ছোট ঘরে

খাওয়ার জিনিসপত্র ও মশলাদি থাকিত। এক সাহেব, একদিন সেই ঘরে প্রবেশ পূর্বক প্রত্যেকটি জিনিস কি জানিয়া, উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। এটি খুব বিরক্তিকর ব্যাপার—চক্ষুলজ্জা ও etiquette-এর (আদব-কায়দা) দায়ে স্বামীজী কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। একটা পাত্রে অনেকগুলি লঙ্কা ছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—'ঐগুলি কি?' স্বামীজী ভাবিলেন এবার ব্যাটাকে জব্দ করিতে হইবে। উত্তরে বলিলেন, 'ওগুলি plums' (কুল) বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এদিকে সাহেব এক মুঠো মুখে দিয়া মরে আর কি? উহারা ঝাল মোটেই খায় না। স্বামীজী লঙ্কা খুব খাইতেন। ঐ ব্যক্তি তদনন্তর পুনরায় আর সে ঘরে ঢুকে নাই।

'ইংলন্ডে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই স্বামীজী আমাকে এক Vegetarian Society (নিরামিষ ভোজীদের সমিতি)-তে বক্তৃতা দিতে বলেন। আমি বলিলাম, 'পারিব না।' 'দিতেই হবে' বলিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। এদিকে আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, যেন বক্তৃতা দিতে না হয়। ভাগ্যের বিষয় সেই সমিতি হইতে সংবাদ আসিল যে অনিবার্য কারণবশত নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যাইবে না। তখন তো বাঁচিলাম। স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া বললেন, 'কি রে গিছিলি?' তখন বলিলাম, 'আমি তো যাবই না বলিয়াছিলাম—তুমি জোর করিলে কি হয়? এই দেখ, ঠাকুরই আমার সহায়।'

'ইহার অল্প দিন পরেই আমাকে আমেরিকায় পাঠালেন। আমি কিন্তু বলিয়া গেলাম, 'বক্তৃতা কিছুতেই দিতে পারিব না।' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আরে বক্তৃতা তো আমিই দিয়া আসিয়াছি, তুই আর সেখানে কি বলবি? একটু গীতা, বেদান্ত পড়াবি। দুই একটা প্রশ্নের জবাব দিবি। এই আর কি?'

''আমি বলিলাম—'এ পর্যন্ত চলিতে পারে।' ও মা! আমেরিকায় যে রাত্রিতে পৌঁছিলাম সেই রাত্রিতেই দেখি আমার বাসায় এক meeting (সভা) হইতেছে। আহারান্তে সেখানে যাইতেই সভাপতি বলিলেন—'স্বামী সারদানন্দজীকে আমরা প্রতি মুহূর্তেই এখানে পাইব আশা করিতেছিলাম, তিনি পৌঁছিয়াছেন। অমুক দিন তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।' আমি তো অবাক। সভাপতিকে

বুঝাইয়া বলায় তিনি বলিলেন, 'আমি সব ঠিক করিয়া দিব।' ভাবিলাম বোধ হয় বক্তৃতা দিতে হইবে না। তবুও কি হয় মনে করিয়া এবং স্বামীজীর নামে কলঙ্ক না পড়ে—ইহা অবশ্য দেখিতে হইবে ভাবিয়া একটু prepared (প্রস্তুত) হইয়া points (বক্তৃতার মূলকথাগুলি) ঠিক করিয়া লইলাম। কিন্তু prepared হইয়া গেলে কি হয়, Platform fright (বক্তৃতামঞ্চের ভীতি) তো আর যায় না। সভাস্থলে সভাপতি প্রথমে আমার পরিচয় করাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আমি মনে ভাবিলাম 'বাঁচিয়া গেলাম'। ওমা! তিনি বলিলেন, 'স্বামীজী অনেক লোকের সম্মুখে বড় হলে কোন দিন বক্তৃতা করেন নাই—তোমরা সকলে একটু নিকটে সরিয়া আইস। দূরে থাকিলে ইঁহার voice (কণ্ঠস্বর) পৌঁছিতে না পারে। শুনিয়া অবাক! যাহা হউক, দাঁড়াইয়া আধ ঘণ্টা কি তিন কোয়ার্টার বক্তৃতা করিলাম। দূরে দেখি Goodwin (গুডউইন সাহেব) হাসিতেছে। মনে হইল বক্তৃতা ভাল হইতেছে না, তাই ও হাসিতেছে। আমি আরও ঘাবড়াইয়া গেলাম। আমি ভাষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে ভাবগুলি লোকে বুঝিতে পারে তাহারই চেষ্টা করিলাম। হয়ত সকল কথা ঠিক মতো প্রকাশ করিতে পারি নাই সন্দেহ করিয়া, প্রশ্ন করিতে বলায়, সকলে নানা প্রকারের প্রশ্ন abstruse metaphysics (দার্শনিক মতবাদ) হইতে 'তোমরা কেন কুমীরের পেটে ছেলে দাও?' ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্নোত্তর শুনিয়া সকলে খুব খুশি হইয়াছিল। Goodwin কেন হাসিতেছিলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিল, 'বক্তৃতা খুব ভাল হইতেছিল, এজন্য হাসিতেছিলাম।' বক্তৃতা যেমনই হউক প্রশ্নসমূহের উত্তর শুনিয়া সকলে প্রশংসা করিয়াছিল।"

(১৩)

একদিন—মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেহরক্ষার দুদিন পূর্বে স্বামীজীকে ঠাকুর নির্জনে ডাকিয়া আনিয়া, 'আজ তোকে সর্বস্ব দিয়া ফকির হইলাম' বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, এই উক্তির অর্থ কি? সত্যই কি ঠাকুরের কষ্ট হইয়াছিল? নতুবা ফকির শব্দ কেন ব্যবহার করিলেন? কাঁদিবারই বা তাৎপর্য কি?

মহারাজ বলিলেন, " 'স্বামিশিষ্য সংবাদ' আমি edit (সম্পাদন) করিয়াছি মাত্র। উক্তবিধ উক্তি আমি স্বামীজীর নিকট শুনি নাই। স্বামীজী উহা চক্রবর্তীর নিকট বলিয়াছিলেন। কাঁদা দুঃখেও যেমন সম্ভব, সুখেও তেমন হয় তো? উপযুক্ত পাত্রে সকল শক্তি অর্পণ করিয়া আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে পারে। বস্তুত স্বামীজীই ঠাকুরের ভাব সর্বাপেক্ষা অধিক পাইয়াছিলেন এবং উহা সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ উক্তির অল্পদিন পরেই ঠাকুর দেহরক্ষা করিলেন। যাহা কিছু সব স্বামীজীর নিকট রাখিয়া গেলেন। যে জন্য এই জন্ম, যে কারণে তপস্যাদি সকল উপলব্ধিই নিঃশেষে স্বামীজীকে দিয়া গেলেন।"

ঠাকুরের মন কতখানি দেহবুদ্ধি রহিত ছিল সেই সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। মহারাজ বলিলেন, "লজ্জা-শরম একেবারেই ছিল না। পরনের কাপড় প্রায়ই থাকিত না। একদিন জামা গায়ে রহিয়াছে দেখিয়া বলিতেছেন, 'দেখ গায়ে জামা, ভদ্র হইয়াছি'—শ্রোতারা হাসিতেছেন। তখন হুঁশ হইল, বুঝিলেন পরনে কাপড় নাই। পঞ্চবটী পর্যন্ত গিয়া কাপড় খুলিয়া ফেলিতেন। আমরা কেহ গাড়ু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছি ফিরিয়া আসিলে শৌচ করিবেন, জল ঢালিয়া দিতে হইবে। পায়ে চটিজুতা থাকিত, শরীর বড় কোমল হইয়াছিল। খালি পায়ে হাঁটিতে পারিতেন না।

"ঠাকুরের শরীর খুব সুস্থ ছিল, নইলে অত সাধনা সম্ভব হইত না। আহার নিদ্রা কিছুরই ঠিকানা ছিল না। আধ সের হইতে দশ ছটাক চালের ভাত খাইতেন। সুস্থ অবস্থায় এইরূপ। ভাবাবেশে অনেক সময় অত্যধিক খাইয়া হজম করিতেন। এক রেক চালের ভাত দুই একটি মৌরলা মাছ ও যৎ কিঞ্চিৎ ঝোলের সহিত খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এক ধামা মুড়ি ও একসের মিঠাই খাওয়ার কথাও শুনিয়াছি। এই সময়ে পেটের অসুখ ছিল। বার্লি প্রভৃতি পথ্য খাইতেন। ভাবের আবেশে এই খাইয়াই আবার খাওয়া। যদি বাড়ির লোকেরা বলিত 'এই খাইয়াছ আবার খাইতে চাহ কেন?' তখন একদিন বলিয়াছিলেন, 'কই কখন খাইলাম? এই তো দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিতেছি।' গোলাপ-মার

প্রদত্ত একখানা সর প্রায় সবটা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ তাহাতে পেটের অসুখ হয় নাই। শিশুকালে গণ্ডমালা (Scrofula) ছিল। পরে Cancer হয়। গণ্ডমালা ও Pthysis বোধ হয় এক পোকা হইতে হয়।"

উদ্বোধনের ঘরে মহারাজের উপস্থিতি কালে —মহাশয় বলিলেন, "ঠাকুর, রোগী ছুঁইতে পারিতেন না। কিন্তু বলরামবাবুকে রুগ্‌ণাবস্থায় স্পর্শ করিয়াও ক্লেশ বোধ করেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, 'রোগীর সকল মনটা শরীরের উপর থাকে, এজন্য রোগী ছুঁইতে পারি না।' —মহাশয় বলিলেন, "ঠাকুরের গভীর ভাব সহজে প্রকাশ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। 'যোগ আর কি? ভগবানের সহিত মনের যোগ।' "

—মহাশয় অন্য একদিন বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর বলিতেন, 'নিজেকে কখনও হীন মনে করবি না। তুই কি কম রে? তুই যে বিরাটের অংশ।' বস্তুত বিরাটের কোন ক্ষুদ্র অংশই ফেলিবার নহে। উহার অভাবে অঙ্গহানি হয়। সকল অংশই সমান। প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। একজনের কাজ অন্যে করিতে পারে না। নানা উদ্দেশ্য সাধনার্থ নানা মূর্তির সৃষ্টি। কোনটাই অনাবশ্যকীয় নহে। এজন্য একটা অন্যটার চেয়ে হেয়ও হইতে পারে না।"

মহারাজ মধ্যে মধ্যে যে গীতার দু-একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন তাহা বেশ সহজ বোধ হইত। এখানে প্রশ্নোত্তর ছলে দু-একটির উল্লেখ করা গেল।

প্রঃ "শুধু কর্মের দ্বারা ভগবান লাভ হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কি?"

উঃ "নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই জ্ঞান বা ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞান আত্মায় স্বভাবত আছে। চাপা পড়ায় উহা প্রকাশ পাইতেছে না। চাপা সরিয়ে দেওয়াই নিষ্কাম কর্মের কার্য। বস্তুত চিত্ত শুদ্ধ হইলেই অতি সত্বর জ্ঞানোদয় হয়। মহাভারতে, পতিব্রতা রমণী, যিনি সাধুকে ধর্মব্যাধের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তিনি পতিসেবা প্রভৃতি কর্ম দ্বারাই তো জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। গীতায় আছে, 'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।' (৩/২০) একজন নহে, জনকাদয়ঃ শব্দ রহিয়াছে।

প্রঃ "কর্ম শব্দের অর্থ কি জপ-তপ?"

উঃ "না, কর্মের উক্ত প্রকার অর্থ টীকাকারেরা করিয়াছেন। নতুবা অর্জুনকে তো শ্রীকৃষ্ণ ঘণ্টা নাড়িতেই বলিতেন। তা না করাইয়া মহাযুদ্ধে লাগাইলেন।" ডাক্তার মহারাজ—"বৈষ্ণবেরা বলেন, 'কর্ম—হরিতোষণম্।' "

(১৪)

প্রঃ "অর্জুন কি অহংজ্ঞানশূন্য হইয়া ভগবৎ চালিত হইয়া কর্ম করিয়াছিলেন?"

উঃ "তা নয় তো কি? বিশ্বরূপ দর্শনের পরেও যদি অহং থাকে, তবে আর কি হইল? 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'[১] ইত্যাদি তো আছেই।"

প্রঃ " 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' ইত্যাদি শ্লোকে 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ কি?

উঃ "গুরু এবং শাস্ত্র বর্ণিত উপদেশাদির বিস্মরণ হইয়াছিল। যে সকল নীতি (principle) অবলম্বন করিয়া অর্জুন আপনাকে উন্নীত করিতেছিলেন মোহবশত সে সকল ভুল হইয়া গিয়াছে। ভয়, ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি মিলিয়া অর্জুনের মোহের উৎপত্তি হইয়াছিল—ইহাই সহজ অর্থ। অদ্বৈতবাদীরা 'স্মৃতি' অর্থে আত্মজ্ঞান ইত্যাদি বুঝাইয়াছেন। তাঁহারাও বেশ অর্থ করিয়াছেন।" এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাধনার কথা উঠিল। মহারাজ বলিলেন, "বৈষ্ণবেরা সাধনায় অগ্রবর্তী হইয়া, যখন অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহারা উহা এড়াইয়া ভগবানের সহিত সম্বন্ধটাই

১ নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥—গীতা ১৮।৭৩

"হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার অজ্ঞান-মোহ নষ্ট এবং আমার যথার্থ স্বরূপের স্মৃতি হইয়াছে। আমি এখন নিঃসংশয় ও স্থির হইয়াছি, তোমারি উপদেশ পালন করিব।"

স্থায়ী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ভগবানের সহিত একীভূত হওয়া সাধনের অন্তরায় মনে করিয়া ঐ ভাব উপস্থিত হইবার উপক্রমেই তাঁহারা সাবধান হইয়া থাকেন। বস্তুত শান্তভাব যাহা অদ্বৈত সাধনের চরম, বৈষ্ণবেরা তাহাই নিম্নে রাখিয়াছেন। তাঁহারা emotional sideটা (ভাবের দিকটা) বাড়াইয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে ভগবানে অর্পণ করাই চরম কার্য মনে করেন। emotion-এর চরম হইতেছে মধুরভাব।" কথাপ্রসঙ্গে নর-নারায়ণের কথা উঠিল। মহারাজ বলিলেন, "নারায়ণ আসিলেই নর তাঁহার সঙ্গী হন। অর্জুন নরের অবতার।"

প্রঃ " 'অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্' ইত্যাদির অর্থ কি?

উঃ "অধিষ্ঠানম্ (উপযুক্ত দেশ) কর্তা (উদ্যমশীল কর্তা) করণং চ পৃথগ্বিধম্ (সতেজ ইন্দ্রিয়) বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টাঃ (একরূপ চেষ্টায় অকৃতকার্য হইলে অন্যভাবে কার্যারম্ভ) দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।"

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদির অর্থ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"ধর্ম যাগযজ্ঞাদি কর্ম পুরশ্চরণ জপ ইত্যাদি; লোকমান্য তিলকের অর্থ, ধর্ম=মহাভারতোক্ত পিতৃমাতৃসেবা, অতিথিসেবা ইত্যাদি। কিন্তু এই অর্থ পরিত্যজ্য, যেহেতু ঐ সকল উপায় অবলম্বন পূর্বক অনেকে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিক ঘেঁষা হইয়া কর্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুনশ্চ গীতায় পুরুষকারের ভারি প্রশংসা; ঐ পুরুষকারেরও যে সীমা আছে তাই গীতাকার এই শ্লোকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।"

প্রঃ "তন্মাত্রা কাহাকে বলে?"

উঃ "তন্মাত্রা—রূপরসাদির সূক্ষ্ম অবস্থার নাম। রূপরসাদির বোধ বা সম্যক স্ফুরণ কতকগুলি সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম stage-এর (অবস্থার) মধ্য দিয়া fully developed (পূর্ণ বিকাশ) হয়; ঐ অতিসূক্ষ্ম ভাবের নাম তন্মাত্রা।"

* * *

মহারাজ ব্যাখ্যা করিলেন—"মৈত্রী=সমানের সহিত মিত্রতা, করুণা=নিম্নস্থের প্রতি সদয়ভাব, মুদিতা=উচ্চ স্থানীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আনন্দভাব—ভগবৎ শক্তি ইঁহার মধ্যে প্রকট হইয়াছে এই জ্ঞানে আনন্দ প্রকাশ। উপেক্ষা=নিন্দাকারীর প্রতি রুষ্ট না হওয়া, গা না দেওয়া। অনেক শব্দের প্রাচীন অর্থ প্রচলিত নাই, যেমন 'কৃপণ' শব্দের। কৃপণ=কৃপার পাত্র। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ=দৌর্বল্য হেতু আমি কৃপার পাত্র হইয়াছি। দৌর্বল্য আমায় কৃপার পাত্র করিয়া আমার স্বভাব বদলাইয়া দিয়াছে।"

মহারাজ সাধনার কথা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিত না হইলে কদাচিৎ বলিতেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—"বর্ষাকাল সাধনার উপযুক্ত কাল নহে, তখন ধ্যান করিতে বসিলেই ঘুম আসে। আমাদের ঐরূপ হয়। মনের চাঞ্চল্য সেই সময়ে বাড়ে। শীতকাল ধ্যানের উপযুক্ত সময়। ধ্যান যাহারা করিবে তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া আবশ্যক। ঘি, মাখন ইত্যাদি খাওয়া ভাল।"

প্রঃ "কুণ্ডলিনী শক্তিকে সর্পাকৃতি কল্পনা করি কেন?"

উঃ "ঠিক কারণ বলা যায় না। বহু জন্মের সংস্কার স্তূপীকৃত হইয়া আছে, যেন সাপের ভিড়। অথবা যখন কুণ্ডলিনী জাগেন তখন সাপ যেরূপভাবে এঁকে বেঁকে চলে কুণ্ডলিনী সেরূপভাবে উঠেন। ঠাকুর কুণ্ডলিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন—'তোমরা সাপ দেখেছ'?"

প্রঃ " 'পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' ইত্যাদির অর্থ কি?"

উঃ "অপরে যদি তাহার ধর্ম উত্তমরূপে পালন করিবার ফলে আনন্দ বা প্রশংসা পায় দেখ, তাহাতে তাহার পথ অবলম্বন করিবার ইচ্ছা তোমার হইতে পারে। এরূপ করিলে ক্ষতি হইবে।"

(১৫)

প্রশ্নঃ "ঠাকুরকে অবতার-বরিষ্ঠ কেন বলা হয়?"

উত্তরঃ "একঘেয়ে নয়। সকল temperament এ suit করে। অন্য অবতারের সহিত comparison হইতেছে না। প্রকাশ লইয়া বিচার। এই অবতারে প্রকাশ অধিক।"

প্রঃ "নিরাকার ধ্যান কাহাকে বলে?"

উঃ "ভূতশুদ্ধির সময় সহস্রারে যে পরমাত্মার ধ্যান হয়, উহাই ঠাকুরের নিরাকার ধ্যান। যখন মূর্তি ভাল না লাগিবে তখন ঐ নিরাকার ধ্যান করিবে।" গুরু ও ইষ্ট সম্বন্ধে কথা হইতেছে—মহারাজ বলিলেন, 'ইষ্টমূর্তির পরিবর্তে গুরু মূর্তির ধ্যান যদি ভাল লাগে, তখন গুরু মূর্তিই ধ্যান করিবে। ইষ্ট গুরুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।"

প্রঃ "জপ ধ্যান ভাল লাগে কি প্রকারে?"

উঃ "অভ্যাসের ফলে জপ ধ্যান ভাল লাগে। সাত্ত্বিক সুখের লক্ষণ জানতো? 'অভ্যাসাৎ রমতে যত্র।' পরে, একবার জপেই আনন্দ আসিবে।"

প্রঃ "শুধু মন্ত্র জপ দ্বারা (অর্থবোধ না করিয়া বা পুরা মনোযোগের সহিত না করিয়া) সিদ্ধিলাভ হয় কি?"

উঃ "তন্ত্রে তো বলিয়াছে, 'জপাৎ সিদ্ধি।' হবে বইকি। মন্ত্র জপের দ্বারা অনেকটা অভ্যাস তো হয়। ঈশান মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর বলিতেন— 'ওরে, বামুন ডুবে যা।' তিনি খুব জপ-পরায়ণ ছিলেন ও বিদ্যাসাগরের মতো দাতা ছিলেন। সারাদিনের পর খাইতে বসিয়া, আগত ভিক্ষুককে আহার্য প্রদান পূর্বক নিজে সামান্য মাত্র আহার করিয়া থাকিতেন। ঈশান মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে উক্ত কথা আমরা স্বামীজীর নিকট শুনিয়াছি।"

প্রঃ "দুর্গা প্রতিমায় সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি জুড়িয়া দেবার প্রথা কবে হইতে হইল?"

উঃ "পূজা বিধিতে বরাবরই ঐসব দেব-দেবীর কথা আছে। উহারা প্রতিমারূপে না থাকিলেও উহাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রাদি পাঠ এবং ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থাদি রহিয়াছে।"

—মহাশয় বলিলেন, "রাজা গণেশের সময় ঐ সকল মূর্তি, মূল প্রতিমার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। এখনও কোন কোন বাটিতে মহিষাসুর-মর্দিনী মূর্তি মাত্রই প্রতিমায় থাকে।

হরিশবাবু আজ উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন।

মহারাজ—"ঠাকুর বলতেন, 'হরিশ যেন জ্যান্তে মরা।' কথাটি ঠিক, ও চলিত ফিরিত কিন্তু মনটা ভিতরে থাকিত—যেন body (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি) কাজ করিতেছে। ঠাকুর ওকে বাড়ি যাইতে বলিয়াছিলেন, 'স্ত্রী প্রভৃতি কষ্ট পাইতেছে, একবার গিয়ে দেখে-শুনে আয়।' হরিশ উত্তর করিয়াছিল, 'ওসব ভাল নয়, ওদের কথা শুনতে নাই।' শুনিয়া ঠাকুর খুব খুশি হইয়াছিলেন। বাড়ি যেতো না। শেষে তুক করলে। ঠাকুর দেখিয়া বলেন—'ওরে, ওরা সর্বনাশ করেছে। একেবারে উন্মাদ হয়ে গেল।' যাহা হউক ঠাকুরের কৃপায় অনেকটা সামলে গিয়াছিল। শশী মহারাজের বাপও প্রথমটা মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা ছেলেকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিন পরিষ্কার বলিয়াই ফেলিলেন, 'এত চেষ্টায়ও কিছুই হইল না।' কেনই বা হইবে? ঠাকুরের কাছে আমরা রহিয়াছি। শশী মহারাজের বাবা শেষে আমাদিগের সঙ্গেই থাকিতেন। সারা রাত্রি জপ ও মন্ত্র পাঠ করিয়া কাটাইতেন। প্রথম দুর্গোৎসব যেবার মঠে হইল, উনিই তন্ত্রধারক ছিলেন। বিজয়ার দিন যাত্রা করিয়া রাখিলে সারা বৎসর, যাত্রার দিন-ক্ষণ দেখিবার আবশ্যক হয় না—আমাদের সকলকে তিনি এজন্য বিজয়ার দিন যাত্রা করাইয়া রাখিতেন। হরিশের শরীর খুব শক্ত ছিল। খুব ব্যায়াম করিত। উহার বয়স এখন ৬৭।৬৮, শরীর রুগ্ণ। পাগলা ছিট আছে।"

একদিন পল্টুবাবু উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথা উঠিল। প্রশ্ন—"ঠাকুর এদের পছন্দ করিতেন, অথচ উঁহারা এতটা হইয়া গেলেন কি করিয়া? ইহা বুঝিতেছি না।"

মহারাজ—"সবই যদি বোঝা যাইত, তবে আর কথা ছিল কি? তবে, ঠাকুর শক্তি প্রকাশের তারতম্য লক্ষ্য করিতেন। ছোট নরেনকেও ঠাকুর স্নেহ করিতেন।" —মহাশয় বলিলেন—"ছোট নরেন ঠাকুরের উৎসবেও কিছু দিত না।"

মহারাজ অন্য একদিন বলিতেছেন—"আমার বিবাহের জন্য বাবা ঠাকুরকে অনুরোধ করিতেছেন। 'আপনি একটু বলিলেই ও বিবাহ করিবে।' আমি উপস্থিত রহিয়াছি। উক্ত কথা শুনিয়াই বলিলাম, 'উনি বলিলেই আমি বিবাহ করিব কিনা? উহা শুনিয়া ঠাকুর একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'শুনেছ, ও কি বলে।' "

একদিন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। মহারাজ বলিলেন—"প্রথম আদি সমাজ, সেখান হইতে কেশববাবু বাহির হইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তারপর কুচবিহারের বিবাহ লইয়া শিবনাথবাবু প্রমুখ অনেকে বাহির হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরে নববিধান নাম গ্রহণ করিল। কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিয়াছি—খুব fiery (তেজ) ছিল। তিনি অতিশয় sincere (অমায়িক) এবং ভক্ত লোক ছিলেন। সুন্দর বক্তৃতা করিতেন, চেহারাও সুন্দর ছিল। শ্রোতারা খুব অনুপ্রাণিত হইত। শেষ দিকে রামায়ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতেন। লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিত।"

(১৬)

"সেকালে নীতিজ্ঞান কম ছিল। বেশ্যাবৃত্তি দোষের ছিল না। সক্রেটিসের যত discourse (আলোচনা) বেশ্যাবাড়িতেই হইত। কারণ, ঐরূপ স্থানেই অনেক পণ্ডিত লোকের সমাগম হইত। আমাদের দেশেও প্রায় সেইরূপই। অনেক পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এই দোষ অমার্জনীয় ভাবে রহিয়াছে। যেমন শঙ্খাসুর-কাহিনী। শঙ্খাসুর বড় বীর—স্ত্রী খুব সতী। বিধান ছিল, যিনি ঐ স্ত্রীর

সতীত্ব হরণ করিবেন, তাহার হস্তে শঙ্খাসুর বধ হইবে। স্বয়ং বিষ্ণু অসুর-স্ত্রীর সতীত্ব হরণপূর্বক শঙ্খকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর কাণ্ডটা দেখিয়া বিষ্ণুভক্তি থাকে কি? তবে ইহার আর একটি দিক হইতে পারে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ—সঙ্ঘ হইতে শঙ্খ অপভ্রংশ। সঙ্ঘকে শক্তিহীন করিতে না পারিলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কাটানো যায় না। তখন বৌদ্ধধর্মের পতনারম্ভ হইয়াছে। বিষ্ণু-অবতার সঙ্ঘের শক্তি হরণ করিলেন। ইহাই হয়ত শঙ্খাসুর-বধ কাহিনীর allegorical explanation (রূপক ব্যাখ্যা)। এটা ঠিক কিনা বলা যায় না। গয়াসুর বধ-কাহিনী বুদ্ধদেবেরই কথা। গয়াসুর এত পবিত্র হইয়া উঠিলেন যে তাঁহাকে দর্শন মাত্র লোক পবিত্র হইয়া যাইত। দেবতারা ভয় পাইলেন। তাঁহার পবিত্র দেহের উপর যজ্ঞ করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় দেবতারা প্রকাশ করিলে গয়াসুর বলিলেন, 'তথাস্তু।' তাঁহাদের নিগূঢ় ইচ্ছা বুঝিয়াই গয়াসুর চিরশয্যা গ্রহণ করিলেন। একটা শর্ত করিতে হইয়াছিল—'যেদিন পিণ্ড না পড়িবে, সেই দিনই উঠিব।' তাই পাণ্ডারা যাত্রী না আসিলে নিজেরাই পিণ্ড দেয়।

"মৃগদাবে, বুদ্ধদেব কঠোর সাধনা করিয়া অস্থিচর্মসার হইয়াছেন, তখন অন্য সাধনা আরম্ভ করিলেন। বোধিদ্রুমতলে অল্প অল্প করিয়া light (উপলব্ধি) পাইলেন। একদিন full light (পূর্ণ অনুভূতি) পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। কয়েকদিন ঐ স্থানে আনন্দ উপভোগ করিয়া মনে হইল, 'এই আনন্দ কি লোকসমাজে দিব না?' তখন হইতে প্রচার আরম্ভ। বুদ্ধদেব যখন দেহের কঠোরতার সাধনা ছাড়িয়া অন্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। এখন উহাদিগকে কাশী নগরীতে পাইয়া উপদেশ দিলেন। তারপর মৃগদাবে প্রচার।

"যিশুর চেহারার তিন রকম বর্ণনা আছে। যেটিতে ইহুদিদিগের মতে নাক একটু চাপা, সেইটিই ঠাকুর দেখিয়াছিলেন। ইহুদিরা বড় ধনী এবং দীর্ঘজীবী। ইহারা উপবাসাদি নিয়ম খুব পালন করে। Sermon on the Mount (শৈলোপদেশ) এবং বুদ্ধদেবের এক জায়গার উপদেশ অনেকটা মিলিয়া যায়। সন্দেহ হয় বুদ্ধের উপদেশের নকল। পোপের palace-এ (প্রাসাদে) রাফেল-

অঙ্কিত সব ছবি যেন সদ্য আঁকা মনে হয়। খ্রিস্টীয় লীলা সব আঁকা। মুসার প্রকাণ্ডমূর্তি! State carriage (রাজশকট) রহিয়াছে—ব্যবহার নাই। যখন পোপ একাধারে রাজা এবং ধর্মমূর্তি ছিলেন, তখন উহা ব্যবহৃত হইত। ২০।৩০ হাজার লোকের বসিবার মতো Amphitheatre (রঙ্গমঞ্চ) রহিয়াছে—সেখানে পশুর লড়াই, বিধর্মী বধ, মানুষে পশুতে লড়াই হইত।

উপাসনা-পদ্ধতি ও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কথা হইল। মহারাজ বলিলেন—"শঙ্করাচার্য কখনই বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির উপর কটাক্ষ করেন নাই; এখানে তিনি একান্ত উদার। তবে Philosophy (দর্শন) লইয়া আলোচনা কালে তিনি অদ্বৈতবাদকেই একমাত্র অবলম্বনীয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।"

এই সময় —মহাশয়ের একটি উক্তি একজন উত্থাপন করিলেন। তিনি কহিয়াছেন—"স্বামীজী নাকি মিস মূলারের নিকট বলিয়াছিলেন, 'আমি এমন তরঙ্গ উঠাইব, যাহাতে বুদ্ধদেবের চেয়েও অধিক বন্যা আসিবে।' মহারাজ শুনিয়াই বলিলেন, "অমন কোন উক্তি স্বামীজী করিয়াছেন কিনা আমার জানা নাই।"

জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে কথা চলিয়াছে। "এই মন্দির বৌদ্ধ মন্দির। পরে উহার উপর শঙ্করাচার্যের প্রভাব—অবশেষে উহা রামানুজের অধিকারভুক্ত। খাওয়া-ছোঁয়া সম্বন্ধে অবাধ স্বাধীনতা বৌদ্ধ প্রভাবের চিহ্ন। বিমলা-মন্দিরে পূজার তিন দিন বলি দেওয়া, বিবিধ মনোহর বেশ-করণ—শঙ্করাচার্যের অধিনায়কত্বে তান্ত্রিক প্রভাবের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান। এই মন্দির শঙ্কর-শিষ্যদিগের বিশেষ মঠ। গাড়ি গাড়ি বেলপাতা দ্বারা পূজা-অর্চনা হইত। সুভদ্রা মূর্তি নামে, কিন্তু ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে ইঁহার পূজা হয়। ইহাও তান্ত্রিক প্রভাব-প্রসূত। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ—ধর্মকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইত। ইহাই ভুবনেশ্বরীরূপে এখন সুভদ্রা নামে চলিতেছে।

"জগন্নাথের ভোগে ৫৬ রকমের জিনিস ব্যবহার হয়। ভোগ নানাবিধ—(১) দৃষ্টি ভোগ (২) উষ্মা ভোগ (?) (৩) আত্মবৎ ভোগ (৪) বৈষ্ণব মতে আত্মবৎ ভোগ। একজন লোকের খাইতে যে সময় লাগে, অন্তত সেই সময়টা

পর্যন্ত দরজা বন্ধ থাকে। ঐ মতে একই ভোগে নানা দেবতার ভোগ চলিতে পারে। রাধারানীর, শ্রীকৃষ্ণ এবং সখা-সখীর ভোগ এক ভোগেই হয়। একটা ভোগেই দীর্ঘ সময় লাগে। দ্বিতীয় মতে ভোগের উষ্মা ভাগ (?) দেবতা গ্রহণ করেন। প্রথম মতে, দৃষ্টিমাত্রেই ভোগকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"জগন্নাথের বিছানার নিকট পান্তাভাত, দই ইত্যাদি রাখা হয়—রাত্রিতে যদি ঠাকুরের আহারেচ্ছা হয়। দামোদর প্রভুর একটি নাম। একবার একটা পাথর মন্দিরের পয়োনালি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কিছুতেই আর পরিষ্কার করা যাইত না। একটা বজ্রপাত হইয়া ঐ পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল! ইহা সত্য ঘটনা।"

(১৭)

কথাপ্রসঙ্গে নিম্নের কথাগুলি সেদিন মহারাজ বলিয়াছিলেন।

"গঙ্গার মুখের কিছু উজানে, খানিকটা নদীর গভীরতা এত অধিক যে উহা মাপা যায় না। 'বরিশাল কামানের' কারণ নির্ণয় হয় নাই।

"সমগ্র বাংলাদেশটা বোধ হয় ভূমিকম্পের ফলস্বরূপ। দেখা যায় একটা পুকুর ভূমিকম্পের ফলে বালুময় হইয়া গেল।"

একদিন বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে কথা চলিয়াছে, "গুণ ও কর্ম ইহাই লক্ষ্যের বিষয়। জন্মগত জাতি নির্ণয়, বর্ণাশ্রম নহে। জ্যোতিষে ব্রাহ্মণ ধর্ম বর্ণ, ক্ষত্রিয় ধর্ম বর্ণ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এ বর্ণ পিতা মাতা বা জাতির বর্ণের উপর নির্ভর করে না। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ত ক্ষত্রিয় বর্ণ। ধাতু ও কাষ্ঠ প্রভৃতির মধ্যেও বর্ণভেদ আছে বস্তুত বর্ণভেদ সর্বত্র। Heridityর (পিতৃপুরুষের) কিছু প্রভাব থাকিতে পারে—ইহা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না।"

জগন্নাথদেবের মন্দিরের কথা বলিতেছেন। "জগন্নাথ দাস নামক এক মহাত্যাগী ভক্তের সহিত জগন্নাথের লীলাভিনয়ের অনেক কাহিনী আছে। ঐ সাধুর আমাশয় হইয়াছে। স্বয়ং জগন্নাথ তাহাকে শৌচ করাইয়া দিতেছেন।

তাহাতে সাধুর উক্তি—'কেনই বা রোগ দেওয়া, কেনই বা এত কষ্ট করা।' একদিন ঐ সাধুকে সঙ্গে লইয়া, নিকটস্থ এক ফলের বাগানে ফল চুরির উদ্দেশ্যে গমন। তাড়া খাইয়া সাধুকে রাখিয়া জগন্নাথের পলায়ন। 'ভালোরে ভালো আমাকে ফুসলাইয়া আনিয়া বিপদে ফেলিয়া নিজে পলায়ন।' তাড়াতাড়িতে প্রভু ওড়না ফেলিয়া আসিয়াছিলেন।"

ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবের কথা উঠিল। "এতবড় অন্নকূট ভারতের কুত্রাপিও নাই। ৫০,০০০ হাজার লোকের সমাবেশ এবং ২০,০০০ হাজার লোকের পংক্তি ভোজন। বসিয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিলে কত লোকে যে প্রসাদ পায় তাহার ইয়ত্তা নাই। জগন্নাথ ক্ষেত্রের প্রসাদ বিতরণের আয়োজন অবশ্য অদ্ভুত। ছত্রিশ জাতির ছোঁয়া মেলা, অথচ সকলেই ভক্তিভাবে প্রসাদ ধারণ করিতেছে।

"এই জগন্নাথ ঠাকুর প্রথম শবরদের ছিলেন। বনে জঙ্গলে লুকাইয়া উহারা তাঁহার পূজা করিত। পরে এক ব্যক্তি সন্ধান পাইয়া ঐ ঠাকুর দেখিবার নিমিত্ত উহাদের সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদের এক মেয়েকে বিবাহ করে। উহারা তাহার পীড়াপীড়িতে চক্ষু বাঁধিয়া ঠাকুরের স্থানে লইয়া গিয়া ঠাকুর দেখায়। ঐ ব্যক্তি সরিষা পুঁটুলি করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে পলাইয়া আসিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সঙ্গে লইয়া সরিষা গাছ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের স্থানে পৌঁছিয়া দেখে, ঠাকুর ভূমিকম্প হওয়ায় অদৃশ্য হইয়াছেন। ভক্তরাজা অতিশয় কাতর হইয়া প্রার্থনা করেন। উহার ফলে দৈববাণী হয়। 'চক্রতীর্থে সমুদ্রের তরঙ্গ সহায়ে যে কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিবে তাহার দ্বারা মূর্তি গড়াইয়া প্রতিষ্ঠা করিলে, তথায় আমি আবির্ভূত হইব।'

"সত্যই কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিল। কিন্তু উহা এত শক্ত যে তাহা ভেদ করা অসম্ভব হইল। তখন বিশ্বকর্মা ছদ্মবেশে মূর্তি গড়াইবার ভার লইলেন। চুক্তি রহিল যে, যে ঘরে মূর্তি গঠিত হইবে, সেই ঘরের দরজা বন্ধ থাকিবে। মূর্তি গঠন শেষ হইলে উহা খোলা হইবে। তৎপূর্বে কেহ উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে মূর্তি যতদূর গড়া হইয়াছে সেইরূপই থাকিবে।

"২।১ দিন ঠুকঠাক শব্দ শোনা গেল। তারপর ১৪ দিন কাজের কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। রাজা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কারিগর মরিয়া গিয়াছে ভাবিয়া দরজা খুলিয়া দেখেন, বিশ্বকর্মা সেখানে নাই এবং মূর্তিও অসম্পূর্ণ! ইত্যবসরে বিশ্বকর্মা উপস্থিত হইলেন—'তুমি অত ব্যস্ত হইলে কেন? আমি বিশ্বকর্মা। ২।৪ দিনের মধ্যেই মূর্তি সম্পূর্ণ করিয়া দিতাম। প্রার্থনাদির ফলে, ভগবৎ বাণী অনুসারে ঐ অসম্পূর্ণ মূর্তিই প্রতিষ্ঠিত হইল। স্কন্দ পুরাণের 'সূত সংহিতায়' এই কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আসল কথা ও নয়।

"বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিন Symbol (প্রতীক) ঐ তিন মূর্তি। অক্ষয় দত্তের উপাসক সম্প্রদায়ে এ বিষয়ে বেশ বর্ণনা আছে। কত ঝড় ঐ মন্দিরের উপর দিয়া গিয়াছে।

"সূর্যনারায়ণ নামে একখানা পাথর পাণ্ডারা দেখায়। খুব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখিবে একটি প্রকাণ্ড মূর্তি ঢাকা দিয়া ঐ মূর্তি খাড়া করা হইয়াছে। আমরা যখন প্রথম পুরী যাই তখন সূর্যনারায়ণই দেখিয়াছিলাম। পরে একখানি বই পড়িয়া আসল বিবরণ অবগত হইলাম। দ্বিতীয়বার গিয়া বাস্তবিকই সূর্যনারায়ণের পশ্চাতে বুদ্ধ মূর্তিই দেখিলাম। (কিন্তু মূর্তির গঠন দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, উহা কণার্ক হইতে আনীত সূর্য মূর্তি।)

"পুরীর মন্দিরে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন হইতেছে ছত্রিশ জাতির একত্রে আহার; বস্তুত আহারাদি বিষয়ে ছুঁৎমার্গ এখানে একটুকুও নাই। বৌদ্ধ প্রভাবের অবসানে, শৈব প্রভাব আরব্ধ হইল। তখন গাড়ি গাড়ি বেলপাতা দ্বারা জগন্নাথের পূজা হইত। মূর্তিত্রয়ের নিকট একটি কুকুরের মূর্তি ছিল। বৈষ্ণব প্রভাবের সময় উহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দেওয়ালে একটি কুকুরের মূর্তি আঁকা আছে। শৈব সন্ন্যাসীদের হাতেই মন্দির পরিচালনার ভার ছিল। বহু সন্ন্যাসী মন্দিরেই বাস করিতেন বৈষ্ণব প্রভাবের সময় উহারা গোবর্ধন মঠে আশ্রয় লইলেন। পাণ্ডারা আজকাল তিলক-কণ্ঠি ধারণ করে, কিন্তু অনেকেই শক্তি মন্ত্রের উপাসক। এখন জগন্নাথের গোপাল মন্ত্রে পূজা হয়। সুভদ্রার পূজা ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে হয়। পুরীর রাজাই মন্দিরের প্রধান সেবাইত। ইংরেজের

সহিত লড়াই হওয়ায়, অনেক জায়গা জমি উহারা কাড়িয়া লইয়াছে, নতুবা মন্দির সেবার জন্য বহু বিস্তৃত সম্পত্তি ছিল।

"—বৌদ্ধধর্মে বেদের কর্মকাণ্ডের কথা নাই। ঐ ধর্মে জ্ঞানকাণ্ডের উপাসনার কথাই রহিয়াছে। Ceylon-এর (সিংহলের) বৌদ্ধেরা হীনযান নামে অভিহিত। উহারা আসল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করায় মূর্তি পূজাদি গ্রহণ করে নাই। চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে মহাযান সম্প্রদায় বর্তমান। মহাযানীদের প্রধান গ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। গৃহস্থের জন্য কয়েকটি নীতিকথা মাত্র বলিয়া সন্ন্যাসীর জন্য নির্বাণ লাভের নানাপ্রকারের stage (অবস্থা) এবং উপায় বর্ণিত হইয়াছে। নির্বাণ প্রাপ্তির লক্ষণ-সকলের উল্লেখ আছে। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানমূলক। চলতি ভাষায় ধর্মপ্রচার বুদ্ধদেবই প্রথম করেন। পালি ভাষাই তখনকার প্রচলিত ভাষা ছিল। নূতন শব্দ তৈয়ারি করিয়া, জীবন্মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য উপর উপর দেখিলে, উহা বেদবর্ণিত জ্ঞানকাণ্ড হইতে পৃথক মনে হইতে পারে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে উহা জ্ঞানের ধর্ম স্পষ্ট অনুমিত হয়। তখন লোকে জ্ঞানের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেব হিংসাত্মক কর্ম বন্ধ করাইয়া পুনরায় জ্ঞানের পথ লোককে দেখাইয়া গিয়াছেন।"

(১৮)

একদিন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কথা হইতেছিল। মহারাজ বলিলেন, "আমরা যতদূর শুনিয়াছি, উনি বারদীর ব্রহ্মচারী, গয়ার পরমহংস ও আমাদের ঠাকুরের নিকট শিক্ষাদি পাইয়াছিলেন।"

প্রঃ "উনি কি খুব সাধন-ভজন করিয়াছিলেন?"

উঃ "তা কি করে বলবো?

বিজয় গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ি একদিন ঠাকুরের নিকট বলিতেছেন, 'বিজয়ের কি অবস্থা! সে হরিনামামৃত পানে বিভোর হইয়া থাকে।' শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—'ও বাবা, আমার কিন্তু না খেলে চলে না।'

"অন্য একদিন ঠাকুর কেশব ও বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এরা যেন গৌর নিতাই।' তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, তাহা হইলে আপনি কে? ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন—'আমি তাঁদের দাসের দাস।'"

প্রঃ "পুরীতে উহাকে (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে) নাকি কেহ বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহারই ফলে উঁহার মৃত্যু।"

উঃ "আমার তো সেরূপ মনে হয় না।"

আজ স্নানযাত্রা, এই দিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। উদ্বোধনের ঘর ৯টার মধ্যে জনশূন্য হইয়া গেল। মহারাজ মাত্র ঘরে রহিয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া নিকটবর্তী হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "বল।"

প্রঃ "আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন—যেমন কুণ্ডলিনী জাগরণ, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সেসব করিতেছি, কিন্তু তেমন সরস হয় না। অনেক সময়েই mechanical (প্রাণহীন) হইয়া পড়ে। ইহার কি করি?"

উঃ "প্রত্যহ একই জিনিস লইয়া থাকিলে কতকটা mechanical ভাব আসিয়াই পড়ে। তবে যেদিন যে সাধনটি ভাল লাগিবে সেই দিন অপর সাধনাংশ বাদ দিয়া ঐটিই লইয়া থাকিবে। এইরূপে হয়ত ২।৪ দিন একটি সাধনা বাদই থাকিবে। পরে দেখিবে উহা করিতে গিয়া সরসতা আসিতেছে।

"ধ্যান চিন্তা করিবার পূর্বে, ঠাকুরকে বেশ করিয়া ভাবিয়া লইবে। তাহা হইলে যাহা করিবে তাহাই ফলপ্রসূ হইবে। কখনও ভাবিবে তিনি সর্বত্র সর্বঘটে আছেন। তুমি তাহার মধ্যে ডুবিয়া আছ। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্'—এই ভাবটা চিন্তা করিবে। তিনি তোমার সকল খবর জানেন। তাঁহার নিকট কোন ভাবই লুকাইয়া রাখা যায় না। অতি গোপন ভাবও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

"নিষ্ঠা ও অভ্যাসের ফলও অবশ্য পাওয়া যায়। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সাধন করিলে মনের শক্তি বাড়ে। করিতে করিতে জিনিসও সরস হয়।"

গায়ত্রী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে বলিলেন—"ঠিকই আছে, কোন্ শব্দ পড়িয়া যায় নাই।" বৈদিক গায়ত্রীর উচ্চারণ শুদ্ধি দেখাইলেন—'বরেণ্যং' পদ পড়িবার সময় 'বরেণিয়ং'—এইভাবে পড়িতে হয়। শিব গায়ত্রীর মধ্যে 'ধিয়ঃ' শব্দ উহ্য রহিয়াছে। গায়ত্রী ছন্দের কথা বলিলেন—"তিন চরণ, প্রতি চরণে অষ্টাক্ষর।"

প্রঃ "ঠাকুরের বিষয় অনেক জানিয়াছি। পুস্তকাদি পাঠে উঁহার সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হইবার সুবিধা হইয়াছে, অথচ ঠাকুরের লীলাদি স্মরণ করিলে, তাঁহাকে জীবন্ত বোধ হয় না; ইহার কি করি?"

উঃ "কোন কিছু সরস করিতে হইলে heart (হৃদয়) এবং brain (মস্তিষ্ক) উভয়ের সহযোগিতা থাকা চাই। কেবলমাত্র brain-এর আশ্রয় লইলে জিনিস—mechanical (প্রাণশূন্য) হইয়া পড়ে। ঠাকুরের সম্বন্ধে যেসব তথ্য জানা হইয়াছে উহা হৃদয় স্পর্শ করিলে লীলাদি সরস ও জীবন্ত বোধ হয়।"

প্রঃ "কল্পনাশক্তির অভাবেই কি ঐরূপ হইতেছে?"

উঃ "ক্রমশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।"

প্রঃ "পূর্বে চাকুরি ছাড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল। একান্তে ভজন সাধনের জন্য মন খুব অস্থির হইত। এখন সে ভাবটা একেবারেই নাই। অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা হইতেছে না। তবে জপ-ধ্যান এবং সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠে মন অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে, ইহাও লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। পূর্বে যে চাকুরি ছাড়িয়া একান্তে সাধন ভজনের জন্য ব্যাকুলতা আসিত তাহা এখন আসিতেছে না কেন?"

উঃ "তা, নাই বা এল। শাস্ত্রে আছে, কোন কর্মের মধ্যে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতে করিতে যদি জ্ঞানলাভ হয়, তাহা হইলেও সাধক অভ্যস্ত কর্ম ছাড়েন না। ধর্মব্যাধেব কথা তো জান? মাংস বিক্রয়রূপ হীনকাজকেও তিনি জ্ঞানলাভের পরেও হীন বা পরিত্যাজ্য মনে করেন

নাই। তাঁর দিকে মন যখন রহিয়াছে, তখন অবস্থা পরিবর্তনের আবশ্যকতা কি? তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে যখন কিছুই হইবার নহে, তখন নিজে plan (কল্পনা) না করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করা ভাল। তিনি যেমন ঘটাইবেন নিজেকে তেমনি লাগাইবে। তাছাড়া অন্য environment (বেষ্টনী)এর মধ্যে পড়িলে, পুনরায় নিজেকে adjust (তদুপযোগী) করিতে বেগ পাইতে হয়। অতএব যাহা আছে, থাকুক উহারই মধ্যে তাঁহার চিন্তা করিয়া যাও। তাঁহার ইচ্ছায় যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে, তখন তাহাই accept (গ্রহণ) করিবে।"

প্রঃ বরাবরই দেখিতেছি শুধু ক্লাসে lecture work (পাঠ্য বিষয়ে বক্তৃতা) করিয়া গেলে কর্তব্য হানি হয়। ছেলেদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। এজন্য অনেকটা সময় ঐ কার্যে ব্যয় হয়। ফলে ধ্যানকালে ছেলেদের কথা এবং কিসে তাহাদের কল্যাণ হয় প্রভৃতি অনেক সময় মনে আসে। ইহাতে বিক্ষেপ ভাব বড় বেশি হয়—ইহার কারণ কি?

উঃ "ও তো আসবেই; তবে বৎসরে ছুটির মধ্যে ২।১ মাস সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে হয়। তাহা হইলে সবদিকই বজায় থাকে। নতুবা একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়।"

(১৯)

এই প্রসঙ্গে কর্মযোগের কথা উঠিল। " 'ফলে তোমার অধিকার নাই।' অর্থাৎ অনেক factors (ব্যাপারের) উপর কর্মের ফল নির্ভর করে। তোমার চেষ্টা একটি মাত্র factor, কিন্তু 'বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা'—সাধক, প্রাপ্ত-কর্তব্য সম্পাদনার্থ নানারূপ চেষ্টা করিয়া যাইবেন, কিন্তু ফল না পাইলে মোটেই উদ্বিগ্ন হইবেন না। একটি factor সুসম্পন্ন হইলেও, অপরগুলির যোগাযোগ না ঘটিলে

কার্য সিদ্ধ হয় না। যেমন ধর, একটি ছেলে হয়ত বেশ উত্তর দিয়াছে। পরীক্ষক সাংসারিক কার্যে উদ্বিগ্ন—এমন সময় কাগজ দেখিবার ফলে ছেলেটি ফেল হইয়া গেল, হয়ত অন্য সময় হইলে ছেলেটি পাশ হইয়া যাইত। এখানে ছেলের কৃতকার্যতা তাহার চেষ্টা বা উদ্যমের উপর নির্ভর করে না। এজন্য নিজের কর্তব্য ষোলআনা করিয়া কি ফল হইবে না হইবে তাহাতে খেয়াল না দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকার অভ্যাসকেই কর্মযোগ বলে।"

এই প্রসঙ্গে, পরীক্ষকদের কর্তব্যজ্ঞান ও মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার কত আবশ্যকতা, তাহা উল্লেখ করিলেন। পুনরায় বলিলেন, "ফলের আকাঙ্ক্ষা করিলেই worries (দুর্ভাবনা) আসিবে।"

প্রঃ " 'সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী' শব্দে কি সকল কর্মত্যাগ বুঝায়? না অহংবোধ শূন্য হইয়া কর্ম করা বুঝাইতেছে?"

উঃ "প্রাপ্ত কর্ম যথাসাধ্য করিয়া যাও। উহা সংসাদনের জন্য নানারূপ plans বা চেষ্টা তো চলিবেই। কিন্তু অপর কর্তব্য জুটাইয়া লইও না। যাহা পাইয়াছ তাহাই সুচারুরূপে করিবে। গায়ে পড়িয়া কাজ জুটাইয়া লওয়া দোষের। বস্তুত দেখাই যায় যে, কতকগুলি কাজের ভার লইয়া কোনটাই উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না। ফলে উদ্বেগাদি উপস্থিত হইয়া চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মায়।"

প্রঃ "মনকে matter (জড়পদার্থ) বলে কেন? উহার seat (অবস্থিতি স্থান) শরীরের কোন স্থানে আছে?"

উঃ "শিরদাঁড়ার মধ্যে, ভ্রূ-মধ্যের চক্র হইতে নাভিচক্র পর্যন্ত স্থানে, মনের বাস।"

প্রঃ "মন কি কতকগুলি Nerves (স্নায়ু) সমষ্টি?"

উঃ "না, Nerves (স্নায়ু সমষ্টি) হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ। দেহপাত হইলে Nerves (স্নায়ু সমষ্টি) পড়িয়া থাকে। কিন্তু মন দেহীর সহিত চলিয়া যায়। নাভিচক্র, হৃদয়পদ্ম, কণ্ঠ ও ভ্রূ-মধ্যস্থিত পদ্মে মনের বিভিন্ন কাজ হয়। ঐ সকলই

মনের modification (বিকৃত বা রূপান্তর) সমস্ত impressions (সংস্কার) ভিতরে রহিয়াছে। উহারই নাম চিত্ত বা mind-stuff । বাহ্য-জগৎ, ইন্দ্রিয় সহায়ে ভিতরে নীত হইলে যে vibration (কম্পন) হয়— অর্থাৎ এটি কি ওটি রূপ সঙ্কল্প-বিকল্প, উহাই মনের এক অবস্থা। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি দ্বিতীয় অবস্থা। উহাই বুদ্ধি। অহংকার তৃতীয় অবস্থা। অন্তঃকরণ internal organs."

দ্রষ্টা ও সাক্ষীর কথা হইল। "সাক্ষী একেবারে passive (উদাসীন) অবস্থা। দ্রষ্টা ও সাক্ষী কখনও কখনও একার্থ বোধক। সাধারণত দ্রষ্টা ভাবে যেন কিছু interest (কৌতূহল) আছে। যখন আত্মস্থ অবস্থা তখন মনাদির লোপ হইয়া যায়।"

মহারাজের সহিত এই আমার শেষ আলোচনা। রাত্রি ১০টারও বোধ হয় বেশি হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে মঠে গিয়া (মহারাজ মঠে গিয়াছিলেন) প্রণাম মাত্র করিয়া আসিলাম। যে ঘরে আজকাল office অর্থাৎ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেই যে ঘর, সেখানে ফরাস পাতা। এক-ধারে একখানা চৌকির উপর মহারাজ বসিয়াছিলেন। প্রণাম করিলে বলিলেন, "আজই ফিরিবে?"

উদ্বোধনের ঘরে, একদিন পুরীতে সমুদ্রতীরে ভ্রমণকালে (১৯২৫ সালের মে মাসের শেষ ভাগ) ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কথা বলিয়াছিলেন। মহারাজের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ছিল। যাহা একবার শুনিয়াছেন, তাহা প্রায়ই ভুল হইত না। কত লোকের নামই না তাঁহার কণ্ঠে থাকিত।

মিশনের সম্মেলন (Convention) সম্বন্ধে কথা হইতেছে। সুধীর মহারাজ ততটা উৎসাহ দেখাইতেছেন না। মহারাজ বশীবাবু ও নি– মঃকে সাহস দিতেছেন। "একজন লোক লাগিয়া থাকিলেই কাজ নিষ্পন্ন হইয়া যায়। কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরাই লাগিয়া যাও। যদি ঠাকুরের কাজ হয় অবশ্যই উহা সুসম্পন্ন হইবে। আমার জীবনে এটি প্রত্যক্ষ—যাহা ধরিয়াছি তাহাই হইয়াছে। আমাদের মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখ না কেন? এক একটি ব্যক্তি এক একটি প্রতিষ্ঠানে লাগিয়া থাকায় উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুধীর

মহারাজের উপর নির্ভর কেন করিতেছ? আজ যদি তিনি নাই থাকেন, তাতেই বা ভয় কি? তোমাদের উৎসাহী দেখিলে তিনি উদ্যোগী হইবেন নিশ্চয়ই। কারণ কাজের লোক উৎসাহ পাইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে, তিনি অনেক কাজ করিয়াছেন। হয়ত পূর্বের ন্যায় উৎসাহশীল না থাকিতে পারেন। সে অনেক বক্তৃতাদি করিয়াছে—স্বামীজীর সকল বইগুলির বঙ্গানুবাদ করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা Grand father (অতি বৃদ্ধ) হইয়াছি, সে father (বৃদ্ধ) হইয়াছে তো বটেই। আমরা সর্বদাই তোমাদের পেছনে আছি, কোনও Controversial (জটিল ব্যাপার) হইলেই আমাদিগকে দেখাইবে। বস্তুত ব্যাপার আর কি? নিজেদেরই সব লোক। General meeting-এ (সাধারণ সভায়) দু-একটি বক্তৃতা হইবে; তাছাড়া অন্যত্র অল্প-সংখ্যক লোক লইয়া আলোচনা। নি—যে প্রবন্ধ লিখিয়াছে (খ্রিস্টোৎসব উপলক্ষে) উহাই তো একটি paper হইতে পারে। পরন্তু এতকাল, এইসব ব্যাপার লইয়া রহিয়াছ, যদি স্বামীজীর ভাব ঠিক ঠিক না বুঝিয়া থাক এবং উহা অপরের নিকট যথাযথ ধরিতে না শিখিয়া থাক, তবে পরিতাপের বিষয়! অতএব Nervousness পরিত্যাগ কর। গীতায় পড় নাই, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বলং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।' আমাদের মিশনের আদর্শ পরিষ্কার করিয়া সকলের নিকট ধরিতে হইবে। আমার শরীর একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে—দেখ না মোটরে মঠে গিয়াছি, সেখানে তো বসিয়াই ছিলাম। পুনরায় উহাতেই ফিরিয়াছি, ইহাতেই হাঁপাইয়া গিয়াছি। তবে উপদেশ, suggestion (মন্তব্য) যাহা চাও পাইবে। পরন্তু এই সম্মেলন যদি না হয় তবে লজ্জার কথা। তোমাদের শুধু নয় আমাকে শুদ্ধ লজ্জিত হইতে হইবে। চিঠিপত্র অনেক জায়গায় লেখা হইয়াছে। এমন কি invitation (নিমন্ত্রণ পত্র) পর্যন্ত গিয়াছে।"

(২০)

একদিন আলোর Refraction (আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন) এর কথা হইতেছিল। জলের মধ্যে একখানি লাঠির কিয়দংশ আছে অপরাংশ ঊর্ধ্বে। মনে হয় যেন লাঠিখানি ভাঙিয়া দুইভাগ হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। মহারাজ বলিলেন—"Refraction-এর (গতিভঙ্গের) জন্যই mirage বা মরীচিকা হয়। পুরীতে দেখিয়াছি, সমুদ্রটা যেন বাড়িয়া গিয়াছে—যেখানে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়ান যায়, মনে হয় যেন সমুদ্র সেখানেও বাড়িয়া চলিয়াছে। বালির নিকটস্থিত বায়ু হইতে যেন আগুনের শিখা উঠিতেছে, যেমন কলিকার উপরিস্থিত গরম টিকা হইতে আগুন উঠে।

"গুজরাটে ট্রেনে চলিয়াছি, মাইলের পর মাইল, রাস্তার ধারে জলরাশি—তার মধ্যে গাছপালার প্রতিবিম্ব! এত জল কোথা হইতে আসিল? পরে বুঝিলাম ইহাই মরীচিকা।

"ভগবান লাভ হইলে পর জগৎ এই মরীচিকাবৎ। জ্ঞানলাভের পর জগৎ থাকিয়াও নাই—অর্থাৎ জগৎ অসার। উহাতে আসক্তির কিছুই নাই। যেমন মরীচিকার জল দৃষ্ট হইলেও লোকে ঠিক জানে উহাতে জল নাই। তেমনি নামরূপ থাকিলেও, উহা মায়া বা ভ্রম জ্ঞানজনিত বোধ হয়।

"প্রথম, ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া চাই। নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিবার পর যখন পুনরায় মনবুদ্ধির এলাকায় আসিতে হয়, তখন জগৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পূর্বে যেমন ছিল তেমনি প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু উহাতে আসক্তি হয় না।

"ভ্রম দূর না হইবার পূর্বে লোকে মরীচিকাতেই জল প্রত্যাশা রাখে, কিন্তু সম্যক জ্ঞান হইলে, মরীচিকা দেখিয়া থাকে বটে, তবে জলের প্রত্যাশা ছাড়িয়া দেয়। জ্ঞানলাভের পরও তদ্রূপ জগৎ পূর্ববৎ দৃষ্ট হইলেও, উহার অস্তিত্ব নাই বোধ হওয়ায় অনাসক্তি আসে।

"Science (বিজ্ঞান) অনেক জিনিসের প্রতি আসক্তি কমাইয়া দেয়। ধর 'রং'-এর ব্যাপার—বস্তুত কোন পদার্থেরই নিজস্ব রং নাই। সূর্যরশ্মি সাতটি

মূল রং-এ বিভাজ্য। কোন বস্তুর উপর উহা পড়িলে, সেই বস্তু উক্ত সাতটি রং-এর কতকগুলিকে আত্মসাৎ করে এবং কতকগুলিকে গ্রহণ করে না অর্থাৎ reflect (প্রতিফলিত) করে! যেগুলি পরিবর্জিত হয় তাহাদের রং-এতেই ঐ বস্তু রঞ্জিত হয়। আমরা সুন্দর দেখিয়া মুগ্ধ হই। বস্তুত যে মূল নীতির উপর রূপের বাহার নির্ভর করে, সেই দিকে লক্ষ্য করিলে বস্তুর উপর হইতে আসক্তি উঠিয়া যায়। কারণ রূপের বাহার সূর্য হইতে প্রাপ্ত। এখন যেটিকে সুন্দর দেখিতেছি অবস্থাভেদে তাহার সৌন্দর্য লুপ্ত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে।

''অপর উদাহরণ 'স্পর্শ'। বস্তুত আমাদের একটি মাত্র ইন্দ্রিয়। উহা স্পর্শ। দেখা, শুনা, গন্ধ পাওয়া, জিহ্বার রস বোধ, সকলই 'স্পর্শ' ব্যতিরেকে অসম্ভব। আমাদের গীতায়ও আছে 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে'। (৫/২২) এই শব্দ স্থান ও কাল ভেদে নানাভাবে (মধুর, কর্কশ ইত্যাদি) প্রতীয়মান হয়। বায়ুর কম্পনের উপর শব্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। এখানেও স্পর্শ।

''মন যখন অন্য ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তখন শব্দ থাকিয়াও না থাকার সমান। স্বামীজীকেই দেখিয়াছি যখন তিনি পড়িতেন, তখন তাঁহার নিকট গোলমাল করিলেও শুনিতে পাইতেন না।

''গিরিশবাবুর খুব concentration (একাগ্রতা) ছিল। তিনি নিজে বই লিখিতেন না। হুকা হাতে করিয়া পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন। চিন্তা করিতে করিতে ছবির মতো সব প্রতিভাত হইত। তখন বলিয়া যাইতেন, এত দ্রুত বলিতেন যে উহা লিখিয়া যাওয়া ভারি দুরূহ হইত। অবিনাশ প্রভৃতি লেখক ছিল। ব্যাঙবাবুও কিছুদিন লিখিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক একখানা নাটক রচনা হইত।''

প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক (Violinist) Ole Bull-এর কথা উঠিল—''উনি Norwayকে স্বাধীন করিবার কয়েকজন বিশিষ্ট উদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতেন। Manager (কার্যকারক) ফাঁকি দিয়া উপার্জিত অর্থ লুণ্ঠন করিত। একটি রমণী Bull-এর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না হইয়া উহাকে

বিবাহ করেন। Mrs. Ole Bull-এর নিকট শুনিয়াছি Mr. Bull ভারি সংযত পুরুষ ছিলেন। Performance-এর (অভিনয়ের) দিন কফি বা চা ছুঁইতেন না— nerves-এর (স্নায়ুর) উপর control (কর্তৃত্ব) থাকিবে না—হাত কাঁপিয়া যাইতে পারে। Performance-এর (অভিনয়ের) শেষে চা কফি খাইতেন।

"কাল, মঠে muscle control (পেশী সংযম) দেখাইল। উহা বস্তুতই অদ্ভুত। সংযত না থাকিলে ঐ শক্তি লোপ পাইবে। শরীরের উপর কতটা মন উহার দিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে পূর্বে ঐ সকল ব্যাপার খুব ছিল। এমন সব নর্তকী ছিল যাহারা ইচ্ছাক্রমে হাতের গহনা কিংবা কব্জির গহনা নাচাইতে পারিত অথচ হাত একেবারেই নড়িত না।

"শরীরের উপর মন সর্বদা দিলে ক্রমশ পতনই হয়। হরি মহারাজদের এক পুরোহিত ছিল—Rectum (গুহ্যদ্বার) দ্বারা জল গ্রহণ পূর্বক তাহা বাহির করিয়া দেওয়া তাহার খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল তাহার ঐ শক্তি রহিল না।

"কর্মযোগ প্রথম ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই ছিল। গীতাতেই রহিয়াছে, 'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্' ইত্যাদি।

"বৌদ্ধধর্ম, সাধু সন্ন্যাসীর দিক হইতে দেখিলে, জ্ঞান-প্রধান—'ধ্যান ধারণ' ইত্যাদি। শান্তভাবের উপাসনা। সর্বেন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্বক ভগবদ্ধ্যান। গৃহস্থের পক্ষে কিন্তু কর্মকাণ্ড। খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকই ধর্ম সম্বন্ধে কেবল গোলমাল করিয়া বসে। —চা—ভারি বুদ্ধিমান ও Well-read-man (সুপণ্ডিত) কিন্তু সে—র একান্ত ভক্ত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু উহার কোন বিশেষত্ব দেখি নাই।

"অমন সুপণ্ডিত লোক—মহাশয়—দলভুক্ত! —র মতো পণ্ডিত—এর পা পূজা করিয়া থাকেন!

"একবার গীতা ক্লাসে বক্তৃতা করিতে গিয়াছি—বৃদ্ধ নরেন সেন সভাপতি। বিদেশীর নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না, ইহা ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলাম। আমাদের সর্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে, এতটুকু জিনিসও নিজেদের নাই। এক ধর্ম মাত্র লইয়া আছি, ইহাও যদি—বিদেশীর

নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে কি পরিতাপের বিষয়। এই কথায় নরেন সেন খুব বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেক্রেটারি অমৃতলাল সরকার খুব খুশি হইয়াছিলেন।

"স্বামীজী বলিলেন, 'ধর্মবিষয়ে ওরা আমাদের চেলা, ওরা আমাদের পা পূজা করবে।'"

প্রশ্ন ঃ "কেন সুপণ্ডিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যক্তিরাও অনুপযুক্ত গুরুর আশ্রয় লয়?"

মহারাজ ঃ "সম্ভবত যোগ বিভূতি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। যাঁরা প্রকৃতই ধার্মিক তাঁরা জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ বিভূতি কিছুই লোককে দেখাইতে চাহেন না। বস্তুত ওসব চট করে দেখানও যায় না। পরন্তু উহার গোপনেচ্ছাই সাধুর স্বাভাবিক। ঠাকুরের অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। স্বামীজীকে উহা দিতে চাহিলেন, তিনি উহা লইলেন না।

গুরুকে খুব দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইবে। যোগীন স্বামীকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'গুরুকে রেতে দেখবি দিনে দেখবি তবে বিশ্বাস করবি।' তিনি আরও বলিতেন, 'সাধু হয়েছিস বলে কি বোকা হবি?'

"গিরিশবাবুর লেখার শক্তি অদ্ভুত। তিনি বলিতেন, 'আমি খোলার ঘর হইতে পরমহংস পর্যন্ত সকল অবস্থার লোক দেখিয়াছি। আমার অঙ্কিত চরিত্রের সমালোচনা বাহিরের লোকে কি করিবে?'

"শঙ্করাচার্য, গিরিশবাবুর অতি চমৎকার সৃষ্টি—অমন আর কে লিখিবে? তিনি যখন Acting (অভিনয়) করিতেন, Stage-এ (রঙ্গমঞ্চে) একটা ধর্মভাব আনিয়া দিতেন।

"স্বামীজী কাহাকেও তাচ্ছিল্য করিতেন না। আমরা যাদের সহিত কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ করিতাম, তিনি দুই ঘণ্টা বসিয়া তাদের সহিত আলাপ করিতেন। একজন রাঁড়ের দালালের সহিত দুই ঘণ্টা বসিয়া সকল বিষয় জানিয়া লইলেন। সব শিখিয়া রাখিলেন। আবশ্যক মতো খাটাইবেন।

"এখন ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু শুনিতেছি, সবই তো স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, নূতন কিছুই শুনিতেছি না। ঠাকুর বলিতেন, 'নরেন ধ্যানসিদ্ধ।' ছেলেবেলা ধ্যানকালে জটা বাহির হইত কিনা দেখিতেন। ধ্যানছলে ঐ বয়সেই দীর্ঘকাল দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতেন। ছেলেদের কোন বিষয়ে আঁট নাই। পরমহংসেরা তাই ছেলে সঙ্গে রাখে। জ্ঞানলাভের পরও স্বভাবের প্রভাব কাটাইয়া উঠা যায় না। বালকদের মনে এতটুকু রাখিবার ঢাকিবার ভাব থাকে না। রাঙা কাপড় মা দিয়াছে, কতই না যত্ন! খেলনা দিলেই ঐ কাপড় নিঃশেষে ফেলিয়া দিল! এবং উহার কথা এককালেই ভুলিল। অভ্যাস ত্যাগ করিলেও আমাদের মন কিন্তু চিরকালের সংস্কার ছাড়িতে পারে না।"

(২১)

২।২।২৬, স্বামীজীর কথা হইতেছে।

"আইন পড়িবার জন্য স্বামীজী ফি জমা দিয়াছিলেন। একদিন মনে হইল 'সবই বৃথা, ঠাকুর আর বেশিদিন থাকিবেন না,' অস্থির হইয়া নগ্নপদে কাশীপুরের বাগানে আসিয়া উপস্থিত। সে সময়ে বাড়ির অবস্থা অতিশয় খারাপ। মাস্টার মহাশয়ের নিকট হইতে কয়েক মাসের খরচ ধার করিয়া মার হাতে দিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, 'আমাকে আর বিরক্ত করিও না।' কাশীপুরে উন্মত্তবৎ আসিতেছেন। ন—বাবু (গিরিশবাবুর ভাই) তাঁহাকে নগ্নপদে যাইতে দেখিয়া, কি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, 'আমার আমি মরিয়াছে।' স্বামীজী গিরিশবাবুকে গোপনে মনের অবস্থা জানাইয়া আসিয়াছিলেন। বাগানে পৌঁছিয়া ঠাকুরের নিকট বায়না করা। 'তুই কি চাস' ঠাকুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। 'সমাধিস্থ হইয়া থাকিব কখনও কদাচিৎ একটু নামিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি পূর্বক পুনরায় সমাধিস্থ হইব।' শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'তোর কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে, তুই অতবড় আধার। তোর অমন বুদ্ধি হইল কেন? সমাধি অভ্যাস পূর্বক ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে যাইবি কেন?' 'তা যা মশায় ভাল হয় করে দেন।' 'আচ্ছা, বাড়ির একটু গোছাল করিয়া আয়, সব হইবে।'

"স্বামীজী ঠাকুরের নির্দেশমত সাধনাই আরম্ভ করিলেন। অবস্থার পর অবস্থা লাভ হইল—অবশেষে একদিন সন্ধ্যার পূর্বে শয়ন অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধি! অনেকক্ষণ পরে দেহ বুদ্ধি একটু ফিরিল। তখন নিজের মাথা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব বোধ যেন নাই। 'ও গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল'—গা টিপিয়া গোপালদা বলিলেন, এই 'তোমার শরীর এইখানেই রহিয়াছে'—কিন্তু হুঁশ হইল না। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়ায়, তিনি হাসিয়া বলিলেন—'থাক শালা, আমাকে প্রতিদিন জ্বালাতন করে, এখন বুঝুক।' অনেক সময় পরে, সমগ্র শরীরের অস্তিত্ব বোধ ফিরিয়া আসিল। দেখ, শরীরের প্রতি মায়া কি সুগভীর। নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছে, এমন ব্যক্তিরও 'শরীর কোথায় গেল' ভয়।

"ঠাকুরের সহিত দ্বিতীয়বার দেখার দিন স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়াছিল। সমাধির আসনে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'তুমি এ কি করলে। আমার যে মা, ভাই আছে।' এবারকার সমাধির পর স্বামীজী ঠাকুরের নিকট আসিলে ঠাকুর ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন—'সব তো দেখলে, এখন বাক্স বন্ধ, চাবি আমার কাছে রহিল, সময় হইলেই উহা পাইবে।'

"স্বামীজী সারাজীবন ঐ সমাধিলাভের জন্য ছটফট করিয়া বেড়াইয়াছেন। একবার হৃষীকেশে খুব জ্বর হইয়াছিল, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল—নাড়ি পাওয়া যায় না। আমরা মনে করিলাম এইবার শেষ। যাহা হউক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল। তখন বুঝিয়াছিলাম, কাজ করিতে হইবে এবং মৃত্যুর পূর্বে ভিন্ন আর সমাধি লাভ হইবে না।' এখন হইতে কি কাজ করিতে হইবে এবং কি রকম ভাবে উহা সম্পন্ন হইবে, এইসব চিন্তা আসিতে লাগিল। স্বামীজীর, ঠাকুরকে ধ্যানে দেখিয়া তৃপ্তি হইত না। সাদা চক্ষে অন্যবস্তুর ন্যায় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সর্বদা মনে হইত কেহ তাঁহার হাত ধরিয়া রহিয়াছে। অসুখের সময় ঐ হাত তাঁহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া দিত। তিনি অসুস্থ অবস্থায় কাহাকেও গায়ে হাত দিতে দিতেন না। অবশ্য এ কথা সেবককে জানিতে দেন নাই। দেহরক্ষার কয়েক মাস পূর্বে বলিযাছিলেন, 'এখন আমার হাত ছাড়িয়া দিয়াছে। পূর্বের মতো কেহ

আমার হাত ধরিয়া নাই।' ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে, স্বামীজীকে একমাসের মধ্যে নানা সাধনা করাইয়া নির্বিকল্প সমাধি পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। He was the rock upon which the whole structure was to be built. (স্বামীজীকে ভিত্তি করিয়াই ধর্ম-সঙ্ঘ রচিত হইয়াছিল।)

"ঠাকুরের সমাধিকালে, Stethoscope (বুক পরীক্ষার যন্ত্র) সাহায্যেও Heart beat (হৃদয়ের স্পন্দন) পাওয়া যাইত না। চক্ষুর পলক পড়ে কিনা দেখিবার জন্য এক ডাক্তার চক্ষুর মধ্যে আঙুল দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। Life (জীবন) তখন কোথায় থাকে? কে জানে? হয়তো Brain-এ (মস্তিষ্কে)।" অপর একদিন স্বামীজীর বিষয় বলিতে গিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন—"পুনরায় নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিব এবং ঠাকুরের একটি স্থান করিতে হইবে" এই ভাব মাথায় লইয়া স্বামীজী দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়াছেন।

"ঠাকুর না আসিলে আমরা আর বেশি কি হইতাম? স্বামীজী একটা মস্ত উকিল হইতেন, আমি হয়ত একটা বড় ডাক্তার হইতাম!"

২।২।২৬, মীরাবাঈ ও রূপ গোস্বামীর বৃন্দাবনে সাক্ষাৎকালীন কথা উঠিল। "এক কৃষ্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষ নাই"—মীরা বলিয়াছিলেন। গীতায় আছে—অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ (৭/৫) স্বস্থজীব আপনাকে দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত মনে করিলেই 'প্রকৃতি' হইয়া গেল।

"ঠাকুরের নিকট বিভিন্ন ভাবাপন্ন ভক্তের আগমনে তাঁহার তত্তৎ ভাবের আবেগ হইত। কেহ হয়ত শ্রীকৃষ্ণের উপাসক—ঐরূপ ব্যক্তি, ঠাকুরের নিকট আসিলে, ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ ভাব আসিত। শক্তি ভাবাপন্ন সাধকের সান্নিধ্যে শক্তির আবির্ভাব অনুভব করিতেন। মহাভাব—শ্রীরাধিকা, চৈতন্য মহাপ্রভু ও ঠাকুরের জীবনে দেখা গিয়াছে। ঠাকুরের সখীভাব সাধনের কথাও এখন সকলেরই জানা আছে।"

২৮।১২।২৫ অ—সম্বন্ধে কথা হইতেছে। একজন বলিলেন, "সেখানে নানা বিভাগ আছে। একটিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। বায়ুমণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ

সংগ্রহ পূর্বক উহা কাজে লাগান হয়। সাধু Ideas (ভাব) দেন, শিষ্যেরা তাহা work out (কার্যে পরিণত) করে।" মহারাজ এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে Laboratory (বিজ্ঞানের যন্ত্রাগার) আছে কি? একজনে ভাব দিবে অপরে তাহা কার্যে পরিণত করিবে, এই কি হয়? তাছাড়া গবেষণা কোন বিষয়ে করিতে হইলে তন্ময় হইয়া উহাতে লাগিয়া থাকিতে হয়।"

অতঃপর যোগ-বিভূতির কথা হইতেছে। একজন এক সাধুর গন্ধদান করিবার শক্তির কথা বলিলেন। মহারাজ বলিলেন, "আমার বাবার নিকট হোসেন নামীয় একটি ফকিরের কথা শুনিয়াছি। তাহাকে কোন জিনিস আনিতে বলিলে সে ঘরের কোণে গিয়া 'হসরৎ, হসরৎ' বলিয়া ডাকিত। তখন উপর হইতে ধুলো বালি তাহার হাতের উপর পড়িত এবং প্রার্থিত বস্তুও আসিত। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তুও সে আনিতে পারিত। একদিন বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে—এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি মূল্যবান ঘড়ি লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল; পরে ঐ ফকিরের নির্দেশ মতো উহা ঘড়ির মালিকের বাড়িতে আলমারির মধ্যে বিশেষ একজায়গায় পাওয়া গেল। হোসেন বড় বড় দোকানে জিনিস কিনিবার ভান করিয়া, পছন্দমত ছুঁইয়া আসিত। ঐ ঐ জিনিস সেই সেই দোকান হইতে আশ্চর্য উপায়ে হোসেনের বাড়িতে চলিয়া যাইত!

"দক্ষিণে ভ্রমণকালে স্বামীজী এক ব্যক্তির অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া উহাকে কিছু দেখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু সে রাজি হয় না। পরে একদিন তার খুব জ্বর, জ্বর সারাইবার জন্য স্বামীজীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। স্বামীজী ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া—'জ্বর সারিয়া যাইবে' বলিয়া দিতেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। তখন সে তাহার শক্তি দেখাইল। ময়লা একখানা কাপড় পরিয়া ও একটি চাদর গায়ে দিয়া সে স্বামীজীর নিকট বসিল এবং চাদরের নিচে হইতে নানাবিধ দ্রব্য বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে একঝোড়া শিশিরে ভেজা সদ্য ফোটা গোলাপফুল বাহির হইল।

"ভূতানন্দেরও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে থাকিত।

প্রাতঃকালে উঠিয়া মণিরামপুর (সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি যেখানে) গিয়া শৌচ করিত। হাতে মাটি দিত কাঁকুড়গাছি আসিয়া—আমরা দেখিয়াছি। তারপর বৈকালে চারটার সময় গঙ্গায় অনেকক্ষণ স্নান করিয়া ১০।১৫ জনের উপযুক্ত আহার্য খাইত। একবার এক ফকির, সর্ববিধ ব্যারাম সারাইবে, এই ঘোষণা করিয়া দিল। দলে দলে লোক একঘটি জল ও কিছু জিরা লইয়া রাস্তায় দুইসারি করিয়া বসিয়া থাকিত। ফকির চলিতে চলিতে ঐ জলের উপর ফুঁ দিত। এই ব্যাপার দেখিয়া ভূতানন্দ ঘোষণা করিয়া দিল যে সে খড়ম পায়ে দিয়া গঙ্গা পার হইবে।

"বহু জন সমাগম হইয়াছে; ভূতানন্দ গঙ্গা পার হইতেছে না দেখিয়া লোকে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে বুঝিয়া সে উহাদিগকে বলিল—'সব ব্যাকুব, এ কভি হোতা হ্যায়?'

"একবার দাঙ্গাহাঙ্গামা করায় পুলিশ ধরিতে আসায় সে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। পুলিশও পিছু পিছু ছুটিতেছে। তখন রূপনারায়ণ নদী সম্মুখে পাইয়া সে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিল এবং তীরস্থ পুলিশকে বলিল 'আও'। পুলিশ কুমীরের ভয়ে নদীতে নামিল না।

"স্নানকালে তাহাকে কুমীরে ধরিয়াছিল, এমন জোয়ান যে কুমীরকে শুদ্ধ তীরে টানিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ঐ কামড়েই septic হইয়া সে মারা গেল!

"শুনা যায় তার জন্মতিথি উপলক্ষে নানা দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহপূর্বক ভোগ দেওয়া হয়। দেখা যায় ঐসব ভোগ কেহ খাইয়া গিয়াছে। কুসোর চিবানো, ডাবে জল নাই, অন্যান্য দ্রব্যও অনেক পরিমাণে ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। একবার বাবুরাম মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তিনি গিয়া খাদ্যাদি ঐরূপভাবে ভুক্ত দেখিয়াছিলেন। Healing balm-এর দুর্গাপদবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও সে উহা দেখিয়াছে।

"আমাদের ঠাকুরের অসীম শক্তি ছিল। অপরের মনে ধর্মভাব জাগাইবার শক্তি তাঁহার আশ্চর্য রকমের ছিল। কাহারও যোগ-বিভূতি থাকিলে উহা, ঐ ঐ ব্যক্তি তাঁহার সমীপস্থ হইলে নিজের মধ্যে আসিত এবং উহার বিভূতি নষ্ট

হইয়া যাইত। বস্তুত বিভূতি ভগবান লাভের একান্ত বিঘ্নকারক। ঠাকুরের পবিত্র সঙ্গে যোগবিভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তির বিভূতি লোপ পাওয়ায় উহার ধর্মজীবনের অন্তরায় দূর হইত।"

স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকণা

সংগ্রাহক ঃ গুরুদাস গুপ্ত

[এই অধ্যায়ের স্মৃতিকণাগুলি গুরুদাস গুপ্তের ডায়েরি হতে স্বামী চেতনানন্দ কর্তৃক সংকলিত।]

১। স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

আমি তখন কোন কাজে বাড়িতে গিছলাম। হঠাৎ শরৎ মহারাজের পত্র পেলাম, "শ্রীশ্রীমহারাজ ব্রহ্মচর্য দিচ্ছেন, তুমি চলে এস। তোমারও ব্রহ্মচর্য দীক্ষার ব্যবস্থা করে দেব।" আমি তদনুযায়ী বাড়িতেই মস্তক মুণ্ডন করে কলকাতায় রওনা হই। হাওড়ায় গাড়ি পৌঁছিবার কথা রাত ৭টায়। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে পৌঁছিতে রাত ১১টা হলো। ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘোড়ারগাড়ি ও ট্যাক্সি করবার পয়সা নেই। বেডিং মাথায় করে হেঁটে বাগবাজার চলেছি। হয়ত রাত দেড়টা বা দুটার সময় উদ্বোধনে পৌঁছে দরজায় একটু কড়া নাড়তেই ওপর থেকে শব্দ এল, "কে রে? রামগতি এলি নাকি?" "হ্যাঁ," বলায় শরৎ মহারাজ স্বয়ং নিচে নেমে দরজা খুলে দিলেন। তারপর তিনি ঢাকা দেওয়া ভাত ও শয়নের স্থান দেখিয়ে বললেন, "খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় ঐ খানটায়।" এখন সকলেই নিদ্রামগ্ন। তিনি বালকটির জন্য রাত জেগে বসে আছেন। মা-ও কি এরূপ করেন?

ব্রহ্মচর্য তিনি দেওয়ালেন। পরদিন এক সাজি পদ্মফুলসহ আমাকে মঠে পাঠিয়ে বললেন, "আমি আসছি, তুই আগে যা।" মঠে গিয়ে রাজা মহারাজকে বললেন, "তুমি যদি দয়া করে এ ছেলেটিকে ব্রহ্মচর্য দাও।" মহারাজ—"শরৎ, তুমি যখন বলছ, এর আর কথা কি?" তারপর তিনি পরেশ মহারাজকে আমার নামটা লিখে নিতে বললেন।

ব্রহ্মচর্যের পর দীক্ষা (মন্ত্র) নেবার জন্য আমার খুব ইচ্ছা। রাজা মহারাজের

কাছে দীক্ষা নেবার খুব আগ্রহ। শরৎ মহারাজকে বলতে, তিনি বললেন, "আমি তোকে মন্ত্র দেব। যথাসময়ে হবে।" আমি পীড়াপীড়ি করায় বলেছিলেন, "তোকে যা বলছি তাই শোন। এতে তোর ভাল হবে।" আমি আর কি করি। ব্রহ্মচর্যের দুবছর পরে দীক্ষা হলো। সাধু হবার আরও যে প্রবল অন্তরায় ছিল, তাও তিনি সম্যক সমাধান করে দিয়েছিলেন।

কাশীতে থাকাকালীন গা টিপবার সময় একদিন ধমক দিয়েছিলেন। তদবধি ঠিক করেছিলাম যে তিনি স্বয়ং না বললে আর সেবা করব না। এই এক অভিমান ছিল। দ্বিতীয়ত তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমাকে আলমোড়া যেতে হয়েছিল; ইচ্ছা ছিল আমি তাঁর নিকট যাই। তিনি পত্রে লিখেছিলেন, "তোমার সহিত আবার দেখা হবে।" মৃত্যুশয্যায় তাঁর নিকটে যাওয়া মাত্র, আমার দিকে তাকালেন এবং তাঁর একখানি হাত আমার কোলের ওপর রেখে টিপে দেবার ভাব প্রকাশ করলেন। আমার অভিমান চলে গেল এবং তার সহিত সাক্ষাৎও হলো।

২। স্বামী হরানন্দ

শরৎ মহারাজের সঙ্গে বেড়াতে গেছি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত। ফিরবার সময় পথের পাশে চিনাবাদাম ভাজছে দেখে বললেন, "চিনাবাদাম খাবে?" আমি অবাক। তিনি বললেন, "চিনাবাদাম ভাল জিনিস। কেনো না।" কাপড়ের এক কোণায় চিনাবাদাম নিলাম। তিনি এক হাত আমার ঘাড়ে রেখে অন্য হাতে আমার কাপড়ের মধ্য থেকে বাদাম নিয়ে খেতে লাগলেন। ঐ যে আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন, সেই থেকে তিনি আমার বন্ধুর মতো হয়ে গেলেন। তাঁর বিশাল গাম্ভীর্য অতঃপর আর আমাকে ভীত বা ত্রস্ত করেনি। এরপর আমি বন্ধুর মতো তাঁর সঙ্গে কত আলাপ আলোচনা করেছি।

কোন একটা ঘটনা উপলক্ষ করে একদিন তাঁকে বললাম, "এখন তো সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য সবই দিচ্ছেন, তখন কেন দেননি? দক্ষিণ হস্ত দিয়ে কারো ঘাড় ধরলে যেমন আঙুলের সংস্থিতি হয়, সেভাবে তিনি আঙুল সংস্থান-পূর্বক বললেন, "তিনি ঘাড় ধরে করিয়ে নিচ্ছেন।"

বাবুরাম মহারাজের কলেরা হয়েছে সংবাদ পেয়েই শরৎ মহারাজ বেলুড় মঠে এসে রইলেন। কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সকলকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন। ভাণ্ডারি ও পূজারিকে বিশদভাবে তাদের কি করণীয় বলে দিলেন। ঐ তো ১০।১৫ মিনিটের কথা। তাঁর উপদেশগুলি যথাযথ কাঁটায় কাঁটায় পালিত হতে থাকল। একবারও তাগাদা দেওয়া বা ভুল সংশোধন করতে হলো না। তাঁর "প্রভুশক্তি" বিপুল ছিল—কেউ না মেনে পারত না।

জয়রামবাটী মন্দির প্রতিষ্ঠা। অনেক রাতে শুতে আসতাম। শরৎ মহারাজ যে ঘরে শুতেন, তার বারান্দায় দরজার নিকট একটু জায়গায় বিছানা করতাম। বহু লোক সমাগম। যাতে আমার জায়গাটায় অন্যে শয়ন না করে সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। সান্যাল মহাশয়কে আমার শোয়ার জায়গাটা আগলে রাখবাব জন্য বলেছিলেন, "ছোকরা অনেক রাতে কাজ সেরে শুতে আসে, ওর জায়গাটা অন্যে না অধিকার করে তুমি দেখো।"

জনৈক সাধু relief-এ যেতে চায় না, অথচ লোকাভাব। আপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে তার মনে কুভাব আসে। শরৎ মহারাজ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে বুকে হাত রেখে বললেন, "আমাকে বিশ্বাস করিস তো? আমি বলছি, তুই যা। তোর কুভাব আসবে না।"

শরৎ মহারাজ মঠ থেকে উদ্বোধনে ফিরবেন। ঝড় উঠেছে, গঙ্গায় খুব তুফান। নৌকায় ঢেউ-এর জল উঠছে এবং ছেঁচে ফেলা হচ্ছে। আমরা কয়েকজন নৌকার মাঝি। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "তোরা নিয়ে যেতে পারবি?" আমরা বললাম, "পারব। এখন মহারাজ যদি পারেন।" শরৎ মহারাজ বললেন, "তোরা যদি পারিস, তো আমিও পারব।" তিনি নৌকায় উঠলে ঐ তুফানের মধ্যে আমরা মহারাজের ভরসায় সানন্দে চলেছি। সালকে এলে তিনি বললেন, "আমি স্টিমারে পার হয়ে যাই; তোরা মঠে ফিরে যা।" বাগবাজার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে আমাদের মহা কষ্ট হবে—একে তুফান তাতে উজান—এজন্যই তিনি ঐরূপ করতে চাইলেন। তারপর বললেন, "ফিরে যেতে পারবি তো?" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন, "যা পারবি, মা

আছেন।" আমরা খুব কষ্টে ফিরলাম। মঠের কাছে এলে দাঁড়ের ঝপাঝপ শব্দ দূর হতে শুনে বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা ডাঙায় উঠলে ভাণ্ডারিকে ডেকে বললেন, "দে, দে, ওদের ভাল করে খাবার দে।"

৩। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা

মা ঠাকুরানীর শরীর যাওয়ার পর একদিন শরৎ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করেই দেখি 'মা-ই' বসে আছেন। বিস্মিত ও ভীত হয়ে ঘরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো না। যোগীন-মাকে এই কথা বলতে তিনি বললেন, "এর আর কি? শরতের শরীর অবলম্বনে মা-ই রয়েছেন।"

মেয়েরা প্রথমটা খুব লজ্জা করত। পরে দেখি তারা মহারাজের সামনে মাথায় কাপড় না দিয়ে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলছে। একদিন আমাকে বললেন, "তোমার সম্বন্ধে আমি এখন নিশ্চিন্ত। দেখলাম ঠাকুর তোমাকে ধরে আছেন। আশ্রমে ইচ্ছা করলে আসতে পার, কিন্তু আমার মত যদি জানতে চাও, আশ্রমে যোগদান না করাই ভাল।"

একদিন মহারাজকে বললাম, "আপনি আমার জন্য এত করেন কেন? শেষে কি আমাদের প্রতি মায়া-মমতায় বাঁধা পড়বেন?" মহারাজ তখন চুপ করে রইলেন। কয়েক দিন পরে বললেন, "দেখ, মঠে গিয়েছিলাম। ঠাকুরকে বললাম, 'ঠাকুর, তবে কি এদের মায়ায় বাঁধা পড়লাম?' ঠাকুর কিন্তু বাপু বললেন, 'না, তুই ওদের মধ্যে আমাকেই দেখতে পাস, এজন্য ওদের প্রতি টান হয়।'"

৪। স্বামী গৌরীশানন্দ

বুড়োবাবা সচ্চিদানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "যোগীন স্বামী, রাজা মহারাজ প্রভৃতি থাকতে আপনি শরৎ মহারাজের শিষ্য হলেন কেন?

বুড়োবাবা ঃ "দেখ, কাশীতে সঙ্কটমোচনের নিকট দণ্ডী সন্ন্যাসীদের এখন যে আশ্রম হয়েছে, তার পিছনে শরৎ মহারাজকে দেখি—কী সৌম্য মূর্তি! মুখে চোখে আনন্দের ভাব। তিনি তখন কাশীতে সাধনা করছিলেন।

তারপর বরানগর মঠে যাই। শুনেছিলাম বরানগর গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে ধারে চলেছি—গঙ্গা থেকে দূরে যাচ্ছি না। অবশেষে একজন বরানগর মঠের অবস্থিতি স্থান বলে দিল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মঠে পৌছে দেখি—অতি প্রসন্নবদনে একটি লোক গামছা পরে বড় হাণ্ডা মাজছে। তখন আঁধার হয়ে গেছে। সেই প্রসন্ন বদন দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, এই তো সেই যাকে কাশীতে দেখেছি। আশ্চর্যের বিষয়, মুখশ্রীতে যে আনন্দভাব তাঁর তপস্যাকালে দেখেছিলাম, হাণ্ডা মাজার কালেও সেই আনন্দভাবের বিন্দুমাত্র বিকৃতি বা হ্রাস হয়নি।

দেখ, এমনটা আর কারো মধ্যে দেখিনি। না যোগীন স্বামীর না মহারাজের মধ্যে।

* * *

গর্ভধারিণী মায়ের অসুখ। মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ মহা উৎসাহ-সহ আমাকে মঠ থেকে তাঁকে দেখবার জন্য পাঠালেন। শরৎ মহারাজ ও জিতেন মহারাজের সঙ্গে নৌকা করে কলকাতায় যাচ্ছি। অনেক কৌতুকজনক কথাবার্তা হচ্ছে।

শরৎ মহারাজ (আমাকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ "ওর অবস্থা যেন কেউ আদা চিবুচ্ছে। ঝাল লাগছে কিন্তু ছাড়তে চাইছে না। ভয় করছে? বাড়ির লোকেরা আসতে দেবে না? আমাকে একখানা চিঠি লিখ—সব ঠিক হয়ে যাবে। আর চিঠিই বা কেন? অমনিই (হাতখানা ঘুরিয়ে) হয়ে যাবে। তবে যদি নিজের ভিতরে গোলমাল থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।" মনে হলো তিনি আমার ভার নিয়েছেন।

* * *

বশীশ্বর সেন উদ্বোধনে এসে শরৎ মহারাজকে প্রণাম করেই উঠলেন। মহারাজ বললেন, "বস্ না। কোথায় যাচ্ছিস?"

বশীবাবু : "মিঃ চ্যাটার্জীকে প্রণাম করে আসি।"

শরৎ মহারাজ : "চ্যাটার্জী কে?"

বশীবাবু : "জি. চ্যাটার্জী [গদাধর চট্টোপাধ্যায়]। ওপরে আছেন।"

তখন হাসির রোল উঠল।

* * *

দু-একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী বহু অর্থব্যয়ে নানাবিধ উপকরণ-সহ বেলুড় মঠে ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুজন ব্রহ্মচারী অসৎ বৃত্তিসম্পন্না দাতার প্রদত্ত অন্ন ঠাকুরের ভোগ সত্ত্বেও গ্রহণে অসম্মতি প্রদান করলে কৃষ্ণলাল মহারাজ তাদের খুব ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু তাতেও তারা মত পরিবর্তন করল না। আমি সবে রেঙ্গুন থেকে ফিরেছি। আমিও ঐ দুই ব্রহ্মচারীর মতাবলম্বী; তবুও ভোজনকালে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলাম। ঐ ব্রহ্মচারিদ্বয় ঠাকুরের নিয়মিত ভোগের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করল। তারপর কৃষ্ণলাল মহারাজ উদ্বোধনে শরৎ মহারাজকে জানালেন। আমি যখন উদ্বোধনে গেলাম, শরৎ মহারাজের কাছে আমাকে বকুনি খাওয়াবার জন্য বেশ সরস করে দোষারোপ করলেন।

শরৎ মহারাজ ধীর হয়ে বললেন, "দেখ কেষ্টলাল, কারো ভাব ভঙ্গ কখনই করতে নেই। ওরা একটা বিশেষ ভাবের প্রেরণায় ঐ সকল অন্ন গ্রহণ করেনি; কেন তুমি ওদের ওপর জুলুম করবে? ঠাকুরের প্রত্যহের বরাদ্দ ভোগ হতে ২।৪টা অন্ন খেতে পারে। সে অন্ন তো ছিল। না কি তা এখন দেওয়া হয় না? আর যদি নাই থাকে তবে একবেলা উপোস থাকলেই বা ক্ষতি কি? রাতে তো যথারীতি রান্না হবে। একবেলা উপবাসে কি হয়?" কৃষ্ণলাল মহারাজ অপ্রতিভ হলেন।

* * *

মঠে দুই সাধুতে খুব ঝগড়া। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "শরৎ মহারাজ আসছেন, তিনি তোমাদের বিচার করবেন।" আমাকে সাক্ষী হতে বললেন।

যথাকালে শরৎ মহারাজ এলেন। তাঁকে আদর আপ্যায়ন করে বসিয়ে আসামি ও সাথীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের বললেন, "দেখ শরৎ মহারাজ perfect gentleman (খাঁটি ভদ্রলোক)।"

শুনেই শরৎ মহারাজ হেসে বললেন, "ও বাবুরামদা, তুমি সাক্ষীকে prejudiced করে দিচ্ছ। ইত্যাদি।"

* * *

শরৎ মহারাজ পাটনায় গিয়েছেন। রাস্তায় যেতে একটা বাড়ির সামনে এলে একটা ছোট অজানা অচেনা ছেলে সাধু দেখে বলল, "আমাদের এই বাড়ি। আসুন এখানে।" মহারাজ হেসে বললেন, "এখন না। এক জায়গায় যাচ্ছি। ৫টার সময় আসব।"

ছেলেটি এ কথা তার মার কাছে বলেছে। মা বললেন, "কই সাধু তো এলেন না। তুই গিয়ে আর একবার তাঁকে অনুরোধ কর।" বালক বলল যে তিনি তো নিজে আসবেন বলেছেন। তবুও মার নির্দেশে ছেলেটি শরৎ মহারাজ যেখানে ছিলেন সেখানে গেল। পৌঁছে দেখে মহারাজ বের হচ্ছেন এবং বললেন, "তোদের বাড়ি যাচ্ছি। তুই কেন এলি?" তারপর ছেলেটির সঙ্গে তাদের বাড়িতে গেলেন এবং সৎপ্রসঙ্গ করে ফলমিষ্টি খেয়ে ফিরে এলেন।

৫। স্বামী বিজয়ানন্দ

লাটু মহারাজ হাড়ারবাগে একটা বাড়িতে থাকতেন। শরৎ মহারাজ কাশীতে পৌঁছে লাটু মহারাজকে ঐ বাড়িতে দেখতে যান। শরৎ মহারাজের মতো এমন ভালবাসাপূর্ণ কথা কখনও শুনিনি। তিনি লাটু মহারাজকে বললেন, "সাধু, তোমার পা একটু টিপে দি।" বলেই পা টিপতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কথা হতে লাগল। লাটু মহারাজ আমাকে বললেন, "যা, মিরাট থেকে যে গড়গড়া

পাঠিয়েছে, তাতে করে তামাক সেজে দে।" গড়গড়া নূতনই রাখা ছিল। আরও বললেন, "বাবা, আমি কি মহারাজ যে এ গড়গড়ায় তামাক খাব? আমার থেলো হুকাই ভাল ছিল।"

ঐ স্থানে উভয়ের মিলন যেন রাম ও ভরতের মিলন। দুই শরীর—কিন্তু প্রাণ যেন এক। পা টিপতে টিপতে শরৎ মহারাজ বললেন, "ভাই, তুমি আমাদের লাটসাহেব। একটু সেবা করলাম।"

লাটু মহারাজ বললেন, "শরোট, আমরা যে কে, কিভাবে এসেছি, একটু লিখে রেখো। স্বামীজী শরীর থাকতে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে ছাপা হবে।"

উভয়ের মুখের ভাব যে কি রকম, তা ভাষায় বলতে পারি না। যেন শরৎ মহারাজ লাটু মহারাজের সঙ্গে মিশে গেছেন এবং লাটু মহারাজ শরৎ মহারাজের সঙ্গে মিশে গেছেন। দুজনে তামাক খাচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এরূপ ভ্রাতৃভাব এ জগতে দেখি না, দেখিবও না। দেবলীলা দেবতারাই বোঝেন, জীবের সাধ্য কি বোঝে?

স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ও আমি

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা)

ভাষান্তর ঃ অশোকা চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (ছদ্মনাম 'নিরালা') হিন্দি সাহিত্যের এক দিক্‌পাল। মুখ্যত তিনি ছিলেন কবি। এই প্রতিভাধর মানুষটি যে আক্ষরিক অর্থে একজন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। নাগপুর কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত কথামৃতের হিন্দি অনুবাদ তাঁরই করা। কথামৃতের এই হিন্দি অনুবাদ অগণিত হিন্দিভাষী মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। নিরালাজীর 'চতুরি চামার' নামে একটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থটির প্রকাশক রাজকমল এ্যাণ্ড সন্স, দিল্লি। ঐ পুস্তিকাতে 'স্বামী সারদানন্দ' সম্পর্কে তাঁর একটি স্মৃতিকথা আছে। বর্তমান প্রবন্ধটি তার বঙ্গানুবাদ।

সাম্প্রতিক কালের একজন সাহিত্য সমালোচক নিরালাজীকে 'মাতোয়ালা নিরালা' নামে অভিহিত করেছেন। সত্যিই তিনি ছিলেন এক মাতোয়ালা কবি, এই মাতোয়ালা কবি-মানুষটি কখনই সংসারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি। ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময়ই দারিদ্র্যের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছে। আর সে যুগে শুধু সাহিত্যের সেবা করে একজন কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে সংসার নির্বাহ করাও সম্ভব ছিল না। এছাড়া একের পর এক পারিবারিক বিপর্যয় তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তিনি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন ঃ

দুঃখ হী জীবনকী কথা রহী,
ক্যা কহুঁ উসে যো নহীঁ কহী। —সংযুক্ত সম্পাদক

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের কথা। এক সাধারণ বিবাদে বাংলার মহিষাদল রাজ্যের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তখন গ্রামের বাড়ি উন্নাওতে ছিলাম। ঐ সময় আমি

প্রায়ই আচার্য মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীজীর সঙ্গে দেখা করতে কানপুরে তাঁর জুহির বাড়িতে যেতাম। তাঁর কাছে যাওয়ার পিছনে কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ আমার ছিল না। হিন্দি সাহিত্যে তাঁর মহান অবদানের জন্য আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। তিনিও আমাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনিই আমার হিন্দি ও বাঙলা ব্যাকরণের ওপর লেখাটি সম্পাদনা করে 'সরস্বতী'-তে প্রকাশ করেছিলেন। আমার মতো একটি বাউণ্ডুলে মানুষের আর্থিক অসুবিধার কথা তিনি ভাল করেই জানতেন। তাই আমার সে অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি দুটি খবরের কাগজে আমার নাম চাকরির জন্য সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরাও আমার যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু কাজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর যোগ্যতা বলতে তো আমার বিশেষ কিছুই ছিল না। ঐ সময় সাহিত্যসেবার প্রেরণা থেকে যা কিছু লিখতাম তা এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পাদকের দপ্তর থেকে আমার কাছে ফিরে আসত, মাত্র দুটি প্রবন্ধ ও দুটি কবিতা তখন পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। দ্বিবেদীজী আর কি করবেন!

এই সময় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী তাঁদের হিন্দি পত্রিকার জন্য এক যোগ্য সম্পাদকের খোঁজে জুহিতে দ্বিবেদীজীর কাছে এলেন, দ্বিবেদীজী স্বামীজীকে আমার কথা বললেন। স্বামীজী যোগ্যতার প্রমাণ পাঠাবার জন্য আমাকে একটি চিঠি দিলেন। বাংলায় থাকার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। দু-চারবার বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার কাজে যোগ দিতেও গিয়েছিলাম, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান শিষ্য পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী যখন মহিষাদলে এসেছিলেন তখন তাঁকে তুলসী রামায়ণ পাঠ করে শুনিয়ে তাঁর অনুপম স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম। পত্রোত্তরে স্বামী মাধবানন্দজীকে এই যোগ্যতার কথাই জানিয়েছিলেম। স্বামীজীর চিঠি ইংরেজিতে ছিল। আমি বাঙলাতেই জবাব দিয়েছিলাম।

কিছুদিন পরে দ্বিবেদীজীর কাছে গিয়ে শুনলাম স্বামীজী কলকাতাতেই এক

সুযোগ্য সম্পাদক পেয়ে গেছেন। বাড়িতে ফি'রে আমিও এক পত্র পেলাম। তাতে তিনি লিখেছেন ঃ "একটু অপেক্ষা করুন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হলে হয়তো আপনারও প্রয়োজন হবে।" এই চিঠি পাবার পরেই মহিষাদল রাজ্য থেকে আমার কাছে তার আসে—"শীঘ্র চলে এসো।" তার পেয়ে ভাবলাম ইস্তফা গ্রাহ্য না হয়ে আমার রাগ করে চলে আসার দোষ যখন ক্ষমা হয়েছে, তখন আর যেতে আপত্তি কি? আমি মহিষাদলে চলে গেলাম। কিন্তু রাজা, যোগী, আগুন ও জলের বিপরীত রীতির কথা তখন মনে ছিল না। এরই মধ্যে 'সমন্বয়' এই সার্থক নামে একটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সুন্দর হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হলো। আমার কাছেও একটি কাগজ এলো। সেই সঙ্গে এলো লেখা পাঠাবার জন্য অনুরোধও। আমি 'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি লেখা পাঠালাম। যখন লেখাটি প্রকাশিত হলো তখন আমি লেখাটি সম্বন্ধে আচার্য দ্বিবেদীজীর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি প্রবন্ধটি পড়ে আমাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। আমি এই ধরনের মৌলিক রচনা যেন লিখি, আচার্য দ্বিবেদীজীর এই আশীর্বাদপূর্ণ উৎসাহবাক্য সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে সাহিত্যসেবায় অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। দ্বিবেদীজী ছাড়া আরও কয়েকজন অগ্রজ সাহিত্যিক এই লেখাটির শৈলী ও বিষয়বস্তু প্রকাশের মুনশিয়ানার জন্য আমাকে আশীর্বাদ জানালেন। এদিকে রাজার উল্টো রীতি আমার সামনে উপস্থিত হলো। ঠিক এই সময় 'সমন্বয়' পত্রিকার পরিচালক স্বামী আত্মবোধানন্দজী আমাকে লিখলেন ঃ "সমন্বয় পত্রিকার জন্য বাঙলা জানে এ রকম একজন লোকের প্রয়োজন। আমাদের কাজে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আপনি চলে আসুন।" পত্র পেয়ে আমি চলে গেলাম। গিয়ে দেখি আট মাসের মধ্যে সমন্বয়ের দুজন সম্পাদক বদল হয়েছে। সম্পাদক হিসাবে স্বামী মাধবানন্দজীর নাম ছাপা হচ্ছিল। তিনি হিন্দি খুবই ভাল জানতেন। শুধু হিন্দি ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য একজন হিন্দিভাষী সম্পাদকের প্রয়োজন ছিল। এভাবেই 'সমন্বয়' প্রকাশে সহায়তা করতে কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী আত্মবোধানন্দজীর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করলাম। এখানেই প্রথম আচার্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের দর্শন পাই। এটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের কথা।

স্বামী সারদানন্দজীর রাশভারী স্থূলকায় চেহারার জন্য ওঁকে দেখে খুবই সম্ভ্রম হতো। এমনিতেই ছোট থেকেই আমার ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। ভূতের দেখা পাবার জন্য রাতে শ্মশানে ঘুরে বেড়াতাম। মাঝরাত্রে রওনা হয়ে ১৬ মাইল পথ হেঁটে সকালে আচার্য দ্বিবেদীজীর সঙ্গে দেখা করতাম। তবুও সারদানন্দজীর মুখের দিকে আমি অনেক দিন চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। তবে কখনো কখনো ওঁকে প্রণাম করে নতমস্তকে ওঁর আলোচনাসভায় যোগ দিতাম। কিন্তু যেদিন কোন দার্শনিক গ্রন্থের পাঠ হতো সেদিন সভা থেকে চটপট পালিয়ে আসতাম, কেননা দার্শনিক তত্ত্বের কথা শুনলেই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত আমার। কয়েক মাস তাঁর আলোচনাসভায় নির্বাক শ্রোতা হয়েই বসে থাকলাম। স্বামীজীও আমার "যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" নীতি দেখে প্রসন্ন হয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন। একদিন সাহস করে প্রশ্ন করে বসলাম ঃ "এ সংসার আমার মধ্যে আছে, অথবা আমি এ সংসারের মধ্যে আছি?" আমার প্রশ্ন শুনে তিনি স্নেহমাখা স্বরে আমাকে উত্তর দিচ্ছিলেন ঃ "এ রকম নয়।"

পরিবেশ ছোট বয়স থেকেই আমাকে সাধু ও ঈশ্বরের অনুরক্ত করে তুলেছিল। এর জন্য ঘুমোলেই দেবদেবীদের স্বপ্ন খুব দেখতাম। জাগ্রত অবস্থায় যাঁরা কথাই বলতেন না, ঘুমের মধ্যে তাঁরাই অফুরন্ত কথা বলতেন। কিন্তু স্বপ্নে দেবতাদের সঙ্গে সংলাপ আমার পক্ষে সুখকর হতো না। কেননা, মনে এই প্রশ্ন সব সময়ই উঠত, জাগ্রত অবস্থায় দেবতারা কেন কথা বলেন না? ক্রমে ক্রমে নানা দার্শনিক চিন্তা মনে ভিড় করতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘোর নাস্তিক হয়ে পড়লাম। যখন 'সমন্বয়' পত্রিকা সম্পাদনার জন্য গেলাম তখন এই অবস্থাই ছিল। তবে পূর্ব সংস্কারের বলে আস্তিক ভাব কখনো কখনো মনে উঁকি দিত মাত্র। আমি একদিন স্বামী সারদানন্দজীকে বললাম ঃ "আমি ঘুমুলে দেবতারা আমার সঙ্গে কথা বলেন।" উনি একটু হেসে মধুর স্বরে বললেন ঃ "বাবুরাম মহারাজের সঙ্গেও দেবতারা কথা বলতেন।" স্বামী প্রেমানন্দজীর পূর্বনাম ছিল বাবুরাম, আগেই বলেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে তাঁরই আমি প্রথম দর্শন পেয়েছিলাম—মহিষাদলে।

কয়েকদিন পরে আমি একদিন দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছি (দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস আজও আমার আছে)। স্বপ্নে দেখি, স্বামী সারদানন্দজী মহাধ্যানে মগ্ন, তাঁর সমস্ত শরীর থেকে যেন দিব্য জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তিনি কমলাসনে বসে উর্ধ্ববাহু, মুদ্রিত নেত্র, মুখে মহা আনন্দের ছটা। ঘুম ভাঙতে মনে হলো আমার সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেদিন মহারাজের মধ্যে মহাজ্ঞানের যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমার মনে বিরোধী শক্তির প্রভাব সবসময়ই প্রবল ছিল। তীব্র ও তীক্ষ্ণ দার্শনিক বজ্রপ্রহারে আমি এইসব বিরোধী চিন্তা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করতাম এবং যখন তা করা সম্ভব হতো তখনই সাহিত্যসেবায় মন লাগাতে পারতাম। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আকাশ থেকে এই পৃথিবীতে এসেও যেন আকাশেই থেকে যেতাম। আর যত লড়াই করতাম ততই যেন মনের বিরোধী ভাব আরো প্রবল হয়ে উঠত। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কি রকম তা এই সময় আরো ভাল করে বুঝতে পারলাম। যখন মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন স্বামী সারদানন্দজী তাঁর মধুর হাসিতে আমার সব ক্লান্তি দূর করে দিতেন। এই মহাদার্শনিক, মহাকবি, মহামনস্বী, আকুমার ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসিপ্রবর মহাপণ্ডিত, সর্বস্বত্যাগী সাক্ষাৎ মহাবীরের সান্নিধ্যে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব এবং মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হতো। অনেক বড় বড় কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতকে দেখেছি। কিন্তু, হায়রে সংসার! কাচের টুকরোকে তুমি হীরে বলে চালাতে কতই না পটু!

স্বামী সারদানন্দজীর সেবক হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন ঃ "তুমি দীক্ষা নেবে? এসো।" তাঁর কথা শুনে ভাবলাম—প্রসাদের মতো এখানে বোধ হয় দীক্ষাও বিতরণ হয়ে থাকে। নিতে আপত্তি কি? বড়কে গুরু বলে মানতে আমার কখনই আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল 'গুরুভাব' মেনে নিতে। মন্ত্র নিলে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে, আর যেখানে পাবার কিছু ব্যাপার থাকে সেখানে যে ব্রাহ্মণ সন্তান পা না বাড়ায় তাকে বেকুব ছাড়া আর কি বলা যাবে! আমি প্রায় দৌড়ে স্বামীজীর (স্বামী সারদানন্দজীর) ঘরে গিয়ে আসনে বসে

পড়লাম। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ "কি চাই?" আমি বললাম ঃ "মন্ত্র নিতে এসেছি।" আমার বলার সুরে কে জানে কি ছিল! আমার তো তন্ত্রমন্ত্রে মোটেই বিশ্বাস ছিল না। স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন ঃ "পরে হবে।" আমি মনে মনে ভাবলাম কে জানে কপালে কি আছে! কয়েকদিন চলে গেল, আমি আর তাঁর কাছে যাইনি।

ওখানে কখনো কখনো শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে তুলসী রামায়ণ পাঠ করতাম। তখন শ্রীশ্রীমা স্থূল শরীরে ছিলেন না। প্রথম যেদিন পাঠ করলাম, সেদিন স্বামী সারদানন্দজী আমাকে দুটি প্রসাদী রসগোল্লা দেওয়ালেন। আর সকলে একটি করেই পেলেন। পরে স্বামী সারদানন্দজীর জ্যেষ্ঠ গুরুভাই, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রিয় শিষ্য শঙ্করানন্দ মহারাজকে দুটি রসগোল্লা পেতে দেখেছি। একদিন পাঠের পরে শঙ্করানন্দ মহারাজ তাঁর ভাগ থেকে একটি রসগোল্লা আমাকে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে সারদানন্দজী যে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেন, সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম। প্রসাদ আমার হাতেই ছিল। মনটি ছিল সুপ্রসন্ন। যেন তুলসীদাসজী আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। ঠিক ঐ সময় স্বামী সারদানন্দজীও ওপরে আসছিলেন। আমাকে ভাবমগ্ন দেখে তিনি রাস্তা ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবমগ্ন থাকলেও আমার মন সজাগ ছিল। তাঁকে দেখে আমিও একপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম, উনি চলে গেলে আমি নিচে নামব। তখন সারদানন্দজী আমাকে প্রশ্ন করলেন ঃ "এ প্রসাদ কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ?" (তাঁর সঙ্গে আমার বাঙলাতেই কথাবার্তা হতো।) আমি বললাম ঃ "আমার নিজের জন্য।" উনি তখন বললেন ঃ "আচ্ছা, প্রসাদ খেয়ে দেখা করো।" আমি চটপট প্রসাদ খেয়ে ওপরে গেলাম। স্বামীজী তাঁর ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে খুব স্নেহভরে বললেন ঃ "সেদিন তুমি কি বলেছিলে?" আমি বললাম আমার তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস নেই। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ "তোমার দীক্ষা হয়েছে?" আমি বললাম ঃ "হাঁ, কিন্তু তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ন-বছর।" তিনি তখন বললেন ঃ "আমরা

তো শ্রীরামকৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলে মানি।" আমি বললাম ঃ "আমিও তো মানি।" আমি কখনো প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করতাম না, তা ঠিকই হোক, আর ভুলই হোক। যাঁরা বক্তা, লেখক, কবি বা দার্শনিক তাঁরা আগে কি বলেছেন আর পরে কি বলেছেন, এনিয়ে মাথা ঘামান না। এ ব্যাপারে আমার জীবন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে! কিন্তু স্বামী সারদানন্দের ভারতীয় কান এ রকম ছিল না যে, ইংরেজি সঙ্গীতের রসবোধ করতে না পেরে তাকে সঙ্গীত বলেই স্বীকার করবেন না। তিনি ভাবস্থ এক গুরুর মূর্তিতে আমার সামনে এলেন। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন এক পরম প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। তিনি আমার জিহ্বাতে নিজের আঙুল দিয়ে একটি বীজমন্ত্র লিখতে লাগলেন। তিনি কি লিখেছেন তা বুঝবার জন্য আমি সমস্ত মন দিয়ে চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারলাম না।

এরপর পরোক্ষভাবে তিনি কখনো কখনো আমাকে ধ্যান-ধারণার কথা মনে করিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মাথায় খেয়াল চেপে গেল, দেখব জিহ্বার মন্ত্র আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। পূজা-পাঠ যেটুকু বা করতাম, তাও বন্ধ করে দিলাম। তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমার মনে হতে লাগল যে, সবকিছু যেন উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে, আর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুরা আমাকে আকর্ষণ করছেন। এতে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, নিশ্চয়ই এই সাধুরা আমার ওপরে বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করেছেন। ঠিক এই সময় 'সমন্বয়' পত্রিকার কর্মকর্তা উদ্বোধন ছেড়ে 'মতওয়ালা' অফিস ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি ঘরে থাকতে লাগলেন। 'মতওয়ালা' কাগজ তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওখানে তখন বালকৃষ্ণ প্রেস ছিল। 'মতওয়ালা' কাগজের সম্পাদক মহাদেব প্রসাদ শেঠ ঐ প্রেসের মালিক ছিলেন। তিনি ওখানেই থাকতেন। আমিও ওখানেই একটি ঘরে থাকতে লাগলাম। একদিন মহাদেববাবুকে বললাম ঃ "আমার মনে হয় এই সাধুরা যাদু জানে।" মহাদেববাবু গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "এ আপনার ভ্রম।"

একদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, জ্যোতির সমুদ্র। শ্রীকৃষ্ণের হাতের ওপরে

আমার মাথা রয়েছে। আমি সেই জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। তারপর গত দশ বছর ধরে এতসব অলৌকিক দর্শনাদি হয়েছে যে, এখন বড় বড় কবি ও দার্শনিকের চমৎকার উক্তি পড়েও হাসি পায়। আর তিন বছর হলো সেই মন্ত্র, যা স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ আমার জিহ্বায় লিখে দিয়েছিলেন, জ্যোতির্ময় রূপে আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আমি সে মন্ত্র পড়ে নিলাম।

সঙ্ঘ-নায়ক

সরলাবালা দাসী

বিগত ১ ভাদ্র (১৩৩৪) বৃহস্পতিবার শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী তাঁহার ইহজগতের কার্য সমাধা করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। নিত্য আনন্দ নিত্য উৎসবময় উদ্বোধন কার্যালয় আজ যেন শূন্যপ্রায়। তাঁহার নিত্যসঙ্গিগণের কথা দূরে থাকুক—দিনেকের জন্যও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ-সৌভাগ্য-লাভের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদেরও অন্তর আজ বিয়োগ-বেদনায় বেদনাতুর। তিনি যে ভারতবর্ষের এবং জগতের পক্ষেও ভগবৎ আশীর্বাদ-স্বরূপ ছিলেন ইহা আজ যেমন সকলে মনে প্রাণে অনুভব করিতেছেন, হয়তো ইতঃপূর্বে কেহ এমনভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই।

মহাপুরুষগণের জীবন পৃথিবীর আনন্দ-দীপস্বরূপ। তাঁহাদেরই জীবনের জ্যোতিতে সাধারণ মানব কিছু কিছু ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। যদি পৃথিবীতে তাঁহাদের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে জগৎ কেবল অন্ধতামসময় দুঃখের আগার হইয়াই রহিত। ভগবান যে আছেন এবং তিনি যে প্রেমস্বরূপ, মহাপুরুষগণের জীবনের মধ্য দিয়াই এই সত্য আমাদের জীবনেও সত্যরূপে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হয়, আর তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি। নতুবা এই মৃত্যুময় জগতে কে বা বাঁচিয়া থাকিত আর কেই বা বাঁচিতে চাহিত! তাঁহাদের সংস্পর্শে মুহূর্তের অবকাশেও যে সত্যের কিরণ আমাদের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করে তাহাই সময়ে জীবনের আমূল পরিবর্তন করিয়া জীবনের নূতনভাবে বিকাশের পথ নির্দেশ করিয়া দেয়। এইরূপ জগতে এককে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, সেই প্রস্ফুটনের কার্যভার লইয়া মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

বেদান্ত-সূর্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাকার্যের ভার লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার 'অভীঃ, অভীঃ' মহা হুঙ্কারে মানবসমাজের চিত্তগত ক্লৈব্য যেন পলায়নের পথ খুঁজিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দও এই মহাকার্যের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার প্লাবনে জগতের অবসাদ অন্ধকার যেন আপনার লয় আপনিই প্রার্থনা করিয়াছিল। এই দুই মহাপুরুষের ভাব ভিন্ন প্রণালীতে প্রকাশ হইলেও মূলত এক। তাঁহাদের উভয়েরই জীবনব্যাপী কর্মসাধনার মূলে মানব দুঃখে করুণা বিগলিত হৃদয়ের নিঃশেষে আত্মদানরূপ মহাপ্রবাহের অক্ষয় উৎস বর্তমান। আপনার সম্বন্ধে কিছু চাহিবার বা পাইবার প্রশ্ন মাত্রও তথায় উঠে না। উঠিবার প্রয়োজনও হয় না। সেতু যেমন গর্জনশীলা তরঙ্গবন্ধুরা নদীর উপর আপনাকে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া জনগণের পরপারে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন সাধনরূপেই অবস্থান করে, তাঁহারাও সেইরূপ সংসার-দুঃখ তাপিত জনের ভগবানের আনন্দরাজ্যে উত্তীর্ণ হইবার সেতুস্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একবাহু অপরিমেয় স্নেহ, কল্যাণ কামনা ও আত্মীয়তার স্পর্শ লইয়া জনমাত্রকেই হৃদয়ে আকর্ষণ করিতে ও অপর বাহু ভগবানের অনন্ত আনন্দ রাজ্যের পথ নির্দেশ কার্যে ব্যাপৃত থাকে। জগতের সকল কর্ম-সাধনার মূলে তাঁহাদের এইটি কেবল মূলমন্ত্র স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। থিওজফিস্ট, খ্রিস্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছে থেকেই হোক লোকে কিছুই সাহায্য পাচ্ছে জানলে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বলব!"

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দেরও জীবনের ইহাই মূলমন্ত্র ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে দিনে দিনে কত তরুণ ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব হইয়াছে, স্বামী সারদানন্দ প্রতিনিয়ত জননীর স্নেহে অসীম ধৈর্যে প্রত্যেকেরই প্রকৃতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ ভাবে নিজ চরিত্র বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন সে বিষয়ে সহায়তা দান ও সুযোগবিধান করিয়া

আসিয়াছেন। আবার সংসারী যাঁহারা তাঁহার নিকটে সঙ্গলাভের জন্য আসিয়াছেন, তাঁহাদের মনেও কথোপকথনের অবসরে—যাহাতে তাঁহারা সংসারে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করিবার মতো শক্তি ও পবিত্রতা লাভ করিতে পরেন—সেইরূপ ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অধ্যাত্মসম্পদ-দান, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই অতি সহজ হইত। কেননা তথায় আচার্য বা শিষ্যের বর্তমানতা রহিত না। তাঁহাকে কেহ আচার্যরূপে কখনই অনুভব করেন নাই, কেবল তিনি যেন অতি স্নেহশীল পরমাত্মীয়, আত্মীয় হইতেও আত্মীয়, নিঃসঙ্কোচে সকল সুখ-দুঃখের কথাই তাঁহাকে নিবেদন করা যায়, আর বিপদে সান্ত্বনা, সমস্যার সমাধান এবং সৎ-সঙ্কল্পে সহানুভূতি ও আশীর্বাদ তাঁহারই নিকট পাওয়া যায়। গৃহীরাও, তিনি যে সন্ন্যাসী এবং আপনারা গৃহী—এ ভেদ ভুলিয়া যাইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সম্পাদক-ভার তিনি কী নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় অনেকেই জানেন। এই নৈপুণ্য ও কর্মতৎপরতা কখনই জগতে সম্ভব হইত না, যদি না একাধারে ত্যাগ, নিষ্ঠা ও স্বার্থহীন প্রেমের ভিত্তিতে তাহার প্রতিষ্ঠা হইত! আলমবাজারের একটি পুরানো বাড়ি ও তাহাতে কয়েকটি নিঃসম্বল গৃহত্যাগী তরুণ ও বালক। তাঁহারা একই কদলীপত্রে সকলে মিলিয়া কেবল লবণমাত্র উপকরণ সংযোগে ভিক্ষান্ন ভোজন করেন, আবার কখনও বা অযাচক বৃত্তিতে উপবাস করিয়া দিন কাটান। একখানি মাত্র কাপড় , যখন যাহার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয়, তিনি পরিধান করেন। শীতাতপে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, উপবাসেও কষ্ট নাই, ধ্যান, ধারণা, গ্রন্থপাঠ, তর্ক ও আলোচনা লইয়া সকলেই মনের আনন্দে কাল কাটাইতেছেন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ। সঙ্ঘের ভ্রাতাগণ সকলেই একান্ত উদাসীন, আসক্তির সম্পর্ক মাত্র সহ্য করিতে পারেন না, আবার সকলেই সকলের ভালবাসার বন্ধনে যেন একপ্রাণ। সহপাঠী বালকের ন্যায় সকলেই যেন প্রতিযোগিতা করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য অন্যের অজ্ঞাতে প্রাণপণ সাধনে লাগিয়া রহিয়াছেন, আবার

সকলেই সকলের উন্নতিতে পরমানন্দিত। শ্রীগুরু মহারাজের স্মৃতি, তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সকলেরই প্রাণ যেন ভরা ভাদ্রের নদীর ন্যায় কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া টলমল করিতেছে।

কঠোর সন্ন্যাস-জীবনে সন্ন্যাসের ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব অধ্যায়। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের জীবন সেই অপূর্বতার পূর্ণ অভিব্যক্তি। অতি গভীর সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর স্থির আবার অতি স্নিগ্ধ স্নেহমধুর সেই যে হৃদয়, জগতের এক অতুলনীয় সম্পত্তি। একদিন—একদিন মাত্রও যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে আর তাহা ভুলিতে পারিত না। সাধনার প্রথম অবস্থায় যে অতি তীব্র বৈরাগ্য তাঁহাকে কঠোর সাধন, প্রব্রজ্যা ও নির্জনবাসে নিয়োজিত করিয়াছিল তাহার তীব্র দহনে তাঁহার প্রকৃতির স্নিগ্ধতা বিন্দুমাত্র নষ্ট না হইয়া বরং আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। সন্তান-কুশলাকাঙ্ক্ষিণী জননীর ন্যায় তিনি তাঁহার অগণিত স্নেহপাত্রের সুখ দুঃখ তাঁহাদের অনুভবের মধ্য দিয়া সম অনুভূতিতে অংশ লইয়াছেন; জননী বরং তাঁহার দু-চারটি সন্তানের উৎপাতও সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি কখনও বিরক্ত হন নাই। আবার আপনাকেও তিনি জননী মহামায়ার স্নেহ-ক্রোড়ে শিশুর মতো নির্ভয়েই একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অধিষ্ঠান-গৃহ উদ্বোধন মঠে তিনি যে থাকিতেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মায়ের দারোয়ান হয়ে আমি এখানে আছি।" আবার সেই মহাদেবী জননীর পীড়ার সময় ক্রোড়স্থ বালিকার ন্যায় তাঁহাকে যেন পিতৃস্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, স্নানান্তে একবার আসিয়া মায়ের গৃহদ্বারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা—ইহাতেই তাঁহার অপরিসীম তৃপ্তি, ততোধিক আর কিছু প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার শান্ত স্থৈর্যের মধ্য দিয়াও যেন ভালবাসা ক্ষরিয়া পড়িত। একবার মঠের এক তরুণ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার অবিশ্রান্ত বমন ও সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা হইতেছিল, জীবনের কোন আশাই ছিল না। শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজ সর্বদা তাঁহার পাশে থাকিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া যন্ত্রণা দূর করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে যেন আর সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সন্তানের পীড়ার সংবাদে তাঁহার জননী আসিয়া

কয়েকদিন মঠে পীড়িত সন্তানের নিকটে ছিলেন। তিনি পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে বারবার সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "মহারাজকে একবার ডাকুন। তিনি গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই ও ভাল হয়ে যাবে।" মহারাজ শুনিয়া মুহূর্তের জন্য যেন অতি গভীর দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিয়া উঠিলেন, "থাক, থাক, ওকথা আর আমাকে শোনাসনে। যেতে দে, ওকে শান্তি পেতে দে। স্বার্থপরের মতো ছেলেটাকে এখনো কি তোরা আরও ভোগাতে চাস?"

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সহিত তাঁহার কর্মজীবন বিশেষভাবে জড়িত এবং তাঁহার সঙ্ঘ-পরিচালনী শক্তির ভিতর দিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যেভাবে এই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা জগতের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহার নিজের জীবনব্যাপী শ্রম যেমন তাঁহার নিকট কষ্টসাধ্য না হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক ও ভগবৎ-নির্দেশিত প্রিয়কার্য-সাধনস্বরূপ ছিল, সঙ্ঘের সকল সেবকের জীবনও তিনি তাঁহার নিজের সেই প্রেরণা দিয়া অনুপ্রাণিত করিতেন। ভগবৎ-সাধনা সম্বন্ধে তিনি নিজে সাধন করিয়া তাহাদের পথ দেখাইতেন ও উৎসাহিত করিতেন, কখনও বা সূর্যোদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত একাসনে উদয়াস্ত জপ করিতেন, কখনও সমস্ত রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইবার একটি আগ্রহের ভাব নিজের ভাব দিয়া সকলের মনে জাগ্রত করিতেন। কিছুদিন পূর্বে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মহাসম্মেলন যখন হয়, তখন তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ ছিল, কিন্তু তথাপি পনের ষোল দিন ধরিয়া এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যটি সমাধা করিয়া তাঁহার সঙ্ঘ-সম্বন্ধে কর্তব্য সমাপন করিলেন। আর এই মহাসম্মেলনই তাঁহার সঙ্ঘ-নায়কত্বের শেষ নিদর্শন। দেশে দেশে প্রসারিত বহু বিস্তৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একবার সকল কর্মীর একত্র মিলন—ভাববিনিময় ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি-নিরূপণ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, দেহত্যাগের পূর্বে তিনি সেই কার্যটি শেষ করিয়া গেলেন। তাঁহার 'নিবেদিতা বিদ্যালয়' সম্বন্ধে একান্ত যত্ন, এই বিদ্যালয়টিকে সহায়হীন অবস্থা হইতে স্থায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নারী-জাতির সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ অতিশয় উচ্চ ছিল এবং ভারত-রমণী সেই আদর্শ

নিজ জীবনে যেন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, ইহা তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। যদিও রাজনৈতিক ব্যাপার প্রভৃতি তিনি পছন্দ করিতেন না, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহারও মাতৃভূমির প্রতি একান্ত অনুরাগ ছিল।

'ভারতে শক্তিপূজা' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' কয়েক ভাগ তিনি বঙ্গভাষাকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, ইহাতে বঙ্গভাষার কিরূপ সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অধিক কিছু লেখা অসম্ভব। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিতে স্বভাবতই মন গঙ্গাতীরবর্তী এক শান্ত অধ্যাত্মনিকেতন দেবালয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে। তথায় ভালবাসার অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজিত এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া তাঁহার তরুণ স্নেহপাত্রদল। ভারতবর্ষের যে পরম কল্যাণ তথায় নবভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, যেন তাহার মহিমা আমাদের জীবনে ব্যর্থ না হইয়া যায়, আজ আমরা নত মস্তকে কেবল এই প্রার্থনাই করি।

আচার্য

গোবিন্দ চন্দ্র দেব

He that hath ears to hear, let him hear; he that hath eyes to see, let him see. –Jesus Christ.

শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর, অন্তরঙ্গ শিষ্য, জগজ্জননীর প্রিয় পুত্র ও সেবক, রামকৃষ্ণ-গত-প্রাণ, অনাথ-আর্তের অনন্যশরণ, দয়াল দেবতা পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী সারদানন্দজী আর স্থূল শরীরে নাই। বিগত ১৩৩৪ সালের ১ ভাদ্র রাত্রি ২টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া লীলাধাম শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য চরিতের অনুধ্যানই এক্ষণে আমাদের অবলম্বন। তাঁহার দেবজীবনের মর্ম কিয়ৎ পরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারিলে জীবন সার্থক হইয়া যাইত, কিন্তু কর্মচক্র তাহা করিতে দেয় নাই—তথাপি তাঁহার শ্রীপাদুকাধ্যানে মনোমল দূরীভূত হইবে—ভরসাতেই এ দুঃসাধ্য প্রয়াস।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) দ্বিষষ্টি বর্ষমাত্র নরকলেবরে মনুষ্যলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবন কিভাবে অতীত হইয়াছিল, যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভে কিভাবে তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্মের ফল্গুপ্রবাহ উচ্ছ্বসিতাকার ধারণ করিয়াছিল, শ্রীগুরুর সঙ্গলাভে সংসারের সর্ববিধ বাসনা বিস্মৃত হইয়া অতঃপর তাঁহার অন্তর্ধানে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণপূর্বক কঠোর ত্যাগ তপস্যা আচরণে তিনি যেভাবে চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, উত্তরকালে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ স্বামী বিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া শ্রীগুরুর ভাবপ্রচারে, মাতৃদেবীর ঐকান্তিক সেবায়, অনাথ আর্তের শরণদানে যেভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা মাদৃশ ব্যক্তির

পক্ষে যে দুর্বোধ্য তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। জীবনের শেষ তিন-চারি বৎসর কাল বিশেষ সৌভাগ্যবশত তাঁহার সঙ্গে একটু মিশিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলাম এবং এইকালে অপরাপর ভক্তদের নিকট হইতেও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি। এখানে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে পরম পূজনীয় শরৎ মহারাজকে ধীর গম্ভীর সাধক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইত। তাঁহার অপূর্ব গাম্ভীর্যে অনেকেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হইত। কিন্তু দুই একদিন তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই বুঝা যাইত তাহার ভিতরটা বড়ই মধুর। যাঁহারা এই ধীর গম্ভীর পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই কথা বলিয়া থাকেন। ইতঃপূর্বে জনৈক সাধু তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "দেখ, বড় জিনিস মনে করে কাছে আসলে প্রথম অমনি একটা ভয় হয়েই থাকে, কিন্তু একটু মিশতে পারলেই বোঝা যায় ভিতরটায় তার কি আছে।" স্বচক্ষে দেখিয়াছি, দুই বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দিবসে বেলুড় মঠ লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই। কিছুদিন পূর্বেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ রক্তপ্রস্রাব করিয়াছেন—কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়াই সেদিন তিনি ভিড় ঠেলিয়া উৎসবে আসিয়াছেন। বেলা চারিটার সময় তিনি পূজনীয় তুলসী মহারাজের সঙ্গে মঠের সামনের দালানের উপরকার বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছেন—ইতঃপূর্বে লোকের ভিড় ঠেলিয়া সমগ্র উৎসবের স্থান দর্শনে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময়ে কোথা হইতে এক ভদ্রলোক উচ্চরোলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই উৎসবের দিনে সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা জননীর ন্যায় শোকসূচক ক্রন্দন উপস্থিত সকলের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। কেহ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কি আরম্ভ করলে বাপু, মহারাজ আজ ভিড়ের চোট সহ্য করতে পাচ্ছেন না, অন্য দিন তাঁর কাছে এসে সব দুঃখের কথা বলো।" কিন্তু শরৎ মহারাজ সে কথা না শুনিয়া কত প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষজী আসিবামাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিবার সময় ঐ ব্যক্তি কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন,

"সংসারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমাদেব কাছে এসেছে।" তখন উভয়ে তাহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে পরিতুষ্ট করিলেন। বস্তুত স্বামী সারদানন্দের প্রশান্ত ভাবের পশ্চাতে যে এমন অচিন্তিত করুণ ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সহসা বুঝা যাইত না।

অনাথ আর্ত—যাহাদিগকে সকলে একবাক্যে পরিত্যাগ করিয়াছে শরৎ মহারাজ তাহাদের মা-বাপ ছিলেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক, বাকশক্তি-বিহীন, মূর্খ, এমন কত লোককে তিনি নির্বিচারে কোল দিয়াছেন—শ্রীশ্রীমায়ের দেহান্তে তিনি যতদিন নরদেহে অবস্থান করিয়াছিলেন ততদিন মাতৃভাবের প্রবল প্রেরণাই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। মায়ের ভক্তগণ তাঁহার দর্শনে মাতৃবিরহ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কথায় কখনো তিনি কাহারও প্রতি ভালবাসার ভাব প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু অজ্ঞাতসারে তাঁহার ভালবাসার সুদৃঢ় বর্মে রক্ষিত হইয়া বহু লোক স্বল্পকালের মধ্যে যথার্থই আধ্যাত্মিক জীবনের আস্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। ধর্মরাজ্যে যাঁহারা যত অগ্রসর হন ততই তাঁহাদের হৃদয় ক্রমশ উদারভাব-সম্পন্ন হইয়া থাকে ইহাই শাস্ত্র-বর্ণিত সত্য। ঐ উদারতা কল্পনাতীত ভাবে স্বামী সারদানন্দে বিদ্যমান ছিল। উদ্বোধন মঠে ঝি-চাকর না থাকিলে আশ্রম-কার্যের যখন অসুবিধা হইত তখন মঠের অন্যান্য সকলের মতো তিনিও সকলের সহিত একত্রে আশ্রমকার্য করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলানায়ক, আধ্যাত্মিক ভাবের ঘনীভূত প্রতিমা, পবিত্রতার মূর্তবিগ্রহ ব্রহ্মবিৎ স্বামী সারদানন্দজীর বিকৃত-মস্তিষ্ককে আশ্রয়দান, তাঁহার চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত, পাপীতাপী-নির্বিশেষে সকলের সহিত প্রেম ও ক্ষমা-মণ্ডিত আচরণ প্রভৃতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, এ মহাপুরুষ মানব ছিলেন না, নরশরীরে দেববিশেষ। জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহার শরীরাবলম্বনে আরও কিছুকাল মরধামে দিব্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের চরিত্রের অপূর্ব ভূষণ ছিল—তাঁহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি
ন কামকামী ॥" (২/৭০)

তাঁহার জীবনে ইহার চরম পরিণতি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণ-মিশনরূপ সমুদ্রের সকল তরঙ্গই তাঁহাকে আঘাত করিত, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে স্বামী সারদানন্দ কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিরাট সঙ্ঘের সকল কার্যের ব্যবস্থায় অনলস ও উৎসাহী ছিলেন। অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি, এই দীর্ঘ অক্লান্ত কর্মজীবনের মধ্যে কেহ তাঁহাকে এক মুহূর্তের জন্যও চঞ্চল হইতে দেখেন নাই। দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে গেলেই মানুষের স্বভাব একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বিবিধ কর্মকেন্দ্রের কর্মিগণ কাজ-কর্ম করিতে গিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যদি কখনও তাঁহার কাছে অভিযোগ আনয়ন করিতেন বা নিজেদের সুবিধা অসুবিধার কথা তাঁহার কাছে বর্ণনা করিতেন—সকল কথা শুনিয়া অসুবিধা অপনয়নের জন্য সারদানন্দ স্বামী সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। আর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একের মুখে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ করিয়াও তিনি কাহারও সম্বন্ধে কোনও অভিমত পোষণ করিতেন না। কল্পনায় ইহার ধারণা, প্রবন্ধে ইহার উপযুক্ত বর্ণনা, সকলের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ও লোকমতের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করিয়াও অর্থাভাব, কর্মীর অভাব ইত্যাদি কত দুর্যোগ সহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বর্তমানাকার কিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সামান্য ইতিহাসও যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকা গমনে 'উদ্বোধন' পত্রিকার উন্নতির মূলে যে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার অপনোদন, কলকাতার স্থানে স্থানে গীতাপাঠ, ভগিনী নিবেদিতাকে পরামর্শ-প্রদান, বলরাম মন্দিরে রামকৃষ্ণ মিশনের আলোচনা, কেন্দ্রে শাস্ত্রালোচনা, সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে সমূহ কর্মের ব্যবস্থা স্বামী সারদানন্দ এককালেই করিয়াছেন। ব্যবস্থা বলিতে যেন কেহ মনে না

করেন, শুধু আদেশ প্রদান—সেকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে মুষ্টিমেয়মাত্র কর্মী ছিলেন—অর্থবল একেবারেই ছিল না—সুতরাং ব্যবস্থা বলিতে কর্মক্ষেত্রে আগমন অর্থ বুঝিলেই ধারণা স্পষ্টতর হইবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যদেশে গমনের পর তাঁহার আহ্বানান্তর ইংলন্ড ও আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর বেলুড় মঠের কার্য-পরিচালনে, তদনন্তর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পাদকতায়, একনিষ্ঠ মাতৃসেবায় তিনি যে দেবজীবন যাপন করিয়াছেন তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধির জন্য আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের জন্ম জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে। পূজনীয় হরি মহারাজ একবার এই কারণেই বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্য যদি কেহ খাটিয়া থাকেন তবে সে শরৎ মহারাজ।" স্বামী সারদানন্দের ধৈর্যের উপরই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুনিয়াছি—স্বামীজী, পূজনীয় শরৎ মহারাজের ধৈর্যের পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে একবার বহু গালিগালাজ করিয়া ভাবান্তর আনয়নে অক্ষম হইয়া বলিয়াছিলেন, "এর বেলে মাছের রক্ত।"

পূজনীয় শরৎ মহারাজের চরিত্রে নিরভিমানতা আর এক অপূর্ব সম্পদ, তিনি নিজে অতি সামান্য লোক এই ধারণাই সকলের কাছে প্রকাশ করিতেন, এত লোক সম্মান দিয়াও তাঁহার পূর্বোক্ত হৃদ্গত ভাব পরিবর্তনে সক্ষম হইত না, সাধারণের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার দেখিলে মনে হইত তিনি যেন তাঁহাদের সকলেরই সমান বরং তাঁহাদের চেয়ে ন্যূন, সকল ভদ্রলোকের ভিতর তিনিও একজন ভদ্রলোক, এত বড় পণ্ডিত, এত বড় সাধু—কিন্তু আচরণে তাহার মোটেই অভিব্যক্তি নাই—কথাবার্তায়, ব্যবহারে, চালচলনে কোথাও আচার্যের ভাবের প্রকাশ নাই, তাঁহাকে প্রশ্নাদি করিয়া আমরা দেখিয়াছি 'আমি এইরূপ বলিতেছি, অতএব ইহা করিবে', তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই। স্থির ধীরভাবে আমাদের প্রশ্ন শ্রবণ-পূর্বক তদন্তর বিষয়টি আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিতেন। আমরা তাঁহাকে মনঃস্থির কিরূপে হয়—তাহার প্রশ্ন করিয়াছি।

চিত্ত স্থৈর্যের পন্থা নিরূপণ-পূর্বক তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন—"আমরাই সবসময়ে মনঃস্থির করিতে পারি না—" বারবার বলিতে শুনিয়াছি—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" সামান্য বালক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়াছে, তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"অল্পবয়সে দীক্ষা নিয়ে কি হবে বাপু, আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ভাল লোক পরে পাবে।" কোথায় আমরা ক্ষুদ্র বালক, আর কোথায় স্বামী সারদানন্দ—এই অতুলনীয় ব্যবহারের ধারণা আমরা করিতে অক্ষম, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহাসম্মেলনে তাঁহার প্রদত্ত এক বক্তৃতার উপসংহারে আমরা তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম—তাহা এখনও আমাদের নানা চিন্তা-সমাকুল মনে জ্বলন্তভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকা-প্রত্যাগত পরমানন্দ স্বামীর পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে বলিতেছেন, "আমার আর কিছু বক্তব্য নাই, অপরাপর ভাল বক্তা সব রহিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই আমার চেয়ে পণ্ডিত, বড়—ইঁহারা এখন আপনাদিগকে সব বলিবেন, ইঁহারা যে আমার চেয়ে বড় তাহাতে আমি খুশি, কারণ ইঁহারা সকলেই আমার পুত্র, আর আমি পুত্রের কাছে পরাজয়ই স্বীকার করিতেছি।" এই বলিয়াই পরমানন্দ স্বামীকে সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন, ইহাই ছিল স্বামী সারদানন্দের অন্তরের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি যে তিনি কিরূপ শ্রদ্ধাপন্ন ছিলেন—তাঁহার ভিতরের দিক বুঝিবার মোটেই ক্ষমতা না থাকিলেও বাহির দেখিয়াও আমাদের ন্যায় মদগর্বিত মানুষের মনেও ক্ষণেকের তরে দেবভাবের উদ্রেক হয়। তিন বৎসর পূর্বে জ্বর-রোগে বিষম ভুগিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ যখন বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত পুরীতে 'শশী নিকেতনে' অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে পরম ভক্তিমতি শ্রীমতি লক্ষ্মীদিদিও সেখানে ছিলেন। তাঁহার তখন বিশেষ অসুস্থ অবস্থা—ঘন ঘন মূর্ছা হইত, পরম পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেই অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে কাছে বসাইয়া স্বহস্তে আহার করাইতেন। একদিন লক্ষ্মীদিদি শরৎ মহারাজের কোলে অনেকক্ষণ মূর্ছাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। অনেকেই মনে করিতেছেন এইবার লক্ষ্মীদিদির শরীর বুঝি গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পরে তাঁহার

বাহ্য চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল—ক্রমে তিনি পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন শরৎ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।" উত্তরে লক্ষ্মীদিদি বলিলেন, "শরীরের কষ্ট, প্রাণ কিন্তু আনন্দে ভরপুর।" লক্ষ্মীদিদিকে পূজনীয় শরৎ মহারাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিতেন। তাঁহার জন্মতিথি-দিনে পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে তাঁহার এবংবিধ ব্যবহার দর্শনে আমরা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, সে অপূর্ব কথা এখানে আমরা যথাসাধ্য বর্ণনা করিতেছি। সেদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে উদ্বোধন গৃহ উৎসবানন্দে ভরপুর—বাড়ি লোকে লোকারণ্য। সকালবেলা হইতে ভক্তগণ পরম পূজনীয় শরৎ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত ফল-পুষ্পাহরণ-পূর্বক বাগবাজারের স্বল্পপরিসর বাটিতে সমবেত হইয়াছেন, শরৎ মহারাজ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই নিজের বাসগৃহে মাটিতে পাতা বিছানার উপর বসিয়া আছেন, একে একে সকলে তাঁহার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে উপস্থিত হইলেন। এখানেও তাঁহার নিরভিমানতার দৃষ্টান্তে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, প্রথমেই ঠাকুরকে পুষ্পমাল্যাদি দেওয়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ভক্তদের প্রদত্ত পুষ্প পদতলে গ্রহণ না করিয়া করজোড়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের মস্তক তাঁহার সুকোমল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দিলেন, সেদিনে যে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন তিনি তাঁহারই মস্তকে মঙ্গল হস্ত অর্পণ-পূর্বক নীরবে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন, আবার বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভক্তদের প্রদত্ত মাল্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্তী সেবককে উহার কোনওটি ঠাকুরকে, কোনওটি মাকে, কোনওটি স্বামীজীকে পরাইয়া দিতে আদেশ করিতে লাগিলেন। ঐ দিন বিকালবেলা পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার জন্মোৎসব সন্দর্শনার্থ—উদ্বোধন বাটিতে আগমন করেন এবং তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরম স্নেহ-সহকারে আলিঙ্গন করেন—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। স্বামী সারদানন্দজী শ্রীমন্মহাপুরুষের চরণে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—"আশীর্বাদ করুন, শ্রীশ্রীঠাকুরে ভক্তি-বিশ্বাস হোক"—আর মহাপুরুষজী তাঁহাকে বক্ষদেশে

গ্রহণ-পূর্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে উচ্চরবে বলিতেছেন—"আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে ঠাকুরের কাজ কর।" পূজ্যপাদ স্বামীজী যখন তাঁহাকে আমেরিকা গমনের আদেশ দিয়াছিলেন তখন তিনি নিজেকে এই কার্যের অনুপযুক্ত বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ যে দেশে প্রচার কার্য করিয়াছেন তাঁহার ন্যায় মূর্খলোক সেখানে গিয়া করিবে কি? পরিশেষে তিনি স্বামীজীর আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আমেরিকা ও ইংলন্ডে গমন করেন। সেখানে গেলে পর স্বামীজী যখন তাঁহাকে বক্তৃতাদি করিতে আদেশ করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার সেবা করিতেই আসিয়াছি, বক্তৃতা দিতে তো আসি নাই।" স্বামীজীও তখন বলিয়াছিলেন, "প্রচারকার্যই আমার সেবা।" অতঃপর তিনি প্রচারকার্য দ্বারা আমেরিকার বহু নরনারীর দৃষ্টি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন—বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দের পর আমেরিকার জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় ইনিও সবিশেষ সক্ষম হইয়াছিলেন। স্তুতিনিন্দা সকলকেই সমজ্ঞান করিয়া ইনি অবস্থান করিতেন—অহঙ্কারের সংস্পর্শ তাঁহার জীবনে ছিল না।

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননীর প্রাণপাত-সেবায় সারদানন্দ নাম সার্থক করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকতারূপ গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ ও দিবারাত্র নানা কর্ম সমাপন করিয়াও তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত সেবা করিয়াছেন। লাটু মহারাজ তাঁহার মাতৃসেবায় সন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়াছিলেন—"তুমি মা ঠাকুরানীর সেবা করছো। তোমার জীবন ধন্য, তোমার শরীর পবিত্র।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী শরৎ মহারাজের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার ভার বইতে এক শরৎই পারে।" শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ, তাঁহাদের শত আবদার পরিপূরণ, মায়ের সমীপে সমাগত ভক্তদের সর্ববিধ ব্যবস্থা, সেই সেবার অঙ্গীভূত ছিল। শেষবারে মায়ের অসুখের সময় তাঁহার রক্তপ্রস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল; মায়ের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়াছিলেন। বহু পরে ডাক্তার তাঁহার মুখে এই অসুখের

কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—এই অসুখ অপরের হইলে মরিতে হইত। কিন্তু মৃত্যুর ভাবনা তো স্বামী সারদানন্দের ছিল না। উদ্বোধন মঠের কখনও কাহারও অসুখ হইলে তিনি চাহিতেন, তাঁহার মতো সকলেরই যেন সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হয়। একজন নবাগত ব্রহ্মচারীর অসুখ হইলেও তিনি তাহার অপেক্ষা অধিক সেবার প্রত্যাশা কখনও করিতেন না। শ্রীশ্রীমায়ের দেহাবসানে মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইয়াছে—মাতৃভাবের প্রবল প্রেরণায় আত্মহারা হইয়া জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির স্থাপনকালে তিনি কিরূপে দিনের পর দিন নির্বিচারে সকলকে তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পদ বিলাইয়া দিয়া জগজ্জননীর অপার করুণার নিদর্শনরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন ভক্তগণ তদ্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন। মাতৃমন্দিরে যে কেহ আসিয়া তাঁহার কৃপার প্রার্থী হইয়াছে তিনি তাহাদের কাহাকেও বিমুখ করেন নাই, সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যতক্ষণ না সমবেত সকল দীক্ষার্থীর মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে ততক্ষণ তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে বসিয়া তাহাদের সংসার-সমুদ্র তরণের উপায় করিয়াছেন। সেদিনও তাঁহার শেষ জন্মোৎসব দিবসে বেলুড় মঠে যখন ভক্তগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার পুষ্পমাল্যাদিতে সজ্জিত করিয়া চতুষ্পার্শে উপবেশন-পূর্বক পরমানন্দ লাভ করিতেছিলেন এমন সময়ে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল মহাশয় যখন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখ-চুম্বন-পূর্বক বলিয়াছিলেন, 'বা, তোমাকে তো বেশ সাজিয়েছে' সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহার অন্তর্নিহিত মাতৃগতপ্রাণতা কথায় অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "দশচক্রে ভগবান ভূত। কোথায় মায়ের বাড়ির দারোয়ান—তাকে কিনা ফুল দিয়ে সাজিয়ে ভগবান করে তুলেছে। " মাতৃজাতি বিশেষভাবে তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীমায়ের ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দিনের পর দিন বিকালবেলা উদ্বোধনের বাড়িতে স্ত্রী-ভক্তদের সমাগম ও পূজনীয় শরৎ মহারাজের তাঁহাদের সঙ্গে করুণ ব্যবহার ও আলাপ পরিচয় তাহার নিদর্শন।

শেষ জীবনে তিনি পুনরায় কঠোর সাধন-ভজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি নিষ্ঠা-সহকারে নিত্য সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত

চারি ঘণ্টাকাল ধ্যানাদিতে তন্ময় থাকিতেন। কোনও কোনও দিন আবার তাহারও চেয়ে অধিককাল এই কার্যে ব্যয়িত হইত। ইহার পর আবার তিনি দীক্ষা-দানে সময়ক্ষেপ করিতেন। বহুবর্ষ যাবৎ বহুমূত্র রোগে তিনি ভুগিতেছিলেন, দীর্ঘকাল ধ্যান ও জপ করা তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইবে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে প্রবল ধ্যান-ধারণাদি হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। যৌবনের অশেষ সাধনায় তৃপ্ত না হইয়াও তিনি বৃদ্ধ বয়সে বলিতেন, "আর কতকাল কাজকর্ম করা যায়! এখন একটু ভগবানকে ডাকা যাক।" আজন্ম তিনি কল্পনাতীত ভাবে নিষ্ঠাপর ছিলেন। এই সময়ে জনৈক সাধু দীক্ষাদি দান তাঁহার শরীরের পক্ষে হানিকর হইবে বলিয়া তাঁহাকে উহা হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বলিয়াছিলেন, "তুমি অমন কথা বলিও না, শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিবার জন্য যে আমার কাছে লোক আসে, তাতে আমিই কৃতার্থ। আমি তাদের কৃতার্থ করছি না। আমি যে এই অধিকার পেয়েছি—এই আমার সৌভাগ্য।" তাঁহার নিষ্ঠার অবধি ছিল না। নিষ্ঠা-সম্পন্না বিধবাগণ যেভাবে বিশ্বনাথকে প্রণামাদি করিয়া থাকে, তিনি একান্ত অক্ষম হইলেও বৃদ্ধবয়সেও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। ইতঃপূর্বে কাশীধামে অবস্থান কালে তিনি স্বহস্তে বস্ত্র-কমণ্ডলু গ্রহণ-পূর্বক গঙ্গাস্নান করিয়া নিত্য বিশ্বনাথ দর্শন করিতেন। সেবা-গ্রহণ তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি নিজের কাপড় নিজেই কাচিয়া লইতেন। গঙ্গার ঘাটে অপর সাধুগণ তাঁহার কাপড়খানা ধুইতে চাহিলে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "তোরা আমাকে অথর্ব করতে চাস নাকি?" জনৈক সাধু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বিশ্বনাথের গৃহের শিকল ধরিয়া টানা, তাঁহার পার্শ্ববর্তী পদ্মের নিম্নদেশ দিয়া গমন ইত্যাদি বিধবাদিগের অনুষ্ঠিত আচার-ব্যবহার যাহাকে আমরা এতকাল কুসংস্কার বলিয়া নিঃসন্দেহ ধারণা করিয়া আসিয়াছি, পূজনীয় শরৎ মহারাজকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাকে এই সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নোক্ত উত্তর পাইয়াছিলাম, "কি করিলে যে ভগবানে ভালবাসা দেখান যায় তাহা তো আমি বুঝিনা। গীতায় অর্জুন বলেছেন,

'নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে'—আমিও তাঁর সর্বাঙ্গে প্রণাম করিয়া থাকি। ভগবানে ভক্তি-লাভের জন্য যাহা সকলে কুসংস্কার বলিয়া থাকে তাহার অনুষ্ঠান করিলেও হানি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" তাঁহার নিষ্ঠার উদাহরণ-স্বরূপে ইহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বামীজী তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সকলে চেষ্টা করিয়াও সেই পদ হইতে তাঁহাকে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

শেষ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন। অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন, তিনি আর বেশি দিন নরদেহে অবস্থান করিবেন না। তিনি নিজেও এই সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেন নাই, তাহা নহে। স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের অবশিষ্ট অংশ এই কালে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি তাঁহাকে তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার আর এখন লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমার এখন (সাধন-ভজনে) ডুবতে ইচ্ছা।" শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের কাজ শেষ হইল।" আবার যোগেন-মা ও গোলাপ-মার দেহান্তেও নাকি বলিয়াছেন, "মা ইহাদের ভার আমার উপরে দিয়াছিলেন—ইহারা চলিয়া গিয়াছে, আমারও কাজ শেষ হইয়াছে।" যাহা হউক ক্রমে ক্রমে তিনি ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে ডুব দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন তাঁহার এই পন্থা প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছিল। দিন পনের ধরিয়া শরীরের অসুস্থতা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি উহার সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই সময়েই তাঁহার বিশেষ প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকরী সভা (Working Committee) গঠিত হয়। মহাসম্মেলনের অবসানে সমবেত সাধুগণকে তিনি একদিন রাত্রিতে মিশনের আদর্শ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দেহাবসানের কয়েকদিন মাত্র পূর্বেও তিনি অযাচিতভাবে Working Committee-র অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সমূহ গুরুতর সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

বিগত (১৩৩৪) ২০ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় তিনি

নিচে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞার বিলোপ হয়। শীঘ্রই ডাক্তার কবিরাজ ডাকা হইল। চিকিৎসকগণ বলিলেন—তাঁহার Apoplexy (সন্ন্যাস রোগ) হইয়াছে। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই নিদারুণ সংবাদ কলকাতা ও পরিশেষে দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ত্রয়োদশ দিবস যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি জন্মের মতো আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেবদেহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক ভক্তগণ উহা অনলে আহুতি প্রদান করত পবিত্র হইলেন। দেখিতে দেখিতে স্বামী সারদানন্দ অতীতের বস্তুতে—ঐতিহাসিকের উপকরণে পরিণত হইলেন।

প্রাণ-নির্গমনের পর তাঁহার মুখমণ্ডলে যে সৌম্যশান্ত ভাবের প্রকাশ ভক্তগণ দেখিয়াছেন তাহা তাঁহারা এ জীবনে বিস্মৃত হইবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা। অন্তরের ভাবধারা গোপন করিয়া রাখা স্বামী সারদানন্দের আজীবন স্বভাব ছিল। পাছে চরমকালে তাঁহার সেই নীরবতা ভঙ্গ হইয়া যায় ভাবিয়াই বুঝি শ্রীভগবান তাঁহাকে বাকশক্তি-শূন্য করিয়া ত্রয়োদশ দিবস রোগশয্যায় রাখিয়াছিলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণের নামে উৎসৃষ্ট-প্রাণ সন্ন্যাসিগণ—আজীবন যাঁহাদের তাঁহার সেবা করিবার বাসনা ব্যর্থ হইয়াছে, জগদ্‌গুরু তাঁহাদের সেই ঐকান্তিক প্রার্থনা পূরণের জন্যই যেন সর্বপ্রকারে অন্তঃকালে তাঁহাকে তাঁহাদের সেবামাত্র-সম্বল করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিবার জন্য বিশেষ আশা অনেক ভক্তের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। স্বামী সারদানন্দ জীবনব্যাপী নীরবেই ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন—পরিনির্বাণকালে আমরা তাহার ব্যত্যয় আকাঙ্ক্ষা করি কেন? তিনি নীরবে আব্রহ্মস্তম্ব প্রাণিজাতকে আশীর্বাদ করিয়া লীলাময় বিগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্বক নিত্যধামে শ্রীগুরুর নিত্যসাহচর্য লাভ করিয়াছেন। দেশকাল-পাত্র-নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহার উচ্চারিত শুভাশীর্বাণী যে এখনও তাঁহার 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর পার্ষদগণ দেবলীলা সম্পন্ন করিয়া প্রায়

সকলেই অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যবশে এখনও তাঁহাদের কেহ কেহ সশরীরে বিদ্যমান থাকিয়া মানবকল্যাণ সাধন করিতেছেন। যুগনায়ক মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের লীলার পুষ্টির জন্য তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, "বাউলের দল এল গেল নাচলে গাইলে, কেউ চিনলে না"—তাঁহাদের প্রেমের হাট প্রায় ভাঙিয়াই গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার লীলাসহচরবর্গের পূতজীবনের মহিমা উপলব্ধির অকপট অভিলাষ অন্তরে যদি সামান্য পরিমাণেও বিদ্যমান থাকে তবে এস হে পাঠক, বেলুড়ের মঠ-মন্দিরে—শ্রীরামকৃষ্ণ সহচরদিগের লীলাক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যদের শ্রীপদপ্রান্তে অভিমান বিসর্জন-পূর্বক জিজ্ঞাসুরূপে উপনীত হই, নতুবা এ তত্ত্ব চিরদিনের তরে দুর্বোধ্যই থাকিয়া যাইবে।

লোক-গুরু

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

পারমার্থিকতাভ্রষ্ট একটা পতিত জাতির মৃত ধর্মকর্ম শিক্ষা সভ্যতার শবের উপর বসিয়া সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল নিরলস নিষ্ঠার সাধনা করিয়াছেন যে মহাভৈরব, অল্প দিন হইল তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। এই পুণ্যকর্ম-ভূয়িষ্ঠ দ্বিষষ্টিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সশ্রদ্ধদৃষ্টি শোকতাপ বিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া মনুষ্যত্বের সুমহৎ গৌরব দর্শন করিয়া ধন্য হউক।

এই শক্তিশালী জীবন নবযৌবনে তৃষ্ণার্ত চিত্ত লইয়া পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে কিভাবে দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছিলেন সে কাহিনী অনেকেই জানেন। দশজন কলেজের ছাত্র যে পথে চলিয়া যে অভীষ্ট লাভ করে, সে পথ তাহার চলিবার পথ নয়—ইহা যেদিন তিনি অনুভব করিলেন, সেই দিনই অবলীলাক্রমে জন্মগত জাতিগত সংস্কারের বাধা ছিন্ন করিয়া একেবারেই মুক্ত আকাশের নিচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তেজোময় ঋজু স্বভাব এই বলিষ্ঠ পুরুষ দক্ষিণে ও বামে চাহিলেন না—একাগ্র লক্ষ্যে ভারতবর্ষের পরম সাধনায় ডুবিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধি ও সাধনা তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছিল; কাজেই বাঙালি সমাজের অভ্যস্ত গতানুগতিকতা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে তাঁহাকে অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয় নাই।

তরুণ বয়সেই সত্যলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্গ্রীব হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া সত্যদীক্ষা লাভ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিলেন—এই

বালকের মধ্যে ত্যাগের জ্বলন্ত শক্তি রহিয়াছে। একদিন শরচ্চন্দ্রকে ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি কিভাবে ঈশ্বর প্রণিধান করিতে চাহ? ধ্যানে কোন্ রূপ দেখিতে তোমার ইচ্ছা?"

শরচ্চন্দ্র উত্তর করিলেন—"আমি ধ্যানে ঈশ্বরের কোন বিশেষ মূর্তি দেখিতে চাহি না। আমি তাঁহাকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত দেখিতে চাহি। অলৌকিক দর্শন আমার অভিপ্রায় নহে।"

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—"এ যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ কথা। এতো একদিনের কাজ নহে।"

যুবক ধীর স্বরে উত্তর দিলেন—"ইহার কমে আমার শান্তি হইবে না। যতদিন ঈপ্সিত লাভ না হয়—ততদিন আমি সাধনায় বিরত হইব না।"

শরচ্চন্দ্রের মানসিক অপরিমেয় বলের চিত্রটি এই কথোপকথনের মধ্য দিয়া কি পরিপূর্ণরূপেই না প্রকাশিত হইয়াছে! সর্বসাধনায় সিদ্ধ জগদ্গুরুর নিকট তিনি কিছু চাহিলেন না, প্রাকৃতজনের ন্যায় অলৌকিক দৃশ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না—তিনি ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-সাধনার চরম লক্ষ্যের উপর ধ্রুবদৃষ্টি রাখিয়া অনায়াসে বলিলেন—গুরুদেব, আমি সাধনা দ্বারাই সত্যলাভ করিব এবং নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিব। এইখানেই বল, এইখানেই তেজ, এইখানেই শক্তি, এইখানেই মনুষ্যত্বের গৌরব। যাহা দুঃখের ধন, তাহা ভিক্ষা করিয়া লইব না, দুঃখ করিয়া পাইব—এই তো মানুষের তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ।

যে সমস্ত মুমুক্ষু যুবক এই কালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সমবেত হইতেন, শরচ্চন্দ্র অল্পদিনেই তাঁহাদের সশ্রদ্ধ ভালবাসা লাভ করিলেন—ধীর গম্ভীর উদার স্বল্পভাষী অথচ কোমল-হৃদয় যুবক স্বীয় চরিত্রমাহাত্ম্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে স্বীয় বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন ভক্তগণের আনন্দের হাট ভাঙিয়া গেল, তখন মুষ্টিমেয় ত্যাগী যুবক বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সংসার ত্যাগ করিয়া

দাঁড়াইলেন—জগতের কল্যাণের জন্য, স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, ধর্মের বিকৃতি, সামাজিক জীবনের অধঃপতন দূর করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহান আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন—তাহার সাধন ও প্রচার করিবেন—এই ইচ্ছা। গুরুবিয়োগব্যথায় দুঃখভারনম্র মহামৌনী সাধক শরচ্চন্দ্রকেও আমরা সেদিন বরাহনগরের ভগ্নবাটিতে গুরুভাইদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহোচ্চসাধনায় ব্রতী দেখিতে পাই। মহৎ আদর্শের জন্য গুরুগতপ্রাণ বাল-সন্ন্যাসীদের এই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন যখন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল—তখন প্রতিপদে তাঁহারা বাধা পাইতে লাগিলেন। তৎকালীন সমাজের প্রতিকূলতা, আত্মীয়-স্বজনের বাধা, দারিদ্র্যের পেষণ এ সকলই পর্যায়ক্রমে তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইল। তাঁহারা দক্ষিণ কি বামে হেলিলেন না—শরবৎ ঋজু একাগ্রতা লইয়া মানব-সাধ্য সকল কৃচ্ছ্রব্রতই স্বীকার করিলেন—ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিত্তি বরানগরের জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনের নিভৃত কক্ষে স্থাপিত হইল।

তারপর দেখিতে পাই—তাপস শরচ্চন্দ্র পরিব্রাজক সন্ন্যাসিরূপে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন, কখনো বা হিমালয়ের শান্ত-গম্ভীর ক্রোড়ে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন—বিশ্বমানবের সেবাব্রতে নিজেকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। অমৃতের সাধনায় দিব্যভাবে বিভোর সাধক কি ব্যাকুলতা লইয়া ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন, কে বলিবে? যে জাতির সামাজিক জীবনের উপর জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিবে তাহাকে অতীত মহত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার সত্য পরিচয় লাভের জন্যই বোধ হয় এই পরিব্রাজক ব্রত, এই তপশ্চর্যা!

এই কালের পূর্ণতায় একদিন সুদূর আমেরিকার বিশ্বধর্ম-সভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন—প্রচারশীল হিন্দুধর্মের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তখন গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বামী সারদানন্দ বেদান্তের পতাকা হস্তে পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিলেন—শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরিয়া আসিযা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা

করিলেন। স্বামী সারদানন্দ গুরুভ্রাতাগণের আগ্রহাতিশয্যে এই নবীন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকত্বের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবনাদর্শে এই যে নূতন ধর্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইল—ইহা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিল না—অথচ বর্তমান ধর্মসাধনার বিকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহাতে লোকাচারপন্থী প্রাচীনের দল চিৎকার করিয়া উঠিলেন। বাঙালি সমাজের কৃশজীর্ণ দৌর্বল্য, নবযুগের নূতন সন্ন্যাসের মহাবীর্যকে আপন শক্তিরই প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিল না। মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে নূতন আদর্শ, নূতনভাব কোনদিনই সমাজে বিনা বাধায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, অতএব এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কিন্তু সত্যের জন্য সকল বাধা-বিপত্তি, সকল অসম্মান যাঁহারা হাস্য মুখে বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিজের বলিতে কিছুই রাখেন নাই—আরাম না, বিশ্রাম না, ভয় না, সঙ্কোচ না—তাঁহাদের কেবল এই পণ ছিল, দেশের সম্মুখে খাঁটি জাতীয় আদর্শ স্থাপন করিবেন। দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের ভাবের গভীরতা এবং উদ্দেশ্যের একতা, সমস্ত বৃহৎ বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিল—এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রত্যাশিত তিরোভাবেও সঙ্ঘের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার কোন বাধা ঘটিল না। "সঙ্ঘের কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন" তাহা স্বামী সারদানন্দের ছিল এবং তাহা ছিল বলিয়াই কোন দিন তাঁহার নৈরাশ্য আসে নাই।

বাহিরে লোকসমাজে যশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার প্রচুর ছিল—কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাবের পর তিনি নিজেকে বাহিরের সকল কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্তভাবে সঙ্ঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আত্মগোপনকারী এমন নিরলস কর্মী কদাচিৎ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

গত সতের বৎসর কাল তাঁহাকে দেখিয়াছি। যে কর্ম প্রচুর উদ্যমের সহিত নিজেকে বিস্তীর্ণভাবে প্রকাশ করে, তাহা তাঁহাতে ছিল না—কেননা কর্মকে অনর্থক বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে অতিরিক্ত আড়ম্বরের আবশ্যক, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ক্ষুদ্র বলিয়া কোন কর্মই তাঁহার নিকট

তুচ্ছ ছিল না—কেননা, ছোট বড় সকল কাজের মধ্যেই তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি সহজ নৈপুণ্যে প্রয়োগ করিতেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অতি ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক বিস্তৃতির মুখেই তিনি অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়াছেন। বিস্তারের ফলে ত্যাগের ভাব ও আদর্শানুরাগ পাছে হ্রাস পায়, এই আশঙ্কা তাঁহার সর্বদাই ছিল। যেখানে বিশ্বাস কম, সেইখানেই প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ আয়তনের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিবার স্পৃহা জাগে—সত্যবস্তুকে ফেনায়িত করিয়া আকারে বৃহৎ করিয়া দেখাইবার লেশমাত্র চেষ্টা তাঁহার মধ্যে কোন দিন দেখি নাই—সত্যকে তিনি খাঁটিভাবেই বিনা আবরণে প্রকাশ করিতেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির মূল রহস্য ইহাই।

বাগবাজারের ক্ষুদ্র বাটিতে শ্রীশ্রীমার পদপ্রান্তে বসিয়া এই আত্মসমাহিত জ্ঞানযোগী তাঁহার জীবন দেশের সকল মঙ্গল চেষ্টায় তিলে তিলে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—এক তলার ছোট্ট ঘরখানিতে এই মহাপুরুষের আত্মমগ্ন 'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' জ্ঞান-গম্ভীর রূপ কতবার না দেখিয়াছি—প্রকাণ্ড ধরণী প্রচণ্ড বলে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান হইয়াও যেমন স্থিরবৎ প্রতীয়মান হয়, এই মহাকর্মীও ঠিক তেমনি আপনাতে আপনি অটল বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। আমাদের স্থূল দৃষ্টির সাধ্য কি যে, সে মহৎ জীবনের যবনিকার এক প্রান্ত তুলিয়া দেখিতে পারে। তথাপি তাঁহার আত্মসম্বরণ করিবার, আত্মগোপন করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বলিয়া সর্বদাই তাঁহাকে আমরা একান্ত আপনার ভাবে অতি নিকটে পাইতাম। ধর্ম কথা, অধ্যাত্ম উপদেশ, কূট তর্ক, সাংসারিক পরামর্শে—কত লোক কত ভাবে সময়ে অসময়ে তাঁহাকে অনর্থক উত্ত্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু তিনি কখনো বিরক্ত হইতেন না, রুষ্ট হইতেন না, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলকে সমানভাবে সমাদর করিতেন, সকলের কথা সমান শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। মানুষের আত্মার চিন্ময়রূপ যিনি দেখিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব! তাঁহার উদার স্বার্থলেশহীন প্রেম দ্বারা তিনি সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন; তাঁহার অপর্যাপ্ত বল-বুদ্ধিদ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও এমন প্রবল, এমন সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যদিগকে নারীমাত্রকেই মাতৃরূপে দেখিবার উপদেশ দিতেন। শ্রীগুরুর পুণ্য আদর্শের অনুসরণে সারদানন্দ মাতৃভাব সাধনার সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী সারদাদেবী তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, দয়া, মমতা লইয়া মাতৃত্বের যে অনুপম আদর্শরূপে বিরাজমানা ছিলেন তাহাই ছিল সারদানন্দের শক্তি-সাধনার মূর্ত প্রতীক। যে ভারতের আর্যগৌরব ঋষিকুল নারীমহিমা প্রথম অনুভব ও প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ভারতে নারীজাতির প্রতি কাপুরুষগণের অবজ্ঞা ও অসম্মান দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ করুণাবিগলিত হৃদয়ে অশ্রুপাত করিতেন। "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে তিনি জগতের যাবতীয় নারী মূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন"—সেই ভারত-নারীকুলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা যে কত সত্য পদার্থ ছিল, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। তাঁহার মধ্যে লেশমাত্র ভাবুকতার স্বপ্নাবরণ ছিল না। নারীর সমস্ত দৈন্য অপূর্ণতা ত্রুটির মধ্যেও তিনি জগদম্বার স্বরূপ দর্শন করিতেন। আমাদের দেশে কাপুরুষগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত অবমানিত নারীর বেদনা সম্পর্কে তাঁহার বোধ এত তীব্র ছিল যে সেই বহুকাল সঞ্চিত অপরাধ সমষ্টির প্রায়শ্চিত্ত ব্রতই যেন তাঁহার সর্বোচ্চ সাধনা—অতি দীনা নারীর প্রতিও অকুণ্ঠিত করুণার মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইত। নারীর দৈন্য তাঁহার শ্রদ্ধাই উদ্বোধিত করিত, অবজ্ঞা নহে। সমাজে নারীর প্রতি প্রতিদিনের অবজ্ঞা দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন, "অস্বাভাবিক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্বর! তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই হইয়াছে! একবার বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্জন নয়ন হইতে অপসৃত করিয়া ভূজগতে দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে, জগতের আদর্শস্থানীয়া দিব্য নারীকুল একমাত্র ভারতেই হিমাচলস্তরের ন্যায় অনুল্লঙ্ঘনীয় শ্রেণিতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মানা। তাঁহাদের পদরজে কেবল ভারত নহে কিন্তু সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমগ্র পৃথিবীই সর্বকালের জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন। ভারতের ধূলি...সীতা, দৌপ্রদী, বুদ্ধৈকপ্রাণা যশোধরা, চৈতন্যঘরনী বিষ্ণুপ্রিয়া, ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাঈ বা চিতোরের বীররমণীকুলের দেবারাধ্য পদস্পর্শে পবিত্রিত! ভাব

দেখি—ভারতের বায়ু যাহা প্রতি নিশ্বাসে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা ঐ সকল দেবীদিগের পবিত্র হৃদয়ে যুগে যুগে প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়া করিয়া তাঁহাদের পবিত্রতায় ওতঃপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দেখিবে—তোমার জগন্মাতা নারীকুলের উপর বিশেষত ভারতের রমণীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্তি প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমার কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমায় পরিণত করিবে।"

'ভারতে শক্তিপূজা'র তত্ত্ব কহিতে গিয়া তাঁহার এই আবেদন অদ্যকার যুবক-বাঙলার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে কিনা বলিতে পারি না; তবে নারীজাতির প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার বলিষ্ঠ পৌরুষের জীবন্ত মূর্তি দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

কর্মশালার সিংহদ্বার দিয়া যে জীবন, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সগৌরবে জগদীশ্বরের বিরামশালায় চলিয়া গেল—তাহার ইহজীবনের সমস্ত সমাপ্ত কর্ম জাতির অক্ষয় সম্পদরূপে দেশের মধ্যে ধ্রুব হইয়া রহিল। ইহাই আমাদিগকে বল দিবে, ভরসা দিবে—সঙ্কটের দিনে অনির্বাণ দীপশিখার মতো পথ দেখাইবে। আজ শুধু এই পরাধীন পতিত জাতির মধ্যে এমন শক্তিমান পুরুষ জন্মিয়াছিলেন বলিয়া স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত হইব—নিশ্চয় করিয়া জানিব—ভারতবর্ষে সমষ্টিমুক্তির এই অগ্রদূতের কল্যাণময়ী সাধনা ব্যর্থ হইবার নহে। উপযুক্ত আধার সকল অবলম্বন করিয়া সেই সাধনা অধিকতর মহীয়ান হইবে—ইহা জানিয়া আসুন সকলে করজোড়ে এই দিব্যধামগত মহাপুরুষের জয়োচ্চারণ করি।

দেব-মানব

প্রফুল্ল কুমার সরকার

আমার উপর স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার আদেশ হইয়াছে। কিন্তু লিখিতে বসিয়া দেখিতেছি যে, কাজটা বড় সহজ নয়, বস্তুত আমার পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। যিনি স্বয়ং পরমহংসদেবের লীলাসহচর এবং স্বামী বিবেকানন্দের সহকর্মী ছিলেন, যিনি একাধারে জ্ঞানী ও কর্মী, গত বিশ বৎসর ধরিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমার ন্যায় সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের সাধ্য কি, তাঁহার সাগরতুল্য মহান গম্ভীর চরিত্রের পরিমাপ করে? আর জ্ঞানী ও কর্মী হিসাবে স্বামী সারদানন্দ যত বড় ছিলেন, তাহা অপেক্ষাও বড় ছিলেন তিনি অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে। গীতায় 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র কথা আছে। এই 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র স্বরূপ কি স্বামীজীকে না দেখিলে, তাহা আমি ধারণা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু এই উচ্চতর অধ্যাত্মক্ষেত্রের কথা, এই ভূমিতে উঠিয়া তিনি স্বীয় জীবনের দ্বারা নবীন ভারতের সম্মুখে যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন—তাহার কথা বলিবার অধিকারী আমি নহি, বলিবার চেষ্টাও আমি করিব না।

আমার ন্যায় মন্দমতি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য যে, আমি তাঁহার পাদমূলে বসিবার অধিকার পাইয়াছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ-দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন দিন আমি তাঁহার নিকট সাহস করিয়া কোন উপদেশ জিজ্ঞাসা করি নাই। আমার ন্যায় দুর্বল মানবের জীবনে যে সমস্ত বিষময় ও জটিল সমস্যার উদয় হয়, সংসার-দাবানলে অহরহ দগ্ধ হইতে হয়, কোন দিন মুখ ফুটিয়া তাহার মীমাংসা জানিতে চাহি নাই, শান্তিলাভের উপায়ও প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, না বলিলেও তিনি যেন মনের

কথা বুঝিতেন। সহস্র উপদেশে যাহা না হয় তাঁহার পাদমূলে বসিয়া তাঁহার প্রশান্ত গাম্ভীর্যের স্নিগ্ধ নীরবতায় তাহা লাভ করিতাম। পাশ্চাত্য কবির কাব্যে পড়িয়াছি হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎবার্তা মানসবার্তা প্রচারিত হয়। ভারতের ঋষি ও কবিরা তাহার অপেক্ষাও বড় কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কথা নয়, মহারাজের সান্নিধ্যে গিয়া আমি অনুভব করিয়াছি যে, অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার—জীবনের জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য অধ্যাত্ম জগতের আর এক ভাষা আছে। সে ভাষা বর্ণনা করিবার, তাহার রূপ দিবার সাধ্য আমার নাই, বোধ হয় তাহা করাও অসম্ভব। কিন্তু তবু আমি দৃঢ়ভাবে বলিব যে, মানব-হৃদয়ের এই অকথিত ভাষা—অধ্যাত্মজগতের এই অরূপ সম্পদ, ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা। আর বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়া এইভাবেই মহাপুরুষেরা ক্ষুদ্র মানবকে অধ্যাত্মজীবনের পথ প্রদর্শন করেন। এত কথা বলিয়াও তবু হয় তো কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। পাঠকগণ, আমার এই অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মহারাজের কাছে যাইলে তিনি বড় বড় তত্ত্বকথা বলিতেন না বা উপদেশ দিবার ধার দিয়াও যাইতেন না। সাধারণ মানুষের মতো অতি অন্তরঙ্গ আপনার জনের মতো সাধারণ সুখ-দুঃখের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যাইত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে জানিয়া ঐ কাগজের কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন। কাগজ কেমন চলিতেছে, কি করিলে কাগজের উন্নতি হয়, কাগজের আদর্শ কেমন হওয়া উচিত—এইসব বিষয় বলিতেন। আবার বলিতেন, ''তোমাদের কাগজ পড়িতে আমি খুব ভালবাসি, প্রত্যহ আদ্যোপান্ত পড়ি।'' বাস্তবিকই একথা তিনি বাড়াইয়া, কেবল মাত্র আমাকে খুশি করিবার জন্য বলিতেন না। আমি সন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে, সত্যই তিনি ঐরূপ করিতেন।

কাহার কোন্ বিষয়ে অনুরাগ—বুঝিতে পারিলে, তিনি তাহার সঙ্গে সেই বিষয়েই আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। একবার একখানি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক আমার নিকট হইতে তিনি পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন। সকলে

বোধ হয় জানেন না যে, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গীতবিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার বোধ হয় কিরূপে ধারণা হইয়াছিল, সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আমার কিছু জানা আছে। একদিন আমি যাইলে ঐ পুস্তকটির প্রসঙ্গ উঠাইয়া সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সঙ্গীতবিদ্যায় আমি একেবারে আনাড়ি। সুতরাং লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমাকে সে কথা স্বীকার করিতে হইল। তিনিও অন্য প্রসঙ্গ উঠাইলেন।

আমি এইসব সামান্য ব্যক্তিগত কথা বলিলাম এইজন্য যে, এইসব ছোটখাট ব্যক্তিগত কথা, দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়াই স্বামীজীর মহান চরিত্র আরও বেশি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিত। সকল শিষ্য, সেবক, অন্তরঙ্গ, পরিচিতের সঙ্গেই তিনি ঐরূপ করিতেন, সকলকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বাহির হইতে দেখিলে তাঁহাকে জ্ঞানগম্ভীর প্রশান্ত সমুদ্রের মতো বোধ হইত। কিন্তু যে একবার তাঁহার কাছে যাইত, মিশিবার সুযোগ পাইত, সেই বুঝিত, সেই সমুদ্রে লোনাজল ছিল না, গঙ্গার পবিত্র বারিধারার মতই তাহা সুমিষ্ট, কত পাপীতাপী সংসারদাবদগ্ধ ব্যক্তি সেই বারি পান করিয়া শান্তিলাভ করিত। একদিকে তিনি যেমন কঠোর জ্ঞানতপস্বী সন্ন্যাসী কর্মযোগী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই তাঁহার প্রকৃতি শিশুর মতই সরল কোমল ছিল। ভবভূতি বলিয়াছেন, লোকোত্তর পুরুষদের চরিত্র বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের চরিত্র দেখিয়া বুঝিয়াছি, ভবভূতির বর্ণনা কবি-কল্পনা নয়।

লীলা-সহচর

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালরূপী ভগবান তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড-উদরে অতীতে কত যে ভক্ষণ করিয়াছেন, বর্তমানে কত যে করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে কত যে ভক্ষ্যবস্তু স্থির করিয়াছেন, এমন শক্তিশালী কে আছে যে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? জিজ্ঞাসিত হইলে ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়াছেন কতবার যে কত শত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, হুতাশন আমার এই বিশাল গর্ভরূপ শান্তি-নিকেতনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহা আমিই স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না—অন্যে পরে কা কথা! তোমাকেও তো প্রায়শ কবলিত করিতেছি, তুমি তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আর কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিবে যখন তোমার সমস্তই আমাতে প্রবিষ্ট হইবে। তখন দেখিবে, তোমার প্রিয় বস্তু সকল রত্নাকরের গর্ভে রত্নের ন্যায় আমার উদরে অনাবরণ ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিতেছে। ওই নির্মল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কত কোটি হীরকখণ্ড স্ব স্ব প্রভায় বিরাজিত হইয়া গগনমণ্ডলের কি এক অনির্বচনীয় শোভার প্রস্ফুরণ করিতেছে; ঐ বিচিত্রিত আকাশমণ্ডল আমার উদরের আংশিক আয়তন। ঐখানে তুমি তোমার অন্বেষণীয় প্রিয় বস্তু সকল দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে—সমস্তই তথায় বিদ্যমান আছে, কাহারও অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। ঐ স্থানেই শ্রীমৎ সারদানন্দ বিদেহমুক্ত অবস্থায় প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন। ঐ দেখ, আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ গোচর করিয়া উল্লসিত হইতেছে এবং স্বর্গীয় কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার বিশাল হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছে।

অন্যদিকে চক্ষুসঞ্চালন করিয়া দেখ, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রমুখ অগ্রগামী সাধুমণ্ডলী তাঁহাদিগের আজানুলম্বিত বাহু প্রসারণ-পূর্বক

বহুদিনের অদর্শন-জনিত মানসিক উদ্বেগ নিবারণ করিবার মানসে শরৎ মহারাজকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার ঐ দেখ, তোমাদের পরমারাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে আধ আধ হাস্যে ভুবন-সুন্দর মুখমণ্ডল উজ্জ্বলীকৃত করিয়া স্বীয় পার্ষদগণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিতেছেন—তোমরা স্থূল দেহে এতদিন ধর্মোপদেষ্টা-স্বরূপে এই সসাগরা, সদ্বীপা ধরামণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিয়াছ, এখন আমার সহিত কিছুদিন বিশ্রাম সুখ অনুভব কর, পরে ক্লান্তির অপগমে প্রয়োজন মতো তোমাদের সহিত পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলা বিস্তার করিব।

এই সন্তাপনাশিনী অশরীরী বাণীই এখন আমাদিগের করস্থিত দণ্ড হউক। এই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দেহপাত পর্যন্ত আমরা এই শোকদুঃখসমাকুল সংসারের বন্ধুর পথে পরিভ্রমণ করিব। মূঢ় মন বুঝিয়াও বুঝে না যে, ইহ সংসারে যাহা জাত হয় তাহাই কিছুদিন স্থিতি লাভ করিয়া অবশেষে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। দেহটা জন্মগ্রহণ করে, এই কারণে তাহার অবসান হয়। দেহী কোনদিনই জাত হয় নাই, অতএব তাহার বিনাশও নাই। সে বস্তু পুরাণ ও শাশ্বত, সুতরাং অবিনাশী। কে কবে চৈতন্যের মৃত্যু দেখিয়াছে? যখন তাহার কোনও সাক্ষী নাই তখন কেন জড়দেহের বিনাশ দেখিয়া কাতর হও?

শোকেরই বা অবসর কোথায়? যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, যৌবনের বিলাসবিভ্রম যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, সেই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ যে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ধামে গমন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? শোকাভিভূত হইলে আমরা যে, তাঁহার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব মন বৃথা শোকের বশ্য হইও না। তবে তাঁহার অদর্শন-জনিত কিছু অভাব অনুভব করিতেছ সত্য, কিছু কেন বিশেষরূপে অভাবগ্রস্ত হইয়াছ। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, এইরূপ বিরহই নিয়তির মর্যাদা—কেননা সংযোগ হইলেই বিয়োগ দুঃখানুভব করিতে হইবেই হইবে। ক্ষিতিতলে এমন নরনারী নাই যাঁহারা মিলন ও বিচ্ছেদজাত সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবে যেদিন সেই মহাপুরুষের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, সে বহুদিনের কথা। সেই অবধিই তিনি ভালবাসার চক্ষে আমাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। সেই আকর্ষণে আমি প্রতিদিনই তাঁহার সহিত সদালাপে, অধ্যাত্মকথা-প্রসঙ্গে দুই-এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতাম। মনে হইত, ভাগ্যক্রমে আমার এই দুর্লভ সাধুসঙ্গ ঘটিয়াছে। তিনি যখন ধ্যান-ধারণা পূজা-পাঠাদি সাঙ্গ করিয়া দিবসান্তে বাহিরের কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিবার জন্য অপেক্ষায় বহুতর ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত থাকিতেন। আমিও সেই সময় দিবসের কার্য শেষ করিয়া যাইতাম। একবার তাঁহার নয়নরশ্মির গোচর হইলেই সেই জনতা মধ্য হইতে দুই-একজনকে অন্য গৃহে যাইতে আদেশ দিয়া সেই গৃহমধ্যে আমার উপবেশনের স্থান নির্দেশ করিয়া দিতেন, তাহাতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ অনুভব করিতাম। সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে সুমধুর গম্ভীর বাক্যে উত্তর দিতেন, "আপনার কথা সাধারণের সহিত তুলনা হইতে পারে না।" ইহাতে আমি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতাম এবং মনে হইত—তিনি আমাকে শুধু ভালবাসিতেন এরূপ নহে, আমাকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষুতেও দৃষ্টি করিতেন। দুই একদিন কার্যবশে দেখা না করিতে পারিলে আমার বাটিতে লোক পাঠাইয়া তথ্য লইতেন। এমন কি স্বতঃ পরতঃ আমার শুভসাধনে যত্নবান ছিলেন। বলিতে কি, সারাদিন এই মায়ামোহময় সুখদুঃখসমাকুল সংসারযাতনা ভোগ করিয়া যখনই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতাম তখনই চিত্তে বিশ্রান্তি বোধ হইত। তিনি আমাদিগের একজন পরমাত্মীয় উপদেষ্টা এবং হিতকারী বন্ধু ছিলেন। দেহত্যাগের কতিপয় দিন পূর্বে আমায় বলেছিলেন, "ক্ষীরোদ তো আমাদের ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল, দেখিবেন, আপনিও যেন সেরূপ করিবেন না।" এখন দেখিতেছি, তিনিই আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আপনিই পলাইয়া গেলেন।

যতদূর তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি একজন মুক্ত পুরুষ ছিলেন। কুম্ভকারের চক্র-সদৃশ নিজের প্রাক্তন দেহের অবসান প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা প্রভৃতি অনন্যসাধারণ গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন,

তাঁহাতে রাগ দ্বেষ অহঙ্কার কোন দিনই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। পরের দুঃখ দেখিলে তাহা আপনাতে আরোপ করিয়া কাতর হইতেন এবং যথাসাধ্য দুঃখ প্রতিকারের জন্য যত্নবান হইতেন। তাঁহাকে স্থৈর্য, গাম্ভীর্য ও উদারতার প্রতিমূর্তি বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। এমন কি রোগের তীব্র যাতনাও তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারিত না। পাছে ভক্তবর্গ কাতর হয় এইজন্য শারীরিক ক্লেশ কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না। সমস্ত শাস্ত্র তাঁহার অধীত ছিল এবং কি ইংরাজি, কি বাঙলা উভয় ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার ইংরাজি ও বাঙলায় সারগর্ভ বক্তৃতা যিনি শ্রবণ-গোচর করিয়াছেন তিনি তাঁহার ভাষাদ্বয়ে কৃতিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রচনাচাতুর্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' এবং অন্যান্য পুস্তকে অনেকেই দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি পরিচয় দিব, সুধীমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন।

একসময়ে সরকার বাহাদুরের ঈষৎ বক্র দৃষ্টি দ্বারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক ও স্বদেশী আন্দোলন সময়ে কতকগুলি নিরপরাধ কৃতবিদ্য যুবকের গতি সরকার বাহাদুরের লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। সেই সকল যুবক তাহাদের ভবিষ্যজীবন অন্ধকারে আবৃত হইতেছে দেখিয়া অনন্যোপায়ে মহারাজের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলে তিনি সাদরে তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া নিজ অঙ্কে স্থান দান করিয়াছিলেন। ইহাই রাজপ্রতিনিধিগণের মিশনের উপর বোধ হয় সন্দেহের কারণ। যাহা হউক তিনি তদানীন্তন বঙ্গের শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গভীর উদার যুক্তিপূর্ণ আলাপে তাঁহার সে সন্দেহ অপসারিত করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে চিরদিনের জন্য নিরাপদ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বড় একটা কম শক্তির কথা নহে—সিংহের কবল হইতে শিকার ছিনাইয়া লওয়ায় যে শক্তির প্রয়োজন, ইঁহাকে সেইরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অধিক কি বলিব, তাঁহার উপমা তাঁহাতেই, যেমন—"গগনং গগনাকারং সাগরো সাগরোপমঃ।"

মহাসমাধি

উদ্বোধন

'ভারতে শক্তিপূজা'র সিদ্ধ মহাপুরুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান গঠনকর্তা ও পালয়িতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-বেদ রচয়িতা, শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ ও লীলাসহচর, আশ্রিতবৎসল, আর্তত্রাতা, মহাপ্রাণ, আচার্যবর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ এ যুগের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিয়া বিগত (১৩৩৪) ১ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ২টো ৩০ মিনিটের সময় মহাসমাধিযোগে স্ব-স্বরূপে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার স্থূল শরীরের এই অপ্রকাশ—'সঙ্ঘের', ভারতের, শুধু তাহাই নহে—সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের এক বিরাট অংশকে শূন্য করিয়া দিয়াছে। এই শূন্যস্থান ততদিন শূন্যই থাকিবে, যতদিন না তিনি আবার আসিয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবেন।

স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি শরচ্চন্দ্রকে (স্বামী সারদানন্দ) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পৌষ-শুক্লা-ষষ্ঠী তিথিতে পাইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতার নাম নীলমণি দেবী। কলকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষ পবিত্র করিয়াছিলেন। বর্তমান হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলই এই মহাপুরুষের জন্মস্থান। বাল্যকালে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ এলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র পূজ্যপাদ শশী মহারাজও (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ঐ স্কুলে পড়িতেন। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণের প্রতিষ্ঠিত একটি সমিতি ছিল। তাঁহারাও দুই ভাই ঐ সমিতির সভ্য ছিলেন। একবার সমিতির বার্ষিক আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে বালকগণ দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানে গমন করেন। বালক শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজ তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তারপর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে যখন স্বামী সারদানন্দ সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে পড়িতেন তখন হইতেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট

নিয়মিতরূপে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ঐ সময় হইতেই তিনি ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। পরস্পরের এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে ও ভ্রাতৃপ্রেমে পরিণত হইয়া, শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করিয়া যে মহাশক্তিশালী ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিল তাহা আজ দুর্লঙ্ঘ গিরি মরু সাগর কান্তার পার হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র শক্তিসঞ্চার করিতে ছুটিয়াছে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গলরোগে আক্রান্ত হইয়া কাশীপুর বাগানে রোগশয্যায় শায়িত তখন স্বামী সারদানন্দ তাঁহার অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক; শ্রীভগবান স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এবং কঠোর তপস্বী; দীর্ঘ দশ বৎসর সাধনান্তে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী সারদানন্দ জগদ্ধিতায় পাশ্চাত্য কর্মক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অনুগত সহকর্মী; তারপর ভারত-প্রত্যাগত হইয়া স্বামীজী-নির্দিষ্ট পথে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণের সহিত তিনিও বিন্দু বিন্দু শোণিতদানে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পোষণকর্তা। লোককল্যাণসাধনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পুষ্টির জন্য যখন তাঁহার শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু নিঃশেষিত হইয়াছে তখন আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি।

লোকহিতায় এই মহাপুরুষের অখণ্ড অনবদ্য জীবনকে আমরা বহুরূপে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি তাঁহাকে উদ্বোধনের সম্পাদক এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ,' 'ভারতে শক্তিপূজা' 'Stray thoughts on the Literature and Religion of India' প্রভৃতির শক্তিমান লেখকরূপে, বক্তৃতামঞ্চে অপূর্ব বক্তারূপে, সঙ্ঘের পরিচালকরূপে, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্যরূপে, জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর একনিষ্ঠ সেবকরূপে, মাতৃজাতির সেবার জন্য 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতারূপে, সুরজ্ঞ গায়করূপে, লোকগুরুগণের ভাব কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য শ্রীশ্রীমাতৃদেবী, আচার্যবর স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধিমন্দির নির্মাতারূপে এবং সর্বশেষ--

সমষ্টি ও ব্যষ্টি মানবের মুক্তির জন্য সকলের অকৃত্রিম সখা, স্নেহময় পিতা এবং উপদেষ্টা ধ্যানী ও জ্ঞানী গুরুরূপে। তাঁহার জীবনের এক একটি দিক, এক একটি ভাবের নিখুঁত সম্পূর্ণ ছবি। যে ভাব তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার জন্মজন্মান্তরের ঐকান্তিক সাধনা তাহা বিন্দুমাত্র অসম্পূর্ণ থাকিতে দেয় নাই। সেই বিভিন্নমুখী ভাব ও পূর্ণ সাধনা সহায়ে তিনি যুগাবতারের কার্য বহুবার সম্পাদন করিয়াছেন, এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি 'ঋষি' (যিশু)খ্রিস্টের দলেও দেখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে পড়িতেছে। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তখন স্বামী সারদানন্দের সহিত অল্পদিন মাত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ উদ্বোধন কার্যালয়ে আসিয়া তাঁহার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন এবং কথাবার্তা শুনিতেন। একদিন কি জানি কি ভাবিয়া ক্ষীরোদবাবু বলিয়া ফেলিলেন, মহারাজ, সেন্ট পিটারের সহিত আপনার বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—রোমে সেন্ট পিটারের স্ট্যাচু (statue) দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে এ কথা তিনি মঠেও বলিয়াছেন। এই যে ইঙ্গিত, ইহাই অন্যান্য সিদ্ধ সাধক হইতে যুগাবতারের পার্ষদগণের বিশেষ পার্থক্য। জন্ম-মরণের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সিদ্ধ পুরুষ চলিয়া যান, তিনি আর ফিরিয়া আসেন না। কিন্তু এই শ্রেণির মহাপুরুগণ জীব-দুঃখে কাতর হইয়া, মুক্তির পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য শ্রীভগবানের সহিত স্বেচ্ছায় আগমন করেন এবং চিরজীবন জীবসেবায় কাটাইয়া যান। জীবের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াও কিন্তু তাঁহারা মনে করেন না যে, কাহারও উপকার তাঁহারা করিতেছেন, অন্যের সেবা করিবার অধিকার পাইয়া নিজেরা ধন্য হইতেছেন—ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর হইতে এ পর্যন্ত বহু নরনারীকে ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সহায়তা করিলেও, স্বামী সারদানন্দ নিজেকে কখনও 'গুরু' ভাবিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরই জগদ্‌গুরু। ইদানীং দীক্ষা দিবার জন্য প্রায়ই দ্বিপ্রহরাবধি তাঁহাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইত। পরিণত বয়সে অসুস্থ দেহে শরীরের উপর নিত্য এইরূপ অত্যাচার হইলে শীঘ্রই উহা একেবারে ভাঙিয়া যাইবে—মনে করিয়া আমাদের

একজন তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন—"কিছু দিনের জন্য দীক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখিলে কিংবা সংখ্যা কমাইয়া দিলে ভাল হয়, নতুবা আপনার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে।" তাহাতে পূজ্যপাদ মহারাজ উত্তর করিয়াছিলেন—"কাহাকেও ভগবানের নাম শোনাইবার অধিকার হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না। আমি যে অন্যকে ঠাকুরের নাম শোনাইতে পারি—ইহা আমারই পরম সৌভাগ্য। তাহাতে শরীর অসুস্থ হইল তো কি হইবে?" স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগীর জন্য এই আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"অন্যের দুঃখ কষ্ট অপনোদন করিয়া ভাবিও না যে, তুমি তাহার কিছু উপকার করিলে, তাহার সেবা করিবার অধিকার পাইয়া নিজে ধন্য হইয়াছ—ইহাই মনে করিও।" স্বামী সারদানন্দ এই আদর্শের জীবন্ত প্রতীক—এই সাধনার সিদ্ধ মহাপুরুষ। আদর্শ কর্মযোগী হইলেও শক্তিসাধনাই ছিল তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় সাধনা। তাঁহার সমস্ত ভাব, সমস্ত প্রেরণা, জীবনের সমস্ত ঘটনা ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সঙ্ঘটিত হইত। এই ভাবেরই পরিণতি 'ভারতে শক্তিপূজা'য় তিনি আংশিক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়া বিধৃত রহিয়াছে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার পরম রহস্য প্রকাশ করিতে গিয়া পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অর্পিত হইল।" "জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ প্রকাশ"—এই সত্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"হে বীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর অবহিত থাকিতে হইবে। তোমাকেই ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নারীপ্রতীকে জগচ্ছক্তিরূপিণী জগদম্বার পূজা করিতে হইবে। প্রবৃত্তির কুহকে ভুলিয়া তোমারই ধৈর্যচ্যুতি হইয়া পদস্খলিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। জানিও, ভারতের তন্ত্রকার তোমার জন্য নিশিপূজার বিধান করিয়া তোমাকে দিবাপেক্ষা নিশিতেই অধিকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত করিতেছেন—কারণ হিংস্র শ্বাপদকুলের ন্যায় ভীষণ ইন্দ্রিয়গ্রাম

নিশার তিমিরাবগুণ্ঠনেই নিঃশঙ্ক প্রচরণে সাহসী হইয়া উঠে। ভাবিও না, নিষ্কামভাবে নারীপূজা তোমার ভাবাশ্রয়ে হইবার নহে। নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম বৃদ্ধ দম্পতির শরীরসম্বন্ধ উঠিয়া যাইয়া পরস্পরের প্রতি ঘনীভূত প্রেমসম্বন্ধে অবস্থিত হইবার কথা একবার স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, পুরুষের নিকট রমণী তখন সখীভাবে পরিণতা; অথবা রমণীতে এবং জননীতে তখন আর বিশেষ প্রভেদ কোথায়? কালধর্মে তাহারা তখন যে অবস্থায় উপনীত, অবহিত থাকিয়া সাধনাসহায়ে সর্বকাল নারীর সহিত তোমায় ঐভাবে অবস্থিত থাকিতে হইবে, তবেই তোমার ভাবসিদ্ধি উপস্থিত হইবে। বিপদ সমূহ, কিন্তু তজ্জন্য তোমাকে তোমার গুরূপদিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিতে বলিতে পারি না। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাহারও ভাব কখনও নষ্ট করেন নাই বা কাহাকেও তদ্রূপ করিতে শিক্ষা দেন নাই। অবহিত থাকিয়া, ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুদ্ধভাবে উপাসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে জগদম্বার দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইবে—গুরুভক্ত, শ্রদ্ধাবান, সাধক, এই কথা তোমাকেও তিনি বারবার বলিয়া অভয় দিয়াছেন। অতএব জগদ্‌গুরুর শ্রীপাদুকার ধ্যান করিয়া, তাঁহার ঐ অভয়বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবহিত হইয়া শক্তিপূজায় অগ্রসর হও—ধন্য হও।"

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ নবীন ভারতকে শক্তিপূজায় আহ্বান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভোগলুব্ধ আধুনিকের ঐ পূজার সামর্থ্য কতটুকু তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। জানিতেন, ঐশী শক্তি সহায় না হইলে দুর্বল ভারত শক্তিপূজা করিয়া কখনও শক্তিমান হইতে পারিবে না। তাই ঐশী শক্তিরই রূপান্তর গুরুশক্তির নিকট নবীন ভারতের জন্য আচার্যবর বারংবার প্রার্থনা করিয়াছেন—"হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো! তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু সম্যক প্রস্ফুটিত কর। তোমাকে বারবার প্রণাম করি। তোমার কৃপায় প্রত্যেক ভারত-ভারতী নবীন আধ্যাত্মিক জীবনের দিব্যভাবের অমিত তেজে সম্যক উদ্বুদ্ধ হউক এবং শ্রদ্ধাসহকারে তোমার পূজা করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদানে সমর্থ হউক। হে শ্যামা, গুরুরূপিণি! পদাশ্রিত ভারতে নবযুগে

নবশক্তি সঞ্চারিত কর। যাহাতে তোমার শ্রীমূর্তির জীবন্ত প্রচারে সে চির কৃতার্থ হইতে পারে, অপরকেও তদ্রূপ করিতে পারে।"

নবীন ভারত গড়িবার জন্য স্বামী সারদানন্দ জগজ্জননী শ্যামার নিকট যেমন এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়াছেন, তেমনি পতিত ভারতে শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্থায়িত্ব-কল্পে আজীবন তিনি কঠোর কর্মেরও অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কর্মপদ্ধতি সাধারণ সকলের কর্মপদ্ধতি হইতে পৃথক ছিল। কর্মক্ষেত্রে কর্মীকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। যাহাতে কর্মীর অন্তর্নিহিত শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ হয়, এইজন্য কর্মের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া দূর হইতে লক্ষ্য করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে সাহায্যের জন্য তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। ইহাই ছিল তাঁহার কর্মের কৌশল। কর্মক্ষেত্রে কর্মীর আর একটি জিনিসের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত—যেন তাহার ভাব নষ্ট না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিষ্যগণকে বারংবার সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, "কাহারও ভাব নষ্ট করিও না।" কর্মীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বামী সারদানন্দ শ্রীগুরুর এই সতর্ক-বাণী কায়মনোবাক্যে মানিয়া চলিতেন। শরীর ত্যাগের কিছুদিন পূর্বেও আমরা তাঁহাকে নিজমুখে বলিতে শুনিয়াছি, "কোন organisation-এ যোগদান করিয়াছে বলিয়া কি কাহারও ব্যক্তিগত কোন মতামত থাকিতে পারে না? এ কি রকম কথা?" কিন্তু ইহাও তিনি চাহিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবানুযায়ী তাঁহাদের পদানুগ কর্মিবৃন্দের মতামত গঠিত হউক, কারণ তাঁহারা যে ভাব দিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্তমান যুগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক।

সংহতি শক্তির পুষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য স্বামী সারদানন্দ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যেমন 'মিশনে'র সম্পাদকতা করিয়াছেন, ব্যক্তিত্ব বিকাশকল্পে কর্মী, সাধক, ভক্ত, বালক, যুবক, বৃদ্ধ—তিনি সকলেরই সহিত তেমনি নানাভাবে অত্যন্ত অন্তরঙ্গের ন্যায় মিশিয়াছেন। কাহারও নিকট তিনি গুরু, পিতা, নেতা, আবার কাহার নিকট সখা, সমবেদক ও আশ্রয়দাতা। প্রয়োজন হইলে তিরস্কাব করিয়াছেন আবার ভালবাসিয়াছেন, যাহাকে সকলে ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে

কোল দিয়াছেন। আশ্রিতের সকল বিপদ নিজ বিশাল বক্ষে অবিচলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কত দিন কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত যে, ঐ বিশাল বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অচল, অটল ও অক্ষুব্ধ। মনে হইত—পর্বত শৃঙ্গেরও শক্তি ও ধৈর্যের সীমা আছে, অশনিপাতে তাহাও খসিয়া পড়ে, কিন্তু এই মহাপুরুষের শক্তি ও ধৈর্য অসীম; বজ্রের বহ্নিজ্বালাও বুঝি এই শান্ত শীতল বক্ষের স্পর্শে নিভিয়া যায়! কত দুঃখী, শোক-তাপগ্রস্ত নরনারী যে তাঁহার নিকট আসিয়া, তাঁহার কাছে ক্ষণকাল বসিয়া শান্তি পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সেদিনও তাঁহার শেষ অসুখের সময় জনৈকা সদ্য স্বামিহারা স্ত্রী-ভক্ত নয়নজলে ভাসিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। আসিয়া, তাঁহাকে রোগশয্যায় শায়িত দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "একি ঠাকুর! এখানে আসিলাম একটু জুড়াইবার জন্য, আবার এখানে তুমি একি করিলে?"

শুধু তিনি কেন? অনেককেই নানা অবস্থায় পড়িয়া নিরাশ্রয় হইয়া এইরূপে কাঁদিতে হইবে; অনেককেই তাঁহার চরণ-চিহ্ন নয়নজলে চিরদিন সিক্ত করিতে হইবে। সকলের জন্য তাঁহার কল্যাণ চিন্তা, যাহা সর্বদা জাগ্রত থাকিত, তাহা আজও নিশ্চিত আমাদিগকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার ভক্ত ও প্রিয়জনের মন তাহাতে প্রবোধ মানিবে না, উহার চিন্তা তাহাদের অশ্রুর পরিমাণ হ্রাস না করিয়া বৃদ্ধিই করিবে। তাঁহার মহাসমাধির দিন অসংখ্য সাধু, ভক্ত ও নরনারীর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় হইতে যে রুদ্ধ-ক্রন্দন নিষেধ না মানিয়া ধারায়-ধারায় বাহির হইয়াছে, তাহা চিরদিন অবিচ্ছিন্নভাবেই ঝরিতে থাকুক, কারণ তাঁহার বিরহব্যাকুল নয়নাশ্রু আমাদের অন্তরের আবিলতা বিধৌত করিয়া একদিন তাঁহারই নিকট আমাদের লইয়া যাইবে। কেন না, আমাদের আচার্যবরের 'স্তব্ধীভূত বাসনাজাল', 'স্তিমিত সলিলরাশি—প্রখ্যামাখ্যাবিহীন', 'বিগতভেদাভেদ শমিতসর্বনামরূপ' বর্তমান যে নিত্য অবস্থা তাহাই যে তাঁহার সকল ভক্তের, সকল শিষ্যের এবং সকল সন্তানের একমাত্র গতি—একমাত্র মুক্তির স্থল।

মহাসমাধির সংবাদ

মাধুকরী

পূজ্যপাদ্ স্বামী সারদানন্দ

বাঙলার নবযুগের নবীন সন্ন্যাসের গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণগিরিচূড়া ভাঙিয়া পড়িল, শান্ত গম্ভীর নিস্তরঙ্গ জ্ঞানসমুদ্র শুকাইয়া গেল, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজী, নরলীলা সম্পূর্ণ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

ভবিষ্য-ভারতের মহা-অভ্যুত্থানের আদর্শরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আদর্শ দেশ তথা জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"—সেদিন যাঁহারা ত্যাগ, তপস্যা, চরিত্রবল, বিদ্যা লইয়া সে আদর্শ-প্রতিষ্ঠা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। অলোকসামান্য প্রতিভা, অপূর্ব বাগ্মিতা, প্রখর পাণ্ডিত্যের সহিত শিশুর সারল্য ও বজ্রের দৃঢ়তা—তাঁহার মধ্যে কঠোর তপস্যার উত্তাপে গলিয়া একটা গোটা মানুষ গড়িয়াছিল—সম্মুখে দাঁড়াইলেই সেই মানুষটির পরিচয় যেন প্রাণে আসিয়া ধরা দিত—মন বলিত, নরের মধ্যে ইনি নরদেব! যে দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে, সেই ধন্য হইয়াছে!

শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে কলেজের ছাত্র বিংশতি-বর্ষীয় যুবক শরচ্চন্দ্রের আসিয়া আত্মসমর্পণ, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রচর্চা, তপস্যা, তীর্থপর্যটন, তারপর বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অভ্যুদয়ের পর বেদান্ত প্রচারে ইংলন্ড ও আমেরিকায় গমন, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকত্ব গ্রহণ—মঠ ও মিশনের শৈশবেই তাহাকে অনাথ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রস্থানের পর গুরুভ্রাতৃগণের সহিত একত্রে

ধর্ম-সঙ্ঘ ও কর্মপ্রতিষ্ঠানের রক্ষা ও পরিপুষ্টির গুরুদায়িত্ব সুদীর্ঘকাল একাগ্র নিষ্ঠায় পালন, মনুষ্য জাতির পরম কল্যাণের জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনা, তারপর বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন আহ্বান, কর্মী, শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট মিশনের মূল লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে সর্বশেষ উপদেশ দান, অবশেষে সর্ব কর্ম সমাপ্ত করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে দেহত্যাগ। কত বড় একটা কর্মময় জীবন যে তিনি ভবিষ্যদ্বংশধরদিগের জন্য রাখিয়া গেলেন, আমাদের সাধ্য নাই—স্পর্ধা নাই যে, তাহার কিয়দংশও অনাবৃত করিয়া দেশকে দেখাই!

বাঙালি অতি সহজেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠে, কোন আদর্শই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিরলস নিষ্ঠায় বহন করিতে পারে না, বাহিরের বাধা ও ভিতরের দৌর্বল্য তাহার আদর্শকে ম্লান করিয়া ফেলে, সাধনা ব্যর্থ করিয়া দেয়, কর্মপ্রতিষ্ঠান খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এই মতের একটা জীবন্ত প্রতিবাদ। উদার অধ্যাত্ম দৃষ্টি, অপূর্ব চরিত্রবল, স্বার্থলেশহীন মানবকল্যাণৈকলক্ষ্য কর্মযোগ, প্রগাঢ় স্বদেশপ্রীতি, শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ছিল, আর তাহা ছিল বলিয়াই ত্রিশ বৎসর কাল স্বামী সারদানন্দজী গুরুভ্রাতাগণের সহিত একত্র হইয়া সম্পাদকরূপে অপূর্ব দক্ষতার সহিত বিভিন্ন কর্ম ও সাধনার কেন্দ্রগুলি পরিচালন করিয়া গিয়াছেন এবং বিদায়ের কিছুকাল পূর্বে জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, "সঙ্ঘকে পবিত্র রাখিও, প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শনিষ্ঠা অব্যাহত রাখিও, যশ অহঙ্কার আত্মগৌরব যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে। সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা ভুলিয়া যাইও না।" আর কর্তব্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার তপস্যালব্ধ যে সকল ভাব জগৎকে দান করিয়াছেন, তাহা যদি আমরা জীবনে পরিণত করিতে পারি, তবে তো কথাই নাই, আমাদের জীবন ধন্য হইবে; যদি এই বিষয় আমরা চিন্তাও করিতে পারি, তবে দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়াই আমাদের দেশের বর্তমান দুর্দশা!"

হে স্বামিন, হে আচার্য, তোমার এই মহাবাণীই আমাদের যাত্রাপথের সম্বল, তোমার ত্যাগপূত গৈরিক-দীপ্তি নিত্যধাম হইতে তোমার দুঃস্থ স্বদেশবাসীকে পথপ্রদর্শন করুক। যে জাতির সমষ্টি-মুক্তির সাধনায় তুমি জীবন অতিবাহিত করিয়া গেলে, সেই জাতির কল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণের যাহাতে আমরা যোগ্য হই, সেই আশীর্বাদ কর।

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগে ভারতবর্ষের দরিদ্র, আর্ত, বিপন্ন জনগণ একজন প্রধান বন্ধু হারাইল। মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, ভূমিকম্পে, ঝড়ে, অগ্নিকাণ্ডে—গ্রাম, নগর, জেলা, প্রদেশ বিপন্ন হইবামাত্র রামকৃষ্ণ মিশন সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। স্বামী সারদানন্দ এই মিশনের অন্যতম সংগঠক এবং স্থাপনের সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ কঠোর তপশ্চর্যায় অতিবাহিত হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা অনুসারে তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং গীতার কর্মোপদেশ কি প্রকারে জীবনে মূর্তিমান হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ঠিকই বলিয়াছেন যে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে যে আগুন ছিল, তাহাই তাঁহাকে অবিচলিত চিত্তে সংসারের কাজ করিতে সমর্থ করিত। তিনি জনহিতকর কার্যের জন্য যত রকম সাহায্য পাইতেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিতেন এবং রিপোর্টে সমস্ত হিসাব দিতেন। তাঁহাকে লোকে যে সাহায্য পাঠাইত, তাহার একটা প্রধান কারণ ছিল, তাঁহার মহৎ চরিত্রে বিশ্বাস, কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত হিসাব রাখা ও প্রকাশ করাও অন্যতম কারণ বলিয়া আমাদের ধারণা। যাঁহারা জনহিতকর অরাজনৈতিক, রাজনৈতিক কোন কার্যের জন্য সর্বসাধারণের টাকা

রাখেন, খরচ করেন, তাঁহারা সকলে স্বামীজীর এই গুণটি লাভ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

SWAMI SARADANANDA

DEATH OF THE SECRETARY OF THE RAMAKRISHNA MISSION

Swami Saradananda, the Secretary of the Ramakrishna Mission, passed away on Friday, at the *Ramakrishna Math*, *Udbodhan* Office, Baghbazar, Calcutta. A direct disciple of Sri Ramakrishna, he lived a life of strenuous prayer and austerity for several years at Baranagore. Puri, Brindaban, Benares and the Himalayas. At the call of Swami Vivekananda in 1896 he went to London and after working there for some time sailed for America where he preached the message of Vedanta for about two years.

He helped Swami Vivekananda to found the *Ramakrishna Math* and to organize the activities of the Ramakrishna Mission. He acted as the Secretary from its inception and was practically the executive head of the whole organization. Swami Saradananda made extensive preaching tours in Guzerat, Kathiawar and Eastern Bengal. The present progress and development of the Sister Nivedita Girls' School owes not a little to his fostering care and close supervision. He edited the Udbodhan for a long time and was the author of several important books, the principal of which is the philosophic treatise on his master's life. --*Statesman, 21-8-27*

THE LATE SWAMI SARADANANDA

TRIBUTE TO THE RAMAKRISHNA MISSION

In moving the resolution expressing sorrow at the death of Swami Saradananda and condolence with the members of the Ramakrishna Mission, Babu Sachindra Nath Mukerjee said at the meeting of the Calcutta Corporation held on Wednesday that a Prince among men had passed away, whose purity of life, loftiness of aims and principles and absorption in a high ideal had entitled him to the reverence and regard, the respect and admiration of his countrymen. It might be said that a Sannyasin is civilly dead but not so the late Swami and his comrades of the religious Order to which he belonged, who had taken their rightful place in the life of the people and laid themselves out for the alleviation of pain and misery. Whenever the call came from any quarter the Ramakrishna Mission was ready and prepared to give their best without any distinction of caste or creed. They were like a band of ministering angels, who extended their right hand of sympathy and fellowship to all who suffered from the ravages of Nature–pestilence or famine. To the speaker, it was a matter of no little surprise that not long ago, the Ramakrishna Mission was looked upon in certain high official quarters with sinister eyes of mistrust and suspicion. This showed how the officials were alien to the realities of things in the country and failed to feel aright the pulse of the people The late Swami sat at the feet of his Master, the Prophet of the new age in India and received from him the message which he promulgated by his life and teachings both here and abroad. In America he was the comrade-in-arms of the late Swami Vivekananda and the two fought together for dissipating the

prevailing prejudice and ignorance of the sublime ideals, traditions and culture of Hindusthan. They went, saw and conquered and the cause of Sanatan Dharma had made such progress as must be gratifying to all lovers of Hindu thought. Though dead, the Swami would live in the Ramakrishna Mission which was in a great measure the out-flowing of his genius and powers of organisation. He had left all he had and followed his Master and the country was all the richer by his sacrifices, his beneficent endeavours and altruistic activities. The speaker concluded by paying a glowing tribute to Paramhansa Ramakrishna and his disciples who had deepened and developed the moral and spiritual forces in the country and carried on such a tough fight against ignorance and ailments, want and penury, suffering and distress, which are unfortunately so much abroad, despite the outward glamour of British rule. –*Bengalee.*

একখানি চিঠি

শ্রী—

প্রিয়—

এই করিয়াই কি মহামায়া খেলা করেন? হায় হায়! এবারে যে একেবারে সব শেষ করিয়া দিলেন! আর তো কিছুই রহিল না। একটু দাঁড়াইবার, জ্বালা জুড়াইবার শেষ আশ্রয়টুকু ছিনাইয়া লইয়া গেলেন। কি বলিব—বুকের ভিতরটায় যে কি হইতেছে তাহা আমি জানি, আর আমার অন্তর্যামী যিনি আছেন তিনি জানেন। কি কুক্ষণে এবার বাহির হইয়াছিলাম। এতদিন আশেপাশে ঘুরিয়া ও নানাভাবে তাঁহারই অহেতুক স্নেহ করুণার আবরণে জীবন ধারণ করিয়া শেষে এই হইল যে, শেষ সময়ে তাঁহার একটু শ্রীচরণ সেবা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। কত কথা, কত স্মৃতি মনে পড়িতেছে; তাহা লইয়াই ভগ্নহৃদয়ে চোখের জল আর হা-হতাশ্বাস সম্বল হইয়াছে। কিন্তু তবুও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সবই করিতে হইবে। শ্রীশ্রীমহারাজ বলিতেন, 'তপ্ত জলে খড় পোড়ে না।' আজ আমার অবস্থা তাহাই হইয়াছে। অসহ্য উত্তাপ, কিন্তু পুড়িয়া মরিব না। ধন্য মহামায়া!

কি বলিব, যেদিন তাঁহার কাছে বিদায় ও আশীর্বাদ লইতে গেলাম, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা, শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে এসো।" মন্দভাগ্য আমি—ভিন্নরূপ করিয়া বসিলাম। আজ সেই কর্মেরই বোধ হয় ফলভোগ হইতেছে—পাঁজর ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ও তপ্ত চোখের জলে। ভারতের সীমান্ত প্রদেশ হইতে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং পত্রে তাহা পাইয়াছিলাম। ভীষণ কষ্টকর পথে চলিতে চলিতে কতবার কতভাবে তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলাম—কতবার যে ভীষণ বিপদের হাত

হইতে রক্ষা পাইয়াছি ও তাঁহার অমোঘ আশীর্বাদ ও ভগবানের দয়ার কথা মনে করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তখন কত ভাবিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের কাছে ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া আরো আনন্দলাভ করিব। আরো কত কি ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! আমার সব আশা ভরসার মূল ভগবান অলক্ষ্যে ছেদন করিয়া দিয়া একবারে পথে দাঁড় করাইয়া দিলেন। কি কর্ম লইয়া যে জন্মিয়াছিলাম আর কত অপরাধই যে মহারাজের শ্রীচরণে করিয়াছিলাম—বুদ্ধিবৈগুণ্য ঘটাইয়া ও বাসনার ফেরে ফেলিয়া তাই তিনি শেষে এই মনস্তাপরূপ ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্যই যেন এই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে আমায় সরাইয়া দিয়াছিলেন! পত্রে লিখিয়া আপনাকে আর মনোবেদনা কি জানাইব—আপনি আমাকে জানেন ও সবই বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার নিজের দিক হইতে দেখিলে তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন তাহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল কিছুই নাই—খুব সত্য কথা। রোগ ও জরাজীর্ণ দুর্বহ জীবনভার লইয়া তিনি এতদিন আমাদেরই কল্যাণের জন্য কতই না কষ্ট করিতেছিলেন! নিজের কর্ম সব শেষ করিয়াও মাত্র আমাদেরই জন্য এই ভীষণ সংসার মঞ্চে নানাভাবে জীবন-নাট্যের অভিনয় করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁহার জীবনের সেই অহেতুক নিঃস্বার্থ ভাবের বিন্দুমাত্রও তাঁহার প্রতি কি জীবনে, কি মরণে, কোন সময়েই দেখাইতে পারিলাম না। কেবল নিজেরা যে অমূল্য নিধি হারাইলাম, তাহাই ভাবিয়া শোক করিতেছি ও করিতে থাকিব।

তাঁহার শুভ আশীর্বাদ ও ইচ্ছার বলে নানাপ্রকার অবস্থা বিপর্যয় ও বিপদ অতিক্রম করিয়া গত ২২ আগস্ট তারিখে সবে আশ্রমভূমিতে পা দিয়াছি, আর অমনি তত্রত্য অধ্যক্ষ আমায় গলা জড়াইয়া ধরিয়া "আমাদের সব গেল"— বলিযা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মুহূর্তেক হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া থাকিতেই অকস্মাৎ মহারাজের মূর্তিখানি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা ভয়ানকভাবে কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাকুলভাবে কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে পর, তিনি মহারাজের অসুস্থ

সংবাদ দিয়া কয়েকখানি পত্র দেখাইলেন। তখনই ক্ষণিকের জন্য মনে আসিয়াছিল যে, এবারে হাট ভাঙিয়া গিয়াছে আর সেই সঙ্গে দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু অনিশ্চিতের উপর স্বপ্নেরও অগোচর চিন্তাকে এরূপভাবে মনে স্থান দিতেও ভয় হইতে লাগিল এবং নানাভাবে মনকে প্রবোধ দিয়া পরদিন কলকাতা রওনা হইব স্থির করিয়াছিলাম। তখন স্বামী—বলিলেন, তিনি পরদিবস একখানি তারের খবর কলকাতা হইতে পাইবার আশা করিতেছেন এবং আমাকে ঐ খবরটা জানিয়া পরে রওনা হইতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন তারের খবর আসিল—কলকাতা হইতে ১৭ তারিখে করা তার—"Sarat Maharaj improving but not out of danger." ঐ দিবসই বিকালে স্বামী—লিখিত একখানি পোস্টাকার্ড ও তারের খবর পাওয়া গেল। তারের খবরে ছিল—"Improving--hopeful" কিন্তু পোস্টকার্ডে এই খবর ছিল যে, wire পাঠাইবার পরই আবার এখানে তাঁহারা wire পাইয়াছিলেন, তাহার wordings এইরূপ—"Sudden change. Condition extremely grave." ইহা ১৮ তারিখের খবর। যাহা হউক এই খবর মাথায় লইয়া একপ্রকার পাগলের মতো অবস্থায় পরদিন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আশ্রম হইতে বাহির হই এবং প্রায় চার দিনের মধ্যে ৯২ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গতকল্য সকালে এখানে উপস্থিত হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া বজ্রাহতের ন্যায় পড়িয়া আছি। কলকাতা যাওয়া আর দরকার হইল না। শীঘ্র হইবেও না। ঐ হাহাকারপূর্ণ শ্মশানে যাইবার ইচ্ছা বা সাহসও আমার আর নাই। এইখানেই চারিদিকে যেন ভীষণ দাবানল জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহাতে আছে কেবল অসহ্য উত্তাপ, অগ্নির লেলিহান জিহ্বা নাই। তাহা থাকিবেও না, কারণ তাহা হইলে তো আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না!

বিভিন্ন বৃত্তি ও সংস্কার লইয়া জন্মিয়াও এতদিন আমরা সকলে এক একটি শীতল ছায়ার আশ্রয়ে বেশ কাটাইতেছিলাম—জ্বালা জুড়াইতেছিলাম, কিন্তু কালের নির্মম হাত, দৃশ্য জগৎ হইতে একটি একটি করিয়া ঐ আশ্রয়গুলি সরাইয়া লইতেছে। ইহার পর আরো যে কি হইবে জানি না—ভাবিতেও পারি

না, আর ভাবিবার অবসরও নাই। কিন্তু এবারে যাহা হইল তাহাতে আমাকে একেবারে নিরাশ্রয় করিয়া রাখিয়াছে। যে অপরিসীম ধৈর্য ও ক্ষমার দ্বারা তিনি আমাকে কোলে স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন, এ জগতে সে জিনিসের একান্ত অভাব হইয়া গেল। সে স্নেহ, সে দয়া ও সহানুভূতি তো আর কোথায়ও পাইব না! চারিদিক হইতে নিদারুণ যন্ত্রণা পাইয়া যখন অসহনীয় বোধ হইত তখন ঐ পায়ের তলায় বসিয়া দুটি মিষ্টি কথা শুনিয়া গা জুড়াইত। এখন তাহাও মিলাইয়া গেল। সম্বল কেবল অতীতের স্মৃতি, আর তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস। বাকি জীবনটুকু তাহা লইয়া কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হই।

(উদ্বোধন ঃ ২৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা)

স্বামিপাদ

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

ধর্মবীর—কর্মবীর—বীর সাধকাগ্রগণ্য,
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ মাঝে উজ্জ্বল-যতি-বরেণ্য;
স্বামীজীর দক্ষপাণি,
গুরুকার্যে প্রাণদানি,
গভীর সমাধি মুখে করিলে মহাপ্রয়াণ।
তোমার অভাবে আজি ধরা শোকে মুহ্যমান ॥১
প্রশান্ত সাগর সম গভীর হৃদয়বান,
রাগদ্বেষ লোভশূন্য—কঠোর-কর্মী মহান।
অপার করুণাধার,
মহাদ্বন্দ্বে নির্বিকার,
বাহ্য আড়ম্বরহীন ছিল তব কর্মগতি।
সাধ্যে তাই সিদ্ধি তব শ্রীকরে করিত স্থিতি ॥২
দেখিনি জীবনে কভু বিরক্তি বা প্রতিবাদ,
গলিত গঙ্গার ধারা বহমান আশীর্বাদ;
হেন ভক্তি ভাবুকতা,
হেন স্নেহ-প্রবণতা,
কদাচিৎ মরলোকে দৃষ্ট হয় ভাগ্যবশে।
দেবত্ব পাইল কত তোমার পদ-পরশে ॥৩
রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-মঠ-আশ্রম যত যথায়,
তব প্রেমে বদ্ধ ছিল সূত্রে মণিগণ প্রায়।
শত্রু-মিত্র উদাসীন
সবে তব স্নেহাধীন,

ভাগ্যবান সেই যেবা আসিল তব পরশে।
ব্যাপিল আ-বঙ্গ-ধরা তব শুভ্র জ্যোতি-যশে ॥৪
জয়রামবাটী মঠ-মন্দির কীর্তি মহতী
ঘোষিবে তোমার নাম—যতদিন সঙ্ঘস্থিতি।
মরুভূমি সমস্থলে,
সাজাইলে জলে ফলে,
কত বিদগ্ধ প্রাণে দিলে শান্তি শীতলতা।
ভুবন-ব্যাপিনী কীর্তি তব যে রহিল গাথা ॥৫
যে উদারভাবে সঙ্ঘ বাঁধা রবে ভবিষ্যতে
করিবে অশেষ কর্ম জগতে জীবের হিতে
সে ভাবের মর্মবাণী
শুনালে হয়ে অগ্রণী
প্রথম সঙ্ঘসভাতে—বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে।
গতবর্ষে—ন্যাসি-গৃহি-ভক্ত-সম্মিলন-দিনে ॥৬
শ্রীহীন হয়েছে সঙ্ঘ আজি তব অপ্রকটে
তব পূত দীপ্ত মূর্তি জাগিছে হৃদয় পটে।
'উদ্বোধন' মঠে আজ
পড়েছে নির্মম বাজ
শূন্য হেরি দশ দিশি হে যতি! তব বিহনে।
তব পূতস্মৃতি যেন জাগ্রত থাকে মননে ॥৭
গুরু কার্য সাঙ্গ করি—গিয়েছ চরণে তাঁর,
বহিয়া নিয়েছ শিরে—কত ভক্তজন ভার।
শ্রীচরণ শিরে ধরি,
তব পুণ্য নাম স্মরি,
এ দীন নয়ন নীরে—রচিল প্রয়াণ-গীতি।
আশীষ অন্তিমে পাই রামকৃষ্ণলোকে স্থিতি ॥৮

(উদ্বোধন ঃ ২৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা)